ওঁ

দেবব্রত ভীষ্ম।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি, এল প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

মূল্য—কাপড়ে বাঁধা ১৷৹
কাগজে বাঁধা ১৷৹।

Printed and Published by C. Guptasarama,

at the Kamala Printing Wor s,

3, Kashi Mitter's Ghat Street, Bagbazar,

উৎসর্গ।

বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া যাঁহার স্নেহে এবং যত্নে ও মুক্ত হস্ততায় সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত অধ্যয়নের ভাগ্য [illegible]য় হইয়াছে, আমার সেই পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের করকমলে দেবব্রত ভীষ্মকে অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা, যেন জন্ম জন্ম তাঁহার ন্যায় অগ্রজের অনুজ হইতে পারি।

শ্রীআশুতোষ শর্ম্মা।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।

শ্রীগুরবে নমঃ।

এখনও পুরাতন সমাজ এবং পুরাতন ব্যবস্থা হইতে আমরা অধিক দূর যাইতে পারি নাই। ইচ্ছা থাকিলেও পারিতেছি না, প্রাচীন বন্ধনে অদ্যাপিও কিছু আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে। আলান অতি প্রাচীন হইলেও এখনও জীর্ণ হয় নাই দু চারিটা রজ্জু ছিঁড়িয়াছে সত্য কিন্তু মূল গুণটি এখনও নষ্ট হয় নাই।

পাশ্চাত্য প্রবৃত্তি ঝঞ্ঝার প্রবল ধাক্কায় কিয়দংশ মূল ছিন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু নিবৃত্তি রসায় বাঁধা সমাজতরণী কিঞ্চিৎ আলোড়িত হইলেও একবারে নঙ্গরহীন হইয়া ভাসিয়া যায় নাই।

ভাসিয়া না যাওয়ার প্রধান কারণ আমাদের দেশের দুইটি অক্ষয় আলোকস্তম্ভ—একটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপরটি কাশীদাসের মহাভারত রামায়ণ এবং মহাভারত বাঙ্গালীর সঞ্জীবনী সুধা; রক্তে অস্থিতে মজ্জায়, মস্তিষ্কে এবং হৃদয়ে চির অনুপ্রবিষ্ট।

পাদরীদিগের আপাতত মধুর বিরেচক ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় বাঙ্গালীর রক্ত দুষ্টি অপসৃত হয় নাই।

বাঙ্গালার কথক পাঠক যাত্রাকার ও কীর্ত্তনীয়া এবং বাঙ্গালীর দেবী মূর্ত্তি ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ বাঙ্গালীকে পুরাতন সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য বশত অতি অল্পদিনেই আমাদের একাল সেকালে পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে।

অধিক দিনের কথা নহে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর গৃহে যে তপ অধ্যবসায় সহিষ্ণুতা এবং ত্যাগ ছিল তাহার এখন কিছুই নাই।

আমরা স্কুলে এবং কলেজে যে শিক্ষা পাই তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক শিক্ষা গৃহে পাই। এই দুই শিক্ষার টানে পড়িয়া কেহ বা গৃহের দিকে কেহ বা গৃহের বাহিরে যাইতেছেন। এরূপ শিক্ষা বিভ্রাট পৃথিবীতে আর কোথাও আছে বলিয়া বোধ হয় না।

পূর্ব্বে প্রতি গৃহেই প্রায় একজন পিসি মা, মাসি মা জেঠাই মা থাকিতেন যাহারা নিরক্ষর হইয়াও আচারে এবং ধর্ম্মজ্ঞানে আজকালকার বহু পাণ্ডিত্যাভিমানীর নাসা কর্ণ ছেদন করিতে পারিতেন।

গ্রন্থকারের রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত অতি বাল্যকালে তাঁহার পিসিমার দ্বারায় পরিচয় হয়।

শ্রীচৈতন্য মন্দিরের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল আরতির সহিত শয্যাত্যাগ করিয়া হরিধ্বনিতে সমস্ত পাড়া মুখরিত করিতে করিতে আঙ্গিনা ঝাঁট দেওয়া গোবরজল দিয়া গৃহদ্বার পবিত্র করণান্তর পাড়ার অন্যান্য বয়স্থাগণকে সাথে লইয়া অনুদয়ে গঙ্গাস্নানে গমন তথায় প্রাতরবগাহনের পরে পূজাদি সমাপন করিয়া প্রত্যুষে গৃহে প্রত্যাগমন এবং সমস্ত গৃহ কার্য্যের পরে অগ্নির সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রত্যহ ২৫।৩০ জনের আহার প্রস্তত—আর সকলের ভোজনের পরে শাকাদি আহারের দ্বারা আপনার দেহ রক্ষা—আজকাল গল্পের মধ্যে পরিগণিত।

তদনন্তর সন্ধ্যা বন্দনাদির পরে বালক বালিকাদের একত্র করিয়া—স্নেহমাখা ভাষায় মহাপুরুষ চরিত্র বর্ণন এবং ধর্ম্মোপদেশ আজকার দিনে দিব্য বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহাদের সেই উপদেশ এবং কথা শিশু শ্রোতৃবৃন্দের ভবিষ্যৎ জীবনকে বৈধ গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে কত সক্ষম তাহা এখন সুন্দর

উপলব্ধি হইতেছে। যে বীজ ঐ পিসি মা মাসিমাদের নিকট হইতে আমরা পাই তাহা যৌবনে উপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ে এক শান্তিময় বৃক্ষে পরিণত হয় এবং উত্তর কালে সংসারে সুখ দুঃখ আশা নিরাশা হর্ষশোকের শ্রান্তি ও বৈষয়িক ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের অমৃতময় ফল প্রদান করে।

বহুদিনের কথা আমাদের গ্রামে শ্রীচৈতন্যের মন্দিরে ঝুলন পূর্ণিমায় এবং অন্যান্য সময়েও প্রায় যাত্রা পাঁচালী এবং কীর্ত্তন হইত।

সে কালে যাত্রাদি রাত্রিতে আরম্ভ হইয়া রাত্রিতেই শেষ হইত। আজকাল আর কালের কোন নিয়ম নাই।

রাত্রি জাগিয়া যাত্রা শুনিতে হইবে সেই অছিলায় স্কুল এবং পাঠশালার ছুটির বহু পূর্ব্বেই পলায়ন হইল, আহার করিলে নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহ অতিশয় প্রবল হয়—সেইজন্য অসুস্থতার ভান করিয়া আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক দুই একটা পয়সা কোন ক্রমে সংগ্রহ করিয়া মোদকালয়ে কিছু মুড়ি এবং মুরকি লইয়া রাত্রির মত জলযোগ হইল, অতঃপর আমাদের মত আরও অনেকে একত্র হইয়া ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া মহোল্লাসে ইতস্তত ভ্রমণপূর্ব্বক যাত্রা বসার প্রতীক্ষা হইতে লাগিল।

ক্রমশ নাট মন্দিরে ঝারে বাতি দেওয়া হইল আলোকে চিত্ত অধিকতর প্রফুল্ল হইতে লাগিল এবং প্রতি ৫ মিনিটে যাত্রা আরম্ভের সময়ের অবগতির জন্য তিলককাটা গোঁসাই প্রভুদের খোষামোদ আরম্ভ হইল; সন্তোষজনক উত্তর বড় কেহই দিতেন না। প্রতীক্ষা প্রায় উৎকণ্ঠায় পরিণত হইল—উৎকণ্ঠা এই যে যদি অধিক রাত্রিতে যাত্রা আরম্ভ হয় তাহা হইলে ভীষণা নিদ্রা রাক্ষসীর আক্রমণ হইতে কি করিয়া রক্ষা পাওয়া যাইবে।

পরামর্শ করিয়া স্থির হইল লবঙ্গ বা গোল মরিচ সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। যখন ঐ নিদ্রা মায়াবিনী আস্তে আস্তে চক্ষুর উপর আসিবে তখন লবঙ্গ এবং মরিচের চর্ব্বণে কটুতা দেখিয়া সে পলায়ন করিবে।

মন্দিরের ঘড়িতে ১০টা বাজিল, তখন চাকরেরা বাঁশের দরমা বিছাইতে লাগিল। প্রাণে অনেক শান্তি আসিল; ক্রমশঃ দরমার উপরে একখানি সহস্র দগ্ধ ছিদ্রযুক্ত চাদর যেন তাহাতে শত্রুপক্ষ ৮ ইঞ্চি গোলাবৃষ্টি করিয়াছে, হুরহুরি করিয়া বিছান হইল। বয়স্থদিগের ধুমপানের অত্যাচারে চাদর ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহাহউক আমরা বালক। আস্তরণের উৎকর্ষ অপকর্ষ আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। অনাবৃত দরমাই রাজাসন অপেক্ষা আদৃত ছিল;

আসরের নিকটে স্থান পাইবার জন্য একটা আন্তরিক চেষ্টা সকল বালকের এবং কখন কখন দুই একটা স্বার্থপর বৃদ্ধেরও দেখা যাইত।

কোন ক্রমে বসা গেল, যাত্রাওয়ালাদের "ঢোলক বেহালা তানপুরা ইত্যাদি যথাস্থানে রক্ষিত হইতে লাগিল— টুং টাং টুং করিয়া এক আধটা যন্ত্র বাঁধা হইতে লাগিল—বিরক্তির আর সীমা নাই, এ যন্ত্র বাঁধা ব্যাপারটা না থাকিলে বড় আনন্দ হইত! এদিকে এই সামান্য বিরক্তিকর সময়ের মধ্যেই নিদ্রা পিশাচী অলক্ষ্যে আপন অধিকার জমাইয়া লইত।

বালক বয়স সুস্থ শরীর নিশ্চিন্ত মন, তাহার পর প্রায় সমস্ত দিনই দৌড়াদৌড়ি; স্থির হইয়া বসা আর ত্রাণ নাই—নয়ন আর উন্মীলিত হইতে চাহে না—সজোরে তাকাইলেও উপরপাতা নীচে পাতাকে পরিত্যাগ করে না। দুই একবার পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতার গায়ে ঢলিয়া পড়ায় ভৎর্সনা এবং ধাক্কা পুরস্কার হইল—কিন্তু নিদ্রা এবার মোহিনী ভাবে আসিয়াছে, তার আকর্ষণ হইতে বাঁচা অসম্ভব; ধরাশায়ী হইতে হইল।

প্রাতঃকাল হইয়াছে—যাত্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—দরমা তোলা হইতেছে যাহারা দরমা তুলিতেছে তাহারা বিরক্ত হইয়া আমাদিগকে ঠেলিতেছে, আর বলিতেছে "খুব যাত্রা শুনিয়াছিস, যা বাড়ী যা।"

যাত্রা শুনিতে পাই নাই তত দুঃখ নাই, কিন্তু কি পালা হইল তাহাতে

কি কি আসিয়াছিল এ প্রশ্ন যখন পিসিমা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তার কি উত্তর দিব। এই চিন্তাই তখন প্রবল হইত। সুতরাং পিশিমা প্রশ্নোদ্যতা কিনা তাহা জানিবার জন্য তাঁহার সম্মুখ দিয়া সবেগে গমন অথবা তিনি যথায় কর্ম্মে ব্যস্ত সেই গৃহের বাতায়নে উকি ঝুঁকি ইত্যাকার উপায় অবলম্বন হইত।

কিন্তু পিসিমা তখন যাত্রা বিষয়ক প্রশ্ন ভুলিয়াছেন, গত রাত্রির উপবাস এবং অসুস্থতার কথা স্মরণ করিয়া মধু হইতেও মধুর ভাষায় "এদিকে আয় তোর জন্য ঠাকুরের প্রসাদ রাখিয়াছি খা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং ফুলের সাজি হইতে একটি পক্ক কদলি তিলের লাড়ু বা গুড়ের পাটালি সস্নেহে অর্পণ করিতেন তখন পিসিমা এবং তাঁহার ঠাকুরের উপর যথেষ্ট ভক্তি উপস্থিত হইত—প্রশ্নের আর ভয় থাকিত না।

পিসিমার উপর বড়ই বিরক্ত হওয়া যাইতে, যখন তিনি স্ত্রীজাতি হইয়াও যথেষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানের এবং ধর্ম্মবিষয়ের পরিচয় দিতেন—তখন তাঁহাকে মুখভঙ্গী এবং কিঞ্চিৎ কর্কশবাক্য প্রত্যর্পণ যে হইত না তাহা নহে।

তাহা হউক কিন্তু সন্ধ্যার সময় যখন ভূতের ভয়ে এবং শারীরিক শ্রান্তিতে দৌরাত্মের সুযোগ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিত তখন পিসিমার উরু-দেশকে উপাধান করিয়া ভাঙ্গাছাদের উপর ছিন্ন মাদুরে শয়ান হইয়া চাঁদের গায়ে বুড়ী এবং তাহার চড়ক ও ষাঁড়ের প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতাম। আর পিসিমার মুখনিসৃত সুধাসিক্ত হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানবাস ভীষ্মের ত্যাগ অভিমন্যুর বীরত্ব—সীতার বনবাস—সাবিত্রীর উপাখ্যান—প্রহ্লাদের নিগ্রহ প্রভৃতি লোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত পুলকের সহিত শুনা যাইত—বাটীর পার্শ্বে বাঁশগাছ সকল শুভ্র জ্যোৎস্নায় ডুবিয়া অবগুণ্ঠনবতী কুলস্ত্রীর ন্যায় তাহারা যেন নতশিরে সেই পবিত্র কথামৃত পান করিত।

এ রকমের মা এবং মাতৃস্থানীয়ারা আজকাল প্রায় অদৃশ্য হইয়াছেন এবং তাঁহাদের স্থানে, সংযম বিরতা গন্ধগোকুলার ন্যায় আঘ্রাণময়ী এবং মাছরাঙ্গা পাখীর ন্যায় বহু বর্ণে বিভূষিতা মিসেস পদ প্রার্থিনী এক অভিনব বঙ্গ ললনায় আগম হইতেছে।

ইঁহাদের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। অথচ বর্ত্তমানেরও কিছু সঞ্চয় নাই, অন্যের নিকট ঋণই ইঁহাদের প্রধান সম্বল। ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী জাতি ইঁহাদের স্তন্যে এবং পালনে গুরু কর্ত্তব্যের ভার বহিতে পারিবে কি? অথবা সংযমের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন এবং অতীতের মহাপুরুষগণের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে—দেশহিতৈষী চিন্তা করুন।

ইহার মধ্যেই দেশে অনেক "ছাটা চুল ফোটা ফুল" রকমের বাঙ্গালী সাহেব আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের সহচরীগণও অবশ্য সাহেবনী হইবেন। সুতরাং ব্রত নিয়ম ইত্যাদির অন্তর্ধান অবশ্যম্ভাবী।

বাল্যে পিসিমার ঋণ ব্যতীত এই গ্রন্থ রচনায় স্বামী হরিহরানন্দ কৃত পাতঞ্জল দর্শনের নিকট আমি যথেষ্ট ঋণী। অল্পমূল্যে শাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসী পত্র অনেক বঙ্গবাসীর উপকার করিয়াছে—আশীর্ব্বাদ করি, বঙ্গবাসী চিরস্থায়ী হউক।

দোষ সমস্তই গ্রন্থকারের। এ পুস্তক বিশেষজ্ঞের লেখনী হইতে হইলেই ভাল হইত। অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছি, ভগবান ক্ষমা করুন।

জামুই।
৮ই পৌষ, ১৩২৩।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধিপত্র।

প্রুফ দেখায় শৈথিল্যবশতঃ, অনেক বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। উদ্ধৃতাংশেই অনেক ভুল আছে, মোটা ভুলের কিয়দংশ সংশোধিত হইল। দোষ গ্রন্থকারের।

পত্রাঙ্ক	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	৬	প্রয়াশ	প্রয়াস
ঐ	১৮	প্রসৃতী	প্রসৃতি
৶০	১৪	অগ্নিকেস্থিত	অন্তিকেস্থিত
ঐ	১৯	সর্ব্বভূক	সর্ব্বভুক
ঐ	২০	নির্ভুল	নির্ভুল
ঐ	৭	সুপকার	সূপকার
ঐ	৮	কুষাথাত	কশাঘাত
ঐ	১৪	ইষদুষ্ণ	ঈষদুষ্ণ
ঐ	১৫	শশুড়ী	শাশুড়ী
ঐ	ঐ	পটিয়সী	পটীয়সী
।০	১৬	স্ফুর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি
।/০	৩	বীজানু	বীজাণু
ঐ	১৪	বস্ত্রা	বস্ত্র
॥০	২	সিন্দুর	সিন্দূর
॥/০	৪	ময়ুব	ময়ূর
॥৶০	৩	দণ্ড	দন্ত
॥৵০	১৭	বিন্যাশ	বিন্যাস

পত্রাঙ্ক	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৸৹ •	২০	রাসবস্পর্দ্ধী	রাসভস্পর্দ্ধী
৸/৹	১৪	সবল	সচল
ঐ	১৬	আবাবমান	অযাচমান
ঐ	১৯	বিরদ্ধ	বিরক্ত
[illegible]	২১	শ্রোতের	স্রোতের
৫	১	প্রক্ষাপ্তবাদী	প্রক্ষিপ্তবাদী
[illegible]	৫	আধুনিক	আধুনিক
১[illegible]	২১	স্থত	সূত
১[illegible]	২৪	শাস্তির	শক্তির
ঐ	২৫	মাথুরিয়া	মাঞ্জুরিয়া
১[illegible]	[illegible]	ধবংশ	ধ্বংস
২[illegible]	[illegible]	স্বর্গশ্চ প্রতিস্বর্গশ্চ	সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ
২১	২[illegible]	ষষ্ঠী	ষষ্ঠি
৩২	১২	ভস্ম	ভস্ম
৩৬	১	অসপত্ন্য	অসপত্ন
ঐ	২৫	বাকসর্ব্বস্য	বাকসর্ব্বস্ব
৪৭	—	নাশংশে	নাশংসে
৫১	২	গৌনত্বের	গৌণত্বের
ঐ	৯	সুধিদিগের	সুধীদিগের
ঐ	—	ব্যাভিচার	ব্যভিচার
ঐ	২২	হরনে	হরণে
৫৩	৩	স্থূল	স্থূল
৫৪	১২	অসচরী বা চরিক	অসচ রা চরিক

পত্রাঙ্ক	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৯	৪	সুক্ষাম্বরধরা	সূক্ষ্মম্বরধরা
৬৬	১১	পরিচায়িকা	পরিচারিকা
৬৮	২০	ইন্দিবর	ইন্দীবর
৬৯	৭০	প্রত্যাহিক	প্রাত্যাহিক
৭২	১৪	নিস্যন্দিনী	নিষ্যন্দিনী
৭৩	২৭	উপপিচর	উপরিচর
৮১	২০	সুশা	সুষ্ম
৮৪	১	তাহা তুলিয়াছেন	গা তুলিয়াছেন
৮৯	২৫	সংসারিক	সাংসারিক
৯ম	২৭	উন্নিতা	উন্নীতা
৯৪	২৫	পবিত্র	অপবিত্র
৯৫	১০	সঞ্চ্যাং	সঞ্জয়ঃ
১৮০	৩	বাগ্মীতা	বাগ্মিতা
১১২	৫	দুর্জ্জেয় মানব বলিয়াছেন	বলিয়াছেন দুর্জ্জেয় মানব—
১২৪	২২	ধৃত	ধৃতরাষ্ট্র
১২৭	৪	বন্ধনাই	বন্ধনাই
১৪১	৩	তিনি	তবে তিনি
১৪৮	১৩	ব্যাথায়	ব্যাথায়
ঐ	৮	তাঁহাকে অস্ত্রের	অস্ত্রের তাঁহাকে
১৬৭	১০	মহাবপেটিকা	মহাচপেটিকা
১৬৯	—	বান	বাণ
১৭১	১৪	বক্রবাহন	বভ্রুবাহন
১৭৭	—	উত্তরায়ন	উত্তরারণ

পত্রাঙ্ক	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭৯	৯৬	ব্রহ্মার্য্য	ব্রহ্মচর্য্য
১৮৯	৩	অবজ্ঞাদর্শণ	অবজ্ঞাদর্শন
১৯২	৭	প্রঞ্চাশ	প্রকাশ
২০০	৮	শান্তি	শান্তি
২০১	৬	শান্তিভগের	শান্তিভঙ্গের
২১০	১০	আমিস	আমিষ
ঐ	১৯	বাঁধায়	ধাধায়
২১৪	১০	কুট	কূট
২২৯	৪	পর্য্ুসিত	পর্য্যুষিত
২২৩	৬	সন্বয়	সঞ্চয়
২২৭	২৪	হিরণ্যগ	হিরণ্যগর্ভ
২২৯	২১	সুকের	শুকের
২৩৬	৪	নিংসন্দ	নিষ্যন্দ
২৪১	১০	পূতুল	পুতুল
২৫০	১৬	বিন্দূ	বিন্দু
ঐ	২০	দ্রুয়পনের	দ্রুয়পনেয়
২৭০	২	গু	ও
২৭৪	২২	হীনপ্রত	হীনপ্রভ
৩১১	১	গুরুপদিষ্ট	গুরূপদিষ্ট
৩৬৭	১৩	শাল	শীল
		অকর্ম্মন্ত	অকর্ম্মণ্য

উপক্রমণিকা।

—:•*•:—

আধুনিক সমাজে এবং জাতীয়তায় দেবব্রত চরিত্র কীর্ত্তনের স্থান আছে এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। যখন প্রবৃত্তির এবং আদর্শের অনুকূল ও অনুরূপ বিষয় ও ব্যক্তির আলোচনা হয়, তখনই সেই বিষয় ও আলোচনা সমাজে ও জাতীয়তায় উপাদেয় বলিয়া স্বীকৃত হয়। বিরুদ্ধ গুণযুক্ত বিষয়ের আলাপন বৈতালিক ও শ্রুতিকঠোর হয়। বিকার গ্রস্তের কুপথ্যেই আশক্তি দেখা যায় এ কথাটা একটি প্রাকৃতিক তত্ত্ব।

বায়ুপিত্ত কফের বৈষম্যে যেমন দৈহিক বিকার উপস্থিত হয়, কাম ক্রোধাদির বিপর্য্যয়ে তেমনই মানসিক বিকার উপস্থিত হয়। শীতাতপ-কুপথ্যাদি শরীরধাতুর বিকৃতির কারণ। কুসঙ্গ কুচিন্তা এবং ভক্ষ্যাভক্ষের অব্যবস্থা তদ্রূপ মনের পরিবর্ত্তনের কারণ।

এ সকল কথা যেমন ব্যক্তিগত হিসাবে সত্য, তেমন সামাজিক এবং জাতিগত হিসাবেও সত্য।

যে সকল নিয়মে ব্যক্তিগত উন্নতি ও অবনতি সাধিত ঠিক সেই সমস্ত নিয়মেই সামাজিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সাধিত হয়। কেবল পরিমাণে বা সংখ্যায় পার্থক্য—প্রকৃতিগত বিভিন্নতা নাই।

বিজাতীয় আচার ও ব্যবহার সংঘর্ষে এবং বিজাতীয় চিন্তার তাল প্রমাণ তরঙ্গে জাতীয় ব্যবহার ও চিন্তা বিশেষ ভাবে চূর্ণিত হইয়া নিমজ্জিত হইয়াছে। চিন্তাই সর্ব্ব কর্ম্মের প্রসূতী; যখন সেই চিন্তাই বৈদেশিক ভাবে অনুপ্রাণিত তখন সেই চিন্তার ব্যক্তরূপ আমাদের ভাব এবং কর্ম্ম সমূহ বিদেশীয়গণের বাক্ত ভিন্ন আর কি হইবে। আমাদের আহার বিহার

পোষাক পরিচ্ছদ ধর্ম্ম কর্ম্ম সাহিত্য সঙ্গীত ভাব ও ভাষা সমস্তই একটা উদ্ভ্রান্ত সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে। দুই একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাক্।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গেই শয্যায় শায়িত হইয়াই—অর্দ্ধ শতাব্দী গতায়ু দ্বিজ পুঙ্গব নীড়স্থিত বায়স শাবকের ন্যায় 'চা' 'চা' 'চা' রবে চেঁচাইয়া উঠিলেন, যদি কোন ক্রমে কিছু বিলম্ব হইল তবেই তাহার পঞ্চ প্রাণ আলুলায়িত বেশে পলায়নপর হইয়া নবদ্বারের দিকে ছুটিল, যখন কিঞ্চিৎ চার্মর্চযন্ত্র যোগে গলাধঃকৃত হইয়া তাপহীন যন্ত্র সমূহে উষ্মা সঞ্চার করিল তখন তাঁহার প্রাণগণ পুনরাবর্ত্তন করিয়া প্রাতকৃত্যে মনোনিবেশ করিল।

তৎপরে কাষ্ঠ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইয়া অথবা প্রকাণ্ড উপাধানোপরি ন্যস্ত দেহভার হইয়া বিদেশীয় ভাষায় বিদেশীয় কর্ত্তৃক অনূদিত একখণ্ড বেদগ্রন্থ কিছুকাল অস্ফুটস্বরে পাঠান্তর মুখনিঃসৃত ধূমের সহিত অণ্ডিকেস্থিত বয়স্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ হিন্দুগণের এ বেদটা "চাষার গানই বটে" সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই, কারণ দেশীয় এবং বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে একমত।

তবে ইহা হইতে কতকগুলি সমাজতত্ত্ব স্পষ্ট বুঝা যায় যথা ঃ—জাতিভেদ বা আশ্রম ভেদ,তার নামগন্ধ নাই বিবাহ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, স্ত্রীগণের পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় অব্যাহত স্বাধীনতা, যুবতী বিবাহ নিয়ম, সকল রকম মাংসই শুদ্ধ এবং ব্যবহার্য্য। বিধবা এবং সধবা বলিয়া কোন একটী ঘৃণিত পার্থক্য নাই। কেবল কতকগুলা অস্থিচর্ম্মসার ব্রাহ্মণে রটনা করিয়া বেড়ায় যে বহুদিনের তপস্যা, গুরূপদেশ ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন বেদের অর্থ গ্রহণ হয় না—বাঃ তবে এই সর্ব্বভুক সাহেবটী কি ক'রে এই বেদের নির্ভুল অনুবাদ করিলেন !!! গোঁড়ামিতে দেশটা একবারে উচ্ছন্ন গিয়াছে।

কিছুকাল এই ভাবের আলাপের পরেই ঘটিকা যন্ত্র১০টা ইঙ্গিত করিল; তখন বেদ এবং বেদাঙ্গ তীব্র মন্তব্য হইতে রক্ষা পাইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। এবং সেই স্থিতিশীল অস্থি পেশী বর্জ্জিত অশেষ ব্যাধি নিকেতন কলেবর পিণ্ডে এক অপূর্ব্ব ত্রস্ত ব্যস্ত ভাবের আবির্ভাব অনুভূত হইল।

অতঃপর দ্বিজবর কাকস্নাত হইয়া প্রায়োন্মূলিত পলিতকেশ কলাপের শৃঙ্গার বিধান করিয়া অর্দ্ধপক্ক অত্যুষ্ণ অশুচি এবং অজ্ঞাতকুলশীল সুপকারের আনীত বিরুদ্ধ ভক্ষ্য কোন প্রকারে উদরসাৎ করনান্তর বিচিত্র বেশে শত কষাঘাত লাঞ্ছিত পৃষ্ঠ অস্থিরপদ অমনোযোগী অশ্বদ্বয়াকৃষ্ট শকটযোগে জীবনের চরমলক্ষ্য দাসত্ব প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং যাবৎ অর্কদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী না হইলেন তাবৎ অধীনতার বিচিত্র রসামোদে ফুল্লপ্রাণ হইয়া যামিনীর প্রথম যামে মুখ্য "হট্ট মন্দিরে" পলান্ন পিশোদনাদি পলাণ্ডুরসোনাদি রস সিঞ্চিত জীবদেহ নির্য্যাসাপ্লুত রসাভিষিক্ত ঈষদুষ্ণ ইন্দ্রিয়োন্মাদকর চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা স্ফীতোদর হইয়া রঙ্গমঞ্চে বারাঙ্গনা অঙ্গের লাস্যময় উদ্ভ্রান্ত ভঙ্গী দর্শন করিয়া নিশাশেষে স্খলিত পদে শয্যায় শায়িত হইলেন।

ইঁহারাই হইলেন সমাজের নেতা, সংস্কারক্ এবং বিধাতা, শিক্ষক ও ধর্ম্মবক্তা।

সমাজের অঙ্গনাগণের ভাবও এই ভাব, অনেকেরই "আসে যদি রুখিয়া তাড়াইব ঘুসিয়া" ভাবের প্রকৃতি।

স্বাতন্ত্র মন্ত্রে পূর্ণদীক্ষিতা এবং তদ্বিষয়ে সাধনাও বিলক্ষণ আছে; পতিপুরে পদার্পনের কতিপয় দিবস পরেই অনশনে ও নিশীত বাক্যবানে শশুড়ী-ননদী-জ্ঞাতি-কুটুম্বগণ বিতাড়ণ পটিয়সী হইয়া দেয়ালের সব কালী দুর্গা পুছে ফেলিয়া একমেবাদ্বিতীয়াং রূপে ভর্ত্তৃকুলে অবস্থান করেন।

"অস্তি নাস্তি ন জানাস্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ" জননী জঠর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর হইতেই এই বচনের সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

ব্রত, নিয়ম, সংযম, অতিথিসেবা, লজ্জা নম্রতা স্ত্রীত্য আর্জ্জব অতীত ইতিহাসের অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। ইহারা নব সভ্যতা আকাশের বিলাসময়ী বিচূর্ণ-শৃঙ্খল-বিহঙ্গী; ইঁহাদের অপ্রতিহত গতি, কোথায় কবে কি ভাবে আবির্ভূতা হন তাহার তত্ত্ব কে বলিতে পারে। হাটে, বাজারে, নাচে থিয়েটারে, শীতকালে সহরে নিদাঘে শৈলশৃঙ্গোপরে বিহার করেন।

ইহারাই ভবিষ্যৎ জাতির বর্ত্তমান প্রসূতী, পালনকর্ত্রী ও শিক্ষয়িত্রী।

এখন বর্ত্তমান সমাজের অবস্থার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল। বহুদিনের কঠোর সাধনায় সম্ভবতঃ এই উন্নতি লাভ হইয়া থাকিবে।

জাতীয় অবনতির সাধারণ পূর্ব্বরূপ আধ্যাত্মিক জাড্য বা প্রাণ হীনতা, সকল কর্ম্মেই একটা ওজন করা ভাব আসিয়া প্রবেশ করে। এই তৌল করা ভাবটি পতিত জাতিতে মৌলিক চিন্তার অভাবে এবং অসদনুকরণে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কিছুকাল আশ্রয় পাইলে এই জড়তা বাহিক সীমা অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মরাজ্যে আপনার অধিকার বিস্তার করে। প্রথমে আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদে পরিচয় প্রদান করে, ক্রমশঃ মনে চিত্তে ও হৃদয়ে বিষের ন্যায় বিসর্পিত হয়। তখন আর উপায় থাকে না, যে দিকে তাকাও সেই আকাশ গভীর নিমীলিত জাড্য বা প্রাণহীনতা, উদ্বোধনের সমগ্রদ্বার অর্গলিত। স্ফূর্ত্তি সম্পূর্ণ তিরোভূত যত্ন বা চেষ্টার সম্যক্ অভাব কেবল তম ভাবের এক ঘন আবরণে সর্ব্ব কর্ম্ম সর্ব্ব অনুভব এবং সর্ব্ব চিন্তা আচ্ছাদিত। পরমুখাপেক্ষা এই রোগের একটি প্রধান লক্ষণ, স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন ও আত্মনির্ভরতার তিরোভাব, ও আত্মপর জ্ঞানহীনতা

ইহার বাহ্যাবস্থা; এ রোগ অতি সংক্রামক এবং দুশ্চিকিৎস্য। চিত্ত মলিনতা বা প্রকৃত অনুভূতির অভাব ইহার ক্ষেত্র এবং বিলাস ইহার বীজাণু।

এ রোগ যখন সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হয় তখন অন্যান্য পদার্থের ত কথাই নাই এমন কি জাতীয় দেবতাগণও দেবত্ব এবং দিব্য বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া আমোদের এবং কৌতুকের উপকরণে পরিণত হয়েন। পূজা পদ্ধতি আচার সংস্কারাদি সামাজিক ব্যবস্থা সমূহ প্রাণ-হীন কঙ্কালমাত্রে উপস্থিত হয়। অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধা সকল কর্ম্মের মূলরূপে প্রতীয়মান হয়। আমিত্ব সকল ভাবের উদ্ভাবক হইয়া পড়ে।

যখনই কোন ব্যক্তিতে বা জাতিতে এই জাড্য বা প্রাণহীনতার আবেশ হয় তখন সেই পুরুষ বা জাতিতে অধ্যবসায়বৃত্তি অতিশয় সঙ্কুচিত হয়; ফল স্বার্থের আবির্ভাব এবং ত্যাগের তিরোভাব।

ত্যাগ বৈরাগ্যের অভিব্যক্তি; চিত্তের বিকাশ-বাচক সুতরাং সাত্বিক। যত্ন বা চেষ্টা না থাকিলে বিকাশ হয় না; এই যত্ন বা চেষ্টাবৃত্তির নামান্তর অধ্যবসায়। এই বৃত্তি সর্ব্বসিদ্ধির আকর এবং ইহাই প্রাণ।

আমিত্ব স্বার্থের জনক; আমিত্ব, অহংকার, চিত্তের সঙ্কোচক ক্রিয়া অন্যের নিমিত্ত চিত্তের যে অনুধাবনবৃত্তি, তাহা ইহাতে নাই, সুতরাং ইহা তামসিক। ইহাই অধঃপতনের প্রকৃষ্ট বর্ত্ম, পরিণাম মৃত্যু বা প্রাণহীনতা।

বর্ত্তমান হিন্দুজাতিতে বিশেষতঃ হিন্দু বাঙ্গালি জাতিতে এই প্রাণের বড়ই অভাব উপস্থিত; ফলতঃ তাঁহার সাত্ত্বিক এবং রাজসিক ভাব গুরু তমোভাবে আচ্ছন্ন। ফল দাঁড়াইয়াছে কর্ম্মে ক্ষাত্র স্থান। দৈহিক সমস্ত শক্তি রসনার আশ্রয় লইয়াছে। যাহা কর্ত্তে
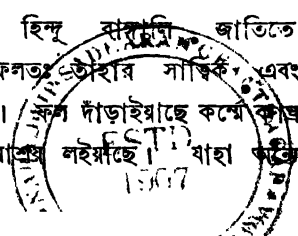
তন্ত পদাদির দ্বারা করিতে যায় বাঙ্গালি তাহা জিহ্বার সঞ্চরণে সিদ্ধ করিতে চাহেন।

অধিক দার্শনিক পরিভাষার প্রাচুর্য্য প্রকাশ না করিয়া দু একটা প্রকৃত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই বাঙ্গালি সমাজের আভ্যন্তরীণ ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

প্রথমে ধরা যাউক তাহার পূজা পদ্ধতি। বঙ্গের সর্ব্ব প্রধান পূজা শ্রীদুর্গা পূজা। গ্রীষ্ম ও বর্ষার শেষ হইয়াছে, নীল নভোমণ্ডল হইতে শরচ্চন্দ্র অবিবাদে স্বর্ণ কিরণ বঙ্গের শ্যামল অঙ্গে ঢালিয়া দিতেছেন। বিশ্বব্যোম কি যেন আনন্দে ভরা; ভক্ত, সাধক, সকলেই সম্বৎসর পরে পরমানন্দে পরমানন্দময়ীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। দ্বারে দ্বারে ভিখারী ললিতরাগে শারিঙ্গী বাজাইয়া আগমনী গান করিতেছে *।

"গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল পাষাণী
ঐ এল মা তোর ঈশাণী—,
যুগল শিশু লয়ে কোলে, মা কৈ মা কৈ আমার বলে
ডাকছে মা তোর শশধর বদনী।
ধরলি যে রত্ন উদরে তোর মতন সংসারে
এমন রত্নগর্ভা আর নাই রমণী।
মা তোমার ঐ তারা চন্দ্রচূড় দারা
চন্দ্র দর্পহরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখিনি কার মনের অন্ধকার হরে
মা তোর হর মনোমোহিনী"।

গান শুনিয়া গৃহস্থ পুত্রশোক ভুলিল, আনন্দে আত্মহারা হইল। এ ভাব আর এখন আছে কি?

* দাশরথী রায়ের রচিত।

তোমার প্রতিমা নানা সাজে সজ্জিত হইল, বহুবিধ খাদ্য সম্ভার এবং বাদ্য ভাণ্ডের আয়োজন হইয়াছে, বাহ্যিক আড়ম্বরের ত্রুটি কিছুই নাই।

অদ্য ষষ্ঠী, জগদম্বার উদ্বোধন হইবে। তুমি গৃহস্বামী; সংযম এবং উপবাস করিয়া দেবীর উদ্বোধন করিতে হয়, কিন্তু তোমার প্রাতঃকালে, কাকে কি খাইবার পূর্ব্বে "চা" পানীয় উদরস্থ না হইলে বাক্যস্ফুরণ হয় না, তুমি কি করিয়া বোধন কার্য্য সমাধা করিবে? সুতরাং একটা অনুকল্প ব্যবস্থা দ্বারা ফলাহার করা হইল, পুনশ্চ যে বিল্ববৃক্ষ মূলে বোধন কার্য্য হইত সেটা অনিবার্য্য কারণে, যথা কতকগুলি বহুমূল্য ক্রোটন এবং "পাম" গুল্ম বিল্ববৃক্ষের শাখায় আক্রান্ত হইয়াছিল এই অপরাধে তাহার মূলচ্ছেদন হইয়াছে, পুরোহিত মহাশয় একবারে বোধন কার্য্যটা বন্ধ হইলে স্বার্থে আঘাত লাগে দেখিয়া ব্যবস্থা করিলেন "নিরস্ত পাদপে দেশে এরণ্ডোপি দ্রুমায়তে" অর্থাৎ "বৃক্ষ না থাকিলে ভেরেণ্ডা গাছেও কায চালাইবে"। বিল্ববৃক্ষের বাধা মিটিল—গৃহস্বামীর উদ্যানে একটা মজাফরপুরের লিচিবৃক্ষের তলে মহামায়ার উদ্বোধন সমাধা হইল।

পরদিন সপ্তমী পূজা; পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে প্রায় কেহই নাই, কেবল পুরোহিত ঠাকুর এবং দু একটা পাচক ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত আছে এবং কিছু "ঠাকুরদের কলা" ইত্যাদি লইয়া দীন মনে তাহাদের পরিমাণ লইয়া কি বলিতেছে।

গৃহস্বামী প্রণামির খাতা এবং তাহার মাত্রা অনুসারে ভক্ষ্য ভোজ্যের ব্যবস্থা লইয়া অতিশয় ব্যস্ত, কি করিয়া দেবীমণ্ডপে আসেন। পুরোহিত ঠাকুর দক্ষিণার ব্যবস্থা দেখিয়া দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিয়াই বেলা ৯টার মধ্যেই পূজা সমাপন করিয়া বলিদানের ব্যবস্থা করিলেন।

ছয়টি ছাগশিশু সন্তস্নাত হইয়া কম্পিত কলেবরে অজলীলার অবসানের অপেক্ষায় যূপকাষ্ঠের নিকট সিন্দুর লাঞ্ছিত শৃঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এখানে লোক দেখে কে, বালক যুবা ও প্রৌঢ় মিলাইয়া প্রায় পঞ্চাশৎ জন ঐ পশু কয়েকটির দেহের মাংসের পরিমাণ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছেন। একজন বলিলেন "বাজার" হতে কেনা ছয়টাতে ৩০ সের হতে পারে"—অপরজনা বলিলেন "সহরের জানোয়ার দানা খায়, ১ মণ হইতে পারে', তৃতীয় ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন "যতই হউক, লোক ২ দুই শতের কম হইবে না।

এমন সময়ে কর্ম্মকর্ত্তার কিশোর পুত্র পরিধানে বানারসী ধুতী এবং কণ্ঠে স্বর্ণহার দোলাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া ঈষৎ ব্যঙ্গস্বরে উত্তর করিল "মাংসের ব্যবস্থা বাবা বহুদিন পূর্ব্বে করে রেখেছে। ইহার ভিতর দুইটা যাবে বাবার আফিসের ছোট সাহেব করিমবক্স খাঁর বাড়িতে, বড় সাহেব দারজিলিং গিয়াছেন। আর দুইটার মাংস রাত্রিতে চপ কটলেট বানান হবে, যারা বিলাত থেকে এসেছে তারা সব খাবে, আর এই ছোটটা এখন কাটা হবেনা, বড়দিনের সময় বড় সাহেবের ডালির সঙ্গে দেওয়া হবে। আর এইটা যদি রন্ধন হইয়া উঠে তবে লোকেদের দেওয়া হবে"। কথা শুনিয়া সকলেই স্থানান্তরের উদ্যোগ করিলেন।

প্রতিমার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার পাত্র কার্ত্তিকের মূর্ত্তি। প্রাচীনকালে ইনিই সুরাসুর যুদ্ধে দেবসেনার অধিপতি ছিলেন, ইনিই হিন্দুদিগের বীরত্বের আদর্শ; শৌর্য্যে, বীর্য্যে এবং সৈনাপত্যে ইহারই ধ্যানের ব্যবস্থা আছে। ইহার অপর নাম স্কন্দদেব; ভগবান্ সেনানীনাং গীতায় বলিয়াছেন "সেনানীনাং স্কন্দোহং"। বর্ত্তমান বাঙ্গালি

সমাজে ইহার যথেষ্ট প্রভাব প্রচার আছে, তবে অধুনা বংশ রক্ষার কর্ত্তা বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন ইহারই প্রদত্ত সন্তান "নব কার্ত্তিকের" দল।

প্রতিমায় ইঁহার স্থান ভগবতীর বামভাগে, ময়ূরের উপর বসিয়া আছেন। পরিধানে একখানি কালাপেড়ে কুঞ্চিত ধুতি, মস্তকে বক্রভাবে বিভক্ত কেশকলাপ, অঙ্গে মূল্যবান "কোট" পায়ে "হন্টিং" পাদুকা, হাতে কোন স্থলে লেখনীর ন্যায় একটি শর এবং তদনুরূপ একখানি মৃণ্ময় সোনালির ধনুক, তাঁহার সেই আদর্শ বীরত্বের এই দুইটি নিদর্শন এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

বীর কার্ত্তিকেয় এখন বাবু কার্ত্তিকে পরিণত হইয়াছেন। যেমন উপাসক তেমনই দেবতা। অন্যান্য দেবগণও মর্ত্ত্যে আসিয়া উপাসকের গৃহে দেবত্ব হারাইয়া ক্রীড়া পুত্তলি ও পশুহিংসার কারণ হইয়াছেন।

বঙ্গের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টা শ্রীচৈতন্য দেব। তাঁহার প্রচারিত অতি উচ্চ প্রেম-ধর্ম্ম। তিনি স্বয়ং যতি-ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী। দণ্ড ও কৌপীন তাঁহার সর্ব্বস্ব; মুণ্ডিত শিরে অনাবৃত দেহে এবং নগ্নপদে সমগ্রভারতে ভগবৎ প্রেম জাগাইয়াছিলেন। ভক্তগণের কৃপায় তিনি রাজবেশ পাইয়াছেন। অপূর্ব্ব বিরাগীবেশ বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া তাঁহার ঘৃণিত সংসারীবেশ হইয়াছে। তাঁহার পবিত্র প্রেমধর্ম্মের ব্যপদেশে বঙ্গদেশে যে কলঙ্ক কালিমা লাগিয়াছে বঙ্গোপসাগরের সমস্ত সলিলে তাহা বিধৌত হইবে না। বাঙ্গালীর দুরপনেয় কলঙ্ক তাহার কর্ম্ম বৈমুখ্য; এ কালিমা তাহার মিথ্যা অপবাদ নহে বরং বাস্তবিক জাতীয় প্রকৃতি আর ইহার জন্য দায়ী তাহার উদ্ভ্রান্ত শিক্ষা, তাহার হৃদয়ের অনাস্থা, তাহার প্রবল অসদনুকরণে প্রবৃত্তি।

নিত্য কর্ম্ম সকল কি অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে একবার দেখা যাক।

পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ (এক হিসাবে প্রায় প্রত্যহই হয়) প্রথমতঃ ইহাতে সংযম উপবাস আছে, সে কায সাধ্যাতীত ; দ্বিতীয়তঃ একজন সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিতের আবশ্যক। দেশে এরূপ লোক দুষ্প্রাপ্য ; তৃতীয়তঃ দাসত্বের অবকাশ নাই। চতুর্থতঃ মৃতব্যক্তির প্রীত্যর্থে কোন কর্ম্ম করা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ এবং আধুনিক সমাজে বর্ব্বরতার পরিচায়ক, সুতরাং এ কার্য্য পরিত্যজ্য।

উপনয়ন—কয়েকগাছ সূত্র দেওয়া হয় কিন্তু নিরর্থক ভাবে। পাছে দুই চারিদিন ব্রহ্মচর্য্যের কষ্ট সহ্য করিতে হয় এজন্য কালীঘাটে ব্যবস্থা হইয়াছে। কতক লোকের মধ্যে ভোজে ফলাহারে ও আত্মা-ভিমানে ঐ সূত্র গাছটার মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয়।

বিবাহ—বড় জটিল ব্যবস্থা, অথচ ইহা না হইলে সমাজ চলে না। সংযম উপবাস এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বংশ এবং জাতীয় উন্নতির উদ্দেশ্য ও ধর্ম্মসাধনার অভিপ্রায়ে ও পিণ্ডোদকের নিমিত্ত বিভিন্নগোত্র স্ত্রীপুরুষের আমরণ অচ্ছেদ্য বন্ধন হইল হিন্দু বিবাহ।

আজ কাল এ ভাবের বিবাহে অনেক দোষ অবিষ্কৃত হইয়াছে ; যথা ধর্ম্মের সহিত বিবাহের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায় না ; পিণ্ডাদির প্রয়োজন পূর্ব্বেই বর্ব্বরতা বলা হইয়াছে ; বিভিন্ন গোত্র এ বিধি হিন্দু বৌদ্ধ ভিন্ন পৃথিবীর কোন সভ্য জাতি অনুকরণ করে না ; বিশেষতঃ এ ব্যবস্থায় পাত্র ও পাত্রীর নির্ব্বাচনে ও অবাধপ্রেমে সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে। বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য হইতে পারেনা, খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজ তাহার প্রমাণ এবং উন্নতির সোপানে ইহা একটি প্রকাণ্ড কণ্টক। এক দলের মত এইরূপ—আর যাহারা এতদূর অগ্রসর হইতে ভয় করেন, তাঁহারা শূকর বিক্রয়ের ন্যায় পাত্র পাত্রীর মূল্য স্থির করিয়া একটা লাভের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আর যত সংস্কার আছে সে সকল কুসংস্কার, অতএব অননুসর্ত্তব্য।

শারীরিক অবস্থাও এই তমোভাবে গাঢ় অনুবিদ্ধ। চেষ্টা একবারে নাই, আয়ুর পরিমাণ দিন দিন সঙ্কুচিত, যৌবন কবে আসে কবে যায় তাহার অনুভব নাই। দণ্ড পতনোন্মুখ হইয়াই নির্গত হয়, চক্ষু তোজোহীন, উপচক্ষুর জোরে কিছু দর্শন করে। ক্ষুধা বলিয়া কোন দৈহিক বৃত্তি নাই; অভ্যাসে আহার হয়; উদর ঔষধালয়, করণ সমূহ কেন্দ্রহীন, তাহারা নিজের ধর্ম্ম ভুলিয়াছে। দেহ একটি স্থিতিশীল মাংসপিণ্ড মাত্র; সকল বিপদের বড় বিপদ বাঙ্গালীর অঙ্গচালনা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বচনের দ্বারা হইলে আর অন্য ইন্দ্রিয়কে তিনি কষ্ট দিতে চাহেন না।

যখন আত্ম পদার্থের নিকটে অনাত্ম পদার্থ উপস্থিত হয় তখনি আত্ম পদার্থে একটা তরঙ্গ উঠে—যেমন লৌহ এবং অয়স্কান্তের সান্নিধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব শক্তির আবির্ভাব হয় তদ্রূপ চিত্ত এবং বিষয়ের নৈকট্য হইলেই চিত্তে এক কম্পন উপস্থিত হয়। এই কম্পনের নাম ভাব। যাহার দ্বারা এই ভাব বাহিক প্রকাশ পায় তাহার নাম ভাষা। ভাষা ভাবের পরিচ্ছদ। এতদর্থে যে কোন উপায়েই ভাবের অভিব্যক্তি হয় তাহাই ভাষা; সুতরাং শারীরিক ইঙ্গিত বা কণ্ঠের সঙ্গীত তাহারাও ভাষা। প্রধানতঃ শব্দাত্মক ভাষাই ভাষা বলিয়া গৃহীত।

ভাষার অত্যুন্নতি না হইলে সমগ্র ভাবটি শাব্দিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এই জন্য স্নায়বিক সাহায্য শব্দাত্মক ভাষাকে লইতে হয়। উপবেশনে শয়নে গমনে এবং বহু প্রকার অঙ্গ ভঙ্গীতে সুন্দর ভাব প্রকাশ করা যায়।

সেইরূপ স্বরের পৌর্ব্বাপৌর্ব্ব বিন্যাশে হ্রস্ব, দীর্ঘ দ্রুত মধ্য এবং বিলম্বিত প্রস্বনে অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ হয়। প্রস্তরে, পটে, মৃত্তিকায় ও রেখায় ভাব প্রকাশ করা যায়। প্রকাশের উপায় অনুসারে ভাষার

অনেক নাম ও বিভাগ হইয়াছে। যথা শব্দময় ভাষায় ব্যক্তরূপ সাহিত্যাদি; স্বরাত্মক ভাষায় সংগীতাদি রেখা বা চিহ্নময় ভাষায় অভিব্যক্তি কলাবিদ্যায় চিত্রে ও স্থাপত্যে।

এখানেও সেই জড় ভাব, বিশাল প্রাণহীনতা। তোমার সাহিত্য প্রাণে তরঙ্গ তুলে না, তোমার তূর্য্য হৃদয় স্পর্শ করে না, তোমার চিত্র কেবল রং। তোমার সাহিত্যরথীরা অনেকে শিল্পী বটেন, বাহিরের কাজ মন্দ করেন না, কিন্তু ভিতরে সেই ধারকরা ভাব, পরমুখাপেক্ষা। দেশী পদার্থ নয় বলিয়া সন্দেহ হয়। বাস্তবিক যাহাদের আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদ শিক্ষা সমাজ একেবারে বিদেশী ভাবে ডুবান তাহাদের অন্তরে দেশী ভাব আছে কি করিয়া বলা যায়।

পরের উৎকৃষ্ট পদার্থ দেখিয়া নিজের প্রাণে উৎস উঠে না তাই তোমার সাহিত্যাদি জাতীয় প্রাণতন্ত্রীকে আঘাত করে না। একটা "কলম" ভাব ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পরিচ্ছদ বিক্রেতার বিজ্ঞাপনের ন্যায় একটা মনুষ্যাকৃতি আছে কিন্তু ভিতরে কেবল তৃণ এবং আবর্জ্জনা।

ওয়াটারলু ও ট্রাফালগারের নাম শুনিয়া ইংরেজ বালক যাহা অনুভব করে জাপানী বালক তাহা করে কি? মুকডেন এবং সুসিমার বৃত্তান্ত জাপগণ যে ভাবে গ্রহণ করিবে বাঙ্গালি তাহা করিবে কি? দেবব্রত ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, লক্ষণ; হনুমন্ত, সীতা সতীর কথা তোমার যেমন উপাদেয় জারমান তাহা বুঝিবে কি? তোমার সাহিত্য দেশীয় উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী আভরণ ধারণ করিয়াছে, প্রাণ তন্ত্রী বাজিবে কেন?

সঙ্গীত ও তদ্রূপ ধ্রুপদের স্থানে খেমটা ঠুংরিকে আসন দিয়াছে মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর মহাপ্রাণ ধ্বনির পরিবর্ত্তে রাসবস্পর্দ্ধী "বাস"কে আদর করিয়াছে।

চিত্রের কথা বলিবার আবশ্যক নাই। কোন ধনী সন্তানের গৃহাভ্যন্তর লক্ষ্য করিলেই অনুভব হইবে।

বিদেশীয় "বুক্নি" বা প্রক্ষেপ ব্যতীত নিজের ভাষায় তোমার ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। দেশের তাঁতি তোমার পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে পারেনা—দেশের মুচি তোমার পাদুকা দিতে পারেনা—দেশের মদক তোমার আহার্য্য যোগাইতে পারেনা—দেশের নাপিত তোমার কেশ কাটিতে পারেনা—কারণ সেত খুবপা দিয়া ঘাসছোলা ভাবে কেশ কাটিতে শিখে নাই।

এইত হইল সমাজের সাধারণ অবস্থা; এরূপ ক্ষেত্রে সেই অনন্ত রত্ন-ভাণ্ডার মহাভারতের উজ্জলতম রত্ন, সংযম ও সাধনার মধ্যাহ্নমিহির শুদ্ধ-সত্ত্বের পূর্ণশশধর দেবব্রতের স্থান কোথায়? এই সর্ব্ব কামাচার কলুষ-ক্ষিপ্ত অনুক্ষণ ক্রোধ-স্ফীত কুঞ্চিত বন্ধুর চিত্ত-ভূমিতে নিষ্কাম নিস্তরঙ্গ জলধিজল—প্রশান্ত জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ বৃত্তি গাঙ্গেয়র আসন সম্ভব কি? এই ক্ষীণায়ু ব্যয়িত-সত্ত্ব সবল সংকল্প গতোজ অপমান সহিষ্ণু শ্ববৃত্তি-তৎপর জাতি কি সেই বশীকৃত-মরণ ঊর্দ্ধরেতা অচল-প্রতিজ্ঞ অযাবমান ভীষ্মের আবাহন করিবে।

ইহারা কি সেই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর বেদবেদাঙ্গ পারগ রাষ্ট্র-শাবক অশেষ ধর্ম্ম বক্তা মুখ্য কুলীন স্বপর জ্ঞানহীন বিরত্ব শান্তনু তনয়ের আমন্ত্রণ করিবে!

এজাতি কি সেই "শুচি দক্ষ উদাসীন গতব্যথ" আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য জনিত অমল ধবল স্বভাব, হিমাচল সম অচল প্রতিষ্ঠ কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তির চিরাধার "সম লোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চন" সন্ন্যাসী ভগবদ্ভক্ত, পরম বৈষ্ণবও যোগী দেবব্রতকে পূজার্হ মনে করিবে?

কিন্তু একদিন ছিল যেদিন তিনি হিন্দুর গৃহে গৃহে পরিচিত ছিলেন

র্পনের সহিত তাঁহার তর্পণ হইত। হিন্দু সমাহিত চিত্তে স্বস্থস্নাত অঞ্জলি পূর্ণোদক হইয়া বলিত

"ওঁ বৈয়াঘ্র পদ গোত্রায় সাঙ্কৃতিক প্রবরায় চ।

অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে।"

একি, তিনি যে চির পরিচিত পিতৃ স্থানীয় তবে তাঁহাকে একেবারে বিস্মৃত কেন? তুমি পুনরায় বলিতে

"ওঁ ভীষ্ম শান্তনবো বীর সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

আভিরদ্ভি রবাপ্নতু পুত্র পৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং"

তাই বলি বাঙ্গালি তোমার এদশা কেন? তুমি গৃহস্থিত নিষ্কলঙ্ক রত্ন পরিত্যাগ করিয়া অপরের কাচখণ্ডের নিমিত্ত ধাবমান হইতেছ। তুমি প্রকৃত রত্নময় কণ্ঠহার ভ্রমে প্রকাণ্ড গোক্ষুর-লাঞ্ছিত বিষধর লইয়া বসিয়া আছ। বিদেশীয় বিলাস তরঙ্গে এমন উৎক্ষিপ্ত যে তুমি আর নিজের প্রাণের কথা নিজেই শুনিতে পাইতেছ না।

তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান বলিয়া অভিমান রাখ; দেশের উন্নতি কল্পে কত সভা সমিতি বাৎসরিক স্মৃতি অধিবেশন অভিভাষণ আর কত কাণ্ড কর, কিন্তু একপদও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছ কি? পার নাই তাহার কারণ তোমার আপন পর জ্ঞান নাই, আচার অনাচার বিচার নাই, ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুসন্ধান নাই।

তুমি ভাব জগতের সমগ্র কার্য্যই তোমার ঐ বুদ্ধি টুকুর ভিতর প্রবেশ করিবে তোমার উপদেষ্টা বা গুরু হইবার কাহার অধিকার নাই।

স্রোতের উজান দিকে মুখ ফিরাইয়া ভাবিতেছ তুমি বড় সন্তরণ পটু, কিন্তু প্রায় মহাসমুদ্রের নিকট ভাসিয়া আসিয়াছ এখনও মুখ ফিরাইলে কুল দেখিতে পাইবে। গুরূপদেশে চিত্তের মলিনতা অপসৃত হইয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানে প্রবৃত্তি হইবে।

এই দেবব্রত চরিত্র কথা কিছু নূতন নহে, সবই পুরাতন; অদৃষ্টবশে নূতন করিয়া বলিতে হইবে। এক সময় ইহা জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ ছিল, এখন শিক্ষার অভাবে এবং দোষে ও বৈদেশিক আদর্শের নিরন্তর আঘাতে বিসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মেঘচুম্বী উন্নতি তোমার সংকুচিত ধারণার বাহিরে গিয়াছে কাযেই তুমি ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান, এবং বিদেশী গুরুর বিদ্বেষ-বিকল্পিত বিজ্ঞান-হীন বৃত্তি অভ্রান্তজ্ঞানে ঘরে বাহিরে শুকপক্ষীর ন্যায় রটনা করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছ।

বর্ত্তমানে এক প্রবল দল উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের কাছে যাহা কিছু প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ বিধানের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহাই "নষ্যাং"। বিচারের এমন প্রকৃষ্ট পদ্ধতি আর দ্বিতীয় নাই। যখন মস্তকই নাই তখন আর ব্যথার চিকিৎসা কি? তবে যদি কোন প্রকারে মস্তক পাওয়া গেল তখন কবি কল্পনা ও প্রক্ষিপ্তের তাড়নায় স্থির থাকা দায়। একথা পরে বিচার করা যাইবে।

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় দেবব্রত চরিত্রকথার আবশ্যকতা এবং উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। কেহ যেন মনে না করেন যে, দেবব্রত ভীষ্ম একটি কল্পনা-প্রসূত ব্যক্তি। এরূপ চরিত্র এবং গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি রক্ত মাংসের দেহ লইয়া পায়ে হাঁটিয়া ধরাতলে ভ্রমণ করিতে পারে একথা অধুনা অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না। দেবব্রত চরিতে আরোপিত বিষয় সমূহ বাস্তবিক কি অলীক তাহার বিচারই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সে চরিত্রের বিশ্লেষণ এবং তাহার ঘটনা সমূহের আভ্যন্তরীন প্রেরণার নির্ণয় পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিতের শক্তি বহির্ভূত। সিদ্ধের জীবনী সাধক ভিন্ন লিখিতে পারে না। ভীষ্ম মহাযোগী, আমরা নরকের কীট, যোগতত্ত্বের সন্ধান কোথায় পাইব? কেবল

তাঁহার বাহ্য কর্ম্মের একটা স্বকল্পিত উদ্দেশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়া অশেষ পুণ্যার্জন হইবে বিশ্বাসে এই মহাপুরুষ চরিত্র লিখিতে সাহসী হইয়াছি। যদি একজন ব্যক্তিও অনিচ্ছায় এবং অবহেলায় গ্রন্থোপরি অঙ্কিত "দেবব্রত ভীষ্ম" এই পুণ্যময় নামোচ্চারণ করেন, তবে মহাপুরুষের নামোচ্চারণের নিমিত্ত হইলাম জানিয়া আপনাকে সার্থক-জন্ম এবং বহু ভাগ্যবান মনে করিব।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেবব্রত ভীষ্ম ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা।

দেবব্রত চরিত্র লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দেবব্রত ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তাহার আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। যাঁহারা মহাভারতকে ইতিহাস গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন, দেবব্রতের ভৌতিক অস্তিত্ব বিষয়ক প্রসঙ্গ তাঁহাদের নিকট বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সকলেই তাহা করেন কি? মহাভারত সম্বন্ধে কতকগুলি বিভিন্ন মত ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে। স্থূলভাবে বলিতে গেলে ঐ সমস্ত মতকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

উপরি উক্ত মত সমূহের বিচার এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়, তবে স্থূলমত কিয়দংশ বিচার না করিলে দেবব্রত সম্বন্ধে একটা অভাব থাকিয়া যায় সুতরাং আমাদিগকে মহাভারত সম্বন্ধে একটা মত প্রকাশ করিতেই হইবে।

যদি মহাভারতের কোন মৌলিকতা না থাকে, তবে দেবব্রত ভীষ্মের এবং অন্যান্য চরিত্র সমূহের ঐতিহাসিকতা স্থাপনের চেষ্টা বৃথা বিড়ম্বনা মাত্র।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা এবং বয়ক্রম লইয়া বহুদিন হইতে একটা প্রকাণ্ড তর্ক ও বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে; সে তর্কের পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তর পক্ষ উভয়ই শ্বেতাঙ্গয়ুরোপীয়গণ।
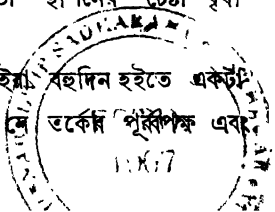
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন এবং অনেকেরই যথেষ্ট পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধান আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বড় কাহারই নিরপেক্ষতা নাই। তাঁহাদের গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিলে একটী সুন্দর তত্ত্ব প্রতিভাত হয়; সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইলে সেটি এইরূপ দাঁড়ায়—"যাহা কিছু ভারতবর্ষে প্রাচীনত্বের এবং সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ পাওয়া যায় তৎসমুদায় খৃষ্ট জন্মের পরে আর যদিই কোন এক আধ বিষয় খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে বলিয়া স্থির হয়, তবে তাহা গ্রীক এবং রোমীয় সভ্যতার বহুপরে আর হয় তাহাদের দত্ত ঋণ না হয় অনুকরণ মাত্র।" বর্ত্তমান মহাভারতের কোন ঐতিহাসিক মূল্য তাঁহাদের অধিকাংশের মতে নাই; কেহ কেহ বলেন, পর্ব্বতপ্রমাণ তুষের ভিতর দুই একটি তণ্ডুলের ন্যায় মহাভারতে কিয়দংশ বাস্তবিক ঘটনা হইলে হইতে পারে, এতদ্ব্যতীত সমস্তই কবি-কল্পনা। বোধহয় বলা উচিত যে, এই সকল পণ্ডিতগণের গবেষণাগত বিষয় যে কেবল ভারতের কাব্য সাহিত্য ও ব্যাকরণ ছিল তাহা নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ যথা বেদ উপনিষৎ পুরাণাদি তূর্য্যশাস্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্র স্থাপত্য ও কলাবিদ্যা ও আরও কত বিদ্যা কেহই তাঁহাদের তীব্র সমালোচনার তীক্ষ্ণ দন্তাঘাত হইতে নিস্তার পায় নাই। কেবল দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবন্ত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের গৃধ্রদৃষ্টি এখানে বিশেষ কিছু ফল দেখাইতে পারে নাই। তবে আঁচড়াইতে ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু বড় কঠিন ঠাঁই।

পূর্ব্বোক্ত মত এবং পণ্ডিতগণ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আবির্ভূত যদি তাঁহাদের ভারতীয় শিষ্য না থাকিতেন, তাহা হইলে বোধহয় তাঁহাদের মত তাঁহাদের দেশেই লয় পাইত, তাহাতে ভারতবাসীর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, আর মহাভারতের মৌলিকতা ও জন্মকাল লইয়া একটা

মহাভারতের সৃষ্টি হইত না। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য যে তাঁহাদের শিষ্যদল বিশেষ পুষ্ট এবং ক্ষমতা বিশিষ্ট।

সুখের বিষয় যে আজকাল ১৯১৩ খৃঃ অব্দে ঐ সকল পণ্ডিতের এবং মহাভারতের ঐতিহাসিকতা এবং জন্মকালাদি বিষয়ক মতের দার্ঢ্যে বিশেষ শৈথিল্য প্রবেশ করিয়াছে এবং অধুনা দেশীয় ও বিদেশীয় অনেকেই মহাভারত গ্রন্থে একটা ঐতিহাসিক কঙ্কালের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন। তবে সে কঙ্কালটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হিন্দু প্রতিমার অস্থীভূত, খড় দড়ি ও মৃত্তিকাবৃত বংশখণ্ডের ন্যায় অনৈসর্গিক অতি প্রাকৃতিক এবং কাল্পনিক ঘটনাও উপন্যাসে প্রোথিত আছে।

ষোলআনা প্রতিভার অধিকারী পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ চরিত্র গ্রন্থ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিচার করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মহাভারতে ঐতিহাসিকতা আছে অর্থাৎ মহাভারতে উল্লিখিত ব্যক্তি এবং ঘটনা সকলের মধ্যে অনেক ব্যক্তি ও ঘটনা বাস্তবিক ছিলেন ও ঘটিয়াছিল।

গ্রন্থান্তরের সাহায্যে মহাভারতের মৌলিকতা প্রমাণ করা বড় দুরূহ ব্যাপার, তবে তাহার প্রাচীনতা প্রমাণ করা সুসাধ্য; কারণ, যদি পরবর্ত্তী গ্রন্থে পূর্ব্বগত গ্রন্থের উল্লেখ থাকে, তবে পরবর্ত্তী গ্রন্থের অপেক্ষা পূর্ব্বগত গ্রন্থের বয়স অধিক তাহা সহজেই অনুমিত হয় কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বগত গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তি এবং ঘটনা বাস্তবিক তাহা প্রমাণ হয় না।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কৃষ্ণ চরিত্রে পাণ্ডবদিগের ও শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা পরিচ্ছেদে অনেকগুলি পাণিনি সূত্র হইতে দেখাইয়াছেন যে পাণিনির সময় মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। অবশ্যই ছিল, আপত্তি হইবে পাণিনি পাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ নহে, মহাভারতের প্রাচীনত্বের প্রমাণ।

আর এক কথা, যে গ্রন্থ যে উদ্দেশ্যে লিখিত, সেই গ্রন্থ সেই উদ্দেশ্যের প্রমাণ এবং অন্য উদ্দেশের অতি ক্ষীণ প্রমাণ—যেমন বেদাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র দেশের বাহ্যিক অবস্থার এবং মানসিক উন্নতির ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে কি দাঁড়ায়; বেদ চাষার গানে পরিণত হয় এবং প্রমাণও ছিদ্রহীন হয় না। পাণিনি ব্যাকরণ শাস্ত্র, ইতিহাস নহে; পাণ্ডবেরা ছিলেন বা না ছিলেন তাহাতে তাঁহার কোন উৎকণ্ঠা ছিল না, তাঁহার পদ সিদ্ধ হইলেই তিনি সন্তুষ্ট। যদি স্বীকার করা যায় যে, মহাভারত ঐতিহাসিক গ্রন্থ, কিন্তু তাহাতে কাল্পনিক এবং অযৌক্তিক বৃত্তান্ত অনেক আছে—দেবব্রত চরিত্রও তদাকার বৃত্তান্তের অন্তর্গত হইতে পারে। সুতরাং মহাভারতের ঐতিহাসিকতা এবং দেবব্রতের মৌলিকতা স্থাপনের ভার আমাদের মস্তকে রহিল।

উপরি উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের মীমাংসার পূর্ব্বে মহাভারতে উল্লিখিত ব্যক্তি এবং ঘটনা সমূহের নাস্তিত্ব বিষয়ক মতের মধ্যে দুইটি বাদ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। একটি প্রক্ষিপ্ত বাদ, অপরটি রূপক বাদ। মোট কথায় এই দুই বাদকে সামান্য কথায় "নস্যাৎ" বাদ বলিলে মন্দ হয় না। এ বাদে প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক নাই, অন্বেষণ আলোচনা বা উপদেশের কথাই নাই।

প্রমাণাভাবে কোন বিষয়ের সত্তাই গ্রাহ্য হইতে পারে না, এই যুক্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত বাদের বাদীরা বলেন,—শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ, ও ভীষ্ম প্রভৃতি ব্যক্তি ছিলেন তাহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, সুতরাং তাঁহারা নস্যাৎ। অথচ তাঁহারা কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া হিরোডটাস থুকিডাইডিস ও রোমীয়গণের লিখিত অনৈসর্গিক বৃত্তান্ত সমূহকে অকুণ্ঠিত ভাবে ইতিহাস বলেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না।

প্রক্ষীপ্তবাদীরা বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবাদি এবং ভীষ্ম প্রভৃতি প্রথমে মহাভারতে উক্ত হয়েন নাই, পরবর্ত্তী লেখকেরা কালক্রমে ঐরূপ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া মহাভারতে বসাইয়া দিয়াছেন। রূপকবাদীরা প্রকাশ করেন যে, মহাভারতের এই যুদ্ধ ব্যাপারটা একটা রূপক বা গল্প; অনেক নৈতিক উপদেশ ঘটনা হইতে বিসৃষ্ট ভাবে কথিত হইলে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয় না, তাই একটা গল্পের আশ্রয় লওয়া হয়; যেমন আমাদের হিতোপদেশ ও সাহেবদের ইসপ্ স্ ফেব্ল্। খৃষ্ট, বুদ্ধ নামে কোন মনুষ্য কোনকালে ধরাধামে ছিলেন না, তাঁহারা গজাইয়াছেন এ প্রকার মতও প্রচলিত আছে।

আরও শুনা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ন্যায় মনুষ্যের কবি কল্পনা ভিন্ন বাস্তবিক জগতে আবির্ভাব অসম্ভব। কারণ বোধহয় এরূপ উন্নত চরিত্রের ব্যপ্তি গ্রীক রোম অন্যান্য ইয়ুরোপীয় জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবব্রতের ন্যায় চরিত্রের উন্নতি মনুষ্যের সম্ভব কি না, তাহা তাঁহার চরিত্র আলোচনায় বুঝা যাইবে; কিন্তু তিনি ছিলেন কি না তাহার অন্বেষণ বিশেষ আবশ্যক।

অনেকে হয়ত উত্তর করিবেন, দেবব্রত ছিলেন কি না তাহা প্রমাণ করিবার এত প্রয়াশ কেন? চরিত্রটি কেমন লেখা হইয়াছে তাহার দোষগুণ সাহিত্যের চক্ষে দেখাই উচিত। কবির সৃষ্টিতে কেমন চাতুর্য্য ও অলঙ্কার আছে, ভাষার ও ভাবের কিরূপ ঝঙ্কার ও উৎস আছে, চিত্রকর কিরূপ রং ফলাইয়াছেন—তাঁহার তুলিকার স্পর্শ কিরূপ সূক্ষ্ম ও ভাবব্যঞ্জক এই সকলের বিচার ও প্রকাশই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

দেবব্রত কবির মানস তুলিকার চরম চিত্র কি হস্তপদাদি সংযুক্ত জরায়ুজ মনুষ্য, তাহার অন্বেষণের কারণ এই যে কবিকপোলপ্রসূত

চরিত্র কখন সাহিত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যথার্থ জগতে আদর্শের স্থান অধিকার করিতে পারে না। ছায়া কখন রস শব্দ স্পর্শ গন্ধাত্মক হইতে পারে না। কবি রূপ দেখাইতে পারেন সত্য, কিন্তু সে রূপের ভিতর সৎপদার্থ দিতে পারেন না। মানুষ মানুষকেই চিরদিন অনুসরণ করে, উপাস্য বলিয়া পূজা করে,—পটকে করেনা। চিত্র যতই সুন্দর হউক, তাহাকে চিত্র বলিয়াই জানে—তাহাকে হৃদয়ে স্থান দেয় না। হৃদয় সত্য-প্রতিষ্ঠ,—সেখানে মিথ্যার অধিকার বড় অল্প। মাকাল তাহার রূপ লইয়া মাকালই আছে, রসালের ঝুলিতে অধিকার পায় নাই।

দেবব্রত যদি কল্পনার ছবি হইতেন,তবে তাঁহার উপযুক্ত স্থান সাহিত্যেই বটে; ধর্ম্মগ্রন্থে মহাভারতে উল্লিখিত হইতেন না; কোন নাটকে ক্ষুদ্র কবির চিত্র হইয়া থাকিতেন, ব্যাসের শ্রম বিফল করিতেন না, এবং আমরাও 'ভীষ্মাষ্টমী ব্রত' ও তাঁহার তর্পণ বিধিপালন করিয়া বর্ব্বরতার পরিচয় হইতে নিস্তার পাইতাম।

আরও একটি ক্ষুদ্র আপত্তি উঠিতে পারে যে, যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, দেবব্রত বলিয়া একজন ব্যক্তি ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্র বর্ণিত প্রকারে না থাকিতে পারে, কবি তাঁহাকে নিজের মনের মত বেশ দিয়াছেন, এ অবস্থায় তিনি কি প্রকারে পূজার্হ হইতে পারেন? এ আপত্তিও পূর্ব্ববর্ত্তী আপত্তির সম প্রকৃতিক একসঙ্গেই দুইএর বিচার করা প্রশস্ত।

মহাভারত ইতিহাস গ্রন্থ কি না? মহাভারত যে ভাবের ইতিহাস এবং আমরা আজকাল ইতিহাস বলিয়া যাহা বুঝি, ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না দেখা যাউক।

হিন্দু ইতিহাস বলিয়া যাহা বুঝেন—অন্ততঃ পূর্ব্বে বুঝিতেন তাহা আজ কালকার ইতিহাস হইতে অনেক বিভিন্ন। হিন্দুর ইতিহাসের সংজ্ঞা এই—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষনামুপদেশ সমন্বিতং,
পূর্ব্ববৃত্ত কথা যুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।

অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিষয়ক উপদেশ সমন্বিত এবং পূর্ব্ববৃত্তান্ত যুক্ত যে গ্রন্থ তাহাই ইতিহাস।

আধুনিক ইতিহাস পূর্ব্ববৃত্তান্তযুক্ত হইলেই হয়। ভবিষ্যতে তাহার উপকারিতা বা অপকারিতা আছে কি না, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার তত আবশ্যক নাই, বিবরণ যথাযথ হইলেই ইতিহাস উৎকৃষ্ট হইল।

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত না থাকিলে জাতির উন্নতি হয় না, পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তি এবং তাহাদিগের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় অবগত না হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না; ইতিহাস সর্ব্ব বিষয়ের উদ্দীপনার আলয়। অতীত স্মৃতি জাগাইবার একমাত্র উপায়—ইতিহাস। বর্ত্তমানে এবং অতীতে সম্বন্ধ রাখিতে হইলে ইতিহাসই ইহাদের যুগবন্ধ। এ হিসাবে ইতিহাসের মূল্য অমেয়।

তবে ইতিহাসের উল্লেখ্য বিষয়ের একটা সীমা আছে। যে সে ব্যক্তির বিবরণ এবং যে সে ঘটনা ইতিহাসে স্থান পাইতে পারে না এবং স্থান দেওয়াও উচিত নয়। তাহাতে ইতিহাসের উদ্দেশ্য বিফল হয়। সেই উদ্দেশ্য হিন্দু সুন্দর বুঝিয়াছেন এবং তাঁহাদের ইতিহাসও সেই ভাবে লিখিয়াছেন। অনেক কলুষিত চরিত্র আছে—যাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিলে পূর্ব্ব কলুষের আবির্ভাব হইতে পারে, সেইরূপ অনেক ঘটনাও আছে যাহার ফল সমাজের পক্ষে বিষময়। এরূপ চরিত্র বা ঘটনা ইতিহাসে স্থান পাইবার উপযুক্ত কি ?

পুনরায় এমন অনেক ব্যক্তি ও ঘটনা আছে, যাহাতে কিছু অসাধারণত্ব নাই, সে সকল ব্যক্তি এবং ঘটনা—যাহাতে কিছু ভালও নাই, বিশেষ মন্দও নাই—তাহাদের বিবরণ লিখিয়া পণ্ডশ্রম করিবার আবশ্যক

দেখা যায় না। কারণ, সেরূপ ব্যক্তি ও ঘটনা জগতে প্রত্যহই জন্ম লয় ও ঘটিয়া থাকে। কত লিখিবেন এবং পড়িবে কে?

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরেজী সাহিত্যিক জনসনের বসওয়েল সাহেব লিখিত জীবন চরিত। জনসন সাহেব ২৪ ঘণ্টায় কি খাইতেন, কি পরিচ্ছদ পড়িতেন, পথে হেলিতে দুলিতে কি ভাবে চলিতেন, তাহার গলার ভিতর কি ব্যাধি হইত ইত্যাদি কত ঘটনাই বিবৃত আছে, আর সে পুস্তক উৎকৃষ্ট জীবন চরিতের মধ্যে পরিগণিত ও অসহায় ছাত্রদিগের পাঠ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত। এরূপ বিবরণ সমাজের কি উপকার সাধন করিবে বুঝা দুষ্কর এরূপ উপাখ্যানকে হিন্দু তাঁহার ইতিহাসে স্থান দেন নাই।

বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে এরূপ জীবন চরিত লেখার একটা পশ্চিমে বাতাস আসিয়াছে। ইহা যত শীঘ্র বন্ধ হয়, ততই মঙ্গল।

হিন্দুর ইতিহাস লেখার বিশেষত্বের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল।

হিন্দু জাতির ইতিহাস নাই বলিয়া অনেকে তাহাদিগকে বর্ব্বর বলেন কিন্তু হিন্দুর ইতিহাসের বিশেষত্ব তাঁহারা উপলব্ধি করেন না বলিয়াই তাঁহাদের ইতিহাস দেখিতে পান না। যে দিন এই বিশেষত্ব তাঁহাদের জ্ঞানে আসিবে, সেই দিন তাঁহারা দেখিবেন, হিন্দুর ইতিহাস কি অপূর্ব্ব। জগতে এমন ইতিহাস আর দ্বিতীয় নাই। তাহার পাঠে পশুকে মানুষ করে, মানুষকে দেবতা করে। প্রবৃত্তির উদ্দীপনা হিন্দু লিখেন নাই, যে স্থানে কোন একটি প্রবৃত্তির নিগ্রহ সাধিত হইয়াছে, সে সাধনার ইতিহাস হিন্দু অতি যত্নে লিখিয়াছেন। রোমনগর প্রজ্বলিত হইতেছে আর সেই রোমের অধীশ্বর নিরো শারিঙ্গী বাজাইয়া আমোদ উপভোগ করিতেছেন—এ বিবরণ হিন্দু ইতিহাসে স্থান দেন নাই।

কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব কি অসীম আত্মনিগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন, প্রহ্লাদ জগতের সাম্রাজ্য কি ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, মহারাজ

হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তব্যের কঠোর অনুরোধে কি ভাবে শৈব্যার নিকট মৃত পুত্রের দাহপণ্য চাহিতেছেন, সতীত্বের প্রভাবে দেবী সাবিত্রী কি ভাবে মৃত পতির পুনর্জীবন লাভ করিলেন, অশোক বনে সীতাদেবী কি সাধনার বলে রাবণের প্রলোভন বাক্য উপেক্ষা করিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন—হিন্দু তাহার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়াছেন। হিন্দু ইতিহাসের বিশেষত্ব এই যে, যাহা কিছু জীব মঙ্গলের সহায়ক তাহাই ইতিহাসের উপযুক্ত উপকরণ। এ বিশেষত্ব অন্য জাতির ইতিহাসে দেখা যায় না; তাহার বিশেষ কারণও আছে। কারণটি এই—হিন্দুর ইতিহাস এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল ঋষিপ্রণীত। তাহারা সাধারণ গ্রন্থকারের ন্যায় প্রসিদ্ধি বা বাহবা প্রাপ্তির আশায় গ্রন্থ লিখিতেন না, বা গ্রন্থ লিখিয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এ চিন্তাও তাহাদের ছিল না। কেবল মানব মঙ্গল উদ্দেশ্যে, জীবনের ব্রতই তাঁহাদের পরহিতে জীবন উৎসর্গ। তাহারা সম্যক অনুভব করিতেন—কর্ম্মফলে জীব কেবল গতায়াত করিতেছে, প্রবৃত্তির তাড়নায় "আশাপাশৈ শতৈর্ব্বদ্ধ" হইয়া অহঃরহঃ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ত্রাণের উপায় জানে না, পথ কোথায় তাহা ভাবে না, কি করিলে সে জালের একটি তন্তুও ছিন্ন হইতে পারে—ত্রিবিধ দুঃখের পীড়ন হইতে শান্তির দিকে ধাবিত হইতে পারে—তাহারই নিমিত্ত পরম কারুণিক ঋষিগণ বহু জন্মের অর্জ্জিত জ্ঞান জীব মঙ্গলের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আত্মগরিমার পাপ স্পর্শ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আপনার নাম ধাম বা পরিচয় প্রায় গ্রন্থেই উল্লেখ করেন নাই, শিষ্যগণ গুরুর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কখন কখন তাঁহাদের নাম করিয়াছেন। মোক্ষই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য। তাই তাঁহাদের সর্ব্ব কর্ম্মই নিবৃত্তি মার্গের নির্দ্দেশক, সুতরাং ঋষি প্রণীত ইতিহাসও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বৃত্তান্ত সমন্বিত।

এখন বুঝা গেল হিন্দুর চক্ষে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বিষয়ক উপাখ্যান কোন গ্রন্থে থাকিলে তাহার ঐতিহাসিকত্ব উড়িয়া গিয়া কবি কল্পনা প্রসূত রূপক বা অন্তঃসারহীন কাব্য মাত্রে তাহা পরিণত হয় না।

আর এক কথা মনুষ্যের মনুষ্যত্বই তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ লইয়া তবে মনুষ্যের ইতিহাস ধর্ম্মাদি বর্জ্জিত কিরূপে হইবে ধারণা হয় না।

সুতরাং মহাভারতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বিষয়ক বর্ণনা তাহার ইতিহাসত্বের প্রতিযোগী বা ব্যাঘাতক নহে।

দেখা যাউক, মহাভারতের সমসাময়িক ব্যক্তিগণ এই মহাগ্রন্থের কি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। বিলাতী ইতিহাসের মাপদণ্ডে মাপিলে হয়ত অনেকে ইহাকে ইতিহাস বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাঁহারাই আবার গ্রীক হিরোডোটস ও থুসিডাইডিস প্রভৃতি পশু পক্ষীর বিবরণ পূর্ণ গ্রন্থকে মুক্তকণ্ঠে ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করিবেন।

ইউরোপীয়গণ মহাভারতকে ইতিহাস বলুন বা নাই বলুন, তাহাতে আমাদের কোন দুঃখ নাই, কিন্তু ঘরের ছেলে তাঁহাদের দুটা কথা শুনিয়া কোমর বাধিয়া বলিয়া উঠিল, — মহাভারত — এ ত দ্বিতীয় আরব্য উপন্যাস—এ দুঃখ রাখা যায় না। এই বিলাতী কুহকের মন্ত্রমুগ্ধগণকে এই মাত্র নিবেদন যে তাঁহারা একবার মহাভারতের উপর অনুগ্রহ করিয়া বারেক গ্রন্থখানির কিছু দূর পড়িয়া দেখুন কি অনুভব করেন, উপন্যাস কি ইতিহাস, ভরসা করি এ অনুরোধ কেহ না কেহ রাখিবেন।

ঐতিহাসিকতার বিচারে মহাভারতই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

মহাভারতে আছে উগ্রশ্রবাসৌতি পিতার নাম লোমহর্ষণ, জাতিতে সূত একজন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক; অর্থাৎ তিনি ইতিহাস এবং পুরাণাদি গ্রন্থে সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী। যে সময়ে মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন, তিনি সে সময়ে

তথায় উপস্থিত ছিলেন; এবং সেই মহাভারত শ্রবণের পর তিনি দেশ পর্য্যটন করত সমন্ত পঞ্চকে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এই সমন্ত পঞ্চকের নিকটেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই মহাপুণ্যক্ষেত্র দর্শন করিয়া সৌতি ঋষিগণ সেবিত নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় শৌনকাদি মহর্ষিগণ এক দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে ব্যাপৃত আছেন।

একজন ঋষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এতকাল কোথায় ছিলেন এবং কোথা হইতেই বা আসিতেছেন?" সৌতি উত্তরে বলিলেন, তিনি মহাভারত শ্রবণ করিয়া সমন্ত পঞ্চকে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে আগমন করিতেছেন এবং ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা এখন কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? আমি কি এই সময়ে ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত পৌরাণিকী পবিত্র কথা এবং মহানুভব নরেন্দ্রগণের ও ঋষিগণের ইতিহাস বর্ণনা করিব?"

পুরাণ সংহিতাঃ পুণ্যাং কথা ধর্ম্মার্থ সংশ্রিতাঃ।
ইতিবৃত্তং নরেন্দ্রানামৃষীনাং মহাত্মনাং॥"

আঃ প ১ম অ ২৬।

ঋষিগণ বলিলেন, "আমরা—মহর্ষি দ্বৈপায়ন যে পুরাণ বলিয়াছেন এবং যৎশ্রবণে দেব এবং ঋষিগণ বহুতর প্রশংসা করিয়াছেন, সেই আখ্যানশ্রেষ্ঠ বিচিত্র পদ পর্বযুক্ত সূক্ষ্মার্থ প্রতিপাদক যুক্তিযুক্ত বেদার্থ ভূষিত ভারতের ইতিহাস শুনিতে ইচ্ছা করি।"

দ্বৈপায়নেন যং প্রোক্তং পুরাণং পরম ঋষিনা।
সুরৈঃ ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব শ্রুত্বা যদভিপূজিতং॥
অস্যাখ্যান বরিষ্ঠস্য বিচিত্রপদ পর্ব্বনঃ।
সূক্ষ্মার্থ ন্যায় যুতস্য বেদার্থ ভূষিতস্য চ।

ভারত স্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থ সংযুতাং
সংস্কারোপগতাং ব্রাহ্মীং নানা শাস্ত্রোপবৃংহিতাঃ
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছাম পুণ্যাং পাপভয়োপহাং ॥

আঃ প ১মঅ ১৬।১৭।১৮।১৯

উগ্রশ্রবা পুনরায় বলিতেছেন "যে ভূমণ্ডলে কেহ কেহ এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালেও কবিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন।"

"আচক্ষু কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে
আখ্যায়ন্তি তথৈবান্যে ইতিহাস মিমংভূবি।

আঃ প ১অ ২৬—

তৎপরে সৌতি মহাভারতে কি কি বিষয় আছে এবং ইহার লক্ষণ কি তাহাও বলিতেছেন—

"সমুদায় ভূতস্থান (দুর্গনগর তীর্থক্ষেত্রাদি) ত্রিবিধ রহস্য (ধর্ম্মার্থকাম) বেদ যোগ বিজ্ঞানশাস্ত্র চতুর্ব্বর্ণ এবং আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদাদি নানাবিধ সংসার যাত্রার আবশ্যক শাস্ত্রসমূহ ব্যাসদেব জানিতেন এবং ঐ সমস্ত বিষয় এই ইতিহাসে কথিত হইয়াছে।"

ভূতস্থানানি সর্ব্বানি রহস্যং ত্রিবিধশ্চ যৎ
বেদা যোগঃ সবিজ্ঞানো ধর্ম্মার্থ কাম এব চ ॥
ধর্ম্মকামার্থযুক্তানি শাস্ত্রানি বিবিধানি চ
লোক যাত্রা বিধনঞ্চ সর্ব্বং তদ্দৃষ্টবানৃষি ॥
ইতিহাস সর্ব্বেমাখ্যা বিবিধা শ্রুতয়োপিচ
ইহ সর্ব্বমনুক্রন্ত মুক্তং গ্রন্থস্যলক্ষণং ॥

আঃ প ১ম অ ৪৮।৪৯।৫০

পুনরায় বলিতেছেন "পরাশরাত্মজ আখ্যান বরিষ্ঠ এই ইতিহাস বেদ

বিভাগের পরে রচনা করিলেন এবং কিরূপে এই শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ শিষ্যগণকে শিখাইব এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ব্যাসদেব কৃতাঞ্জলি ও দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন যে তিনি একখানি এতাদৃশ গ্রন্থ রচনা করিতে সংকল্প করিয়াছেন যাহাতে বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব বেদ বেদান্ত ও উপনিষদের ব্যাখ্যা ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ এবং কালত্রয়ের নিরূপণ দ্বারা সত্য ভয় ব্যাধি ভাব ও অভাব নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্মের ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, বর্ণচতুষ্টয়ের নানা পুরাণোক্ত আচার বিধি, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও যুগ চতুষ্টয়ের প্রমাণ, ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ আত্মতত্ত্ব নিরূপণ, ন্যায়শিক্ষা দান ধর্ম্ম চিকিৎসা পাশুপত ধর্ম্ম এবং যিনি যে কারণে দিব্য বা মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; পবিত্র তীর্থ, বন, নদী সমুদ্র পর্ব্বত দিব্যপুরী, দুর্গ সেনাব্যূহ রচনাদি যুদ্ধ কৌশল বাক্যবিশেষ জাতিবিশেষ ও লোক যাত্রা বিধান কথিত হইবে; অথচ যিনি অখিল সংসার ব্যাপিয়া আছেন সেই পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইবেন।"

> "তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনং
> ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতী সুতঃ॥
>
> ঐ ৫৪—
>
> "ব্রহ্মণ বেদ রহস্য যচ্চান্যৎ স্থাপিতং ময়া
> সাঙ্গোপনিষদাশ্বেব বেদানাং বিস্তরক্রিয়া॥
> ইতিহাস পুরাণানামুন্মেষং নির্ম্মিতঞ্চমৎ
> ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্রিবিধং কালসঙ্গিতং॥
> জরা মৃত্যু ভয় ব্যাধি ভাবাভাব বিনিশ্চিয়ঃ।
> বিবিধস্য ধর্ম্মস্য———"

আদিপর্ব্ব ১ম অধ্যায় ৬২ হইতে ৭০ শ্লোক।

এই শ্লোক কয়েকটি মহাভারতে উল্লেখ্য বিষয়ের সূচিকা। যাহারা বলেন যে, মহাভারতে কুরুপাণ্ডবদিগের ইতিবৃত্ত ব্যতীত অন্য যে সকল কথা আছে তাহা ব্যাসের লিখিত নয়, ক্রমশঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাঁহারা এই শ্লোকগুলির কি অর্থ করেন বলা যায় না। বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে "যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে" এ প্রচলিত কথাটি যথার্থ বলিয়া বোধ হয়।

পুনশ্চ আদিপর্ব্বের শেষভাগে সৌতি বলিতেছেন,—"যেমন দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদপ্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদের মধ্যে আরণ্যক, ঔষধির মধ্যে অমৃত, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ইতিহাসের মধ্যে মহাভারত প্রধান।

নবনীতং যথা দধ্নে
দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা॥
ওষধিভ্যো অমৃতং যথা
হ্রদানামুদধি শ্রেষ্ঠো॥
গৌর্ববিষ্ঠো চতুষ্পদাং॥
যথৈ তানীতি হাসানাং।
তথা ভারত মুচ্যতে॥

আঃ প ১ম অধ্যায় ২৬৪।২৬৫।২৬৬

স্থানান্তরে পর্ব্ব সংগ্রহ বলিবার পূর্ব্বে এই ভারতকে "যেমন লৌকিক ও বৈদিক বাক্য সমুদায় স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণে পরিপূর্ণ থাকে, সেইরূপ এই ইতিহাস শ্রেষ্ঠ ভারত হিতসাধিনী বুদ্ধির আধার হইয়াছে" বলা হইয়াছে।

ইতিহাসঃ প্রধানার্থ
শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বাগমেস্বয়ং।
ইতিহাসোত্তমে যস্মিন
অর্পিতা বুদ্ধিরুত্তমা ॥

আঃ প ২অ ৩৬।৩৯

পুনশ্চ, ঋষি বৈশম্পায়নের উক্তি এই "পরম তেজস্বী সত্যবতীনন্দন পবিত্র লক্ষশ্লোক দ্বারা এই আখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। এই মহাপবিত্র ইতিহাস মধ্যে অর্থ কাম ও মোক্ষ সমস্ত বিষয়ের উপদেশ আছে।

"অস্মিন্নর্থশ্চ কামশ্চ নিখিলে নোপ দেক্ষতে
ইতিহাসে মহাপুণ্যে বুদ্ধিশ্চ পরিনৈষ্ঠিকী ॥

আঃ প—৬২ অঃ ৪২

এতদ্ব্যতীত অনেক স্থানে মহাভারতের ইতিহাস বিশেষণ আছে। এই সমস্ত শ্লোক দ্বারা মহাভারত যে ইতিহাসাত্মক গ্রন্থ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষতঃ ঋষি বৈশাম্পায়ন—যিনি ব্যাসের শিষ্য তিনিও এই গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং তিনিই মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন।

মহাভারত রচনার সময় বৈশাম্পায়ন আশ্রমে গুরুর নিকট উপস্থিত থাকিতেন। মহাভারতে ভারত ইতিবৃত্তের দুইটি সর্ব্বপ্রধান ঘটনা বিবৃত আছে। ঐ ঘটনাদ্বয় মহাভারতের মূলভিত্তি। যে উপায়ে এবং যাঁহাদের দ্বারা সেই মহাঘটনাদ্বয় সংসাধিত হইয়াছিল, সেই সকল উপায় এবং ব্যক্তির বিবরণই মহাভারত। ভারতের যে দুইটি যুগান্তরকারী ঘটনা মহাভারতে নিহিত—সে ঘটনা যুগল এই—

১। চিরবিখণ্ডিত ভারতে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন;

২। বহু উপধর্ম্মের সংস্কার করিয়া সর্ব্ববাদীসম্মত একধর্ম্মের বন্ধন বিধান।

বড় হইতে হইলে এই দুইটি পদার্থের বড় আবশ্যক—এক সাম্রাজ্য এবং এক ধর্ম্ম। যে জাতিতে এই দুই অবস্থার অভাব আছে সে জাতি কখন উন্নত হয় না, ভারত চিরদিনই বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং ধর্ম্মমতের আলয়,—ফল চির অশান্তি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্য একস্থানে থাকিলে যুদ্ধের বিরাম হয় না, দেশ শান্তি ভোগ করিতে পারে না, প্রাণ লইয়াই অনুক্ষণ ব্যস্ত—উন্নতির চিন্তা কখন হইবে। পৃথিবীর ইতিহাস ইহার সাক্ষী।

এই প্রবল প্রতাপান্বিত মহামহিম ইংরাজ জাতির প্রথমাবস্থা একবার স্মরণ করুন। ক্ষুদ্র ব্রিটেনে স্পিকট কেণ্ট ওয়েনস্ স্কট প্রভৃতি বহু স্বতন্ত্র জাতির আবাস ছিল; কেবল 'মার কাট যুদ্ধং দেহি' ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসায় তাহারা জানিত কি? কালে কত শত যুদ্ধের পরে অগণ্য প্রাণী ক্ষয় করিয়া তবে ক্ষুদ্র ব্রিটেন—"গ্রেট ব্রিটেনে" পরিণত হইয়াছে।

১৮৭০ সালের পূর্ব্বে জারম্যানদেরও এই দশা ছিল। বহু খণ্ডরাজ্যে যথা—বাভেরিয়া, সাক্সনি, ষ্টমবর্গ, হনর্থিক, সেগ্নবর্গ, ব্রাডেনবর্গ প্রভৃতিতে—বিভক্ত ছিল। মোণ্টকে এবং বিস্মার্ক—এই রাজ্যগুলিকে একে একে সমরানলে আহুতি দিয়া এক প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন। সেই সমবেত জারমান জাতি ফরাসাকে এক ফুৎকারে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিল।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানেরও এই অবস্থা ছিল। ইটো ইয়াম গেটা নগি প্রভৃতি মনীষীগণ কত যত্নে ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহকে নিষ্পেষিত করিয়া মিকাড়োকে সম্রাট স্বীকার করিলেন। সেই পুঞ্জীভূত শক্তির পরিণাম মাথুরিয়া ক্ষেত্রে রুব ঋক্ষের দন্তোৎপাটন।

গৃহ বিবাদই অধঃপতনের প্রথম সোপান।

ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, যখনই কোন জাতি সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছে—তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই এক মহাসমর। রাজলক্ষ্মী বুঝি নরশোণিতে পদ ধৌত না করিয়া সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হয়েন না; এ বিধির ব্যাভিচার ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় না, কথন পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধও হয় না। কারণ স্বার্থ মানবের স্বভাব, বহু স্বার্থান্ধের ধ্বংশ না হইলে সাম্রাজ্য হয় না। সুতরাং যদি যুধিষ্ঠির ভারতের সম্রাট হইয়া থাকেন, তবে অগণ্য শিশুপালের উত্তপ্ত শোণিতে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রূপক নহে, বাস্তবিক ঘটনা।

পাশব বলে ক্ষুদ্ররাজ্য সমূহকে চূর্ণ করিয়া একত্র করিলেই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব হয় না, একটা সাধারণ বন্ধন না দিলে তাহারা পুনরায় কেন্দ্রচ্যুত হইতে আরম্ভ হয়। সকল বন্ধনের শ্রেষ্ঠ বন্ধন ধর্ম্মবন্ধন। আজকাল অনেকে এমতের যাথার্থ্য স্বীকার করেন না এবং বলেন বহু ধর্ম্মিত্ব জাতীয়তার প্রতিবন্ধক নহে; প্রাদেশিকত্ব অর্থাৎ একদেশবাসিত্ব জাতীয়তার প্রধান বন্ধন। উত্তরে আমরা বলি, কই—এই হিন্দু মুসলমান বহুদিন এক দেশে বাস করিতেছে জাতীয়তা কেন হয় নাই? রুমাণিয়া বুলগারিয়া এবং তুরস্ক একদেশ বটে, কিন্তু এক জাতীয়তায় পরিণত হওয়া দূরে থাকুক চিরদিন বিপক্ষতায় নিমগ্ন। অষ্ট্রোহঙ্গেরিতে অষ্ট্রিয়ানগণ এবং স্লাভ জাতি বাস করে, কিন্তু স্লাভগণ রুষিয়ারই পক্ষপাতী—কারণ রুষিয়া স্লাভ জাতি। অন্যদিকে তুর্ক সুলতানের বিপদে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান চঞ্চল হইয়া উঠে।

যাহাহউক, একদেশবাসিত্বের বন্ধন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে বন্ধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে,—সাধারণের পক্ষে অতি দুর্ব্বল বন্ধন। ধর্ম্ম

বন্ধন শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয়েরই প্রবল শৃঙ্খল। ভারতে যে ব্যক্তি সাম্রাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন, তিনি সমধর্ম্মিত্বকেই আদর করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

গীতোক্ত মহাধর্ম্মই সেই জাতীয় বন্ধন, ইহাতে কোন ধর্ম্মই পরিবর্জ্জিত নহে, সকল ধর্ম্মই ইহার অন্তর্গত। যিনি আস্তিক—যিনি নাস্তিক উভয়েই ইহার আশ্রয়ে থাকিতে পাবেন। নাস্তিক ভগবৎ সাক্ষাৎকার না মানিতে পারেন, কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকারে তাঁহার বাধা নাই। কি স্বরগ্রামে এই গীত রচিত—যিনি রচিয়াছেন তিনিই জানেন।

দেবব্রত ভীষ্ম, কুরুপাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক প্রমাণ—অধিকন্তু এই, যদি মহাভারত না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কুরুপাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত জানিতে পারিতাম কিনা, যদি না পারিতাম তাহা হইলে মহাভারত রূপক বা কবি কল্পনা হইতে পারিত। কিন্তু অনেক পুরাতন গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের সম্যক বিবরণ অবগত হওয়া যায়। যথা বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমৎভাগবত, হরিবংশ, রাজ তরঙ্গিনী এবং বৌদ্ধ গ্রন্থাদি। বিষ্ণুপুরাণে যে রাজবংশ সকল কথিত রহিয়াছে, তাহা মহাভারত হইতে ধার করা বলিবার উপায় নাই, কারণ বিষ্ণুপুরাণে যে সকল ব্যক্তির উল্লেখ আছে, মহাভারতে তাঁহাদের অনেকের নাম নাই এবং তাঁহারা যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার অবসর নাই।

যখনই কোন জাতিতে কোন একটা অসাধারণ ঘটনা উপস্থিত হয়, ভবিষ্যতে সেই ঘটনার প্রচার এবং স্থায়িত্ব রক্ষার ভার সমসাময়িক কবি ও লেখকগণের উপর পড়ে। শ্রীব্যাসদেব মহাকবি—তাঁহার স্বদেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মবিধি স্থাপনের ইতিবৃত্ত চিরস্মরণীয় করার দায়িত্ব তাঁহার উপরে পড়িয়াছিল, এ দায়িত্ব যে তাঁহার উপর কেহ চাপাইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহার জন্মই তাঁহার এ দায়িত্বের কারণ।

মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিলেই যেমন জননীর কাছে ঋণী হয়, তেমনি ভূমির কাছেও বহু ঋণে আবদ্ধ হয়। ক্ষমতা অনুসারে সে ঋণ বিশোধের চেষ্টা করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। যিনি অর্থবান তিনি অর্থের দ্বারা, যিনি বলবান তিনি বলের দ্বারা, যিনি সুকণ্ঠ তিনি সঙ্গীতের দ্বারা, যিনি বাগ্মী তিনি বাক্যের দ্বারা, যিনি সিদ্ধ তিনি সাধনার দ্বারা, যিনি জ্ঞানী তিনি জ্ঞানের দ্বারা এবং যাহার যাহা কিছু আছে তিনি তাহার দ্বারা জননী এবং জন্মভূমির সেবা করিবেন।

সমগ্র বসুধাই ব্যাসের জন্মভূমি, তাই তাহার অনন্ত জ্ঞান জগতের হিতে উৎসৃষ্ট। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী পুরুষ কখন মিথ্যা জ্ঞান প্রচারের সহায়ক হইবেন এ কথা অশ্রদ্ধেয়। মহাভারতের ব্যক্তি এবং ঘটনা সমূহ অসার হইলে ব্যাসদেব তাহা তাঁহার ভারত বিশদ গ্রন্থের ভিত্তি বলিয়া অবলম্বন করিতেন না।

মহাভারতকে ইতিহাস গ্রন্থ মধ্যে গণনা না করিবার আর একটা প্রধান কারণ এই যে মহাভারতের পুরাণ বলিয় বিশেষণ আছে। আজ কাল পুরাণ শব্দটার অর্থ এইরূপ দাড়াইয়াছে যে, শুনিলেই বোধহয় যে কতকগুলি দুর্বোধ্য, অপ্রকৃত, অজ্ঞানতা পূর্ণ গল্পের সমাবেশ মাত্র। সুতরাং যখন মহাভারতে পুরাণ সংশ্লিষ্ট আছে, তখন আর উহাতে সত্য থাকিতে পারে না—একেবারে আরব্য উপন্যাস। আর যদি উপন্যাসই হইল, তবে আর কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়িবার আবশ্যক নাই।

পুরাণ শব্দটার এরূপ অর্থে পরিণত হইবার প্রধান কারণ পুরাণ পড়া, দ্বিতীয়তঃ দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকগণের পুরাণাদির প্রতি অশ্রদ্ধাজনিত বিদ্বেষ। আমাদের দেশে যিনি পৌরাণিক, তাহার কি বিত্তির প্রাথর্য্যের উপর লোকে সন্দিহান, কাজেই তাঁহার বিদায়ও "অর্দ্ধ চন্দ্রের" কাছাকাছি। যিনি ন্যায় শাস্ত্রের মলাট দুখানা খুলিয়াছেন

মাত্র, তিনি মনে করেন এবং অজ্ঞানতাবশত লোকেও ভাবে তিনি পাণ্ডিত্যের "জালা" হইয়াছেন এবং তাঁহার দক্ষিণাও সেই ভাবে স্ফীত হওয়া উচিৎ। অতঃপর পুরাণ লোকে কেন পড়িবে।

পুরাণেও যথেষ্ট সত্য এবং জ্ঞানের কথা আছে। আমাদের বিশ্বাস সার্ব্বজনীন শিক্ষার পক্ষে পুরাণ অতি সুন্দর উপায়। পুরাণের সংজ্ঞা এই

"স্বর্গস্ব প্রতিস্বর্গস্ব বংশোমন্বন্তবানি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণং।"

পুরাণ সকলও ইতিহাসাত্মক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহারা কালে বিকৃত হইতে পাবে এবং সকল অংশই এক সময়ে রচিত নহে একথা স্বীকার করা যাইতে পারে।

আর এক কথা এই যে, ঐতিহাসিক গ্রন্থের মৌলিকতার তারতম্য গ্রন্থকারেব এবং গ্রন্থের সমসাময়িকত্বেব উপর নির্ভর করে। বর্ণনা এবং বর্ণনকার বিবৃত বিষয়ের যত সমবয়স্ক হইবে, ততই তাহার সত্যেব দাওয়া অধিক। যদি গ্রন্থকার উল্লিখিত ঘটনা সমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার গ্রন্থের প্রামাণিকতা ছিদ্রহীন। সুতরাং মহাভারতে বর্ণিত প্রধান বিষয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—তাহার কত পরে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ বিচার করা আবশ্যক মনে হয়।

"মহারাজ জনমেজয় সর্পসত্রে দীক্ষিত শুনিয়া তথায় পরাশরাত্মজ ব্যাসদেব উপস্থিত হইলেন।" আঃপ ৬০ অ ১।

তদনন্তর জনমেজয় তাঁহাকে বলিলেন "আপনি কুরু পাণ্ডবের অশেষ চরিত্র প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বর্ণনা করুন, আমার শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে—"

"কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ ভবান প্রত্যক্ষ দর্শিবান
চরিততেষাংমিচ্ছামি কথ্যমানং ত্বয়াদ্বিজ।"

"তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপে উপবিষ্ট শিষ্য বৈশম্পায়নকে কহিলেন, পূর্ব্বে যেরূপ কুরু পাণ্ডবগণের গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল তাহা তুমি আমার নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ এই ভূপতির নিকট অবিকল সেইরূপ বর্ণনা কর।"

"কুরূনাং পাণ্ডবানাঞ্চ যথা ভেদোভবৎ পুরা।
তদস্মৈ সর্ব্বমাচক্ষ্ব যৎমত্ত শ্রুতবানসি।"

আঃ প ৬০অ ২১।২২

এখন দেখা গেল, বর্ত্তমান মহাভারত জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়ন পাঠ করিয়াছিলেন।

মহারাজ জনমেজয় অর্জ্জুনের প্রপৌত্র এবং যখন মহাভারত পাঠ হইতেছিল তখন জনমেজয়ের পৌত্র অশ্বমেধদত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং সে সময় তাঁহার বয়ক্রম অন্ততঃ ৩২ বৎসর হইয়াছিল। ১৬ বৎসরে পুত্রলাভ মহাভারতে আছে, এই জন্য ৩২ বৎসর ধরিলাম।

"শতানীকস্য বৈদেহ্যাং পুত্র উৎপন্নোশ্বমেধ দত্ত ইতি"

আঃ ৯৫ অ ৮৬—

তাহার পূর্ব্বে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভারত যুদ্ধের ৬ মাস পরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন এবং ৬০ বৎসর জীবিত ছিলেন; তাহা হইলে ২৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

"প্রজা ইমাস্তব পিতা ষষ্টী বর্ষাণ্যপাল যৎ।"

আঃ ৪৯ অ ১৭—

"পরিশ্রান্ত বয়স্তস্য ষষ্টী বর্ষোজ্জরান্বিতঃ।

ঐ——২৬।০

মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার শিশুপুত্র জনমেজয় সিংহাসনারূঢ় হইলেন।

"শিশুং তস্য সুতং প্রচক্রিরে সমেত্য সর্ব্বে পুরবাসিনো জনাঃ॥"

আঃ ৪৪ অ ৬।—

যদি জনমেজয়ের শিশুকালের ৫ বৎসর বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কুরু ক্ষেত্র যুদ্ধের ৮৮ বৎসর পরে জনমেজয়ের সর্পসত্রে মহাভারতপাঠ হইয়াছিল।

এখন বিচার করা যাউক, মহাভারত কবে প্রথম প্রচারিত হয়। অনেকের ধারণা আছে যে, ইহা প্রথম জনমেজয়ের সত্রে প্রচারিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, জনমেজয়েব বহু পূর্ব্বে মহাভারত প্রচারিত হয়। প্রায় শতবৎসর পরে রচিত হইলে সমসাময়িকত্বে অনেকে দোষ দেখিতে পারেন। মহাভারত প্রচার বিষয়ে অনুক্রমণিকা-ধ্যায়ে এই ভাবে লিখিত আছে। অনুক্রমণিকা অধ্যায় মহাভারতেব সূচীপত্র স্বরূপ এবং ব্যাসের লিখিত বলিয়া উভয় পক্ষেরই স্বীকৃত।

"পূর্ব্বকালে মহাবীর্য্যশালী ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জননীর ও প্রজ্ঞা-সম্পন্ন ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়ের ন্যায় তেজস্বী তিনপুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। বেদব্যাস এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন সন্তান উৎপাদন করিয়া তপস্যার নিমিত্ত পুনর্ব্বার আশ্রমে গমন করেন। পরে ঐ পুত্রেরা বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে মহর্ষি বেদব্যাস মনুষ্যলোকে মহাভারত প্রচাব করিলেন।" *

মূল এই ———

"মাতুর্নিয়োগাদ্ধর্ম্মাত্মা গাঙ্গেয়স্য চ ধীমতঃ।
ক্ষেত্রে বিচীত্রবীর্য্যস্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ পুরা॥
ত্রীনগ্নীনিব কৌরব্যান জনয়ামাস বীর্য্যবান।
উৎপাদ্য ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুং বিদুরমেবচ॥

---

* বর্দ্ধমান রাজবাটির অনুবাদ বঙ্গবাসী আফিসের মুদ্রিত।

জগাম তপসে ধীমান পুনরেবাশ্রমং প্রতি।
* তেষু জাতেষু বৃদ্ধেষু গতেষু পরমাং গতিং॥
অব্রবীৎ ভারতং লোকে মানুসেস্মিন্মহানৃষি।
জনমেজয়েন পৃষ্টয়ঃসন ব্রাহ্মণৈশ্চসহস্রশঃ॥
শশাস শিষ্যমাসীনং বৈশম্পায়নমন্তিকে।
স সদস্থৈ সহাসীনঃ শ্রাবয়ামাস ভারতং॥

আঃ ১ম অ ৯৩—৯৯ বঙ্গবাসীর সংস্করণ।

উপরে শ্লোক গুলির সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে চিহ্নিত শ্লোকটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। টীকাকার নীলকণ্ঠ "তেষু জাতেষু" পদের এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "তেষু ধৃতরাষ্ট্রাদিষু জাতেষু পুত্র পৌত্রাদি রূপেন প্রাদুর্ভূতেষ্ব প্রবৃদ্ধেষু রাজ্যভাগিষু, পুত্র পৌত্রাদিনং রাজ্যার্থনাং পরমাং গতিং মৃত্যুং গতেষু" টীকার অর্থ এইরূপ "সেই ধৃতরাষ্ট্রদিতে (দ্বারা) উৎপন্ন পুত্র পৌত্রাদিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মরিয়া গেলে।" এ অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না,—যাহারা মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহারাও করেন নাই। জনমেজয় ত পুত্রপৌত্রাদির মধ্যে, তবে তাঁহার সময় কেন মহাভারতের প্রকাশ হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবৎকারও টীকাকারের অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎকে শুকদেব শুনাইতেছেন, আর এই গ্রন্থ ব্যাসদেব মহাভারতের পরে লিখিয়াছেন এইরূপ ভনিতা। যদি মহাভারত প্রথম জনমেজয়ের নিকট প্রকাশ হইত তাহা হইলে ভাগবতকার কখন পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনাইয়া সাময়িক অসঙ্গতিতে পড়িতেন না। শ্রীমৎ ভাগবত ব্যাসের লিখিত কিনা তাহার বিচার এ তর্কে আসে না। যিনিই কেন ভাগবতকার হউন না, তিনি মহাভারত পরীক্ষিতের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এ কথা স্বীকার করেন নাই।

উপরন্তু মহাভারত প্রকাশ সম্বন্ধে অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এইরূপ লেখা আছে "কোন কোন বিদ্বান সংক্ষেপে জানিতে ইচ্ছা করেন, কেহ বা বিস্তার রূপে জানিতে ইচ্ছা করেন এই নিমিত্ত ভগবান বেদব্যাস এই গ্রন্থ সংক্ষেপে ও বিস্তার রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

নানা পণ্ডিত নানা স্থানে সংহিতা আরম্ভ মনে করেন, কেহ কেহ "নারায়ণং নমস্কৃত্য" এই মন্ত্র হইতে কেহ বা আস্তীকপর্ব্ব হইতে কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করেন।

"বিস্তীর্য্যৈতন্মহজ্জ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাস ধারণং॥
মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তীকাদি তথাপরে
তথোপরিচরবদ্যন্তে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে॥

আঃ ১ম অঃ ৫১।৫২।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সর্পসত্রে মহাভারত পাঠ হইবার বহু পূর্ব্বেই ঐ গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল এবং জনমেজয়ের সময়ে তাহার আরম্ভ লইয়া একটা গোলমাল আরম্ভ হইয়াছে। যে সময় সমস্তই মুখে মুখে চলিত, তখন এত বড় বিরাট গ্রন্থে একটা গোলমাল হওয়াই স্বাভাবিক। আর এই গোলমাল ভবিষ্যতে অধিক বাড়িতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব অনুক্রমণিকা অধ্যায় সংকলিত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

বুঝা গেল, মহাভারত সর্পসত্রের পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারত-গ্রন্থের কত পরে তাহার স্থির হইল না। আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি যে, সেই পুত্রদের অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রাদির মৃত্যুর পরে মহাভারত প্রকাশ হইয়াছিল; যদি তাহাদিগের মৃত্যুর কাল নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলেই মহাভারতের বয়স নির্ণীত হইবে।

মহারাজ পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের জীবদ্দশাতেই স্বর্গারোহণ করেন। ভারত যুদ্ধের ১৫ বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয় বনে প্রস্থান করেন এবং তিন বৎসর পরে দাবাগ্নিতে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী এবং পৃথাদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বিদুর পূর্ব্বেই কুরুক্ষেত্রে যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন।

"পাণ্ডবাঃ সর্ব্ব কার্য্যানি সংপৃচ্ছন্তি স্মতং নৃপং।
চক্রুস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতা বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ॥

আশ্রম বাসিক ১ম অ ৬।

"হৃদয়ে শল্যভূতানি ধারয়ামি সহস্রশঃ।
বিশেষতস্ত পশ্যামি বর্ষে পঞ্চদশেহদ্যবৈ॥

ঐ ৩অ ১৪।

আশ্রম বাসিক পর্ব্বের ৩৭ অঃ দ্রষ্টব্য।

মহাভারত প্রকাশের এই উৎকৃষ্ট অবসর কৌরবরাজ্য শান্তিময় হইয়াছে। দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি অধর্ম্ম সহায়গণের স্ত্রীগণ গঙ্গা-সলিলে দেহত্যাগ করিয়াছেন, মহাভারত প্রকাশে যাঁহাদের আপত্তি এবং মানসিক বেদনা হইতে পারে তাঁহাদের আর কেহ জীবিত নাই। পাণ্ডবগণ আছেন কিন্তু তাহাদের কীর্ত্তিতেই ত মহাভারত ভাস্বর। আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ১৮ বৎসর পরে মহাভারতের প্রচার অনুমান করি, আর তাহা হইলে মহাভারত প্রত্যক্ষদর্শীর এবং ঘটনার অব্যবহিত পরেই লিখিত এ কথা প্রমাণ হইল।

এক্ষণে মহাভারতের প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা যে তত্ত্বে উপস্থিত হইলাম, তাহাতে আশ্রমবাসিক পর্ব্বের পরে যে কয়টি পর্ব্ব আছে, তাহা বৈয়াসিক মহাভারতের অংশ হইতে পারে না। ভীষ্ম চরিত্র লেখকের পক্ষে উক্ত পর্ব্ব সমূহ বৈয়াসিক কিনা তাহারা বিচারের কোন প্রয়োজন ছিল না

কারণ ঐসকল অধ্যায়ের সহিত ভীষ্মের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু যখন মহাভারতের মৌলিকতা বিচারে আমরা প্রবৃত্ত, তখন কোন কোন পৰ্ব্ব বৈয়াসিক এবং কোন কোন অংশ অবৈয়াসিক তাহা সর্ব্বতোভাবে বিচার করা উচিত।

পরন্তু, যাঁহারা মহাভারতের সকল অংশই ব্যাসকৃত বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের একটা ঘোরতর মতভেদ হইল এবং মহাভারতের যে সকল অংশ আমরা অবৈয়াসিক বলিয়া অনুমান করি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল।

অনুক্রমণিকাধ্যায়ে মহাভারতের পৰ্ব্ব সমুহের সম্বন্ধে এইভাবে লিখিত আছে—ভারত বৃক্ষের সংগ্রহাধ্যায় বীজস্বরূপ, পৌলোম ও আস্তীক পৰ্ব্ব মূল স্বরূপ, সম্ভবপর্ব্ব স্কন্ধস্বরূপ, সভা ও বনপৰ্ব্ব বিটপী স্বরূপ, অরণিপৰ্ব্ব পৰ্ব্ব স্বরূপ, বিরাট ও উদ্যোগ পৰ্ব্ব সার স্বরূপ, ভীষ্মপৰ্ব্ব মহাশাখা স্বরূপ, দ্রোণপৰ্ব্ব পত্রস্বরূপ, কর্ণপৰ্ব্ব শুষ্ক পুষ্প স্বরূপ, শল্য পৰ্ব্ব সৌরভ স্বরূপ, স্ত্রীপৰ্ব্ব ও ঐষিকপৰ্ব্ব ছায়া স্বরূপ, শান্তিপৰ্ব্ব মহাফল স্বরূপ, অশ্বমেধ পৰ্ব্ব অমৃতরস স্বরূপ, মৌষলপৰ্ব্ব দীর্ঘ শাখার প্রান্তভাগ স্বরূপ হইয়াছে।” আঃ প ১অ, ৮৮।৮৯

ইহার ভিতর পৌষ্য এবং অনুশাসন পর্ব্বের নাম নাই। পৌষ্য পৌলোম এবং আস্তীকপৰ্ব্ব অর্থাৎ আদিপৰ্ব্ব ২য় অধ্যায় হইতে ৫৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাসকৃত মহাভারতে ছিল কি না সৌতির কথা হইতেই তাহার সন্দেহ উপস্থিত, এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এখন এ পৰ্ব্ব তিনটির বিষয় বিচার করিয়া মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারা যায় কিনা দেখা যাক।

পৌষ্য পর্ব্বে উতঙ্ক মুনির সহিত নাগরাজ তক্ষকের কুণ্ডল লইয়া একটা বিবাদ হয়, মুনি মহাশয় সেই বিবাদের প্রতিশোধের জন্য মহারাজ

জন্মেজয়ের নিকট আসিয়া তক্ষকের বিপক্ষে অনেক অনুযোগ করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার পিতৃবৈর স্মরণ করাইয়া সর্প যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তক্ষককে ধ্বংস করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

পৌলোম পর্ব্বটি আরও চমৎকার। ইহাতে মহর্ষি ভৃগুর বংশ বিবরণ আছে। ঐ বংশে রুরু নামে একজন জন্মগ্রহণ করেন, তিনি প্রমদ্বরা নাম্নিকা কোন কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হয়েন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিবাহের পূর্ব্বেই কন্যা সর্পাঘাতে প্রাণ হারান, রুরু ভগ্নমনোরথ হইয়া আক্রোষে সর্পগণকে "দেখ মার" আরম্ভ করিলেন। একদিন ডুণ্ডুভ নামে একটা সর্পকে মারিতে উদ্যত হওয়ায়, ঐ সর্প ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বিষয়ক এক নীতিদীর্ঘ বক্তৃতাপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, "আপনি জনমেজয় রাজার সর্পসত্রের এবং আস্তিক মুনির সর্প কুলের ত্রাণ বিষয়ক সন্দর্ভ শ্রবণ করিবেন।"

বলিতে হইবে না যে, এ কথাগুলি অবশ্য সর্পসত্রের পরের কথা।

"জনমেজয়স্য যজ্ঞেস্মিন সর্পানাং হিসনং পুরাপরিত্রানঞ্চ ভীতানাং সর্পানাং ব্রাহ্মনাদপি। আস্তীকাদ্বিজ মুখ্যাদ্বৈ সর্পসত্রে দ্বিজোত্তম।"

আঃ ১১অ ১৮।১৯

অতঃপর সেই আস্তিক মুনির কথা হইতে সর্পবংশবিস্তার প্রভৃতি অনেক সাপের গল্প আছে, গরুড়ের গল্প আছে, অমৃত হরণের কথা আছে তবে সর্পদিগের বিষয়ই মুখ্য।

বৈয়াসিক মহাভারতে এপর্ব্ব তিনটি ছিল না বলিয়া বোধ হয়,—ইহারা যে অনেক পরে সংযোজিত হইয়াছে এরূপ সন্দেহের বিশেষ কারণ আছে।

এ পর্ব্ব তিনটিতে যে বিষয় উল্লিখিত, সে বিষয়গুলি সর্পসত্রের সময় অথবা তাহার পরে ঘটিয়াছে—মহাভারত সর্পসত্রে পঠিত হইলেও

বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত, তা হইলে ব্যাসকৃত মহাভারতে এ অধ্যায় তিনটি কোথা হইতে আসিল।

পর্ব্ব সংগ্রহাধ্যয়ে এ তিনটি পর্ব্বের উল্লেখ অছে; অনুক্রমণিকাধ্যায়েও আছে এবং যখন সেই অনুক্রমণিকাধ্যায়ের মৌলিকতা স্বীকার করিতেছি, তখন এ পর্ব্বত্রয়ের মৌলিকতা স্বীকার করা উচিত। কিন্তু উপক্রমণিকাধ্যায়ের সে স্থলে পৌষ্য এবং পৌলেম ও আস্তীক পর্ব্বের উল্লেখ আছে, সে অংশটি মৌলিক বলিয়া স্বীকার না করার পক্ষে উপরিউক্ত কারণ ব্যতীত আরও কারণ আছে। অধ্যায় তিনটি একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।

পৌষ্য পর্ব্ব—বলিয়াছি ইহাতে উতঙ্কমুনির কথা আছে—ইনি আয়দধৌম্যের শিষ্য। ধৌম্য পাণ্ডবদিগের পুরোহিত। ইনি গুরু দক্ষিণার জন্য কুণ্ডল আনিতে পৌষ্য রাজার নিকট গিয়াছিলেন। কুণ্ডল লইয়া প্রত্যাগমনের সময় নাগরাজ তক্ষক—যাঁহার দংশনে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রাণ হারান—ঐ কুণ্ডল চুরি করিয়া পলায়ন করেন; এই দোষের জন্য তক্ষকের উপর তাঁহার বড় রাগ এবং সেইজন্য জনমেজয়কে তাঁহার বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।

এই উতঙ্ক মুনির কথা পুনরায় অশ্বমেধ পর্ব্বে ৫৩ অধ্যায় হইতে ৫৮ অধ্যায়ে আছে। এখানে যে উতঙ্ক মুনির উপাখ্যান আছে, তাহা পৌষ্য পর্ব্বের উপাখ্যান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অশ্বমেধ পর্ব্বে উতঙ্ক গৌতমের শিষ্য। পৌষ্য পর্ব্বে তিনি ধৌম্য শিষ্য বেদের শিষ্য। গৌতম পত্নী অহল্যা দেবীর জন্য সৌদাস রাজার নিকটে কুণ্ডল আনিতে গিয়াছেন, আসিবার পথে বেলগাছে উঠিয়া বেল পাড়িতেছেন, এমন সময় একটা সর্প আসিয়া কুণ্ডল লইয়া পলায়ন করিল। উতঙ্কমুনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন

এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের দিন কয়েক পূর্ব্বে মরুভূমির মধ্যে ভগবান তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, উতঙ্কের কুণ্ডল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ব্বে চুরি গিয়াছিল আর তক্ষকের সেই অপরাধ তিনি প্রায় শত বৎসর পরে জনমেজয়কে বলিতেছেন। ক্রোধের কি দীর্ঘস্থায়িত্ব? এই দুই বৃত্তান্ত এতই পৃথক যে, কখনই এক ব্যক্তির লিখিত হইতে পারে না।

পর্ব্ব সংগ্রহাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণে অশ্বমেধপর্ব্বে উতঙ্ক মুনির বিবরণ নাই। উতঙ্কোপাখ্যানে কোন উৎকৃষ্ট নীতি কথাও নাই।

পরন্তু এই পর্ব্বে একটি শ্লোক আছে,—সেটি বিশেষ লক্ষ্যের যোগ্য; শ্লোকটি এই——

"সোপস্যদথ পথি নগ্নং ক্ষপণকমাগচ্ছন্তং।
মুহুর্মুহু দৃশ্যমানং অদৃশ্য মানঞ্চ॥

আঃ প—৩ অঃ ১২৬।

নগ্ন এবং ক্ষপণক এই শব্দ দুইটি হিন্দুরা বৌদ্ধদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন। ক্ষপণক অর্থে বৌদ্ধ ভিক্ষুক এবং নগ্ন অর্থে পাষণ্ড অতএব সে চোর এবং সর্পের ন্যায় ক্রুর। বৌদ্ধগণের প্রতি বিদ্বেষ বহুদিন ছিল তাহা ইতিহাসে পাওয়া যায়। রামায়ণে বৌদ্ধদিগের চোর সংজ্ঞা আছে। বৌদ্ধেরা বেদবিহিত যজ্ঞের বিদ্বেষী এবং ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের ঐ সব ভূষণ দিয়াছেন। নগ্ন শব্দটি যে হিন্দুরা বৌদ্ধদিগের বিপক্ষে প্রয়োগ করিতেন, তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ বিষ্ণু পুরাণে আছে। নগ্ন শব্দের অর্থ কি তাহা তথায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণ ৩ অংশ ১৭।১৮শ অধ্যায়— উপরিউক্ত শ্লোকটি পৌষ্য পর্ব্বের আবির্ভাবের নির্দ্দেশক।

যথা হিচৌরঃ স তথাহি বৌদ্ধঃ
তথাগতং নাস্তিকঃ সচ বিদ্ধি॥

অযোধ্যাকাণ্ড।

বৌদ্ধ বিদ্বেষ বিষ্ণু পুরাণের অধ্যায়দ্বয়ের মূল কারণ। মানব অজ্ঞানতার প্রভাবে কত কুকার্য্যই করে; এই দুই অধ্যায়ে ভগবদবতার শ্রীবুদ্ধদেব কি ভাবেই বর্ণিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে, এই দুই অধ্যায় দেবব্রত ভীষ্মের পবিত্র নামের সহিত জড়িত।

নগ্ন অর্থে পাষণ্ড বেদাবরণ হীন ব্যক্তি, সর্প এবং নাগ প্রভৃতি শব্দ যে বৌদ্ধগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট অনুমান হয়। অতএব এই পৌষ্য পর্ব্বে মহাভারতের অনেক পরে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

পৌলেম পর্ব্বের ১২শ অধ্যায়ের ১ম এবং ২য় শ্লোক ধ্যান যোগ্য তথায় রুরু বলিতেছেন "জনমেজয় সর্পদিগকে কেন হিংসা করিলেন আর কেনই বা ধীমান আস্তীক তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন বিশেষ করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করেন।" এ ত সর্প যজ্ঞের পরের কথা মহাভারতে কি করিয়া স্থান পাইল?

তৎপরে আস্তীক পর্ব্ব—ইহাতে সর্পকুলের কুলজি বংশ পরিচয় সমুদ্র মন্থন এবং অন্যান্য কথা আছে।

এই আস্তীকোপখ্যান স্থির চিত্তে বিবেচনার বস্তু। আস্তীক মুনি সর্পদিগের ভাগিনেয় এবং ব্রাহ্মণের ঔরষজাত। ইনি মাতৃকুলের উপকারের নিমিত্ত মহারাজ জনমেজয়ের সভায় উপস্থিত হইয়া স্তব স্তুতি এবং যুক্তি দ্বারা সেই হিংসাত্মক সর্প যজ্ঞ বন্ধ করাইলেন। মহারাজ জনমেজয় এবং অন্যান্য ঋত্বিকগণ অহিংসা পরম ধর্ম্ম স্বীকার করিলেন এবং নাগগণের সহিত একটা সখ্য ভাব স্থাপিত হইল। এ উপাখ্যানটি কি নাগানন্দ নাটকের পূর্ব্বাভাস বলিয়া বোধ হয় না?

এই পর্ব্বে সর্পগণের একটি সভার সুন্দর বর্ণনা আছে। কিয়ৎ পরিমাণে অবান্তর কথা হইলেও উল্লেখযোগ্য।

তাঁহারা সমবেত হইয়া কি উপায়ে জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞ দক্ষ যজ্ঞে পরিণত করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন এবং ফোঁস ফোঁস ফোঁসা ফোঁস করিয়া আপন আপন প্রস্তাব প্রকাশ ও সমর্থন করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বাসুকি সভাপতির আসনে পড়িয়া আছেন। অতঃপর এক বিচক্ষণ উরগ উদরের উপর উঁচু হইয়া প্রস্তাব করিলেন, "আমরা উত্তম ব্রাহ্মণ হইয়া জনমেজয়ের নিকট এই ভিক্ষা করিব তিনি যেন সর্প যজ্ঞ না করেন। পাণ্ডিত্যাভিমানী কোন নাগ কহিলেন, "চল, আমরা জনমেজয়ের নিকট তাঁহার মন্ত্রী হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে সকল বিষয়েই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিবেন তখন আমরা যাহাতে যজ্ঞ না হয় সেই পরামর্শ দিব। আমরা বলিব "জীব হিংসা করিলে নরকে যাইতে হইবে এবং সর্পগণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজা সমস্তকে দংশন করিবে।" অপর জন বলিলেন "যিনি এই সত্রের উপাধ্যায় হইবেন তাঁহাকে দংশন কর, পুনরায় তাঁহার স্থানে কেহ আসিলে তাঁহাকেও দংশন কর, যজ্ঞ করিবে কে।" অন্য এক পন্নগবর প্রস্তাব করিলেন, "আমরা জলধারা বর্ষণ করিয়া যজ্ঞীয় কাষ্ঠ এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দিব, না হয় স্রুক ভাণ্ডাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য সমুদায় চুরি করিয়া আনিব, না হয় সকলে মিলিয়া যাহাকে পাইব তাহাকে দন্তাঘাত করিব।"

পুনরায় কোন এক ভুজঙ্গদল প্রকাশ করিলেন, "আমরা মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ভক্ষ্য ভোজ্য দূষিত করিয়া দিব।" এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে অনেক বামুনকে ভগ্ন মনোরথ হইতে হইত।

অবশেষে তাঁহাদের মধ্যে একটি কৃতকর্ম্মা ফণীবর এই বলিয়া উপসংহার করিলেন যে "ও সব কিছুই নয়, জনমেজয়কে দংশন না করিলে

কিছুই হবে না।” এটি পাকা উপদেশ। বাবা না মরিলে পড় বন্ধ হবে না, গুরু মহাশয়কে মারিলে কি হইবে অপর এক জন আসিবে।”

আরও মুখরোচক উপাখ্যানের অভাব নাই। একটি উপাখ্যান এই,—“তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন করিতে যাইতেছেন পথের মাঝে কশ্যপের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, তুমি রাজাকে দংশন করিলে আমি তাহাকে আরোগ্য করিব। তক্ষক বলিলেন, আচ্ছা এই বট গাছটাকে আমি দংশন করি, তুমি জীবিত কর দেখি,—কেমন তোমার ক্ষমতা, এই বলিয়া তক্ষক সেই গাছটাকে দংশন করিলেন, বৃক্ষটা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। তখন কশ্যপ সেই ভস্ম লইয়া মন্ত্রপুত করিলেন, অমনি বনস্পতি শনৈঃ শনৈঃ পুনর্জীবিত হইল। মহারাজ জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বৃত্তান্তটা প্রকাশ করিল কে, উত্তর হইল “সেই বৃক্ষে একটি লোক কাষ্ঠ ভাঙ্গিতেছিল সেও বৃক্ষের সহিত ভস্ম হইয়াছিল তারপর যখন গাছটি পুনর্জীবিত হইল সেই সঙ্গে সে লোকটিও জীবিত হইল। সেই ব্যক্তি এ গল্পটি ঋষিদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছে। গল্পটির রচনায় বাগ্বাজার পরাভূত নহে কি।

যাহা হউক, এই পর্ব্ব তিনটিতে একটি সুন্দর ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। পৌষ্য পর্ব্বে হিন্দু বৌদ্ধের বিদ্বেষ, পৌলোম পর্ব্বে সেই বিদ্বেষ হেতু বিবাদের সম্ভবনা এবং উদ্যোগ। আস্তীক পর্ব্বে হিন্দু এবং বৌদ্ধ মতের সংঘর্ষ এবং পরিণামে প্রচলিত হিংসাত্মক বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তে অহিংসা ধর্ম্মের তাৎকালিক প্রাধান্য স্থাপন এবং জন [illegible]করণের দ্বারা গ্রহণ।

যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহাতে এই স্থির হইল যে, এ পর্ব্ব তিনটি ব্যাসের মহাভারতে ছিল না বহুকাল পরে সংযুক্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে অনুক্রমিকাধ্যায় ও পর্ব্বাধ্যায়ও বিকৃত হইয়াছে।

অতঃপর অনুক্রমণিকাধ্যায়ে অনুশাসন পর্ব্বের উল্লেখ নাই। এ পর্ব্বটির বিষয়ে আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিব এবং দেখাইব এই পর্ব্ব প্রক্ষিপ্ত নহে, শান্তি পর্ব্বের অংশ মাত্র ক্রমশঃ পর্ব্বাকারে পরিণত হইয়াছে।

এখন আর একটি পর্ব্বের বিষয় কিছু বক্তব্য আছে সেটি মৌষল-পর্ব্ব। পণ্ডিত বঙ্কিম চন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ চরিত্রে "যদু বংশ" পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন "মৌষল পর্ব্ব আদিমস্তরের কিনা তাহা আমি বিচার করি নাই" তবে প্রথমস্তরের নয় বলিয়া তাঁহার অনুমান। তিনি বলিয়াছেন যে অনুক্রমনিকাধ্যায়ে এই পর্ব্বের কোন প্রসঙ্গই নাই কিন্তু আমরা যে সংস্করণ দেখিতেছি তাহাতে প্রসঙ্গ আছে এবং এইরূপ ভাবে আছে "মৌষল শ্রুতি সংক্ষেপঃ (শাখান্তঃ) শিষ্ট দ্বিজ নিষেবিতঃ"

অবশ্য ইহা সৌতির কথা বলিয়া লিখিত ব্যাসের নহে এবং ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের পূর্ব্বে। নীলকণ্ঠ টীকাতে লিখিয়াছেন, "মৌষলাদি গ্রন্থ শ্রুতিস্থানীয় দীর্ঘশাখান্তঃ" অর্থাৎ মৌষল পর্ব্ব শ্রুতিস্থানীয় এবং দীর্ঘ শাখার প্রান্তভাগ। ব্যাখ্যা হইতে বুঝা গেল না শাখান্ত কি করিয়া হইল। মহাভারতের বিষয়ের সহিত মৌষল পর্ব্বের কথিত বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে এ পর্ব্ব মহাভারতের শাখান্ত কেন হইল।

মৌষল বৃত্তান্ত যদুবংশের শেষকথা,—হরিবংশের শাখান্ত হইতে পারে। যদি হরিবংশ মহাভারতের অন্তর্গত ছিল তাহা হইলে পুনরায় মৌষল পর্ব্বের উপযোগিতা অনুভব করা যায় না। বর্ত্তমান মহাভারতে যদুবংশের কোন বৃত্তান্ত নাই তবে সেই বংশের ধ্বংসের উপাখ্যানটি কেন থাকিবে ?

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মহাভারত প্রকাশের উপযুক্ত সময় ধৃতরাষ্ট্রাদির মৃত্যুর পরে এবং তাহার কারণও প্রদর্শিত হইয়াছে সে কারণ অনুসারে এ পর্ব্ব বৈয়াসিক হইতে পারে না। মৌষল পর্ব্বের বর্ণিত

ঘটনা সমূহ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে ঘটিয়াছে। স্ত্রীপর্ব্বে গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিতেছেন।

"ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষটত্রিংশে মধুসূদন।
হতজ্ঞাতি হতামাত্যো হতপুত্র বনেচরঃ॥

তুমিও ৩৬ বৎসর পরে হতজ্ঞাতি অমাত্য হতপুত্র বনচর হইয়া" কুৎসিত উপায়ে নিধন পাইবে। মৌষল পর্ব্বের ১ম শ্লোকটি এই

"ষটত্রিংশে ত্বথ সম্প্রাপ্তে বর্ষে কৌরব নন্দনঃ
দদর্শ বিপরীতানি নিমিত্তানি যুধিষ্ঠিরঃ।
"শুশ্রাব বৃষ্টি চক্রস্য মৌষলে কদনং কৃতং"

অনন্তর ৩৬ বৎসর প্রাপ্ত হইলে যুধিষ্টির বিপরীত নিমিত্ত সকল দেখিতে লাগিলেন। বৃষ্ণি বংশের মূষল দ্বারা ধ্বংশ শ্রবণ করিলেন।

আমাদের যুক্তি অনুসারে ইহার ১৮ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছিল।

আপত্তিকারীরা বলিতে পারেন, যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার বহুদিন পরেও ব্যাসদেব জীবিত ছিলেন; যদিও মহাভারত কিছুপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত ব্যাসের লিখিত হওয়া কিছুই অবিশ্বাস্য নহে। পশ্চাতে অবশিষ্টাংশ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

আমরা নিম্নলিখিত প্রকারে এ আপত্তির মীমাংসা করি। বর্ত্তমান মহাভারতে মৌষল পর্ব্বের পরে মহাপ্রস্থানিক এবং স্বর্গারোহণ পর্ব্ব আছে: এ পর্ব্ব দুইটির উল্লেখ অনুক্রমণিকায় নাই। এ পর্ব্ব দুইটির বিষয় পাণ্ডব নির্ব্বেদ প্রাপ্তি এবং তাঁহাদিগের পরীক্ষিৎকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া প্রস্থান ও তাঁহাদের একে একে মৃত্যু ও শেষে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

পাণ্ডবদিগের রাজ্য ত্যাগের কারণ মৌষল পর্ব্বের লিখিত শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব। এই দুইটি পর্ব্বের জন্যই মৌষল পর্ব্বের সার্থকতা নচেৎ আর

কোন সম্পর্ক মহাভারতের ঘটনাবলির সহিত ইহার নাই। যখন শেষ পর্ব্ব দ্বয় মহাভারতে ছিল না, তখন তাহাদের কারণ যে মৌষল পর্ব্ব কেন থাকিবে। ব্যাস কি এতই বোকা ছিলেন যে কারণ বলিলেন কিন্তু কার্য্য বলিলেন না। মৌষল পর্ব্ব সংক্রান্ত পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক হইতে এই বুঝা যায় যে, মৌষল পর্ব্ব এক সময়ে মহাভারতের শেষ পর্ব্ব ছিল (শাখান্ত শব্দের এই অর্থ) আর সেই সময় অনুক্রমনিকাধ্যায়ে ঐ শ্লোকটি প্রবিষ্ট হইয়াছে।

মহাভারতের আদি পর্ব্বে ব্যাস কৃত ভারতের স্থূল ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, তাহাতে কুরুবংশের ধ্বংস এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লাভ পর্য্যন্ত ব্যাসের মহাভারতের সমাপ্তি বলিয়া পরিচয় দেওয়া আছে। এই ভাবে লিখিত আছে, মহারাজ জনমেজয় মহাভারত শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বৈশম্পায়ন ব্যাস কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রথমে মহাভারতের স্থূল ঘটনাগুলি বিনা উপাখ্যানে বর্ণনা করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বলিয়া শেষ করিলেন।

"এবমেতৎ পুরাবৃত্তং তেষামক্লিষ্ট কর্ম্মনাং।

আ—৬০।৫৩।

মৌষলপর্ব্ব এবং তৎপরের পর্ব্ব দুইটি ব্যাসের মহাভারতে থাকিলে এখানে তাহার অবশ্য উল্লেখ থাকিত এবং পরে সংযুক্ত হইলে ব্যাস কি কিছু বর্দ্ধিত করিতেন না? বৈশম্পায়ন যুধিষ্ঠিরের রাজ্যত্যাগ বৃত্তান্তটা পরিত্যাগ করিলেন কেন তাহার কোন কারণ দেখা যায় না।

মৌষল পর্ব্বে বিবৃত যদুবংশের ধ্বংস এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রয়াণ ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। কেবল শাম্বের মূষল প্রসব এবং তচ্চূর্ণের এরকা প্রাপ্তি কথাটা সাবধানে গলাধঃকরণ করিতে হইবে। এরকের (শরগাছ) মুষলত্ব প্রাপ্তি এবং এরকমূলের সজোর আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি আশ্চর্য্য নহে,

বিশেষতঃ যখন সুরাপানে পূর্ণ মত্ততার আবির্ভাব হইয়াছে। স্থান বিশেষে সামান্য লতাগুল্মের বৃদ্ধি বিশ্বাসের বাহিরে যায় এবং শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। *

মূষল প্রসব এবং তৎ চূর্ণ হইতে উৎপন্ন এরকের আঘাতে যদুবংশ ধ্বংসের বৃত্তান্তটা বাস্তবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। গল্পটি মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে, শ্রীভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণেও আছে কিন্তু কথাটা সকল গ্রন্থে একভাবে নাই। কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত দেখা যায়।

মহাভারতে আছে,—"একদা সারণপ্রমুখ যাদবগণ মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব এবং নারদকে দ্বারকায় আসিতে দেখিয়া দুর্ব্বিনীত হইয়া কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে একটি গর্ভবতী স্ত্রী সাজাইয়া ঋষিদিগকে বলিল যে আপনারা গণনা করিয়া বলুন—এই কামিনীর গর্ভে কি সন্তান হইবে। এরূপ ব্যবহারে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত দিলেন যে যদুবংশ উৎসন্ন করিবার জন্য এক লৌহময় মূষল প্রসব হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে এক সুমহৎ মুষল শাম্ব প্রসব করিলেন। বিষ্ণুপুরাণেও জঠর হইতে প্রসবের কথা আছে, কিন্তু ভাগবৎ

* "ই, বি, এস আর মদনপুরের ষ্টেশনের নিকট একস্থানে পালমশাকের মূল পাকা ১৭ সের ওজন হইতে দেখিয়াছি এবং ১ মণে পরিণত হয় তাহা বিশ্বস্ত লোকের মুখে সেই স্থানেই শুনিয়াছি। কশৌলিপর্ব্বতে মনসাগাছের তরুত্ব প্রাপ্তি দেখিয়া——

"তরবঃ পারিজাতাদ্যাঃ।
স্নুহি বৃক্ষঃ মহাতরুঃ

কথাটি মনে করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি। দার্জ্জিলিংয়ের পথে ধুতুরাগাছ এবং লাউন স্যানাটরিয়মে গোলাপগাছের আকার বিস্মৃত হইবার নহে। বাগান পাটিতে মৌবল যুদ্ধের অভিনয় কখন কখন শুনা যায়।

গ্রন্থকার।

কার বোধ হয় পুরুষের সুমহৎ মূষল প্রসব অবিশ্বাস করিয়া প্রসবের কথাটা ত্যাগ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন কৃত্রিম উদরে একটি মূষল দেখা গেল। তৎপরে সেই মূষল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষিপ্ত হইল। বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতের মতে মূষলটার কিছু অংশ চূর্ণ
করা গেল না সেই অংশটা জলে নিক্ষিপ্ত হইলে একটা মৎস্য সেই অংশ উদরসাৎ করিলে এবং ঘটনাক্রমে জালে উঠিয়া কর্ত্তিত হইলে সেই অংশ এক ব্যাধ গ্রহণ করিল। পরে তদ্দ্বারা এক অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মৃগভ্রমে আহত করিল। মহাভারতে এরূপ বৃত্তান্ত নাই মূষল চূর্ণ করিয়া জলে নিক্ষিপ্ত হইল তাহাই আছে। তাহা হইতে এরকা উৎপন্ন হইল এ কথা নাই, বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতে আছে।

অতঃপর প্রভাসতীর্থে যাদবগণ পরস্পর কলহ আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ একমুষ্টি এরকা লইয়া আঘাত করিলেন। তাহাতে সেই এরকা বজ্রতুল্য হইল। তৎপরে অন্যান্য যাদবেরাও এরকা উৎপাটন দ্বারা পরস্পরকে আঘাত আরম্ভ করিলেন; এরকা সকল মূষলের ন্যায় কার্য্য করিল! বিষ্ণুপুরাণে আছে—'প্রথমে তাহারা অস্ত্রের দ্বারা আঘাত আরম্ভ করিল, পরে অস্ত্র নিঃশেষ হইলে এরকা দ্বারা আঘাত চলিল এরকা বজ্রতুল্য হইল। এরকের মূষল প্রাপ্তি প্রমাণ হইল কিন্তু মূষল চূর্ণের এরকত্ব প্রাপ্তি মহাভারতে নাই, পরবর্ত্তী গ্রন্থে আছে। লৌহচূর্ণের উদ্ভিদত্ব প্রাপ্তি বিশেষ কারণ ব্যতীত গ্রহণ করা যায় না। অনেকে বলিবেন যে এখানে বিশেষ কারণ বর্ত্তমান যথা, ঋষিদিগের অভিসম্পাত। কিন্তু ঋষিরা ত এরূপ অভিসম্পাত দেন নাই যে, লৌহ মূষলচূর্ণ তৃণে পরিণত হইবে এবং সেই তৃণেতে মূষলের কাঠিন্য উপস্থিত হইবে। পুনরায় মূষল চূর্ণ হইতে এরকা হইয়াছিল এ কথাটা প্রকাশ কি করিয়া হইল? আর যদি প্রকাশই ছিল, তবে সেই তৃণগুলি উৎপাটন করিলেই ত সকল গোল শেষ হইত।

উপাসক হইতে উপাস্যের লাঞ্ছনা জগতে চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের জীবনে অনেক অতিরঞ্জিত এবং অলীক ঘটনা উপাসকগণ কর্ত্তৃক আরোপিত হইয়াছে, শ্রীবুদ্ধের জীবনেও অনেক অযথা ঘটনা স্থান পাইয়াছে। শ্রীচৈতন্য অল্পদিনের হইলেও তাঁহার জীবনেও অনেক ঘটনা বিবৃত আছে—যাহা তিনি কখন করেন নাই অথবা যে ভাবে বর্ণিত আছে সে ভাবে করেন নাই। অন্যান্য মহাপুরুষগণের জীবনেও এ কথার যাথার্থ্য দেখা যায়।

যদুবংশ মূষল প্রহারে ধ্বংস হইয়াছিল এ কথাটা প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বংশ যে মূষলে ধ্বংস হইয়াছে সে মূষল সামান্য লৌহখণ্ড কখনই হইতে পারে না, তাহাতে অবশ্য একটা আধ্যাত্মিক কিছু আছে। ভক্তগণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে মূষলোপাখ্যানের সৃষ্টি হইল এবং ক্রমশঃ গ্রন্থে স্থান পাইল। এ উপাখ্যানে কবির কল্পনা কিছুই নাই বরং মহামূর্খের জল্পনারই প্রকাশ।

বালক কালে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম—যে, একজন দেবীভক্ত ব্রাহ্মণকে তাঁহার পৌত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা মহাশয়, স্ত্রীলোকের কাছা দিতে নাই কেন?" ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, তাইত! ইহাতে একটা নিশ্চয়ই গভীর তত্ত্ব আছে এবং চিন্তা করিয়া বলিলেন, "জান দিদি, স্ত্রীজাতি জগন্মাতার প্রতিমূর্ত্তি তিনি ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, প্রতিমুহূর্ত্তে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছেন, কাছা দেন কখন!" শাম্বের মূষল প্রসব এবং তৎচূর্ণ হইতে এরকের উৎপত্তি এই ভাবেই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

মৌলিকতা প্রসঙ্গে আর এক কথা বিচারের প্রয়োজন। সে কথাটি এই যে, যে সকল পর্ব্ব বৈয়াসিক বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, তাহাদের আদ্যোপান্তই কি বৈয়াসিক অথবা তাহাদের ভিতরেও হস্তান্তরের সঞ্চারণ অনুভব হয়।

উপরিউক্ত প্রশ্নের মীমাংসা বড়ই দুরূহ। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং সুদীর্ঘ অন্বেষণ ব্যতীত উত্তর দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কেহ কেহ

ব্যাসের সংস্কৃত রচনার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তাঁহার রচিত বিষয়ের উদ্ধারেব বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের মতে এরূপ চেষ্টার উপর নিভব করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ব্যাস সাধারণ লেখক নহেন, যে তাঁহার রচনায় একটা ব্যক্তিগত ভার সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইবে। তিনি অনন্তজ্ঞানী—একাধারে দর্শনকার, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, বেদ বিভাগকার কবি, রাষ্ট্রবিৎ তপস্বী গৃহী যোগী এবং কর্ম্মী। বিষয়ভেদে রচনার ভেদ হয়,—দর্শনের ভাষা এবং পুরাণের ভাষা এক হয় না—সুতরাং ভাষা এবং রচনা দ্বারা ব্যাসকে ধরার চেষ্টা বৃথা নহে কি। স্থূলভাবে বলিতে হইলে সকল প্রকার রচনাই তাঁহাতে সম্ভব।

মহাভারতে কত শ্লোক ছিল স্থির করিতে পারিলে, কতটা বৈয়াসিক অংশ তাহা কিয়ৎ পরিমাণে নির্দ্দেশ করা যায়। মহাভারতে লিখিত রহিয়াছে ব্যাসদেব এক লক্ষ শ্লোক দ্বারা ভারতপ্রকাশ করেন।

বৈশম্পায়ন উক্তি "ইদং শত সহস্রং হি শ্লোকানাং পুণ্যকর্ম্মণাং
সত্য—বত্যাজ্জেনেহ ব্যাখ্যাতমমিতৌজসা।"

আঃ ৬২।১৪।—

লক্ষ শ্লোকময় মহাভারতের কথা উপক্রমণিকাধ্যায়ে এই ভাবে আছে। "অনন্তব তিনি ষষ্টি লক্ষ শ্লোকময়ী অপর এক সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ত্রিংশৎ লক্ষ দেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশ লক্ষ গন্ধর্ব লোকে এবং এক লক্ষ শ্লোক মর্ত্ত্য লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারদ দেবগণকে, অসিত দেবল পিতৃগণকে, শুকদেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসগণকে এবং বৈশাম্পায়ন মনুষ্যলোকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন।"

আঃ ১ম অ—১০৫-১০০

বর্ত্তমান মহাভারতে লক্ষ শ্লোক নাই। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় হইতে গণনা করিলে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা এইরূপ দাঁড়ায়—

পর্ব্বাধ্যায় অনুসারে	বর্ত্তমান শ্লোক	সংখ্যা (কৃষ্ণচরিত্র হইত
আদি	৮৮৮৪	৮৪৭৯
সভা	২৫১১	১৭০৯
বন	১১৮৬৪	১৭৪৭৮
বিরাট	২০৪০	২৩৭৬
উদ্যোগ	৬৬৯৮	৭৬৫৬
ভীষ্মপর্ব্ব	৫৮৮৪	৫৮৫৬
দ্রোণ	৮৯০০	৯৬৪৯
কর্ণ	৪৯৬৪	৫০৪৬
শল্য	৩২২০	৩৬৭১
সৌপ্তিক	৮৭০	৮১১
স্ত্রী	৭৭০	৮২৭
শান্তি	১৪৭০৭	১৩৯৪৩
অনুশাষন	৮০০০	৭৭৯৬
অশ্বমেধ	৩৩২০	২৯০০
আশ্রমবাসিক	১৫০৬	১১০৫
মৌষলপর্ব্ব	৩২০	২৯২
মহাপ্রস্থানিক	৩২৩	১০৯
স্বর্গারোহণ	২০৯	৩১২
হরিবংশ ও ভবিষ্য	১২০০	১৬৩০৪
	৯৬৯৭০	১৭৩৯০

অধিক ১০৪২

ইহা হইতে দেখা যায় যে, যে সময় পর্ব্বাধ্যায় রচিত, তাহার পরে প্রায় সাড়ে দশহাজার শ্লোক বাড়িয়াছে। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, এক বনপর্ব্বে এবং হরিবংশেই প্রায় ১০ হাজার শ্লোক বাড়িয়াছে। এবং শান্তিপর্ব্বে প্রায় ১ হাজার কমিয়াছে। অবশ্য বলিতে হইবে, বর্ত্তমান মহাভারতে অন্ততঃ ১০ হাজার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমাদের বিচারানুসারে যদি হরিবংশ স্বর্গারোহণ মহাপ্রস্থানিক এবং মৌষলপর্ব্বের ১৩ হাজার শ্লোক বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রায় ৮৪ হাজার শ্লোক মহাভারতে ছিল বলিয়া বোধ হয়। অধিক থাকাও আশ্চর্য্য নহে। লক্ষ শ্লোক না থাকিলেও প্রায় লক্ষ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পর্ব্বাধ্যায় আদিম মহাভারতের পরে সংযুক্ত হইয়াছে, যে সময় উহা মহাভারতে স্থান পাইয়াছে তাহার পূর্ব্বে মহাভারতের অধ্যায় এবং শ্লোক সংখ্যা অনেক বিকৃত হইয়াছিল নচেৎ পর্ব্বাধ্যায়ের আবশ্যকতা ছিল না।

মহাভারতে লক্ষ শ্লোক ছিল এ কথা পর্ব্বাধ্যায়ের সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল, অথচ গণনায় প্রায় ১৫ হাজার শ্লোক কম পড়িতেছিল, তাই লক্ষ শ্লোক পূর্ণ করিবার নিমিত্ত পর্ব্বাধ্যায় কবি অথবা তৎপরে কেহ হরিবংশ মহাভারতের অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করিলেন কিন্তু তাহাতেও লক্ষ শ্লোকের কিছু কম হয়,—সুতরাং হরিবংশে এবং বনপর্ব্বে কিছু শ্লোক বাড়ান হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

হরিবংশ মহাভারতে ছিল না, তাহা আমরা বলিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবত-কারও হরিবংশ মহাভারতের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যাসনারদ সংবাদে এইরূপ লিখিত আছে যথা—"ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করিয়াছেন, পুরাণাদি গ্রন্থ সমস্ত প্রচার করিয়াছেন, বেদ বিভাগ করিয়াছেন

কিন্তু তথাপি তাঁহাব আত্মার তৃপ্তি হইতেছে না।” নারদকে এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, “তুমি ভারতাদিতে ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রদর্শন কবিয়াছ কিন্তু বাসুদেবের মহিমা সেরূপ সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন কর নাই। যদি হবিবংশ মহাভারতে ছিলই তবে এ কথার কোন অর্থই হয় না। ভগবং কার সামান্য ব্যক্তি নহেন।

মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা বিষয়ক কথা অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে এবং যে কয়েকটি শ্লোকেব দ্বাবা তাহা প্রকাশিত, তাহার অর্থ এবং পাঠ লইয়া মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণ চরিত্রে এই মত প্রকাশ কবিয়াছেন যে, ব্যাসকৃত মহাভারতে ২৪ হাজার শ্লোক মাত্র ছিল এবং সেই ২৪ হাজারি মহাভারত জনমেজয়ের সভার বৈশম্পায়ন কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল। মহাভারতের বর্ত্তমান কলেবর ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়াছে; ইহাতে লক্ষ শ্লোক কোন কালেই ছিল না। তিনি আরো প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান মহাভারত বৈশম্পায়ন সংহিতা; ব্যাসকৃত নহে। এ থানে বলিয়া রাখি যে বঙ্কিম বাবু মহাভারতেব যে সংস্করণ দেখিতেছিলেন তাহাতে অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক ছিল, আমরা বঙ্গবাসীর প্রকাশিত সংস্করণ ব্যবহার করিতেছি ইহাতে ঐ অধ্যায়ে ২৭৫ শ্লোক আছে। বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদে ২৭২ শ্লোক ছিল বোধ হয়। আমবা নিম্নলিখিত ভাবেব শ্লোক দেখিতেছি।

“কর্ম্মান্তরেষু যজ্ঞস্য চোদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ?
বিস্তারং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্ম্মশীলতাং॥
ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যা দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাণ্ডবানাঞ্চ সত্যতাং॥
দুর্ব্বৃত্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণামুক্তবান ভগবানৃষি।

ইদং শতসহস্রান্তু লোকানাং পুণ্যকর্ম্মণাং
উপাখ্যানৈঃ সহজ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমং।

চতুর্বিংশতি সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাং॥
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতমুচ্যতে বুধৈঃ।
ততোঽধ্যর্দ্ধ শতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষি॥
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বনাং।
ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং সপুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকং॥

অনুক্রমণিকা—৯৯—১০৪।

উপরিউক্ত শ্লোকগুলির অনুবাদ এইরূপ "প্রত্যহ যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে বৈশম্পায়ন মুনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া দ্বৈপায়ন কর্তৃক কথিত কুরুবংশের বিস্তার গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য্য বাসুদেবের মাহাত্ম্য ও পাণ্ডবগণের সত্যনিষ্ঠা এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের দুর্বৃত্ততা ও শত সহস্র পুণ্যবান লোকের বিষয় বর্ণনা করিলেন। উপাখ্যান সহিত প্রথম রচনা ভারতোত্তম (মহাভারত বলিয়া জ্ঞাতব্য। তৎপরে উপাখ্যান ভাগ ত্যাগ করিয়া চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক দ্বারা ভারতসংহিতা রচিত হইয়াছিল বুধগণ তাহাকে ভারত বলেন। অতঃপর ঋষি সমুদয় পর্ব্ব ও বৃত্তান্তের (ভূয়ঃ) পুনরায় সংক্ষেপ করিয়া অনুক্রমণিকা রচনা করেন; (ইদং) ভারতোত্তম প্রথমে তিনি স্বপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। বঙ্কিম বাবু যে মহাভারত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ঐ চিহ্নিত শ্লোকটি (উপাখ্যান সহ) ছিল না, সুতরাং তিনি ঐ চতুর্ব্বিংশতি-সাহস্রী ভারত সংহিতাকে মহাভারত বলিয়াছেন। কিন্তু "উপাখ্যান বিনা পদটি "উপাখ্যান সহ" "একটি পদ না থাকিলে ব্যবহার হইত কি? অকারণে উপখ্যান শব্দটি শ্লোকের প্রথমে দেওয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্য হইতেই

পারে না। চিহ্নিত শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত কখনও হইতে পারে না বরং উহার অভাব "উপখ্যান বিনা" পদটিতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান।

পুনরায় (ভূয়ঃ) শব্দটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য। একবার "সংক্ষেপ" করিলে ঐ শব্দটি ব্যবহার হইত না, ব্যাস দুইবার সংক্ষেপ করিয়াছেন তাই "ভূয়ঃ সংক্ষেপং" কৃতবান পদ ব্যবহারিত হইয়াছে। শ্লোকগুলি হইতে এই প্রমাণ হয় যে ব্যাস প্রথম উপাখ্যান যুক্ত মহাভারত প্রকাশ করিলেন পরে ২৪ হাজারি ভারত সংহিতা প্রকাশ করিলেন, অবশেষে ১৫০ শ্লোকযুক্ত এক অনুক্রমণিকা বা সুচী পত্র প্রস্তুত করিলেন।

এইরূপ সংক্ষেপ করিবার কারণ ও এই অনুক্রমণিকাতে রহিয়াছে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যথা—

"কোন বিদ্বান সংক্ষেপে জানিতে ইচ্ছা করেন কেহ বা বিস্তার রূপে জানিতে ইচ্ছা করেন এই জন্য ব্যাসদেব এই গ্রন্থ সংক্ষেপে ও বিস্তার রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"বিস্তীর্য্যৈ তন্মাহ জ্ঞান জজ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ"—অনু—৫০।

এই তর্কের প্রসঙ্গে এ কথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে ব্যাসদেব তিন বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই মহাভারত প্রচার করিয়াছিলেন; এবং এই কর্ম্মের জন্য তাঁহাকে অদ্ভুত কর্ম্মা বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে।

"ত্রিভি র্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণ দ্বৈপায়নোমুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমদ্ভুতং"॥

অঃ—৬২ম—৫০।

প্রবক্ষ্যামি মতং পুণ্যং ব্যাসস্যাদ্ভুত কর্ম্মণঃ॥

আঃ—১—২৫।

যদি মহাভরেতে মোট ২৪ হাজার শ্লোক ছিল তাহা হইলে

বৎসরে ৮ হাজার এবং মাসে ৬৬৬ ও প্রতিদিনে ২২ শ শ্লোক ব্যাসদেব রচনা করিয়াছিলেন। ব্যাসের কি এই অদ্ভুত কর্ম্মের পরিচয়? তাঁহার তিন বৎসর ব্যাপী পরিশ্রমের ফল একখানি সামান্য গ্রন্থ এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ২৪ হাজারি গ্রন্থে এত আবর্জনা পড়িয়াছে যে চতুর্গুণ স্ফীত হইয়াছে? এ কথা বলিবার পূর্ব্বে আমাদের সাবধান হওয়া উচিৎ নয় কি?

এতাবৎ অলোচনার শেষে আমরা কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম তাহা দেখা যাউক। আমরা পাইলাম।

১। মহাভারত ইতিহাস গ্রন্থ, আরব্য উপন্যাস নহে। তবে ইহার আদ্যোপান্তই ব্যাসকৃত নহে।

২। ইহা ধৃতরাষ্ট্রাদির দেহ ত্যাগের পর ভারতে প্রচারিত হয়।

৩। ইহাতে পৌষ্য পৌলোম, আস্তীক মৌসল মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ছিল না পরে সংযুক্ত হইয়াছে।

৪। ব্যাসদেব উপাখ্যান যুক্ত এক মহাভারত প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে কত শ্লোক ছিল ঠিক বলা যায় না তবে লক্ষ শ্লোক থাকা আশ্চর্য্য নহে, সম্ভবতঃ ছিল। ২৪ হাজার শ্লোকের অনেক অধিক ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

৫। ইহাতে সামান্য অংশ প্রক্ষিপ্ত আছে।

৬। পর্ব্বাধ্যায় সংযুক্ত হইবার পূর্ব্বে মহাভারতের অনেকাংশ বিকৃত হইয়াছিল। হইবারই কথা কারণ মহাভারতেই রহিয়াছে যে ব্যাস ভারত করিলে তাঁহার পাঁচ শিষ্য পৃথক ২ পাঁচখানি ভারত সংহিতা রচনা করেন সুতরাং এক বিষয়ের এতগুলি গ্রন্থ এক সময়ে প্রচারিত হইলে গোলমাল অবশ্যম্ভাবী, বিশেষতঃ যখন মুদ্রাঙ্কণের সৃষ্টি হয় নাই। হস্তলিপিই একমাত্র উপায় ছিল। মহাভারতের কাল আমরা পরিশিষ্টে বিচার করিয়াছি।

মহাভারত যতদিন হিন্দুদিগের অসপত্না সম্পত্তি ছিল ততদিন তাহাতে কোন মারাত্মক প্রক্ষেপ হয় নাই। মহাভারত বহু প্রচারিত ও আদরের গ্রন্থ ছিল এবং অদ্যাপিও আছে। কালে ভারতে ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন এবং নব নব মতের উৎপত্তি আরম্ভ হইল। একদিকে ব্রাহ্মণগণ টানিতে লাগিলেন অপর দিকে ব্রাহ্মণেতর মত বাদীরা স্বমতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার লইয়া মহাভারতকে টানিতে লাগিলেন. এই দু টানায় পড়িয়া মহাভারতের পূর্ণ কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। স্বমতের বিরুদ্ধার্থ যুক্ত অংশগুলি যথাসম্ভব উৎখাত হইতে লাগিল এবং পরিপোষক নূতনাংশ সকল ক্রমশঃ স্থান পাইতে লাগিল। এই সকল মত বাদীরা সকলেই সমান দরের লেখক ছিলেন না। বিদ্যা বুদ্ধিও সকলের এক ভাবের ছিল না, সুতরাং আগ্নেয় গিরির সন্নিহিত জনপদের উপর ভস্মাদির ন্যায় এই সার্ব্বভৌম গ্রন্থে আবর্জ্জনা আসিয়া আপতিত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি এক প্রকাণ্ড অতি প্রাচীন দেব মন্দির সর্ব্বধ্বংসী কালকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যুগ যুগান্তর হইতে দণ্ডায়মান আছে; অসংস্কার বশতঃ স্থানে স্থানে লতাগুল্মের উৎপত্তি হইয়াছে বটে; কিন্তু নিরীক্ষণ করিলে তাহাদের ভিতর দিয়া সেই মিহিরস্পর্শী মন্দিরের অতুল কারুকার্য্যময় অমল ধবল অশেষ জ্ঞান রত্ন খচিত অতীব গৌরব গ্রথিত বিস্ময়কর বিশাল ভিত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কত কত ঝড় ঝঞ্ঝা ও অশনি সম্পাত তাহার উপর দিয়া গিয়াছে চিন্তাকরিলে শরীর রোমাঞ্চিত গৌরবে বক্ষ স্ফীত ও নয়ন বিগলিত হয়। মহিমায় বিশ্ববাসীর নমস্কার আকর্ষণ করিয়া যেন বাক্‌সর্ব্বস্ব কর্ম্মহীনগণকে তিরস্কার করতঃ ক্ষুণ্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

দেবব্রতের মৌলিকতা।

দেবব্রত মহাভারতের একটি মূল চরিত্র কি না তদ্বিষয় বিবেচনা করিতে আমাদিগকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না! তিনি মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত একথা বলিলে লোকে মস্তিস্কের সুস্থভাবে সন্দিহান হইবে। যখন মহাভারতের এবং তদন্তর্গত অনুক্রমণিকাধ্যায়ের মৌলিকতা প্রমানীকৃত তখন সে অধ্যায়ে পুনঃ পুনঃ উক্ত ভীষ্ম পরে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারেন না। অনুক্রমণিকায় রহিয়াছে—

"যদাশ্রৌষং ভীষ্মমমিত্র কর্ষণং নিঘ্নন্তমাজাবযুতং রথানাং।
নৈষাং কশ্চিৎ বধ্যতে খ্যাতরূপস্তদা নাশংশে বিজয়ায় সঞ্জয়॥
যদাশ্রৌষংশ্চাপগেয়েন সংখ্যে স্বয়ং মৃত্যুং বিহিতেন ধার্ম্মিকেন।
তচ্চাকুর্য্যাঃ পাণ্ডবেয়াঃ প্রহৃষ্টাস্তদা নাশংশে বিজয়ায় সঞ্জয়॥
যদাশ্রৌষং ভীষ্মমত্যন্ত শূরং পার্থেনাহবেধ্বপ্রধৃষ্যাং শিখণ্ডিনং পুরতঃ স্থাপয়িত্বা-তদা নাশংশে বিজয়ায় সঞ্জয়॥
যদাশ্রৌষং শরতল্পে শয়ানং বৃদ্ধং বীরং সাদিতং চিত্র পুঙ্খৈঃ ভীষ্মংকৃত্বা সোমকানল্প শেষাঃ তদা নাশংশ বিজয়ায় সঞ্জয়॥
যদাশ্রৌষং শান্তনবে শয়ানে পানীয়ার্থে চোদিতেতোর্জ্জুনেন।
ভূমিং ভিত্বা তর্পিতং তত্র ভীষ্মং তদা নাশংশে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

দেবব্রত ভীষ্ম মহাভারতের মেরুদণ্ড ইহাতে যত কথা আছে তাঁহার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক ভীষ্মোক্তি এবং তদ্বিষয়ক কথা। মহাভারতে

বিশ্বগুরু শ্রীকৃষ্ণের পরই ভীষ্মই উজ্জ্বলতম রত্ন। তাঁহাকে অপসৃত করিলে এক গাঢ় অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হয়, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে শ্রীমৎভাগবতে, এবং অন্যান্য পুরাণেও ভরত বংশের এক কুলজি আছে তাহাতে দেবব্রত শান্তনুর পুত্র বলিয়া পরিচিত, এই বংশ বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আদিপর্ব্বে ৯৫ অধ্যায় বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ১৮, ১৯, ২০, অধ্যায় ও ভাগবতের নবম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়—দ্রষ্টব্য। যদিও অধিকাংশ পুরাণই মহাভারতের পরে রচিত তথাপি সে সমস্তে অনেক প্রাচীন কথা সন্নিবিষ্ট আছে। মহাভারতে নাই এমন অনেক কথা এ সকল পুরাণে আছে;—বিশেষতঃ এই রাজবংশ মহাভারত হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয় না।

তৃতীয়তঃ যদি স্বীকার করা যায় যে মহাভারত যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ত্যাগের পর প্রচারিত হইয়াছে তথাপি ভীষ্ম বলিয়া একজন বংশাতিরিক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষিৎ কি বলিয়া পূর্ব্ব পুরুষ স্বীকার করিবেন। তখনও ভীষ্মকে দেখিয়াছেন এমন অনেক লোক জীবিত ছিলেন। যেমন উত্তরাদেবী সুভদ্রাদেবী, পুরোহিত ধৌম্য। তাঁহারা কখনই ব্যাসের কল্পনা প্রসূত ভীষ্মকে পিতামহ বলিয়া স্বীকার করিতেন না, এবং ব্যাসও ভারত যুদ্ধের এত অল্প পরেই একটা নাটকের চরিত্র অকারণে স্থাপন করিয়া তাঁহার লোকপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকে শ্রদ্ধাহীন করিবার অবসর দিতেন না।

অতঃপর দেবব্রতের চরিত্র ব্যাসের বিবরণ ব্যতীত স্বভাবত কিরূপ ছিল জানিবার কোন উপায় আছে কি না বিবেচনা করা যাউক।

স্থির হইয়াছে দেবব্রত নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার বংশ পর্য্যালোচনায় পাওয়া যায় তিনি মহারাজ শান্তনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ; তিনিই কৌরব রাজ্যের বিধিসম্মত উত্তরাধিকারী ; কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রেরা রাজা হইয়াছেন। আর তিনি একজন বৃত্তিভুক মাত্র। তাঁহার ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাঁহাকে ছলে বা বলে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহা সম্ভব নয়, কারণ দেখা যায় তিনিই শৈশবে তাহাদিগকে পিতার ন্যায় লালন পালন করিয়াছেন এবং কৌরবরাজ্যের তিনি অশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এরূপ ঘটনার কারণ তাঁহার স্বেচ্ছায় রাজ্য পরিত্যাগ ব্যতীত আর কি হইতে পারে।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই তাঁহার সন্তান সন্ততি নাই এবং তিনি আমরণ কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত এ কঠোর ব্রত পালন করার অন্য উদ্দেশ্য দেখা যায় না। শিশুপাল তাঁহার কৌমার্য্য ক্লীবত্ব হেতুক বলিয়া উপহাস করিয়াছে ; কিন্তু ক্লীব কি কখন যুদ্ধে সৈন্য চালনা করিতে পারে ?

এই ঘটনাদ্বয় হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে দেবব্রত চিত্রে কবির অতিরঞ্জনের অবকাশ অত্যল্প। যে স্বভাবসুন্দর তাহার অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না। কবি দেবব্রতকে আমাদের সমক্ষে তিনি যেমন ছিলেন তেমনি দাঁড় করাইয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রক্ষিপ্ত নির্ব্বাচন।

আমরা পূর্ব্বে বিচার করিয়াছি যে বর্ত্তমান মহাভারত সমগ্র বৈয়াসিক নহে এবং সেই বিচারের ফলে কতকগুলি পর্ব্বের মৌলিকতায় সন্দেহ করিয়াছি এবং আরো বলিয়াছি যে যে সকল পর্ব্ব প্রধানতঃ বৈয়াসিক তাহার ভিতরেও কখন কখন বিভিন্ন হস্তের আঁচড় অনুভব করা যায়।

এখন এমন কোন প্রণালী বা কৌশল আবিষ্কার করা যায় কি না যদ্বারা আসল এবং নকল সহজে নিরূপন করা যায়। বহু শতাব্দীর পরে এ চেষ্টা অতীব দুরূহ তবে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে; কারণ বিচারের নিয়ম চিরদিনই একভাবে আছে। তর্কের সাধারণ সূত্রগুলি প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মত, বিষয় এবং অবস্থা ভেদে তাহাদের প্রয়োগ লইয়া মতভেদ হয়।

সুবিচারক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত নির্ব্বাচন প্রণালী শীর্ষক পরিচ্ছেদে ও তাহার পরবর্ত্তী অনৈসর্গিক বা অতি প্রকৃত বিষয়ক পরিচ্ছেদে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের অবতারণা করিয়াছেন আমরা কত দূর সেই নিয়ম গুলির অনুবর্ত্তী হইতে পারি এই পরিচ্ছেদে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

তাঁহার প্রথম এবং পঞ্চম নিয়মের অর্থ এই অনুক্রমণিকায় এবং পর্ব্বাধ্যায়ে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ নাই তাহা যদি মহাভারতে পাই তবে সে বিষয় প্রক্ষিপ্ত। এ নিয়ম আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যদি কোন বিষয় এক অধ্যায়ে থাকে এবং অন্যে না থাকে।

সে স্থলে কি নিয়মে চলিব তাহা তিনি বলেন নাই। আমরা বলি সে স্থলে বিষয়ের মুখ্যত্ব এবং গৌনত্বের উপর নির্ভর করিতে হইবে। যদি বিষয়টি কোন এক মৌলিক ঘটনার কারণ রূপে বা আপেক্ষিক ভাবে বর্ণিত থাকে, অথচ এক অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে সে স্থলে সে বিষয়কে একবারে প্রক্ষিপ্ত বলিব না। শান্তি এবং অনুশাষণ পর্ব্বে এরূপ ঘটনা অনেক বিবৃত আছে।

তৃতীয় নিয়ম এই পরস্পর বিরোধী বিষয়ের অবশ্য একটি প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই, স্থান বিশেষে দুইটিও হইতে পারে, যথা উতঙ্কমুনির উপাখ্যান।

৪র্থ নিয়ম এই যে সুধিদিগের রচনা প্রণালী বিশিষ্ট-লক্ষণাক্রান্ত এ বিষয়ে বিতণ্ডার কিছু নাই তবে সকল বিষয়ে এবং সকল অবস্থাতে সুকবি এক ভাবে রচনা করেন বলিয়া বোধ হয় না সুতরাং এ ব্যবস্থাটি সর্ব্ববাদী সম্মত নহে।

৫ম নিয়মটি এই—মহাভারতের কবি একজন মহাকবি; তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সকল সর্ব্বাঙ্গে সুসঙ্গত হইবে, যদি কোথাও তাহার ব্যাভিচার দেখা যায় তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হইবে। এ প্রস্তাবটিও চতুর্থ নিয়মের ন্যায় মতভেদ হীন নহে তবে যদি ব্যাভিচার এমত হয় যে মূল চরিত্র চূর্ণ হইয়া যাইতেছে সে অবস্থায় এ নিয়মটি অবশ্য পালনীয়। যেমন ভীষ্মের আত্মশ্লাঘা কখনই ভীষ্ম চরিত্রের অঙ্গ হইতে পারে না। আবার সেই ভীষ্মকে বিরাটের গো হরনে লিপ্ত দেখিয়া তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারি না। অবস্থার বিচার সর্ব্বাগ্রে করা উচিৎ।

ষষ্ঠ এবং ৭ম বিধিতে কোন বিশেষ নিয়ম সংস্থাপিত নহে। আলোচনার প্রয়োজন নাই।

এতদুর পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমাদের কোন দুর্জ্জয় মতভেদ

হয় নাই ; কিন্তু তাঁহার অনৈসর্গিক বা অতিপ্রকৃত সম্বন্ধীয় বিধি ও ব্যাখ্যা আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে ও নতশিরে অঙ্গীকার করিতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না। এই ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে বর্ত্তমান মহাভারতের তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত এবং এক ভাগে কিছু ঐতিহাসিকতা আছে। ইহা ব্যাসের লিখিত নহে বৈশম্পায়ন সংহিতা। এই গ্রন্থকে কোন চরিত্রের ভিত্তি করিতে হইলে অতি সাবধানে ইহাকে ব্যবহার করিতে হইবে এবং সেই সাবধানতা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই সূত্র করিয়াছেন যে যাহা "অনৈসর্গিক বা অতিপ্রকৃত তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিব না।"

তাঁহার এই অতিপ্রকৃত বিষয়ক সতর্কতার একটি প্রধান কারণ এই যে তিনি প্রথম মহাভারতের তিন অংশ প্রক্ষিপ্ত স্থির করিয়াছেন। আর ঐ বিবেচনারও কারণ এই যে তাঁহার মতে ব্যাসকৃত মহাভারতে ২৪ হাজারের অধিক শ্লোক ছিল না, কিন্তু সৌতির কথিত মহাভারতে এবং বর্ত্তমান মহাভরতে প্রায় লক্ষ শ্লোক রহিয়াছে ; সুতরাং যেস্থানে প্রক্ষিপ্তের এত প্রাচুর্য্য সেই স্থলে অতি সতর্কতা ব্যতীত পদক্ষেপ বড় অনিশ্চিত এবং বিপদজ্জনক। আমরা দেখাইব যে এই অনৈসর্গিকতা সূত্রের অতি কঠোরতায় অনেক নৈসর্গিক ব্যাপারও প্রক্ষিপ্তের বাজরায় আবর্জ্জনা রূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে বঙ্কিমবাবু নৈসর্গিক এবং অনৈসর্গিকের সীমা বাচক রেখা নির্দ্দেশ করেন নাই। ঘটনা এবং পদার্থ কতদূর যাইলে এবং কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নৈসর্গিকতা অতিক্রম করিয়া অনৈসর্গিকতার রাজ্যে প্রবেশ করে তাহার নির্দ্দেশক কোন অবস্থা বলেন নাই।

তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে যদি কেহ বলে যে "আমগাছে তাল ফলিতে দেখিয়াছি তবে সে কথা বিশ্বাস করিব না। আমরা জিজ্ঞাসা

করি কেন, উত্তর অবশ্য এই যে এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু আমরা জগতের সকল আমগাছ কি দেখিয়াছি? কতকগুলি দেখিয়াছি এবং সেইগুলি হইতে অনুমান করি যে আমগাছে তাল হয় না। স্থূল কথায় সাধারণ নিয়ম এই হইতে পারে যে আমগাছে সচরাচর তাল হয় না। সাধারণ নিয়মের কি ব্যাভিচার থাকে না? প্রকৃতির নিয়মের কথন কথন ব্যাতিক্রম হইতেও দেখা যায়।

অতঃপর মনে করুণ যে ব্যক্তি বলিলেন যে তিনি আমগাছে তাল দেখিয়াছেন তিনি যদি এমন লোক হয়েন যে তিনি মিথ্যা কথা বলেন না—প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলেন না তাহা হইলেও কি আমগাছে তাল হওয়া বিশ্বাস করিব না?

মনে করুণ শ্রীবুদ্ধদেব, কপিল বা শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে তাঁহারা এই বিশ্বের বীজ সাক্ষাৎ ও স্পর্শ করিয়াছেন—আম তালের কথাত অতি সামান্য তা হলে কি শ্রীবুদ্ধদেব, কপিল এবং শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহেন? এ প্রশ্নের উত্তর ধীমান পাঠক দিবেন। অগ্নির দাহিকা শক্তি সাধারণ ধর্ম্ম কিন্তু এমন অবস্থাও হয় যখন তাহার দাহিকা শক্তি স্থগিত বা তিরো-ভূত হয়। প্রহ্লাদ অগ্নিমধ্যে সুখে বসিয়া ভগবানের স্তব করিতেছেন কথাটি কি অমূলক। মানুষ উড়িতে পারে না—কিন্তু কুম্ভক বলে সে অনায়াসে শূন্যে অবস্থান করে এঘটনা অনেকে দেখিয়াছেন। সাধু হরি-দাসের শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গস্বামীর অদ্ভুত উপাখ্যান ত অধিক দিনের কথা নয়।"

সচরাচর প্রত্যক্ষ হয় না সাধারণ লোকের জ্ঞানের গ্রাহ্য নয় বিধায় বিষয় নৈসর্গিক বা তদ্বিপরীত হয় না। প্রকৃতি নিত্য সুতরাং সদাই পূর্ণ। যাহা নাই তাহা আর কখন হয় না। সুতরাং যাহা অতিপ্রকৃত তাহাও কোন প্রাকৃতিক নিয়মে সিদ্ধ হয়। আমাদের অজ্ঞানতায় তাহাকে অনৈসর্গিক বা অতিপ্রকৃত বলিয়া থাকি।

সাধনায় প্রাকৃতিক শক্তি মানবের আয়ত্ত হয়। ক্ষুদ্র মানব অসীম জ্ঞান সম্পন্ন দেবতা হয় বা তাঁহাদেরও উপারে যায়। প্রকৃতির শক্তি অনন্ত; যিনি যতটা আয়ত্ত করিতে পারেন তিনি অনৈসর্গিকতা হইতে তত দূরে আছেন; যিনি সমগ্র প্রকৃতিকে বশে আনিয়াছেন তাঁহার সমক্ষে কিছুই অতিপ্রকৃত নাই। তাঁহার দৃষ্ট ঘটনায় অবিশ্বাস কি করিয়া হইতে পারে। যদি ব্যাস কোন স্থানে বলিয়া থাকেন যে তিনি আমগাছে তাল দেখিয়াছেন তবে আমাদের অবিশ্বাসের কারণ কি? কেহ হয় ত উত্তর করিবেন আমাদের আধুনিক শিক্ষা এবং দীক্ষা। উপযুক্ত পাত্র হইলে অবশ্য বিশ্বাস করিব নচেৎ যে সে ব্যক্তির কথায় আস্থা স্থাপন করিতে কেহই বলেন না।

আমরা যাহাকে অসচরা বা চরিক বলিয়া অনৈসর্গিক বলি তাহা সাধারণত দুই প্রকারে ঘটিয়া থাকে। প্রথমত সমপ্রকৃতিক এবং দ্বিতীয়ত অসমপ্রকৃতিক ভাবে। যদি কেহ বলে যে কোন আম গাছে একটা এত বড় আম হইয়াছে, যে তাহা বিশজন সিপাহী তুলিতে পারে না—ঘটনাটি অসাধারণত্ব হেতু অনৈসর্গিক বলিব বটে; কিন্তু এখানে ঐ বিশজন সিপাহীর কটিদেশ ভগ্নকারী আম এবং একজনের খাদ্য ২০ গণ্ডা আম উভয়েই সমপ্রকৃতিক, পার্থক্য স্বাভাবিক নহে; কেবল পারিমাণিক। ভীমের একটা যুদ্ধের রীতি ছিল যে তিনি ধনুর্ব্বাণ লইয়া বড় কষ্ট করিতেন না, একটা প্রকাণ্ড হস্তীকে শুণ্ডে ধরিয়া শূন্যে ঘূর্ণায়মান করিয়া বিপক্ষ দলের ভিতর লোষ্ট্রের ন্যায় নিক্ষেপ করিতেন—তাহাতে হাতিও মরিত আর অপর লোকও অনেক মরিত। এই যে অবিশ্বাস্য শক্তির প্রকাশ ইহা সমপ্রকৃতিক, কারণ মনুষ্য কিঞ্চিৎ ভার উত্তোলনের ক্ষমতা রাখে—এখানেও প্রভেদ কেবল পরিমাণে।

লৌহচূর্ণ হইতে এরকার উৎপত্তি অসমপ্রকৃতিক, কারণ ধাতু এবং উদ্ভিদ এক ধর্ম্মাক্রান্ত নহে, এখানে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

আর এক প্রকার আপাতত অসমপ্রকৃতিক অনৈসর্গিকতা আমরা দেখিতে পাই,—যেমন মানব দেহে প্রস্তর বা অতি কঠিন দ্রব্যের উৎপত্তি। বাস্তবিক এখানে মৌলিক উৎপত্তি নাই, প্রস্তর বা কোন পদার্থের সূক্ষ্মাংশ সমূহ ক্রমশ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন অজ্ঞাত কারণে পুঞ্জীভূত হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। শাম্বের মুষল প্রসব এ হিসাবে একবারে অলীক না হইলেও হইতে পারে।

উপরিউক্ত তিন প্রকার অনৈসর্গিকতায় আস্থা স্থাপনের তারতম্য আছে। সমপ্রকৃতিক অনৈসর্গিকতা অপেক্ষা মৌলিক অনৈসর্গিকতা গ্রহণ করিতে বলবত্তর প্রমাণের আবশ্যক।

বঙ্কিম বাবু ঐশী এবং মানুষী শক্তির প্রভেদ করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যের কতটুকু শক্তিতে অধিকার তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনিই বলিতেছেন যে এই সামান্য শক্তিই সম্যক অনুশীলনে দৈবী-শক্তিতে পরিণত হয়, সুতরাং দৈবী এবং মানুষী শক্তি বলিয়া দুই বিভিন্ন শক্তি নাই, একই পদার্থ কেবল অবস্থার ভেদ মাত্র।

এখন আমরা বুঝিলাম যে কোন ঘটনা আপাতত অনৈসর্গিক প্রতীয়মান হইলেই তাহা ঘটে নাই এ সিদ্ধান্ত প্রমাদপূর্ণ, সকল ঘটনাই অবস্থানুসারে বিচার্য্য। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহে বলিয়া আমরা সকল ঘটনাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। সাধারণ মনুষ্যের জ্ঞান অতি অল্প, বরং অক্ষমতা স্বীকার করা ভাল তথাপি বুদ্ধির ভ্রান্তিহীনতার উপর নির্ভর করিয়া সম্প্রজ্ঞাত দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি-গণের বাক্যে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া নিরয় গমনের পথ নিষ্কণ্টক করা ভাল নয়।

তবে এ কথা স্বীকর্ত্তব্য যে ঋষি প্রণীত বাক্য নির্দ্ধারণ অনেক সময় বড় জটিল বিষয়। সৎগুরুর উপদেশ ভিন্ন সে গ্রন্থির উন্মোচন দুঃসাধ্য।

এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত, আমরা এখন মহাভারতীয় অমৃত কথা আরম্ভ করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুরুবংশ।

অতি প্রাচীনকালে বৈবস্বত মনুর বংশে মহারাজ নহুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত যযাতি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এবং বৃষপর্ব্ব দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র যদু, তুর্ব্বসু, অনু দ্রুহ্যু ও পুরু। যদু যাদবদিগের মূলপুরুষ যে বংশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েন। পুরু হইতে পৌরব বংশ উৎপন্ন।

বহুকাল পরে এই পুরুবংশে মহারাজ দুষ্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বিশ্বামিত্র দুহিতা শ্রীমতী শকুন্তলা দেবীকে বিবাহ করেন। ইহারই গর্ভে এবং দুষ্যন্তের ঔরসে মহাত্মা সম্রাট ভরত আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার নামেই আমাদের এই জন্মভূমি ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

কিয়ংকাল পরে এই ভরতবংশে হস্তী নামে এক রাজা উৎপন্ন হয়েন। গঙ্গাতীরে তিনিই স্বনামে হস্তিনাপুর স্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র প্রসিদ্ধ অজামীঢ়, অজামীঢ়ের পৌত্র কুরু; ইনি বহু যজ্ঞাদির দ্বারা কুরুক্ষেত্রের প্রসিদ্ধি স্থাপন করেন।

কুরু হইতে অধস্তন ৭ম পুরুষ রাজা প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র দেবাপি বাহ্লিক এবং শান্তনু। দেবাপি বাল্যকালেই বনে গমন করেন, বাহ্লিক মাতামহের রাজ্য বহ্লিক প্রদেশে রাজা হয়েন এবং শান্তনু

হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহন করেন। ইনি গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন। মহারাজ শান্তনুর ঔরসে এবং গঙ্গাদেবীর অষ্টম গর্ভে পূর্ণ মনুষ্যত্বের উপার্জক পুরুষসিংহ দেবব্রত অবতীর্ণ হয়েন। ইনিই ভারতের আবালবৃদ্ধ বনিতার নিকট ভীষ্মদেব নামে সুপরিচিত। আমরা এখন সংযত মনে এই মহাপুরুষের মহাপুন্যময় ঘটনাপূর্ণ জীবনের কীর্ত্তন আরম্ভ করি।

আরম্ভের পূর্ব্বে আমরা চরাচর গুরু বাসুদেবকে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি এবং সেই বিশাল বুদ্ধি জননী ভারতের অদ্বিতীয় জ্ঞানাকর মহাকবি ব্যাসের পদরজ মস্তকে স্থাপিয়া শনৈঃ অগ্রসর হই

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জন্ম কথা।

জগতে যাহারা কর্ম্মে এবং জ্ঞানে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের জন্মেও এক অসাধারণ ভাব প্রায় দেখা যায়। সে অসাধারণত্ব প্রায়শ দেশ কাল এবং পাত্রগত। ভগবান কপিল, শ্রীরামচন্দ্র, ভগীরথ, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ ব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, ও শ্রীযীশুখৃষ্ট ইঁহাদের জন্মস্থান, জন্মকাল ও জনক জননীর বিবরণ পাঠ করিলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য অনুভব করা যায়।

যাহারা ভগবদবতরণে বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগকে কিছুই বলিবার নাই কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস করেন না মহাপুরুষ জন্মবৃত্তান্তের অনুসন্ধান করিলে আমাদের কথার সত্যতার উপলব্ধি হইবে।

দেবব্রতের জন্মও এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। তাঁহার মাতৃ বিবরণ অদ্ভুত; জগতে যে সকল ব্যক্তি জননীর পালনে, শিক্ষায় ও দীক্ষায় পূজনীয় হইয়াছেন দেবব্রত তাঁহাদের মধ্যে একজন।

কথিত আছে রাজা শান্তনু একদিন মৃগয়া হেতু গঙ্গাতীরে একাকী বিচরণ করিতেছেন এমত সময়ে লক্ষ্মীর ন্যায় কান্তিমতী পদ্মোদর সমপ্রভা সূক্ষ্মাম্বরধরা এক কামিনীকে দেখিতে পাইলেন এবং মধুর বচনে তাঁহাকে বলিলেন "ভার্য্যা মে ভব শোভনে"। গঙ্গাদেবীও পত্নীত্ব স্বীকার করিয়া উত্তর করিলেন "ভবিষ্যামি মহীপাল মহিষী তে বশানুগা" কিন্তু আপনাকে এক প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে শুভ অশুভ আমি যে কোন কর্ম্ম করিব তাহাতে আপনি আমাকে বারণ করিতে বা অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারিবেন না, যদি করেন বা বলেন তাহা হইলে আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিব। শান্তনু তাহাই স্বীকার করিলেন।

বিবাহের পর গঙ্গাদেবী স্বামীগৃহে বাস করিতে লাগিলেন এবং এক এক করিয়া সাত পুত্রের জননী হইলেন ও জাত জাত অবস্থাতেই তাহাদিগকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ শান্তনু পাছে গঙ্গাদেবী চলিয়া যান এই ভয়ে ভীত হইয়া এতদিন কিছু উচ্চবাচ্য করিলেন না। তবে সহিষ্ণুতার সীমা আছে। অল্পদিন পরেই অষ্টম গর্ভে এক পুত্র জাত হইলেন; যথাপূর্ব্বং গঙ্গাদেবী তাঁহাকেও সলিলস্থ করিবেন দেখিয়া শান্তনু দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে তাঁহাকে বলিলেন।

"মা বধীঃ কস্য কাসিতি কিং হিনংসি সুতানিতি॥ পুত্রঘ্নি সুমহৎ পাপং সম্প্রাপ্তং সুগর্হিতং॥"

'তুমি ইহাকে বধ করিও না, কে তুমি, কাহার কন্যা, কি জন্য পুত্র বধ কর? পুত্রঘাতিনি তুমি সুগর্হিত পাপ করিতেছে।" এ কথায় গঙ্গাদেবীর পূর্ব্বকৃত নিয়ম ভগ্ন হইল, এবং তিনি উত্তর করিলেন,

আচ্ছা আমি এই পুত্রকে হনন করিব না "পুত্রং পাহি মহাব্রতং" আমি যাইতেছি।

আঃ প ৯৮ অধ্যায়।

অতঃপর শান্তনু তাঁহাকে এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে বসুগণ কোন সময়ে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের হোমধেনু অপহরণ করেন। ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ঋষি বশিষ্ঠ এ কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন যে তোমরা পৃথিবীতে মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ কর। বসুগণ দেবতা এবং বিশ্বসৃষ্টির মাঝে, লোক সকলকে পালন করার ভার তাহাদের উপর আছে। মনুষ্যযোনি তাঁহাদিগের শাস্তি। অনন্তর এই ব্যবস্থা হইল যে দ্যু নামক বসু যাহার জন্য ঐ ধেনু অপহৃত হইয়াছিল তিনি দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকিবেন আর সপ্তজন এক বৎসর হইলেই শাপমুক্ত হইয়া স্বস্থানে যাইবেন। এই পুত্র সেই দ্যুনামক বসু; আমি বসুগণের প্রীত্যর্থে মানুষী তনু ধরিয়া তোমার গৃহে এতদিন বাস করিয়াছি এই কথা বলিয়া গঙ্গাদেবী সেই পুত্রটি লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

আঃ প ৯৯ অধ্যায়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে এই বসু ঘটিত উপাখ্যানটি সম্ভব কি অসম্ভব। সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব কি অনৈসর্গিক বলিয়া পরিত্যাগ করিব? সভ্য জাতির বিশ্বাস্য কি আলিক লয়লার একটি অধ্যায় বলিয়া অশ্রদ্ধেয়!

উত্তরে আমরা বলিব যাহারা জন্ম এবং মৃত্যু এই দুই ঘটনার অন্তর্বর্ত্তী জীবের পরিদৃশ্যমান অধিষ্ঠানকে জীবত্বের আরম্ভ এবং শেষ বলিবেন তাঁহাদের চক্ষে অবশ্য এ ঘটনাটি অলীক এবং আরব্যউপন্যাস। আর যাহারা ঐ দুই ঘটনার পূর্ব্বে এবং পরে জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের কাছে এ উপাখ্যানে কিছুই অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য নাই।

সকল কার্য্যেরই কারণ আছে; জন্ম একটি কার্য্য, সুতরাং তাহার পূর্ব্বে একটা কারণ স্বীকার না করিলে আর উপায় নাই। আমি ছিলাম না শূন্য হইতে আবির্ভূত হইলাম এ বাক্য অবৈজ্ঞানিক। যাহা ছিল না তাহা আর কি করিয়া হইবে, বিশ্বে নূতন সৃষ্টি নাই—তাহা হইলে বিশ্ব থাকে না। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি জ্ঞানবিরুদ্ধ; জন্মান্তর বাদীর কাছে এ সকল কথা নূতন নহে। তিনি জানেন আমি ছিলাম আছি ও থাকিব; আমার ধ্বংস নাই, আমি নিত্য কর্ম্মবশে কখন আছি হই কখন ছিলাম হই। তিনি জানেন—

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ!"
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

কতবার মরিয়াছি, কতবার মরিব তাহার ইয়ত্তা নাই। কত বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছি ও করিব তাহার সংখ্যা নাই। কর্ম্মফলে দেবতা মানুষ হয়, মানুষ পশু হয়, পশু মানুষ হয়, মানুষ দেবতা হয়। হিন্দু দর্শণের সিদ্ধান্তই এই। সুতরাং এঘটনাটি আমরা অলীক এবং প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগে অসমর্থ।

গঙ্গাদেবী কুমারকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। মহারাজ শান্তনু ক্ষুব্ধ চিত্তে কয়েক বৎসর রাজ্য পালন করিলেন।

"একদা তিনি এক মৃগ বিদ্ধ করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবন করিতে করিতে সন্নিহিতা নদী গঙ্গাকে অল্পতোয়া দেখিতে পাইলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন অদ্য গঙ্গায় কেন পূর্ব্বের ন্যায় স্রোত বহিতেছে না। কারণানুসন্ধানে দেখিলেন চারুদর্শন বৃহৎকায় রূপবান দেবরাজ পুরন্দর সদৃশ এক কুমার তীক্ষ্ণ শরজাল দ্বারা সমস্ত গঙ্গাস্রোতে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। রাজা অন্তিকেই গঙ্গানদীকে শররচিত দেখিয়া কুমারের এই অতি মানুষকর্ম্মে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

মহারাজ কুমারকে জাত মাত্র দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকে আত্মজ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। কুমার পিতাকে দেখিয়া তাঁহাকে যেন মমতায় মোহিত করিয়াই অপসৃত হইলেন। শান্তনু সন্দিগ্ধ চিত্তে গঙ্গাকে বলিলেন, ঐ কুমারকে আমাকে দেখাও। গঙ্গা কুমারকে অলঙ্কৃত করিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া নিজেও আভরণ সংবৃতা হইয়া রাজাকে দেখাইলেন, রাজা পূর্ব্বে গঙ্গাদেবীকে জানিলেও এখন চিনিতে পারিলেন না।

গঙ্গাদেবী কহিলেন, মহারাজ পূর্ব্বে আপনি যে আমার গর্ভে অষ্টম পুত্র লাভ করিয়াছিলেন এটি সেই পুত্র, ইঁহাকে আমি সম্বর্দ্ধিত করিয়াছি, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুণ এবং গৃহে লইয়া যান। ইনি বশিষ্ঠের নিকট ষড়ঙ্গ বেদাধ্যায়ন করিয়াছেন; দেবরাজ ইন্দ্রের সদৃশ কৃতাস্ত্র ধনুর্দ্ধর হন। ইনি সুরাসুর উভয়েরই প্রিয় হইয়াছেন। অসুর গুরু উশনা যে যে শাস্ত্র অবগত আছেন এবং সুরাসুর নমস্কৃত অঙ্গিরস পুত্র বৃহস্পতি যত শাস্ত্র জ্ঞান ধরেন তৎসমস্ত ইঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতাপবান দুদ্ধর্ষ ঋষি জামদগ্ন্য রাম যে সকল অস্ত্র বিদ্যা জানেন এই কুমার সে সমুদায় স্বায়ত্ত করিয়াছেন। রাজন, ধর্ম্মার্থকোবিদ মহেষ্বাস এই আপনার বীর পুত্রকে আমি এখন অর্পণ করিতেছি ইহাকে গৃহে লইয়া যান।

"ময়াদত্তং নিজং পুত্রং বীরং বীর গৃহং নয়।"

রাজা শান্তনু গঙ্গা কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া আদিত্য দ্যুতি আত্মজকে লইয়া পুরন্দরপুরসদৃশ স্বপুরে প্রবেশ করিলেন এবং আপনাকে সমৃদ্ধ ও সিদ্ধিবাণ মনে করিলেন। অনন্তর পৌরব বংশের রাজ্য পরিরক্ষণ নিমিত্ত অভয়প্রদ গুণবন্ত মহাত্মা পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। শান্তনুসুত সুচরিত দ্বারা পিতা পৌরবগণ ও রাজ্যবাসীকে অনুরক্ত করিয়াছিলেন।

"পৌরবাণ শান্তনো পুত্র পিতরঞ্চ মহাযশা
রাষ্ট্রঞ্চ রঞ্জয়ামাস বৃত্তেন ভরতর্ষভ ॥"

এই ভাবে ৪ বৎসর অতীত হইল।

আং প ১০০ অধ্যায়।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে আমরা দেবব্রতের বাল্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাব পরিচয় পাই। মহাকবি স্বল্পরেখায় কি ভাবে সেই অসামান্য বালককে চিত্রিত করিয়াছেন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি।

আজকাল কয়েক বৎসর হইতে "শিক্ষা শিক্ষা" লইয়া দেশে একটা মহা হৈ চৈ ব্যাপার চলিতেছে। তদ্বিষয়ক সভা সমিতি ও বক্তৃতাও অনেক হইয়াছে ও হইতেছে এবং হইবেও। দুঃখের বিষয় শিক্ষা বিষয়ক যত বাক্য ব্যয়িত হইয়াছে তাহার কোন স্থানেই "কাহার শিক্ষা, কিসের শিক্ষা এবং শিক্ষার চরম লক্ষ্য কি, কতদূর শিক্ষা হওয়া চাই এ সকল বিষয়ের কোন সারগর্ভ আলোচনা দেখা যায় না। সুতরাং এত কণ্ঠধ্বনির পরেও কোন সুপন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ বলেন রাজনৈতিক শিক্ষা চাই, কেহ বলেন নৈতিক শিক্ষা চাই, কেহ বলেন ব্যবসায়িক শিক্ষা চাই ইত্যাদি। এ সমস্ত শিক্ষার পরিণাম কি হইবে এবং কি উদ্দেশ্যে এ সব পরিশ্রম স্বীকাব কবা যাইবে—তাহার কোন যুক্তিযুক্ত বিবরণ দেখা যায় না।

প্রথমত শিক্ষা কাহাকে বলে এবং কাহার শিক্ষা তাহা বিচার করা উচিত। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তির উপযুক্ত হইবার যে চেষ্টা তাহার নাম শিক্ষা।

কাহার শিক্ষা—এ প্রশ্নের সর্ব্ববাদীসম্মত উত্তর অবশ্য "আমার"। "আমি"হইতে আমার। "আমি" পদার্থটা কি তাহার বিবেচনা অত্যাবশ্যক। এস্থলে আমরা সাংখ্যের দ্রষ্টা, যোগের ভোক্তা এবং বেদান্তের সোহাং বা আমি কে বিচার করিতেছি না। সচরাচর "আমি" বলিলে যাহা বুঝি

সেই "আমি"র বিচার করিতেছি। বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় "আমি"তে তিনটি প্রধান উপাদান আছে।

(১) একটি জড় দেহ। (২) ঐ জড় দেহের উপর কর্তৃত্ব করে এক শক্তি যাহার নাম মন। (৩) শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ প্রভৃতির গ্রাহক এক শক্তি যাহা আত্মা বা জীব বলা যায়।

যদি এই বিভাগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আমার শিক্ষা বলিলে এই তিন উপাদানের শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই তিনটি উপাদান এমত ভাবে সংশ্লিষ্ট আছে সে একের প্রয়োজনাধিক আদরে অন্যের হীনতা উপস্থিত। শরীরকে ছাড়িয়া মনের অত্যন্ত অনুশীলন বৃথা হয়, তদ্রূপ আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া মনের চর্চ্চায় রাক্ষসীবুদ্ধির উৎপত্তি হয়। সুতরাং এই তিনের সমকালীন বা যুগপৎ অনুশীলন অত্যাবশ্যক। আধুনিক শিক্ষায় এরূপ ব্যবস্থা নাই। ফলও ভাল হইতেছে না। বর্ত্তমান কালে যে সকল জাতি শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও এই তিনের সমকালীন ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। হিন্দুদিগের আসন প্রণায়ামাদি ব্যবস্থাতেই এই তিন উপাদানের যুগপৎ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রাণায়াম পদ্ধতি অবগত আছেন তাঁহারা এই ব্যবস্থা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় কথা—শিক্ষার লক্ষ্য বড়ই আবশ্যক, লক্ষ্যহীন শিক্ষা উদ্‌ভ্রান্ত, তাহাতে অপকার হয়। অমূল্য শক্তির অনর্থক অপচয় হয়। দেখুন সাত সমুদ্র পার হইয়া কেহ কৃষিবিদ্যা অর্জ্জন করিবেন। কিন্তু তাঁহার জীবন শেষ হইল প্রাদেশিক বিচার বিভাগে। কৃষিবিদ্যা অর্জ্জনের যে শক্তি ক্ষয় হয়, তাহার মূল্য কি? আর অশিক্ষিত বিচারকের মূল্যই বা কি? ইহাকে বলে লক্ষ্যহীন শিক্ষা। ব্যক্তিগত শিক্ষাই জাতির শিক্ষায় পরিণত হয়। অনেক "আমি"তেই জাতি হয়। সুতরাং জাতির শিক্ষায় লক্ষ্যহীন হওয়া

উচিৎ নহে। প্রথমে শিক্ষার চরম আদর্শ স্থির করিতে হয়, পরে শিক্ষার বিধি সকলকে তদনুকূল করিতে হয় তবে সম্যক ফল পাওয়া যাইবে। যত দিন লক্ষ্যের স্থিরতা না হইবে ততদিন শিক্ষাও চঞ্চল থাকিবে।

অনেকে ব্যক্ত করেন যে আমাদের দেশে বৈদেশিক শিক্ষা প্রথা প্রচলিত হইলে চরম উন্নতি হইবে। তাহারা বিবেচনা করেন কি বৈদেশিক লক্ষ্য আর আমাদের লক্ষ্য এক!

দেবব্রতের শিক্ষা হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইলাম। আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই ব্যাসদেব দেবব্রতের শিক্ষা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মহাকবি দেবব্রতকে প্রথম সাক্ষাতেই এই ভাবে দেখাইতেছেন।

"কুমারং রূপ সম্পন্নং বৃহন্তং চারু দর্শনং॥"
"দিব্যমস্ত্রং বিকুর্ব্বানং যথা দেব পুরন্দরং।"
কৃৎস্নাং গঙ্গাং সমাবৃত্য শরৈস্তীক্ষ্ণৈ রবস্থিতং॥"

আঃ ১৮০।২৫।২৬

"চারু দর্শন বৃহদাকার রূপবান দেবরাজ পুরন্দর সদৃশ এক কুমার তীক্ষ্ণ শর দ্বারা সমস্ত গঙ্গাস্রোত অবরুদ্ধ করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন।"

দেবব্রতের শারীরিক উন্নতির পরিচয় কি অপূর্ব্ব ভাবে আমাদিগকে কবি জানাইলেন অনুধাবন করুন। কতদূর দৈহিক সাধনা হইলে ঐরূপ হস্ত লাঘব লাভ হয় তাহা বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করে কি! কবি কল্পনা এবং উৎকট বর্ণনা প্রভৃতি বাক্যের আশ্রয় না লইলে এরূপ ঘটনার কারণ অনুভবে আমরা অসমর্থ।

অতঃপর গঙ্গাদেবী পরিচয়ে বলিতেছেন "বেদানধিজগে সাঙ্গান বশিষ্ঠাৎ এব বীর্য্যবান।" বশিষ্ঠ হইতে ইনি সমগ্র বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন। দেবব্রত জাতিতে ক্ষত্রিয় বেদাধ্যয়ন তাঁহার অবশ্য কর্ম্ম; দ্বিজাতির

বেদাধ্যয়ন শাস্ত্র বিধি। পূর্ব্বকালে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। বেদ বলিলে আজকাল কতক গুলি চাষার গান অনেকে মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা আত্মবশে আনিবার উপায়কে বেদ বলে। বেদ-মন্ত্র যথাবিহিত সাধিত হইলে মনুষ্যের জ্ঞানের অভাব থাকে না; প্রাকৃতিক শক্তি অনন্ত; যেমন ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাত তাড়িতের আবির্ভাব, অয়স্কান্তের লৌহাকর্ষণ এ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি, সেইরূপ স্নেহ মমতা দয়া রাগ দ্বেষ হিংসা ইহারাও প্রাকৃতিক শক্তি।

গ্রামোফোন টেলিফোন উড়োকল ডুবাকল এবং আরো কত কল ইহারা প্রাকৃতিক শক্তির দাসীভাবের পরিচায়ক। তেমনি মারণ উচাটন বশীকরণ স্তম্ভন ইত্যাদিও সেই শক্তির পরিচায়িকা ভাবের জ্ঞাপক। প্রথমটি স্থূল প্রকৃতির এবং অন্যটি সূক্ষ্ম প্রকৃতির কার্য্য, প্রকৃতির জড় এবং অজড় ভাবে বিভাগের কোন বিশেষ অর্থ নাই। জড় ও অজড় দুই প্রকৃতির অন্তর্গত।

তড়িৎ উৎপন্ন করিতে হইলে কতকগুলি বস্তুর প্রয়োজন হয়, যথা বিড়াল চর্ম্ম, কাচ খণ্ড এবং ঘর্ষণ। তুমি এই প্রক্রিয়ার একটা সাঙ্কেতিক নাম দিলে যথা তড়িৎ তেমনি অন্য দিকেও ক্লীং খ্বাং হুং ফট এক ক্রিয়া বিশেষের সঙ্কেত। বেদার্থ গ্রহণ করিতে হইলে আপাততঃ দুর্ব্বোধ্য সঙ্কেত সমূহকে গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। অভ্যাস হইলে তবে তাহার শক্তি অনুভূত হয়। জড় বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে যেমন উপদেশ আবশ্যক অজড় বা সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলেও বিশেষজ্ঞের উপদেশ আবশ্যক। ফ্যারাডে, কেল্‌ভিন, এডিসন, জগদীশ চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র ইহারা জড় প্রকৃতির (স্থূল) উপাসনা করিয়া কত উচ্চ মানসিক অবস্থার অধিকারী বলিয়া গণ্য ও বহুমান্য হইতেছেন। আর

যাঁহারা সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিয়াছেন, তাঁহাদের মানসিক উন্নতি কত উচ্চ সহজেই অনুমান করা যায়। দেবব্রতের মানসিক শিক্ষা তাহার সাঙ্গ বেদাধ্যয়নে পরিস্ফুট।

তৎপরে গঙ্গাদেবী দেবব্রতের আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিষয়ে বলিতেছেন

"উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রময়ং তদ্বেদ সর্ব্বশঃ।
তথৈবাঙ্গিরসঃ পুত্রঃ সুরাসুর নমস্কৃতঃ॥
যদ্বেদ শাস্ত্রং তচ্চাপি কৃৎস্নমস্মিন প্রতিষ্ঠিতং।"

আ—১০০।৩৬।৩৭

উশনা এবং অঙ্গিরসপুত্র বৃহস্পতি যত শাস্ত্র জানিতেন তৎসমুদায় ইহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে।

গীতায় ভগবান বলিতেছেন—

"মুনীনামপ্যহং ব্যাস কবীনামুশনাঃ কবি।
পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিং।"

উশনা শুক্রাচার্য্যের অন্য নাম। কবি অর্থে ক্রান্তদর্শী। বিশ্বসৃষ্টির সূক্ষ্ম কারণ যিনি দেখিয়াছেন তিনিই কবি বা ক্রান্তদর্শী, যাহার পরে আর কিছু দেখিবার নাই তাহাই ক্রান্তদর্শন। চরম যোগ সাধন এবং বৈরাগ্য না হইলে অতিক্রান্ত দর্শন হয় না, বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্য্য ইঁহারা ক্রান্তদর্শী। দেবব্রত তাঁহাদের শিষ্য।

পরশুরাম যিনি একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, যাঁহার তুল্য অস্ত্রধারী ভূমণ্ডলে আর কেহ ছিলেন না; তাঁহার সমগ্র অস্ত্র বিদ্যা দেবব্রতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যদস্ত্রং বেদ রামশ্চতদেতস্মিন প্রতিষ্ঠিতং।

এতদ্ভিন্ন দেবব্রতের আর একটি বিশেষণ আছে "রাজ ধর্ম্ম কোবিদং" রাজ ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা বলেন দেবব্রতের

রাজনৈতিক শিক্ষার অবসর ছিল না অতএব তাঁহার শিক্ষা আংশিক, তাঁহারা বোধ হয় এখন হৃষ্ট হইবেন।

আমরা দেখিতেছি দেবব্রত অশেষ বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ব্রহ্মচারী যোগজ্ঞানসম্পন্ন বিরাগী সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী রাজ ধর্ম্মজ্ঞ নিখিল শস্ত্রবেত্তা সর্ব্বজন প্রিয় বৃহৎকায় ও রূপবান। যে তিনটি উপকরণের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের আত্যান্তিক স্ফূর্ত্তি দেবব্রতে বর্ত্তমান। ইহাকেই বলে শিক্ষা।

কেবল শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে কোন ফল নাই, চিত্তে তাহাদের প্রতিষ্ঠা চাই। বিদ্যা এবং নীতি কর্ম্মেও চরিত্রে পরিস্ফুট হওয়া চাই, নচেৎ শকবাহী গর্দ্দভের ন্যায় পণ্ডশ্রম এবং বৃথা আত্মাভিমানের আকর হইতে হইবে। এই মঙ্গলময় তত্ত্বের উপদেশের জন্যই মহাকবি ধনুর্ব্বানহস্তে সেই জাহ্নবীজল স্রোত বিরোধরূপ অতি মানুষ কর্ম্মেরত ক্ষত্রিয় দেবব্রতকে প্রথমেই আমাদের সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছেন।

শস্ত্র-গুরু রামের নিকট দেবব্রত কি শিখিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ পরীক্ষা আমরা পাইলাম, শাস্ত্র গুরু বৃহস্পতি এবং উশনার নিকট কি লাভ করিয়াছেন তাহা পরাধ্যায়ে আমরা বলিব।

সাধারণ কবির ন্যায় ভারতকার দেবব্রতের বাহ্যাবয়বের বিশেষ কিছু বলেন নাই। তাঁহার উরুদেশ তাল সদৃশ, ভ্রূদেশ ইন্দ্র-ধনুর ন্যায়, বক্ষঃস্থল গড়ের মাঠের মত, নয়ন ইন্দিবর নিন্দিত ইত্যাদি পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতিকর কোন বর্ণনা নাই। তিনি দেবব্রতকে গুণময় আকৃতিতে অঙ্কিত করিয়াছেন, বাহ্যরূপ সেই গুণসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, রূপ গুণে মিশিয়া এক দেবরূপ আমাদের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

আবার সেই পুরাতন আপত্তি উঠিবে যে এই নদীস্রোত অবরোধের গল্পটা অনৈসর্গিক শরের দ্বারা এ কার্য্য অসম্ভব।

আধুনিক বাঙ্গালী জাতির শক্তি এবং অভ্যাস অনুসারে সত্যই অসম্ভব। অনুশীলনে বৃত্তির কতদূর উন্নতি হয় অনভ্যাসে আমাদের ধারণা করাও কঠিন হইয়াছে। অভ্যাসে হস্তের অচিন্তনীয় লঘুতা উৎপন্ন হয়। যাহারা উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গ, সেতার বা বীণা শুনিয়াছেন তাহাদের কিছু অনুভব হইবে হস্ত লাঘব কাহাকে বলে। অন্তরহীন শরক্ষেপ হইলে জলস্রোত রোধ হওয়া বুদ্ধির অগম্য নয়।

ধনুর্বেদের কিছুই আমরা জানি না। ধনুকের মধ্যে যাত্রাদলে এবং রঙ্গালয়ে কৃত্রিম ধনুক আর আকাশে সেই রঞ্জিত বাঁকা রেখাটিকে ধনুক বলিয়া জানি। এ সব হইতে ধনুর্বিদ্যায় কি রকম পারদর্শিতা হইতে পারে বুঝান অসম্ভব। সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিতে ধনুকের প্রচলন আছে। তাহারা তাহার বলে বাঘ ভালুক অনায়াসে মারে। লেখনী যাহাদের আত্মরক্ষার প্রধান শস্ত্র তাহাদের অস্ত্রাদি চালনা বিষয়ে কোন আপত্তি না করাই ভাল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মানুষ কি দেবতা।

এক দুই করিয়া চারি বৎসর মহারাজ শান্তনু দেবপ্রতিম যুবরাজ দেবব্রতের সহিত অতিবাহিত করিলেন।

অতঃপর একদা যমুনা তটে কোন বনভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে দিব্যগন্ধ প্রসারিণী দেবরূপিণী অসিতলোচনা এক দাশ কন্যাকে নয়ন পথের পথিক দেখিলেন। পরিচয় লইয়া কন্যার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বিবাহার্থ কন্যা প্রার্থনা করিলেন। কন্যার পিতা শুল্কের কথা উঠিলে এই বিষম পণ চাহিলেন যে "এই কন্যার গর্ভজাত পুত্রকেই আপনার পরে রাজা করিতে হইবে আর কোন পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারিবেন না।"

সেই ক্ষণে মস্তকে অশনিপাত হইলেও বোধহয় শান্তনুর এত কষ্ট হইত না। সেই সর্ব্বজননয়নানন্দ প্রজার হৃদয়-রাজা দেবব্রত এই কৌরবরাজ্যের রাজা হইবেন না এ চিন্তা তাঁহার চিত্তে স্থান পাইল না। দীন চিত্তে প্রত্যাগত হইয়া বিষণ্ণ মনে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

প্রত্যাহিক অশ্বারোহণ আর নাই, রাজ কার্য্যেও তাদৃশ আস্থা নাই। সদাই চিন্তারেখান্বিত অপ্রসন্ন মুখমণ্ডল, সহাস্য আলাপ নাই, অলব্ধকাম হইলে যত অশান্তির স্ফূরণ হয় সে সব হইয়াছে।

পিতাকে তদবস্থ দেখিয়া পিতৃভক্ত দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ব্যাধিমিচ্ছামি তে জ্ঞাতুং" আপনার কি ব্যাধি জানিতে ইচ্ছা করি এবং "প্রতিকুর্য্যাং হি তত্র" তার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিব।

শান্তনু তাঁর সেই যমুনাতীরে উৎপন্ন ব্যাধি পুত্রকে এই ভাবে বলিতেছেন।

"হে ভরতকুল প্রদীপ! আমাদের এই মহদ্বংশে তুমি একমাত্র সন্তান, তুমি সর্ব্বদা অস্ত্রচালনায় নিরত ও পৌরুষাকাঙ্ক্ষী অতএব মনুষ্যের অনিত্যতা বিবেচনা করিয়া আমি শোকাবিষ্ট হইয়াছি। যদি কোন রূপে তোমার বিপত্তি ঘটে তবে আমাদের বংশ থাকিবে না। পরন্তু তুমি এক পুত্রই আমার শত পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই এ জন্য পুনর্ব্বার আমি বৃথা দারপরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি না কেবল বংশরক্ষা করিবার নিমিত্ত কামনা করি যে তুমি কুশলী হইয়া থাক। ধর্ম্মবাদীরা বলিয়াছেন যাহাদের একমাত্র পুত্র তাহারা অনপত্য (অর্থাৎ এক ছেলে ছেলেই নয়)" পুনরায় প্রমাণ দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন "সন্তান হইতে যে স্বর্গ হয় তাহাতে আমার সংশয় নাই; পুরাণ সকলের মূলীভূত ও দেবতাদিগের প্রমাণীভূত যে বেদ তাহাতে সর্ব্বদা ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হে ভারত! তুমি শূর,—শস্ত্র সঞ্চালনে নিয়ত নিযুক্ত থাক তাহাতে যুদ্ধ স্থলেই তোমার নিধন সম্ভাবনা দেখিতেছি তাহা হইলে এই বংশের গতি কি হইবে এই জন্যই আমি চিন্তিত আছি।"

আঃ পঃ—১০০ অধ্যায়।

এই বক্তৃতাটি যদি যমুনাতীরে অসিতলোচনাকে এবং যোজনগন্ধাকে দেখিবার ও আঘ্রাণ করিবার পূর্ব্বে হইত তাহা হইলে আমাদের কিছুই বলিবার ছিল না। প্রৌঢ়াবস্থায় সন্তান সত্ত্বেও দারান্তর পরিগ্রহণের প্রার্থীগণের পক্ষে এমন প্রমাণ ও যুক্তিপূর্ণ সমর্থন আর দেখা যায় না। এবম্বিধগণের শান্তনু অবশ্য ধন্যবাদার্হ।

যাহা হউক, আমরা যাহাই বলি বা জগতের লোকে যাহাই বলুক দেবব্রত পিতার এই দারান্তর গ্রহণের ইচ্ছা ইন্দ্রিয়লালসা সম্ভূত মনে করেন নাই। তিনি আদর্শ সন্তান—পিতার গ্লানিকর চিন্তা তাঁহার উদারচিত্তে স্থান পায় না;—তাই তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন "পণ্ডিতেরা এক পুত্রকে পুত্র বলিয়াই গণনা করেন না এ কারণ আর একটি পুত্রের নিমিত্ত পিতার একান্ত ইচ্ছা হইল, কিসে কুলের বিচ্ছেদ না হয় কি প্রকারেই বা যশ বিস্তৃত হয়। এই অভিপ্রায় জানিয়া কালীকে আহরণ করিলাম।

"নচোচ্ছেদং কুলং যায়াদ্বিস্তীর্য্যেচ্চ কথং যশঃ।

উদ্যোগ পঃ ১৪৭ অ—১৮।১৯

দেবব্রত জানিতেন "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে তৃপ্যান্তি সর্ব্ব দেবতাঃ।" এ কথা তিনি শুকের ন্যায় কেবল মুখে বলিতেন না হৃদয়ে অনুভব করিতেন তাই আজ পিতৃভক্ত দেবব্রত পিতার প্রীত্যর্থে দেবের অসাধ্য ব্রত সাধনে চলিয়াছেন।

বঙ্গবাসী! সেই পীযূষ নিস্যন্দিনী পুণ্যপূত কাহিনী শুনিবার পূর্ব্বে তোমার বিলাসকলুষিত বিষয়বিষবিসর্পিত তমোময় চিত্তকে ক্ষণিকের জন্য সংযত কর। জানিও স্থির সাধনার পথ কুসুমাস্তৃত নহে কদাচিৎ।

দেবব্রত বৃদ্ধ অমাত্যগণের প্রমুখাৎ কন্যাপক্ষের পণের বিষয় অবগত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দাশের ভবনে আসিয়া উপস্থিত এবং পিতার জন্য সত্যবতীকে যাচঞা করিলেন।

দাশ জাতিতে কৈবর্ত্ত, ব্যবসায় মৎস্য শিকার ও বিক্রয়, কি করিলে ষোলআনা স্বার্থ রক্ষা হয় সে শাস্ত্রে সে বিশেষ ব্যুৎপন্ন; সে দেবব্রতকে বলিতে লাগিল "আপনি শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ও শান্তনুর একমাত্র পুত্র আপনিই সর্ব্ব বিষয়ের কর্ত্তা আপনাকে একটা নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন;—

কন্যার পিতা যত বড় লোকই হউক এ সম্বন্ধ ত্যাগ করা উচিৎ নয়। যে পুরুষ প্রধান আপনাদের সদৃশ গুণবান তাঁহারই শুক্র হইতে এই বরবর্ণিনী সত্যবতী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।* তিনি অনেকবার বলিয়াছেন যে শান্তনুই এই কন্যার উপযুক্ত পাত্র। তবে জানিবেন যে ঋষিসত্তম অসিত পূর্ব্বে সত্যবতীর নিমিত্ত ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।”

এতটা ভণিতার পর দাশ বলিল “অন্য কিছুই নয় কেবল ইহাতে সাপত্ন্য দোষ আছে কারণ আপনি যাহার সপত্ন (বিপক্ষ) তাহার আর রক্ষা নাই, এইটি বিবেচনা করিবেন এতদ্ব্যতীত আর কোন আপত্তি নাই।”

একথা শুনিবামাত্র আর কালবিলম্ব নাই, দ্বিধা নাই, চিন্তা নাই—দেবব্রত সমাগত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “আপনারা শ্রবণ করুন, “সত্যই আমার ব্রত, পিতার জন্য আমি সত্য কথাই বলিতেছি তুমি যেমন বলিতেছ আমি সেইরূপই করিব।”

মূলে শ্লোকটি লিপিপ্রমাদে পাঠান্তরিত হইয়াছে।

“ইদং মে ব্রতমাধৎস্ব সত্যং সত্যবতাংবর।
নৈব জাতো ন বা জাত ঈদৃশং বক্তুমুৎসহেৎ॥”

দ্বিতীয় চরণটি ভীষ্মোক্তি কখনই নহে। এটি বৈশম্পায়নোক্তি ভুল বশে পূর্ব্বেকার শ্লোক হইতে বিচ্যুত হইয়া ভীষ্মের মুখে উঠিয়াছে। দেবব্রতের কথিত স্বীকার করিলে আত্মশ্লাঘায় দেবব্রত চরিত্রে বিশেষ দোষ পড়ে। অথচ দেবব্রত আত্মশ্লাঘা আর কখনই করেন নাই। ইহার পূর্ব্বের শ্লোকটি এই। বৈশম্পায়ন উবাচ—

* সত্যবতী উপরিচর বসুর কন্যা। দাশ পালক-পিতা মাত্র, বসু জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন।

"এবমুক্তস্তু গাঙ্গেয়স্তু যুক্তং প্রত্যভাষত।
শৃন্বতাং ভূমি পালানাং পিতুরর্থায় ভারত॥"
পরের শ্লোকটি এই "এবমেত্য করিষ্যামি যথাত্ব মনুভাষসে।
যোম্যাং জনিষ্যতে পুত্র সনো রাজা ভবিষ্যতি॥

আঃ ১৮০ অ। ৮৫।৮৬।৮৭

এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে "নজাতে নবাজাতে" চরণটি বৈশম্পায়নের উক্ত "এবমুক্তস্তু" শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ।

এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে সেই আমাদের রাজা হইবে।"

দাশ বড়ই চতুর; সে যখন দেখিল দেবব্রত অনায়াসে এই বিশাল কৌরব রাজ্য লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিলেন তখন বাকচাতুর্য্যের সহিত আর একটি অভিনব এবং লোমহর্ষণ পণ উপস্থিত করিল। সে দুষ্কর কর্ম্ম চিকীর্ষু হইয়া বলিল, "আপনি শান্তনু পক্ষের কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন পরন্তু এই কন্যা পক্ষেরও কর্ত্তা আপনি হউন, এস্থলে আর এক বক্তব্য আছে, সে বিষয়েও আপনি বিবেচনা করুন। যাহাদের কন্যার প্রতি স্নেহ আছে তাহাদের ইহা অবশ্য বক্তব্য। অতএব আমি কন্যাবাৎসল্য বশতই বলিতেছি হে সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ! এই রাজগণের মধ্যে আপনি সত্যবতীর নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিলেন—আপনি যেরূপ মহানুভব তাহা আপনারই উপযুক্ত হইয়াছে। এ প্রতিজ্ঞার যে অন্যথা হইবে না সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনার যে সন্তান হইবে তাহাতে আমার মহৎ সংশয় হইতেছে।"

এই প্রস্তাবের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। দাশ স্বার্থে অন্ধ ঘোর বিষয় বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি (বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই উকিলের পরামর্শ লইয়া রাখিয়াছিল) সে বুঝিয়াছিল দেবব্রত রাজা না হইলেই যে তাঁহার পুত্রদের দায় বিলুপ্ত হইবে তাহা নহে, কারণ জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হয় এবং জ্যেষ্ঠ

পুত্রের পুত্রেরাও রাজা হইবে, অন্ততঃ রাজ্য দাওয়া করিবে; সে পথও এখনি নিষ্কণ্টক করিয়া রাখা উচিৎ এই ভাবিয়াই সে এই সুদারুণ প্রস্তাব করিল।

দাশ ভাবিয়াছে দৌহিত্রবংশ রাজবংশ হইল তাহার এবং তাহার বংশের জাল ফেলাও এইবার শেষ হইল। মনুষ্য এই রকমই বুঝে কিন্তু ভগবদভিপ্রায় যে অন্যরূপ তাহার চিন্তাও করে না।

প্রস্তাব শুনিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু দেবব্রতের সেই পূর্ব্ব ভাব; অকম্পিত কণ্ঠে দৃঢ়তা ব্যঞ্জক স্বরে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--

"দাশরাজ নিবোধেদং বচনং মে নৃপোত্তম।
শৃন্বতাং ভূমি পালানাং যদ্রবীমি পিতুঃ কৃতো॥"

দাশরাজ প্রীত্যর্থে সকল ভূমিপালগণের সঙ্গে আমার এই বচন শ্রবণ কর।

"রাজ্যং তাবৎ পূর্ব্বমেব ময়া ত্যক্তং নরাধিপাঃ।
অপত্যহেতোরপি করিষ্যে অদ্য বিনিশ্চয়ং॥"

সমস্ত রাজ্যই পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়াছি, আমার অপত্য হেতু যে সংশয় হইতেছে তাহারও এই বিনিশ্চয় করিতেছি শুন।

"অদ্য প্রভৃতি মে দাশ ব্রহ্মচর্য্যং ভবিষ্যতি।
অপুত্রস্যপি মে লোকা ভবিষ্যত্যক্ষয়া দিবি॥"

দাশ! অদ্য হইতে আমি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম। আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্তি হইবে।

এ মানুষের ইতিবৃত্ত কি দেবতার ত্রিদিব কাহিনী? মর্ত্ত্যের ভাষায় এ ত্যাগের বিবরণ কি পূর্ণ প্রাকশ করা যায়? মূকতাই ইহার উৎকৃষ্ট ভাষা। সারা মনটি দিয়া অনুভব ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।

বাঙ্গালী! একবার তোমার বিলাস নিমীলিত চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ

মহাকবি তোমার জন্য কি চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছেন। এই দেবব্রত ভারতের অন্নে, ভারতের জলে, ভারতের বায়ুতে জীবন ধরিয়া কি সাধনায় এ দেব বিনিন্দিত সিদ্ধি অর্জ্জন করিলেন?

নবোদ্গত যৌবন, বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী, প্রবৃত্তিগণ কোথায় চিত্তে নিত্য নব তরঙ্গ সৃষ্টি করিবে, না শৈশবেই দগ্ধবীজের ন্যায় উষর ক্ষেত্রে বিশুষ্ক হইল। *

মহর্ষিগণের নিকট দেবব্রত কি শিক্ষা পাইয়াছেন তাহার চূড়ান্ত পরীক্ষা পাইলাম।

কি অপূর্ব্ব দৃশ্য; একদিকে কুঞ্চিত স্বার্থ সংস্থান অন্য দিকে বিশাল আত্ম বলিদান; একদিকে মানুষ মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া পশুত্বে চলিয়াছে অপর দিকে মনুষ্যত্ব ত্যজিয়া দেবত্বে উঠিয়াছে।

এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার পরে দেবগণ দেবব্রতকে ভীষ্ম উপাধি দিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, আসুন আমরা ভূলগ্নমস্তক হইয়া এই নরদেবকে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি আর তাঁহার এই সন্ন্যাস সিদ্ধির ধ্যান করিয়া পবিত্র হই। অদ্য হইতে দেবব্রত বক্ষ্মা জগতে দেবব্রত ভীষ্ম বা "ভীষ্ম" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

---

* দাশরথির পিতৃসত্য পালনে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও ব্রহ্মচর্য্য—ভীষ্মের এই ভীম প্রতিজ্ঞার পার্শ্বে মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বংশ রক্ষা।

দাশ কন্যা সত্যা বিধিলিপিতে রাজ্ঞী হইয়াছেন, শান্তনুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র তাঁহাকে মধুর স্বরে পিতা বলিয়া ডাকিতেছে

নিয়তি কাহার বাধ্য নয়। কিছুকাল পরে মহারাজ শান্তনু তাঁহার সেই যমুনাতীরের অসিতলোচনা গন্ধকালীকে কাঁদাইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ভীষ্ম নিজবাসে প্রবাসী হইয়া চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসাইলেন। চিত্রাঙ্গদ তিন বৎসর রাজ্য করিয়া এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন।

অগত্যা ভীষ্ম বালক বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া সত্যবতীর মতস্থ হইয়া রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলেন।

বিচিত্রবীর্য্য প্রাপ্তযৌবন হইলে ভীষ্ম শুনিলেন যে, কাশীরাজের তিন কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন, বিমাতার অনুমতি লইয়া ভীষ্ম কাশীধামে বহু রাজগণালঙ্কৃতা সেই স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর সেই সভায় সমবেত মহীপালগণকে গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন। "দেখুন শাস্ত্রে অষ্ট প্রকার বিবাহ ব্যবস্থা আছে যথা ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। তবে রাজগণের পক্ষে বীর্য্যলব্ধ কন্যাই প্রশস্ত। ধর্ম্মবাদীরা বলেন যে, স্বয়ম্বর সভায় বিপক্ষ পক্ষ প্রমথিত করিয়া বলপূর্ব্বক যে কন্যা গৃহীত হয় সেই পত্নীই শ্রেষ্ঠ।"

এই বলিয়া তিনি সেই কন্যাগণকে স্বীয় রথে স্থাপন করিয়া সমাগত রাজগণকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন।

ক্ষণকালের মধ্যেই তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কিন্তু ধন্য ভীষ্মের শস্ত্রসাধনা! তিনি একাকীই সমস্ত ভূপালগণকে পরাভূত করিলেন। "তখন রথচারী রাজগণ শত্রুপক্ষ হইয়াও তাঁহার অলৌকিক অদ্ভুতকর্ম্ম ও লঘুহস্ততা এবং আত্মরক্ষা দেখিয়া তাঁহাকে প্রশংসা পূর্ব্বক সম্মান করিলেন। আঃ প ১০২ অ

অতঃপর জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম কন্যাগণকে হস্তিনাপুরে আনিয়া যথাবিহিত শাস্ত্র বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহোদ্যোগ করিতেছেন, এমত সময় জেষ্ঠা কন্যা অম্বা বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে অন্যগতপ্রাণ, অতএব আপনি বিবেচনা করত কর্ম্ম করিবেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্ম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ লইয়া ঐ কন্যাকে তাঁহার অভীষ্ট সাধনে অনুমতি দিলেন। এই কন্যার সহিত আমাদের পরে শিখণ্ডী রূপে সাক্ষাৎ হইবে।

বিবাহের পর সপ্ত বৎসর কালের মধ্যেই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবনে যক্ষারোগগ্রস্ত হইয়া বিচিত্রবীর্য্য কালকবলে পতিত হইলেন।

অদৃষ্ট অলঙ্ঘ্য। যে কুল রক্ষার জন্য এত কাণ্ড হইল—দাশকন্যা রাজ্ঞী হইলেন, যুবরাজ দেবব্রত যৌবনে সন্ন্যাসী হইলেন তথাপি সে কুল নির্ম্মূল হইল।

হিন্দুর নিকট পিণ্ডলোপ মহাপাপ, পিতৃপুরুষ ক্ষুণ্ণ হয়েন,—মহাত্মা ভরতের বংশ লোপ হইতে চলিয়াছে এখন উপায় কি।

কুলক্ষয়ে কুলস্ত্রীতে পুত্রোৎপাদনের জন্য শাস্ত্রে নিয়োগ-প্রথা ব্যবস্থা আছে। ভীষ্মের সময় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। নিয়োগোৎপন্ন পুত্রকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলে। ক্ষেত্রজ হইতে পিণ্ডাদি দান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। কলিযুগের পূর্ব্বে হিন্দু শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের প্রচলন ছিল সমাজে তাহা কোন দোষ বলিয়া গৃহীত হইত না। পাণ্ডবেরা সকলেই ক্ষেত্রজ পুত্র।

এই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া সত্যবতী ব্রহ্মচারী ভীষ্মকে অনুরোধ করিলেন "তুমি আমার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া নিয়োগানুসারে এই বিধবা বধূদ্বয়ে অপত্যোৎপাদন কর। তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ভারত রাজ্যশাসন কর, দারপরিগ্রহ কর, পিতামহগণকে নরকে নিমগ্ন করিও না।"

ভীষ্ম নিজেও উদ্যোগপর্ব্বে কি বলিতেছেন দেখুন।

"এইরূপে কুরুরাজ্য অরাজক হইলে প্রজাগণ ভয় ও ক্ষুধা পীড়িত হইয়া মৎসমিধানে সত্বর প্রধাবিত হইল এবং আমাকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল 'হে শান্তনু কুলবর্দ্ধন! রাজ বিবর্জ্জিত হওয়ায় আপনার প্রজা সমুদায় সংহার দশায় উপনীতপ্রায় হইল, অতএব আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত আপনিই রাজ্যভার গ্রহণ করুন।" আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাদিগের মনোবেদনার উপশম হইবার আর উপায়ান্তর নাই; অতএব কৃপাবিতরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করুন।' তখন সমস্ত পুরবাসীগণ আমার বিমাতা কল্যাণময়ী কালী, ভৃত্য, পুরোহিত, আচার্য্য ও বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলেই অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া আমাকে রাজপদ গ্রহণে অনুরোধ করতঃ আমাকে কহিলেন 'হে মহামতে! আমাদিগের হিতার্থে তুমি রাজসিংহাসনে আরোহণ কর।' তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলাম 'আমি পিতার গৌরব এবং কুলের রক্ষা হেতু রাজত্ব রহিত ও ঊর্দ্ধরেতা হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখন কি প্রকারে রাজ্য ভার গ্রহণ করিতে পারি'।" উদ্যোগ প ১৪৭ অঃ

এই ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীষ্ম তাঁহার বিমাতাকে যাহা বলিলেন তাহা বাঙ্গালির দ্বারে দ্বারে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রাখা উচিৎ।

তিনি বলিলেন "মাতঃ! আপনি যাহা বলিলেন তাহা ধর্ম্ম বটে, কিন্তু সন্তান সম্বন্ধে আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে তাহা আপনি অবগত

আছেন। হে সত্যবতী আপনার নিমিত্ত যে সত্যপণ হইয়াছিল তাহাও আপনি অবগত আছেন। আর সেই সত্য রক্ষার নিমিত্ত পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

"পরিত্যজেয়ং ত্রৈলোক্য রাজ্যং দেবেষু বা পুনঃ।
যদ্বাপ্যাধিক মেতাভ্যাং ন তু সত্যং কথঞ্চন॥"

ত্রৈলোক্য রাজ্য পরিত্যাগ করিতে পারি অথবা ইহার অপেক্ষা অধিক যাহা হয় তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারি কিন্তু সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

"ত্যজেচ্চ পৃথিবী গন্ধ মাপশ্চ রসমাত্মনঃ।
জ্যোতিস্তথা ত্যজেদ্রূপং বায়ু স্পর্শগুণং ত্যজেৎ॥
প্রভাং সমুৎসৃজেদর্কো ধূমকেতু স্তথোষ্মতাং।
ত্যজেচ্ছব্দং তথাকাশং সোমঃ শীতাংশুতা ত্যজেৎ॥
বিক্রমং বৃত্রহা জহ্যাদ্ধর্ম্মং জহ্যাচ্চ ধর্ম্মরাট।
ন ত্বহং সত্যমুৎ স্রষ্টুং ব্যবসেয়ং কথঞ্চন॥"

"যদিও পৃথিবী গন্ধ ত্যাগ করে জল রস ত্যাগ করে জ্যোতি রূপ ত্যাগ করে বায়ু স্পর্শ গুণ ত্যাগ করে সূর্য্য প্রভা ত্যাগ করে ধূমকেতু উষ্মা ত্যাগ করে আকাশ শব্দ ত্যাগ করে চন্দ্র হিম কিরণ ত্যাগ করে ইন্দ্র বিক্রম ত্যাগ করিতে পারেন, এবং ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন তথাপি আমি সত্যকে ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না।"

কিন্তু সত্যবতী নাচার—বারম্বার অনুরোধ করায় ভীষ্ম বলিলেন "রাজ্ঞি ধর্ম্মাণৎবক্ষস্ব।" রাজ্ঞি ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করুণ।

"সত্যচ্যুতি ক্ষত্রিয়স্য ন ধর্ম্মেষু প্রশস্যতে"

"ক্ষত্রিয়ের সত্যচ্যুতি বড়ই অধর্ম্ম।" হিন্দু চিরকালই ধর্ম্ম ভীরু।

আঃ প ১০৩ অধ্যায়।

অতঃপর ভীষ্ম দুইটি বিবরণ দ্বারা সত্যকে বেদপারগ ব্রাহ্মণের দ্বারা পুত্রোৎপাদনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন।

তিনি বলিলেন "পূর্ব্বকালে জামদগ্ন্য রাম ক্ষত্রিয়গণের অধিপতি হৈহয়-কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে, পিতৃবধহেতু বিনষ্ট করেন, তৎপরে তিনি অমর্যান্বিত হইয়া পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করিলেন। এইরূপে ভূলোক নিক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয় কামিনীগণ ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের সংসর্গে উপরতা হইয়াছিলেন, ইহাতেই ক্ষত্রিয়গণের পুনোরুৎপত্তি হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপাখ্যানটি এই—দীর্ঘতমা একজন বহুজ্ঞানসম্পন্ন ঋষি। তিনি বলি-বনিতা সুদেষ্ণাতে অনেক পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন; বলি ক্ষত্রিয় নহেন।"

এই দীর্ঘতমা ঋষির উপাখ্যানে আধুনিক মাপে কিন্তু অশ্লীল ভাব আছে। উপাখ্যানটি সত্য কিনা সে বিষয়ে ভীষ্মদেব কিছু বলিতেছেন না। এরকম একটা গল্প আছে তাহাই বলিতেছেন। ব্রাহ্মণের ঔরসে নিয়োগদ্বারা সন্তানোৎপত্তির একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। এই উপাখ্যানটির মৌলিকতা বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, পূর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার কোন উল্লেখ নাই, ২য়, ভীষ্ম ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি বলিতেছেন এ উপাখ্যানে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি নাই। বলি দৈত্য, তিনি প্রহ্লাদের পৌত্র। তাহার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম বলিয়া কোন পুত্র ছিল না। (বিষ্ণু পুরাণ ২১ অংশ); ৩য়, দীর্ঘতমার জন্ম বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক। ৪থ, আদিপর্ব্বে ২২৭ অধ্যায় পর্ব্ব-সংগ্রহ পর্ব্বে কথিত আছে, কিন্তু এখন আছে ২৩৪ অধ্যায়। ৫ম এই দীর্ঘতমার উপাখ্যান পুনর্ব্বার শান্তি পর্ব্বে ৩৪১ অধ্যায়ে লিখিত আছে, তথায় বিবরণ অন্যরূপ আছে। আমরা অশ্লীলতার জন্য ইহার মৌলিকতার সন্দেহ করি না; অশ্লীলতা আমাদের মনে; ভীষ্মের মনে অবশ্য ছিল না।

অনন্তর ভীষ্ম পর্য্যায়ে প্রতিজ্ঞাত উপায় বলিলেন। "আপনি কোন গুণবান ব্রাহ্মণকে ধন দ্বারা নিমন্ত্রণ করুন; তিনি পুত্র উৎপাদন করিবেন। এ কথায় সত্যা তাঁহার কানীন পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিলেন, ভীষ্মও তাহাতে তথাস্তু বলিলেন। ফলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও দাসীগর্ভে মহাত্মা বিদুর জন্মগ্রহণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও জন্মান্ধতা দোষে রাজা হইলেন না, পাণ্ডু রাজা হইলেন; এই ভাবে কৌরব বংশ পুনঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিয়োগ এবং বহুবিবাহ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত ঘটনা সকল তিনটি অতি সুন্দর তত্ত্ব আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। সে তত্ত্ব তিনটির আলোচনা ভীষ্ম চরিত্রে আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। তত্ত্বত্রয় এই—

১ম—দেবব্রতের প্রতিজ্ঞার প্রকৃতি।

২য়—তাঁহার বহুবিবাহের ব্যবস্থা।

৩য়—নিয়োগ দ্বারা অপত্যোৎপাদনের অনুমোদন।

প্রথম তত্ত্বটি ভীষ্মের মানসিক অবস্থার অসীম উন্নতির পরিচায়ক, কিন্তু ২য় এবং ৩য়টি আধুনিক বিচারে তেমনি অবনতিসূচক।

আমরা পাইয়াছি পূর্ব্বে দেবব্রত সত্যবতীকে আহরণ জন্য দুইটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; একটি দ্বারা তিনি কৌরবরাজ্যের রাজস্বত্ব পরিত্যাগ করেন, দ্বিতীয়টির দ্বারা আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবেন অঙ্গীকার করেন।

কথা উঠিতে পারে যে, দেবব্রত যখন এ প্রতিজ্ঞা করেন তখন তিনি অপরিণতবয়স্ক, হিতাহিত জ্ঞান তাঁহার হয় নাই ; ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া এবং আপন স্বত্বাদির বিষয়ে ব্যবহারজীবদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়াই হঠকারিতার সহিত এই ভীষণ শপথ করিয়া বসিলেন। অথবা পিতা তখন রাজা, তাঁহার কোন প্রিয়কার্য্য করিলে তিনি প্রীত হইয়া তাঁহার বিষয়ে কোন একটা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিবেন। রাজ্যের অর্দ্ধেকাংশ অথবা অন্য কোন রাজ্য জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারেন। অথচ একটা বড় নাম কিনিবার সুযোগ হইল, এ সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিৎ নহে ; এই আশায় প্রণোদিত হইয়া এতবড় অবিবেচনার কর্ম্মটা করিয়া পশ্চাতে অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

প্রায়ই দেখা যায়, মর্য্যাদার খাতিরে চাঁদার খাতায় দস্তখত করিয়া বা রাজকর্ম্মচারীর আজ্ঞাব্যঞ্জক অনুরোধ রক্ষা করিয়া প্রতিজ্ঞা করত শেষে কার্য্যকালে ভগবানের নিকট প্রার্থনা হয় যে, যাহাতে প্রস্তাবিত বিষয় কার্য্যে পরিণত না হয়, যে কোন প্রকারে হউক অর্থটা না দিতে হয়। সামান্য ছিদ্র পাইলেই অঙ্গীকার প্রত্যাহার। গোপনে প্রস্তাবিত বিষয়ের বিপক্ষে সংবাদপত্রে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়—যদি তাহাতে কোন ফল হয় ভালই। এ সকল সন্দেহের অবসর ভগবান ভীষ্মের প্রতিজ্ঞায় রাখেন নাই। দেবব্রতের সত্য শপথ শব্দমাত্র শূন্যগর্ভ কি অন্তরহীন কুলিশ—সারাত্মক তাহার সত্যতা সর্ব্বান্তর্যামী স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন।

দেবব্রত অবশ্য লেখা পড়া করিয়া রাজ্য ত্যাগ করেন নাই, চারিজন

বৃদ্ধ অমাত্য এ কর্ম্মের সাক্ষী ছিলেন; তাহারা প্রায় তাহা ভুলিয়াছেন; ব্যবহার জীবদিগের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা অতি সহজেই রাজ্যের পুনঃ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিতেন।

ভগবদিচ্ছায় চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান লোকান্তর গিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে ভীষ্মই এখন কৌরবরাজ্যের উত্তরাধিকারী; উপরন্তু, প্রজাবর্গ গুরু পুরোহিত এবং যাহার জন্য প্রতিজ্ঞা—সেই সত্যবতীও তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন "রাজা হও"। রাজ্য গ্রহণ করিলেও ধর্ম্মতঃ তাঁহার সত্যচ্যুতি দেখা যায় না। কিন্তু ভীষ্ম এরূপ ক্ষেত্রে কি করিলেন? তিনি পুনরায় সেই যৌবনাবস্থার প্রতিজ্ঞার প্রতিধ্বনি করিয়া উত্তর করিলেন, "আমি ত্রৈলোক্যরাজ্য বা তাহার অপেক্ষা বড় রাজ্যও পরিত্যাগ করিব, কিন্তু "সত্যং ন কথঞ্চন।" তিনি জানিতেন "নতদ্ধর্ম্মং যচ্ছল মভ্যু পৈতি"; কি করিয়া করতলগত রাজ্য হাসিমুখে পরিত্যাগ করিলেন চিন্তার বিষয় নহে কি?

বাঙ্গালি! এ ঘটনার প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে আবার এইরূপ বিশাল আত্মত্যাগের পুনরাভিনয় তোমার মনে পড়ে কি?

সেই সমৃদ্ধ রাজ্য, বৃদ্ধ পিতা, লক্ষ্মীরূপিণী ভার্য্যা, নবপ্রসূত কুমার; সেই নিশাভাগে নিদ্রিত রাজপুরী হইতে "অয়মেব সময়" বলিয়া নিঃশব্দে সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সিদ্ধার্থের নিষ্ক্রমণ স্মৃতিপথে আসে কি?

বোধি-সত্ত্বের নৈরঞ্জনাতীরে মহাবোধিদ্রুমমূলে সেই প্রতিজ্ঞা একবার চিন্তা কর।

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু॥
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকালদুর্লভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মিতশ্চলিষ্যতে॥

"এই আসনে শরীর শুষ্কই হউক আর ত্বক্ অস্থি মাংস প্রলয় প্রাপ্ত হউক, বহুকাল দুর্লভ জ্ঞান না পাওয়া পর্য্যন্ত এ আসন হইতে এ শরীর বিচলিত হইবে না।"

কয়েক শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে তোমার ভদ্রাসনের অতি নিকটে জাহ্নবীতীরে সেই বৃদ্ধা মাতা, সেই বালিকা বনিতা, সেই প্রতিবেশীগণের অসীম মমতা জন্মের মত বির্জ্জন দিয়া নিশীথ আঁধারে পতিতোদ্ধারের পথে শ্রীচৈতন্যের পলায়ন ভুলিয়াছ কি?

যখন চিত্ত চরম বৈরাগ্যের আশ্রয় লয়, তখনই এই প্রকারের প্রতিজ্ঞা ও ত্যাগ স্বতই আবির্ভূত হয়।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তত্ত্বের কিছু আলোচনা না করিলে যাঁহারা এক-পত্নী-বাদী এবং সুরুচি-সমিতির সভ্য, তাঁহারা কখনই ভীষ্মকে ক্ষমা করিবেন না।

এ দুইটিই অতি গভীর সমাজতত্ত্ব। সমাজ বলিলে আমরা কি বুঝি? ইউরোপের লোকে কি বুঝে তাহা আমাদের অন্বেষণের আবশ্যক নাই। যদি তাহারা আমরা যাহা বুঝি তাহাই বুঝে, তবে কোন গোল নাই। যদি তাহারা অন্য নূতন কিছু বুঝে, তবে বহুবিবাহ ও নিয়োগ তাহাদের বুদ্ধির বিষয় হইবে না।

মনুষ্য কতকগুলি চিত্তবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং দেখা যায় সেই বৃত্তিগুলি যত্ন করিলে উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়। একাধিক মনুষ্য না থাকিলে সে বৃত্তিগুলির উদ্ভব ও মার্জ্জনা হয় না। পৃথিবীতে যদি একজন লোক এক সময় থাকে, তাহা হইলে তাহার দয়া, মমতা, সহানুভূতি; ত্যাগ, দান প্রভৃতি সমূহ উৎপন্ন হইতে পারে না। অবশ্য দণ্ডবিধি আইনের কোন অপরাধও সে করিতে পারে না, চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, পরস্ত্রীহরণ, রাজদ্রোহিতা এ সমস্ত কথন হইয়া যাইবে না।

তাহা হইলেই চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষের জন্য যে একাধিক মানবের সমাবেশ তাহাই সমাজস্থিতি।

মানুষ দুই প্রকার, স্ত্রী এবং পুরুষ। কেহ হয়ত বলিবেন কেবল স্ত্রীতে বা পুরুষে সমাজ হয় কি না। অবশ্য সমাজ হয় কিন্তু তাহার প্রবাহ বা স্থায়িত্ব হয় না। এই স্থায়িত্বের কল্পনাতেই স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি। মিথুন ব্যতিরেকে উৎপত্তি নাই; সৃষ্টির আদিতেও এই মৈথুনাভাব বিদ্যমান! পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত প্রকৃতির পরিণাম হয় না। জীব এবং উদ্ভিদ সৃষ্টিতে এই ভাব নিরন্তর অবস্থিত।

প্রাকৃতিক পরিণাম বা সৃষ্টি মাত্রেই উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের বাধ্য; ইহার কদাচ ব্যভিচার নাই, সুতরাং সমাজও এই নিয়মের অন্তর্গত।

সমাজের আবয়বিক গঠনের উপকরণ স্ত্রী ও পুরুষ। উভয়ের সহযোগে সমাজের অঙ্গবৃদ্ধি হয়। যতদিন এতদুভয়ের সংখ্যা সমান থাকে, ততদিন সমাজের কলেবর পুষ্টির জন্য কাহাকেও চিন্তিত হইতে হয় না; কিন্তু যখন স্ত্রী ও পুরুষের ভাগ অসমান হয়, তখনই একটা বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। মনে করুন, কোন সমাজে ১০০ পুরুষ আছে অথচ ৫০ টির অধিক স্ত্রী নাই, তখন সমাজ রক্ষার উপায় কি।

ঐরূপ বৈষম্য নানা কারণে এবং সকল কালেই উপস্থিত হইতে পারে। যথা—

১ম। স্ত্রীগণ যদি কেবল এক প্রকার সন্তান প্রসব করে।

২য়। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে ব্যাধির প্রবলতা।

৩য়। যুদ্ধ বিগ্রহাদি;—যথা ভৃগুরাম প্রায় সমুদয় ক্ষত্রিয়পুরুষকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যে দেশে বহু সমাজ সে দেশে যুদ্ধাদির বিরাম হয় না।

৪র্থ। ভৌতিক কারণ—যথা ভূকম্পন, জল প্লাবন; দুর্ভিক্ষ মহামারী

ইত্যাদি। এ সকল অবস্থায় যাহারা অধিক বলিষ্ঠ তাহারাই সংখ্যায় অধিক জীবিত থাকিবে।

৫ম। ভৌগোলিক কারণ—শীতপ্রধান কি গ্রীষ্মাতিশয্য, জলবায়ুর উৎকর্ষ, অপকর্ষ ইত্যাদি।

উপর্য্যুক্ত সামাজিক বৈষম্যের নিরাকরণ উপায়, অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি প্রধান।

১। যদি পুরুষ অধিক হয়, তবে হয় ভিন্ন সমাজ হইতে অতিরিক্ত স্ত্রীর আহরণ, না হয় এক স্ত্রীর বহুপুরুষ গ্রহণ। কোন কোন জাতিতে বহুপুরুষ গ্রহণ প্রথা আছে, যথা তিব্বৎ। কিন্তু এ ব্যবস্থা সমীচিন নহে, কারণ বিবাদের বড়ই সম্ভাবনা এবং এক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বীজের বপনে ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

২। যদি স্ত্রী অধিক হয়, তবে অন্য স্থান হইতে পুরুষের আমন্ত্রণ না করিয়া বহুস্ত্রীগ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভিন্ন সমাজ হইতে স্ত্রী আহরণ বড় কঠিন ব্যাপার, হয় বলে না হয় অর্থে আহরণ করিতে হইবে।

গত রুষ জাপান যুদ্ধে যে ভাবে পুরুষ ক্ষয় হইতেছিল,—যদি এই ভাবে আর কিছু দিন হইত অথবা যদি এমন কোন যুদ্ধ ব্যাপার উপস্থিত হয় যাহাতে অত্যন্ত অধিক পুরুষ ক্ষয় হইবে, তখন কি উপায়ে সমাজ স্থিতি রক্ষা হইবে। যুদ্ধে প্রায়শ সক্ষম পুরুষই নষ্ট হয় এবং দেশে বহু বিধবার সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে জাপান এবং রুষকে এক পুরুষের বহু স্ত্রী গ্রহণ ব্যবস্থা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে রুচিভঙ্গ বা অধর্ম্ম নাই। কারণ, সর্ব্বাগ্রে সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

দেশান্তর হইতে পুরুষ আনিয়া যে প্রজা স্থাপন ব্যবস্থা সেটি নিয়োগ

ধর্ম্মের মূল এবং এক পুরুষের বহু স্ত্রীতে বীজ প্রদানের যে ব্যবস্থা, তাহা বহুবিবাহের মূল।

বিবাহ সমাজের অতি মঙ্গলময় ব্যবস্থা। বিবাহে জননক্রিয়া ধারাবাহিক রূপে চলে, সন্তান রোগহীন ও দীর্ঘজীবী হয়, সুতরাং সমাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি হয়।

বিবাহের সহিত সচরাচর এক দায়িত্ব আছে, বিবাহিতকে স্ত্রী এবং পুত্রের ভরণ পোষণ করিতে হয়, নচেৎ সমাজে বহু অন্নহীনের স্থান হয়; অধিক দারিদ্র্য হইলে পাপস্রোত বৃদ্ধি পায় "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং।"

যে অবস্থায় সমাজে পুরুষের অত্যন্ত অভাব হয় তখন বিবাহ বন্ধন দৃঢ় থাকিতে পারে না এবং রাখাও উচিৎ নয়; কারণ, তাহা হইলে পুরুষ বহুস্ত্রী গ্রহণ করিবে না, সমাজও পুষ্ট হইবে না। সে অবস্থায় ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতা হইতে অপসৃত না হইলে পিতা বীজ প্রদানে সম্মত হইবে না। এ অবস্থায় কন্যাগণ স্বপ্রণোদিতা হওয়াই সম্ভব এবং আবশ্যক। এই জন্যই কোন সময়ে গূঢ়জ এবং কানীন পুত্রের ব্যবস্থা সমাজকে আদর করিতে হয়। সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা দেখিবেন, এই ভাবেই সমাজের পুষ্টি চিরকাল হইয়া আসিতেছে।

সমাজে যতই বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন, ততই সমাজের উন্নতি হইবে। উৎকৃষ্ট সন্তান চাহিলে উৎকৃষ্ট পিতা চাহি। যাহাতে সমাজে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপন্ন হয়, সমাজতত্ত্বজ্ঞের উচিত তাহার সুব্যবস্থা করা। বহুবিবাহ এবং নিয়োগ ভিন্ন অন্য ব্যবস্থা আর নাই। উদাহরণে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ব্যাসদেব আদর্শ ব্যক্তি, তাঁহার ন্যায় গুণবান পুরুষ যে সমাজকে যত অলংকৃত করিবে ততই সেই সমাজের উন্নতি হইবে। কিন্তু যদি একপত্নীকের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, তাহা হইলে সমাজকে ব্যাসের ঔরসজাত গুণবান পুত্র হইতে বঞ্চিত

থাকিতে হয়। অতএব অবস্থা বিশেষে বহুবিবাহ এবং নিয়োগ ধর্ম্ম নহে কি ?

হিন্দু বুঝেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" পুত্র উৎপাদনে মহাধর্ম্ম হয়। বাস্তবিকই হয়, নচেৎ সমাজস্থিতির ব্যাঘাত হয়। তবেই যে ব্যক্তির ভার্য্যা সন্তান প্রসবে অক্ষম, তাহার ত দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়াই বোধ হয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য এ সকল ব্যবস্থা ঋষিরা প্রচলিত করেন নাই। তাঁহারা এই সকল ব্যবস্থাকে সামাজিক বৈষম্যের অর্থাৎ আপদ্ধর্ম্মের ব্যবস্থা বলিয়াছেন।

শান্তির অবস্থায় যখন সমাজে কোন বিপদ নাই তখন এ সকল ব্যবস্থা সামান্যত প্রযোজ্য নয়, অবস্থানুসারে অনুসরণীয়।

নিয়োগ প্রথায় কতকগুলি নিয়ম আছে। যাহাকে তাহাকে, যে সে সময় এবং যত ইচ্ছা তত পুত্রের নিমিত্ত নিয়োগ হয় না। কুলক্ষয়ে বেদ পারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা এক স্ত্রীতে একটি সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে। অতি মঙ্গলময় ব্যবস্থা; কামবিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধচিত্তে সন্তানবীজগ্রহণ; সমাজোন্নতির প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা নহে কি ? বর্ত্তমান সমাজে নিয়োগের আবশ্যক নাই, কাযেই আর্য্য ব্যবস্থায় তাহা এখন অধর্ম্ম।

সমাজ সংস্কার ২ বলিয়া একটা গর্জ্জন যখন তখন কর্ণ পটহে আঘাত করে। যাঁহারা এই ভৈরব রবে দেশ এবং তাহার উপরের আকাশ ও তাহার নীচে পাতাল বিদীর্ণ করিতেছেন, তাঁহাদের সমাজ সম্পর্কীয় জ্ঞান, আহার, বিহার ও রোজগার এই তিনটি অবস্থার বহিরে গড়ায় নাই। তাঁহারা আমাদের মত মূর্খকে বুঝাইতে চাহেন যে, এই সমাজ ব্যাপারটা একটা বুদ্বুদ, ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছায় ইহার জন্ম ও মরণ। ইহার পরিচালনভার সংসারিক স্বচ্ছন্দতাযুক্ত কতিপয় ব্যক্তির উপর স্থাপিত।

কেবল হুঙ্কার করিলে কি হইবে, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা হৃদ্‌গত করিতে না পারিলে কি করিয়া সংস্কার হইবে? হিন্দু সমাজ এমন ভাবে গাঁথা আছে ইহার একটি তন্ত্রীতে আঘাত কর, সমগ্র তন্ত্রে আঘাত পড়িবে, পরিণামে এক ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

আজ কাল এক দল হইয়াছে—যাহার ব্যবস্থা ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ উচিৎ নয়। বঙ্গদেশে ১৩ বৎসরে কন্যা জননী হয়েন, এ ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে অন্তত ৩ বৎসর কাল কন্যাকে ঘরে রাখিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে কত গূঢ়সন্তান উৎপন্ন হইবে তাহার একটা হিসাব হওয়া উচিৎ। কেহ হয়ত বলিবেন "কেন মহাশয়, আমাদের কন্যারা সতী সাবিত্রী দময়ন্তী সীতার দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যে আপনারা অনায়াসে নির্ভর করিতে পারেন।"

যিনি সমাজের ক খ পড়িয়াছেন, তিনি উত্তর করিবেন, "আজ্ঞে পারি না, যেখানে চপ কাটলেট আহার, থিয়েটারে বাগানে বিহার—সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের নাম শুনিলে ভয় পাই।"

যদি ব্রহ্মচর্য্য না হয়, তবে অবশ্য রাশি রাশি অজ্ঞাতকুলশীল দৌহিত্র সমাজে দর্শন দিবে। শাস্ত্রে তাহাদের কোন ব্যবস্থা নাই কাহার উত্তরাধিকারী হইবে বা কোন্ গোত্রে যাইবে তাহার কোন ব্যবস্থা স্থির হইল না, অথচ তদ্বিষয়ক পুস্তিকা প্রচার আরম্ভ হইল। কি বলিয়া এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়?

আমরা দেখিলাম, ভীষ্মদেব কুলক্ষয়ে ভ্রাতার বহু বিবাহ এবং নিয়োগ প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন।

রাজা না থাকিলে প্রজা থাকে না। তাহারা কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় সাগরে মগ্ন হয়; রাজবংশ রক্ষা মহাপুণ্যময় কর্ম্ম, কুরুবংশ ধ্বংশ প্রায় হইয়াছে, সন্ততি নাই সুতরাং ভীষ্মদের বিচিত্রবীর্য্যের একাধিক স্ত্রী করিয়া

দিলেন, ইহা ভিন্ন বংশবৃদ্ধির অন্য উপায় ছিল না, যখন সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল তখন শাস্ত্রবিধি অনুসারে ক্ষেত্রজপুত্র ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এখন বোধ হয়, ভীষ্মদেব এই দুষ্কর্ম্মের অপবাদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেও পাইতে পারেন।

পৃথিবীতে যে সকল ব্যাপার মনুষ্যবুদ্ধির চরম পরীক্ষা গ্রহণ করে, তাহার মধ্যে সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রপালন প্রধান। সমাজের দৈহিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি কি উপায়ে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়, তাহার সিদ্ধান্ত যে সে মস্তিষ্কের কম্ম নয়। জগতের ইতিহাসে কত কত সমাজের উৎপত্তি ও লয়ের বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু হিন্দু সমাজের ন্যায় দীর্ঘ আয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি কোন সমাজেই লক্ষিত হয় কি? হিন্দুসমাজ কি ভাবে কীলিত এবং ইহার কেন্দ্রে কত জীবনীশক্তি এবং ধৃতি অর্পিত, তাহা চিন্তা করিলে সমাজ রচয়িতাগণকে প্রণাম না করিয়া থাকা যায় না।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন সভ্যতার দেশ, কতবার সমাজের লয় এবং উৎপত্তি হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। পুরাণাদিতে ধ্বংসের পর কিরূপে সমাজ পুনর্জীবিত হইয়াছে এবং সেই মুমূর্ষু অবস্থায় স্ত্রী এবং পুরুষগণের আচরণ কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা অনেক স্থলে বর্ণিত আছে। ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে কুফল ফলিবে এই আশঙ্কায় সে সকল আপৎ অবস্থার আচরণ আলোচনা এস্থলে যুক্তিযুক্ত নহে, একটু সাবধানতার আশ্রয় লওয়া উচিৎ।*

---

* শিক্ষার দোষে যে বুদ্ধি কত বিকৃত হয় তাহার একটা গল্প আমরা বালক কালে শুনিয়াছিলাম, যথা:—কোন এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তির একটিমাত্র কন্যা ছিল; তাঁহার বড় ইচ্ছা যে বৃদ্ধ বয়সে কন্যা তাহাকে মহাভারত পাঠ করিয়া শুনায়। কন্যা কলেজে পড়েন, শ্রেণীর পর শ্রেণী হইতে প্রশংসার সহিত উন্নিতা হইতেছেন। যথাকালে কন্যা মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুদিন পরে পিতাকে মহাভারত শুনাইবার জন্য প্রস্তুত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভীষ্ম-দ্রোণ সংবাদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—পাণ্ডু রাজা হইলেন, তিনি রাজ্যভার ভীষ্ম, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্রের উপর দিয়া সস্ত্রীক মৃগয়ারত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। পরে তথায় তাঁহার পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হইলেন,—এই পঞ্চপুত্র কাহারা তাহা আর বলিতে হইবে না। কিছুকাল পরে তাঁহার তথায় দেহান্ত হয়।

হিমালয়ে অবস্থিত ঋষিগণ তাঁহার ঐ পঞ্চপুত্র এবং শ্রীমতী কুন্তীদেবীকে হস্তিনাপুরে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছেন,—পাণ্ডবেরা পিতৃহীন হইয়া পিতামহ ভীষ্মের নিকট পালিত হইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ, কুমারগণের শিক্ষার সময় আসিয়া উপস্থিত। ভীষ্মদেব পৌত্রগণের বিশিষ্টরূপ বিদ্যা ও বিনয় শিক্ষার নিমিত্ত ইষু-প্রয়োগ-নিপুণ-অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ বীর্য্যশালী আচার্য্য অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

হইলেন। পিতার আর আনন্দ ধরে না—তিনি বলিলেন, 'মা' মহাভারতে কি উপদেশ পাইলে ?' কন্যা উত্তর করিলেন, "অন্যান্য উপদেশের মধ্যে একটি সামজিক উপদেশ স্পষ্ট বুঝা যায়—সোট এই যে 'এককালে বহু পুরুষ গ্রহণ স্ত্রীলোকের পক্ষে অশাস্ত্রীয় বা নিন্দাকর নহে,।" পিতা অন্য উপদেশ শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই কাশীযাত্রার ব্যবস্থা করিলেন। গল্পটি রুচিবিরুদ্ধ হইলেও শিক্ষাপ্রদ তাই লিখিতে বাধ্য হইলাম।

যিনি উত্তম বুদ্ধিমান্, মহাভাগ, নানাশস্ত্র প্রয়োগে পণ্ডিত ও দেবতুল্য মহাত্মা না হইবেন, তিনি যেন কৌরবগণকে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান না করেন।

"ইম্বস্ত্রজ্ঞান পর্য্যপৃচ্ছদাচার্য্যান বীর্য্যসম্মতান্।
নাল্পধীর্নামহাভাগস্তথানানাস্ত্রকোবিদঃ॥
নাদেবসত্ত্বো বিনয়ে কুরূনস্ত্রে মহাবলান্।

আঃ প ১৩১ অ ১।২

দেবতুল্য শিক্ষক না হইলে তিনি শিক্ষক রাখিবেন না।

এই শিক্ষক নির্ব্বাচনতত্ত্ব ভীষ্মের নিকট সকলের শিক্ষা করা উচিত। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ আমরা একবারে ভুলিয়াছি। যেমন শিক্ষক শিক্ষিতও প্রায় তদ্রূপ হয়েন; আমাদেরও তাহাই হইয়াছে এবং দেশেও তাহাই চলিতেছে,—নহিলে কি এত অধঃপতন হয়।

মানুষ পশুত্ব লইয়া জন্মায়, কিন্তু শিক্ষার গুণে মানুষ হয়। জ্ঞান সকলের বড় পদার্থ; আর সেই পদার্থ গুরু দান করেন,—সুতরাং গুরু অপেক্ষা গুরু পদার্থ জগতে আর কি হইতে পারে।

কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বেই গুরুকে স্মরণ করিতে হয়।

"তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

এই নমস্কারের সহিত সর্ব্বকর্ম্মে ব্রতী হইতে হয়, তবে সিদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়।

গুরু নির্ব্বাচন অতি গুরুতর ব্যাপার। জাতির জীবন গুরুর উপর নির্ভর করে। ক্ষুদ্রচেতা, চরিত্রহীন, নীচবংশোদ্ভূত ও লোভী ব্যক্তিকে কদাচ শিক্ষক নিযুক্ত করিতে নাই। সে গুরুতে ভক্তি হয় না, তাহার নিকট যাইতে নাই।

কেন ভীষ্মদেব উপযুক্ত আচার্য্যের অন্বেষণ করিতেছেন, তাহার কারণ অধিক বলিতে হইবে না, দু চারিটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে বোধ হয়।

অনুকরণই বাল্যকালের শিক্ষা। বালককালে কোমল মতি থাকায় ঘটনা সমূহ অতি শীঘ্রই বালকের চিত্তে অঙ্কিত হইয়া যায়। সেই শৈশবের ছাপ পরিণত-জীবনে মুছিয়া ফেলা যায় না। যুক্তি বিচার বা বিবেক অধিক বয়সে উৎপন্ন হয়, বালককালে যুক্তি দ্বারা কোন কার্য্য বালক নিশ্চয় করে না, সম্মুখে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করে।

আমাদের চিত্তে দুইভাবে ছাপ পড়ে,—এক জ্ঞাতসারে, ২য় অজ্ঞাতসারে। শেষোক্তটি অতি ভয়ানক কারণ: ইহার প্রতিকারের উপায় নাই।

শিক্ষক বালকের নিকট তাঁহার অধিক জ্ঞানশক্তিপ্রযুক্ত আদর্শ মনুষ্য বলিয়া বিবেচিত হয়েন। সুতরাং সে তাঁহাকে ক্রমশঃ অনুকরণ করিবেই করিবে, করেও তাহাই। যদি আমরা এখন বালক হইতে পারিতাম, তবে দেখাইতাম শিক্ষকের নিকট অনুকরণের মাত্রা আমাদের কত অধিক। ফল কথা, শিক্ষকের সমস্ত কার্য্যই বালকের মানসপটে চিত্রিত হইয়া থাকিবে। মনে একবার ছাপ ধরিলে তাহার ধ্বংস হয় না, অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সেই পুরাতন ছাপটি নিহিত শরীর ব্যাধির ন্যায় বলবান হইবে এবং অনুরূপ কর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবে। তাই, হিন্দুরা বলেন, এক জন্মের শিক্ষা অন্য জন্মে প্রকাশ পায়।

শিক্ষকের অপ্রকট চিন্তা এবং ভাব অলক্ষ্যে শিষ্যে উপস্থিত হয়। চিন্তা একটি শক্তি, আকাশে তাহার তরঙ্গ উপস্থিত হয়। যত জোরে চিন্তা হইবে তত জোরে তরঙ্গ উঠিবে। আকাশ অতি সূক্ষ্ম, এবং সর্ব্বব্যাপী, অনায়াসে সেই আকাশে উত্থিত তরঙ্গ সকলকে স্পর্শ করে এবং মনের উপরে আঘাত করিতে থাকে। তারহীন দুরদ্ধন যন্ত্র ঠিক এই ভাবে কার্য্য করে। যাহার মন যত কোমল, তাহার আঘাতও ছাপ তত গভীর হয়। শিক্ষকের পবিত্র চিন্তা বালকের অতি কোমল

মনে দাগ লাগাইয়া দেয়, সেই চিহ্নগুলি পরে কুচিন্তার এবং কার্য্যের বীজ হয়; গ্রামোফনের রেকর্ডে যেমন দাগ ধরে আবার সেই দাগ হইতে পূর্ব্বকার সুর উৎপন্ন হয়, মনেও অবিকল সেইরূপ হয়। যাহারা যোগীর শিষ্য তাঁহারা এ কথাটা অতি শীঘ্রই হৃদঙ্গম করিবেন, সাধারণ লোকে তত শীঘ্র স্বীকার করিবেন না।

এই তত্ত্ব আমাদিগকে শিখাইবার জন্যই শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন ঃ—

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"

বৌদ্ধেরা তাই বলেন "সঙ্ঘ্যং মে শরণং।"

সজ্জনের সাধুচিন্তা আকাশে প্রবল তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া বিশ্বকে সাধুতার দিকে আকর্ষণ করিতেছে; তাই এখনও বিশ্ব রসাতলে যায় নাই। জগৎগুরুগণের মঙ্গল চিন্তাতেই আমরা পশু হইতে মনুষ্য এবং মনুষ্য হইতে দেবতা হইতেছি। চিন্তার অর্থাৎ ধ্যানের এই বিরাট শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াই ঋষিগণ সামাজিক ব্যবস্থা করিয়াছেন। কুচিন্তার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্তই যোগী ভীষ্মের উপযুক্ত আচার্য্য অন্বেষণ।

সৎশিক্ষা পাওয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। ভীষ্মকে পৌত্রগণের শিক্ষকের জন্য অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।

একদিন তাঁহার পৌত্রগণ আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "দাদামহাশয়, একজন বড় অদ্ভুত লোক হস্তিনাপুরে আসিয়াছেন; তিনি শ্যামবর্ণ বৃদ্ধভাবাপন্ন, অগ্নিহোত্র পুরস্কৃত, কৃতাহ্নিক এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ। আমরা নগরের বাহিরে বীটা ক্রীড়া করিতেছিলাম; (বীটা— কন্দুক—গোলা—গেঁড); বীটা হঠাৎ একটা কূপে পতিত হইল, উত্তোলনের কোন উপায় না দেখিয়া আমরা লজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন

সময় ঐ ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন, 'বাপ সকল, এই অঙ্গুরীয়টিও আমি কূপে নিক্ষেপ করিতেছি এবং বীটা ও অঙ্গুরী দুইই কি করিয়া উঠাই দেখ।' তৎপরে তিনি কতকগুলি ইষিকা (তৃণ বিশেষ) মন্ত্রপূত করিয়া কূপে ফেলিয়া দিলেন এবং তদ্দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া বীটা এবং অঙ্গুরী দুই উত্তোলন করিলেন। আমরা তাঁহার বিদ্যা দেখিয়া অবাক হইয়াছি; তিনি ভোজনার্থী।" বিবরণ শুনিয়াই ভীষ্ম বলিলেন, "ইনিই সেই ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ, ইনিই আচার্য্যের উপযুক্ত।" এ সুযোগ অপরিহার্য্য ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে সমাদর সহকারে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"অর্থৈনমানীয় তদা স্বয়মেব সুসৎকৃতং।
পরিপপ্রচ্ছ নিপুণং ভীষ্মঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ॥

দ্রোণ উত্তর করিলেন, দারিদ্র্য তাঁহাকে তথায় আনয়ন করিয়াছে, উপযুক্ত শিষ্যের আশায় তিনি কৌরব রাজ্যে উপস্থিত। ভীষ্ম বলিলেন, "আপনি শরাসন হইতে জ্যা উন্মোচন করুন; এই কুমারগণকে উত্তমরূপ শিক্ষা দিউন, কুরুগৃহে পূজ্যমান হইয়া সুপ্রীতমনে ভোগ্যবস্তু সমুদয় ভোগ করুন, কুরুদিগের এই রাষ্ট্রসমেত রাজ্য ও যে কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, আপনি সমুদয়ের রাজাস্বরূপ হইয়া থাকুন। সমস্ত কৌরবেরা আপনারই হইল—হে ব্রাহ্মণ, আপনার যাহা কিছু প্রার্থিত, তাহা সিদ্ধই হইয়াছে বিবেচনা করুন, আমাদিগের ভাগ্যক্রমেই আপনি মহৎ অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

"অপজ্যং ক্রিয়তাং চাপং সাধ্যস্ত্রং প্রতিপাদয়।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ ভৃশং প্রীতঃ পূজ্যমানঃ কুরুক্ষয়ে॥
কুরূনামস্তি যদ্বিত্তং রাজ্যঞ্চেদং সরাষ্ট্রকং।
ত্বমেব পরমো রাজা সর্ব্বে চ কুরবস্তব॥"

যচ্চ তে প্রার্থিতম্ ব্রহ্মণ কৃতংতদিতি বিজ্ঞতাং।
দিষ্ট্যা প্রাপ্তোসি বিপ্রর্ষে মহানেহ অনুগ্রহকৃতঃ॥

আঃ স ১৩১ অঃ ৭৭।৭৮।৭৯।

আমরা দেবব্রতের বিনয় এবং গুণীর প্রতি সম্মান দেখিয়া আমাদের আত্মাভিমান এবং বৃথা পদগৌরব পরিহার করিতে শিক্ষা করি। যাঁহারা জীবনে কখন কোন অধস্তন রাজকর্ম্মচারীর নিকট প্রয়োজন বশতঃ গিয়াছেন ও তাঁহার ঔদ্ধত্য, ভ্রুকুটি ও অশিষ্টাচারের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন তাঁহারা কৌরবরাজ্যের কর্ণধার, পুরুষসিংহ ভীষ্মের, প্রার্থী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আনয়ন ও তাঁহার প্রতি মনোহর বিনয় বাক্যের প্রয়োগ ও সুজনতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া বিকৃত শিক্ষার পরিণাম অনুভব করুন এই প্রার্থনা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজ বিভাগোপদেশ।

দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের মধ্যে একটা বিষম মনোমালিন্য উৎপন্ন হইয়াছে। ভীমার্জ্জুনের বাহুবল ও পাণ্ডবদিগের সর্ব্বজনপ্রিয়তা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে শঙ্কায় ও মাৎসর্য্যে শতবৃশ্চিক দংশনের যাতনা দিতেছে; তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে, বিশেষতঃ ভীমকে নষ্ট করিবার জন্য বিষপ্রয়োগ, জতুগৃহ প্রভৃতি কত মারাত্মক উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে।

পাণ্ডবেরা ধ্বংস হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা মহারাজ দ্রুপদের কন্যা কৃষ্ণাকে স্বয়ম্বর সভায় অলৌকিক কৌশলে আহরণ করিয়াছেন এবং বিপক্ষ দলকে প্রমথিত করিয়া জয়শ্রীযুক্ত হইয়া পুনরায় হস্তিনাপুরে আসিতেছেন। এখন আর তাঁহারা বালক নহেন,—কৃতাস্ত্র যুবাপুরুষ।

পূর্ব্বে প্রচার হইয়াছিল যে, পাণ্ডবেরা তাঁহাদের জননীর সহিত জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছিলন। কৌরবেরা কণ্টকহীন হইয়াছেন; কিন্তু ফলে তাহা ঘটে নাই। তাঁহারা আসিয়াই রাজ্য প্রার্থনা করিবেন। এখন কর্ত্তব্য কি, এই বিষয়ে উপদেশের জন্য ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি যাহা উত্তর দিলেন, আমরা তাহা উদগ্রীব হইয়া শ্রবণ করি। তিনি বলিলেন "ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণের সহিত বিবাদ করিতে আমার কোন ক্রমেই মত হয় না, কারণ আমার পক্ষে তুমি যেমন পাণ্ডুও সেইরূপ ছিলেন এবং গান্ধারীপুত্রেরা যেমন স্নেহভাজন, কুন্তীপুত্রেরাও তদ্রূপ। আমাকে যেমন তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হয়, তোমাকেও সেইরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহারা আমার যেমন আত্মীয়, রাজা দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরববর্গও তদনুরূপ আত্মীয়; ইহাতে সংশয় নাই। এমত স্থলে তাহাদিগের সহিত বিবাদ করিতে কি প্রকারে অভিরুচি হইতে পারে? রাজন্! সেই বীর-দিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান কর। ইহা সেই কুরূত্তমদিগেরও পৈতৃক রাজ্য।

পুনরায় দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস দুর্য্যোধন! ইহা তোমার পৈতৃক রাজ্য বলিয়া তুমি যেমন বিবেচনা করিতেছ, পাণ্ডবগণও আপনাদিগের পৈতৃক রাজ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। যদ্যপি সেই যশস্বী পাণ্ডবগণ রাজ্যাধিকারী না হয়েন তাহা হইলে তুমি অথবা ভরতবংশীয় অন্য কোন ব্যক্তি রাজ্যাধিকারী হইবে? হে ভারতর্ষভ! যদি এমত বিবেচনা করিয়া থাক যে আমি ধর্ম্মাধিকারে রাজা হইয়াছি,

তাহা হইলে পূর্ব্বেই ধর্ম্মতঃ রাজ্য তাহাদিগের হইয়াছে, অতএব আমার মত এই যে তাহাদিগকে অৰ্দ্ধেক রাজ্য প্রদান কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! ইহা হইলে সকলেরই হিত হইবে। যদি অন্যথা কর, তবে কাহারও মঙ্গল হইবে না এবং তোমার সম্পূর্ণ অপযশ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই! গান্ধারীনন্দন, তুমি কীর্ত্তিরক্ষণে যত্নবান হও, এই ভূমণ্ডলে কীর্ত্তিই পরম বল এবং কীর্ত্তিহীন ব্যক্তির জীবনই বৃথা। হে কৌরব! যে ব্যক্তির যত দিন পর্য্যন্ত কীর্ত্তিবিনাশ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি পরলোক গমন করিলেও জীবিত বলা যায়; এবং কীর্ত্তিবিনাশ হইলে সে জীবন থাকিতেও মৃত বলিয়া কথিত হয়। হে মহারাজ! তুমি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হও এবং স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনুরূপ কার্য্য কর। জানিও, আমাদিগের সৌভাগ্য-ক্রমেই পাণ্ডবগণ ও কুন্তী জীবিত রহিয়াছে। পাপাত্মা পুরোচন যে পূর্ণ-মনোরথ না হইয়া যমভবন গমন করিয়াছে তাহা আমাদিগেরই ভাগ্যবল। আমি যে অবধি শুনিয়াছি যে কুন্তীভোজ-সুতার নন্দনেরা দগ্ধ হইয়াছে সেই অবধি এই ভূমণ্ডলে কাহারও সহিত উত্তমরূপে সাক্ষাৎ করিতে পারি না। হে পুরুষব্যাঘ্র! লোকে কুন্তীকে সেইরূপ অবস্থাপন্ন শ্রবণ করিয়া যেমন তোমাকে দোষী বলিয়া জানে পুরোচনকে তাদৃশ দোষী মনে করে না।

হে মহারাজ! পাণ্ডবদিগের জীবিত থাকা ও তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাওয়া কেবল তোমারই কলঙ্কক্ষয় বিবেচনা করিতে হইবে। হে কুরুনন্দন! সেই সমস্ত বীর জীবিত থাকিতে স্বয়ং মহেন্দ্রও তাহা-দিগের পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন, বিশেষতঃ পাণ্ডবেরা সকলে একচিত্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও তুল্যাধিকার রাজ্যে অধর্ম্ম দ্বারা বঞ্চিত হইতেছে। অতএব যদি তোমার ধর্ম্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়, যদি তুমি আমার প্রিয়কর্ম্ম করিতে অভিলাষ কর এবং যদি তোমার স্বীয়

মঙ্গল প্রার্থনা থাকে তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে অৰ্দ্ধেক রাজ্য প্রদান কর।”

আঃ পঃ ২০৪ অধ্যায়।

কি অপূৰ্ব্ব বাগ্মীতা! ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মমতায় অন্ধ, তাঁহাকে অধিক উপদেশ দেওয়ার আবশ্যক নাই, তাই ভীষ্মদেব তুল্যাধিকারের বিষয় বলিয়াই অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিতে বলিলেন। দুৰ্য্যোধনের যত দোষই থাকুক তাঁহার প্রধান গুণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। যে সকল ব্যক্তি সঙ্কল্প সহজে পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাদিগকে সঙ্কল্প ত্যাগ করাইতে হইলে সঙ্কল্পের প্রগাঢ় দোষ, অশাস্ত্রীয়তা ধৰ্ম্মহীনতা, এবং বিষময় পরিণাম উজ্জ্বল বর্ণে দেখাইতে হয়। ভীষ্ম তাহাই করিয়াছেন!

১ম,— রাজ্যে উভয়ের সমান, বরং অপর পক্ষের অধিক দাওয়া দেখাইলেন। ২য়,—জতুগৃহ দাহহেতু রাজ্যে দুর্য্যোধনের যে অসীম অপযশঃ বিস্তৃত হইয়াছে তাহা শুনাইলেন এবং সেই অপযশঃ ক্ষালনের উপদেশ দিলেন। ৩য়,—ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইতে উপদেশ দিলেন এবং শেষে রাজ্য প্রদান না করিলে তাঁহার পরিণাম কি হইবে তাহা শুনাইলেন। ইহার ফলও হইয়াছিল; দুর্য্যোধন অৰ্দ্ধেক রাজ্য পাণ্ডগণকে প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন! রাজপুরুষের ইহা অপেক্ষা নির্ভীক কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং মঙ্গলময় উপদেশ জগতের ইতিহাসে দ্বিতীয় আছে বলিয়া বোধ হয় না। আধুনিক মন্ত্রীগণের উপদেশ যাহা প্রায়ই পড়া যায় তাহার তুলনায় এই উপদেশ দিব্য।

বৰ্ত্তমান রাজনৈতিকগণ রাজনীতিতে ধৰ্ম্ম থাকিতে পারে, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

সভাপর্ব্ব—অর্ঘ্যাহরণ প্রকরণ।

পাণ্ডবেরা অর্দ্ধেক রাজ্য পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে * রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতি অল্পদিনেই ইন্দ্রপ্রস্থ ভারতের এক প্রধান জনপদে পরিণত হইয়াছে, যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন সহায় হইয়া একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তিনি রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন, সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া সমবেত হইয়াছেন। বঙ্গদেশ হইতে পৌণ্ড্র বাসুদেব উপস্থিত হইয়াছেন।

"পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ বঙ্গ কলিঙ্গকস্তথা।"

সভা ৩৪ অঃ ১১।

কৌরবগণেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে, তাঁহারাও আসিয়াছেন এবং ভাবী সম্রাট যুধিষ্ঠির সকলকে এক এক কর্ম্মে ব্রতী করিয়াছেন। ভক্ষ্যভোজ্যের অধিকারে দুঃশাসণকে, ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যার জন্য অশ্বত্থামাকে, রাজগণের প্রীতিপূজার্থে সঞ্জয়কে নিয়োজিত করিলেন। আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হইল কিনা তাহার পরিজ্ঞান বিষয়ে মহামতি ভীষ্ম

---

* আধুনিক দিল্লীতে এখনও পাণ্ডবদিগের গৃহ বর্ত্তমান, তাহাকে পুরাণ কিল্লা বলে।

ও দ্রোণাচার্য্য থাকিলেন। এই কর্ম্মটি সকল কর্ম্মের অপেক্ষা দুরূহ বিশেষ অপক্ষপাতিত্ব এবং লোকাচার জ্ঞান থাকা চাই।

অনন্তর ভীষ্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে ভরতকুলতিলক! রাজগণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা কর, দেখ আচার্য্য ঋত্বিক সম্বন্ধীস্নাতক মিত্র ও নৃপতি এই ছয় ব্যক্তি অর্ঘ্যদানের যোগ্যপাত্র। পণ্ডিতেরা বলেন, অভ্যাগত হইয়া সম্বৎসর সহবাস করিলেই ইহাদিগকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়; এই ভূপালবৃন্দ বহুকাল আমাদিগের নিকট সমাগত হইয়াছেন অতএব ইহাদিগের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একটি অর্ঘ্য আহরণ কর। পরন্তু ইহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে অগ্রে প্রদান কর।

দেবব্রতের লৌকিকতার পরিচয় আমরা পাইলাম। আজকাল যদি কেহ অর্ঘ্য পায়েন তবে সম্বন্ধী এবং নৃপতি বা তাঁহার কর্ম্মচারীগণ পাইয়া থাকেন। দ্রোণের ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তির অর্ঘ্য পৃষ্ঠদেশেই প্রায় প্রদত্ত হয়।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দাদামহাশয়! এই অসংখ্য রাজগণের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রধান আমি কি করিয়া বুঝিব, আপনি বলুন কাহাকে অর্ঘ্য প্রথম দেওয়া উচিত।"

তখন ভীষ্ম "বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য" বুদ্ধি (শ্রবণ মনন ধ্যানাত্মিকা চেতোবৃত্তি) দ্বারা নিশ্চয় করিয়া বলিলেন, "বাষ্ণের্য়ং মন্যতে কৃষ্ণমর্হনীয়তমং ভুবি" পৃথিবীর ভিতর বৃষ্ণিকুল সমুদ্ভূত কৃষ্ণকেই অর্হনীয়তম নিশ্চয় করিতেছি।"

আরও বলিতে লাগিলেন, "যেমন সমুদয় জ্যোতিঃপুঞ্জ মধ্যে ভাস্কর সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বান, তদ্রূপ ইনি এই রাজগণ মধ্যে তেজ বল ও পরাক্রম-দ্বারা সমধিক প্রভাসমান প্রতীয়মান হইতেছেন।" সূর্য্যহীন প্রদেশে সূর্য্যো-দয় হইলে এবং নির্বাতস্থানে বায়ুসঞ্চার হইলে যেরূপ হয়, কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের এই সভামন্দিরও তদ্রূপ উদ্ভাষিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে।"

ভীষ্মের কথামত শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ্য দেওয়া হইল এবং বিশ্বগুরু তাহা গ্রহণ

করিলেন। রাজসূয় সভায় শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ্য পূজা পরমবৈষ্ণব দেবব্রত কর্ত্তৃক প্রথম স্থাপিত হইল। বুঝিলাম, দেবব্রতের ন্যায় "বুদ্ধি" না থাকিলে তাঁহাকে চেনা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের এ পূজা কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল এবং তাঁহার মত জ্ঞানে শিশু-গণের সহ্য হইল না।

তিনি সভামধ্যে দেবব্রতকে অকথ্য ভাষায় সম্বোধন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনেক নিন্দা করত, দলবল লইয়া সভা ত্যাগ করিলেন। যুধি-ষ্ঠির তাঁহাকে অনেক অনুনয় করিলেন এবং বুঝাইলেন যে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ জানেন আপনি সেরূপ জানেন না, অতএব আপনি কৃষ্ণের অর্চ্চনা সহ্য করুন।

ভীষ্ম শিশুপালের এইরূপ ব্যবহারে কহিতে লাগিলেন,—"সকল লোক-মধ্যে বৃদ্ধতম কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অভিমত না হয় এতাদৃশ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা বা অনুনয় করা অনুচিত। রণকরি শ্রেষ্ঠ যে ক্ষত্রিয় পুরুষ কোন ক্ষত্রিয়কে সমরে পরাজয় পূর্ব্বক বশবর্ত্তী করিয়া পরিত্যাগ করেন তিনি তাঁহার গুরু হয়েন। যদুনন্দনের তেজোপ্রভাবে সংগ্রামে পরাভূত না হইয়াছেন এই রাজসমাজে আমি এমন একজন মহীপালকেও দেখিতে পাই না। এই মহাবাহু অচ্যুত কেবল আমাদিগেরই অর্চ্চনীয় নহেন, ইনি ত্রৈলোক্যেরও প্রধান অর্চ্চনীয়; কারণ অনেকানেক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সমরে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছেন এবং সমগ্র বিশ্বই ইহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব বৃদ্ধবৃন্দ থাকিতেও আমি কৃষ্ণকে অর্চ্চনা এবং অপর সকলকে প্রত্যাখ্যান করিলাম।

"আমি অনেকানেক জ্ঞানবৃদ্ধ লোকের উপাসনা করিয়াছি, সমাগত সেই সমস্ত সজ্জনগণের কথায় প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণ সমূহ শ্রবণ করিয়াছি, অপিচ এই ধীসম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মাবধি যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন,

তৎসমুদয়ের সংকীর্ত্তনও বহুবার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। ওহে চেদিরাজ! সকল ভূমণ্ডলে সাধুগণ সমর্চ্চিত সর্ব্বভূত সুখাবহ জনার্দ্দনকে আমরা সম্বন্ধ কি উপকারের অনুরোধে অর্চ্চনা করি কদাচ মনে করিও না। ইঁহার যশৈশ্বর্য্য ও জন্মবৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানিয়াই আমরা ইঁহাকে পূজা করিয়া থাকি। এই সভামধ্যে অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে বাকি রাখি নাই, পরন্তু গুণবৃদ্ধ মানবগণকে অতি-ক্রম করিয়া হরিই আমাদিগের মতে প্রধান অর্চ্চনীয় হইয়াছেন।

"ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে সমধিক বলশালী, বৈশ্যদিগের মধ্যে প্রচুর ধনধান্যসম্পন্ন এবং শূদ্রদিগের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিই পূজনীয় হয়েন, আর গোবিন্দের পূজ্যতা বিষয়ে বেদবেদান্ত বিজ্ঞান ও অধিক বল এই দুইটি হেতু সমবেত হইয়াছে। দান, দাক্ষিণ্য, শাস্ত্রজ্ঞান শৌর্য্য লজ্জা কীর্ত্তি উত্তমাবুদ্ধি বিনয় শ্রীধৃতি তুষ্টি ও পুষ্টি এই সমস্ত গুণা-বলি কৃষ্ণেতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব হে ভূপালগণ! আপনারা কৃষ্ণের পূজা অনুমোদন করুন।"

পুনরায় বলিতে লাগিলেন "ইনি অব্যক্তা প্রকৃতি কর্ত্তা সনাতন এবং সর্ব্বভূতের অতীত।"

অবশেষে তিনি—"অথবা এই পূজা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া শিশুপালের যদি নিশ্চয় হয় তবে অন্যায় পূজা যাহাতে ন্যায্য হইতে পারে স্বচ্ছন্দে তাহার অনুষ্ঠান করুন।"

এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন। সভা ৩৯ অধ্যায়ঃ।

শিশুপাল ভীষ্মের এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তিনি অন্যান্য রাজ-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া যজ্ঞ ব্যাঘাতের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির একে শান্ত ব্যক্তি, তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তা—তিনি বলিলেন, 'পিতামহ! যাহাতে যজ্ঞ বিঘ্ন না হয় তাহার উপায় করুন।

ভীষ্ম চেদিরাজের এই ব্যবহারে অতিশয় বিরক্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—"তুমি ভয় করিও না. কুকুর কি কখনও সিংহকে বধ করিতে পারে? এ বিষয়ে সুনিশ্চিত শুভ পন্থা আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি। সিংহ প্রসুপ্ত থাকিলে কুকুরেরা যেমন তৎসমীপে যাইয়া সকলে মিলিত হইয়া শব্দ করিতে থাকে এই রাজগণও সেইরূপ গর্জ্জন করিতেছে। সিংহসমীপে কুকুরদিগের ন্যায় এই নৃপতিমণ্ডল প্রসুপ্ত বৃষ্ণিসিংহের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া সাতিশয় রোষভরে চীৎকার করিতেছে। নিদ্রাগত সিংহের ন্যায় অচ্যুত যে পর্য্যন্ত জাগরিত না হইতেছেন, সেই পর্য্যন্তই চেদিপুঙ্গব ইহাদিগকে সিংহ করিয়া তুলিতেছে। অল্পবুদ্ধি শিশুপাল সমুদয় পার্থিবগণকে সর্ব্বথা যমালয়ে লইয়া যাইবার বাসনা করিতেছে। এই দুর্বুদ্ধি চেদিরাজের এবং সমস্ত ভূপাল বর্গেরই বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে,—ফলতঃ এই নরব্যাঘ্র যে যে ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের এইরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয়ই ঘটিয়া থাকে।"

ভীষ্ম তদনন্তর শিশুপালের জন্মবিষয়ক যে কথা প্রচলিত ছিল তাহা সকলকে শুনাইলেন এবং প্রকাশ করিলেন যে এই কুলাঙ্গার শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইবে। "এ আজ আমাকে যে ভাবে অপমান করিয়াছে অন্য কেহ কখন সে ভাবে করিতে সাহসী হয় না!"

শিশুপাল সপ্তমে উঠিয়া ভীষ্মকে এবং শ্রীকৃষ্ণকে বহুতর মর্ম্মস্পর্শী কর্কশ কথা প্রয়োগ করিল এবং শেষে ভীষ্মকে এই বলিয়া সম্বোধন করিল, "রে অধর্ম্মিষ্ঠ, ভূপালগণের ইচ্ছাতেই তুমি জীবিত রহিয়াছ।" ভীষ্ম উত্তর করিলেন, "হাঁ আমি ইহাদের ইচ্ছাতেই জীবিত আছি বটে, কিন্তু এই নরাধিপগণকে আমি তৃণের সঙ্গেও তুলনা করি না।"

একথা শুনিয়া নরপতিরা বলিলেন "বৃদ্ধ হইয়া পাপাত্মা ভীষ্ম গর্ব্ব করিতেছে, অতএব এ অমার্জ্জনীয়। ইহাকে পশুর ন্যায় হত্যা করাই ভাল অথবা ইহাকে শুষ্ক তৃণদ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেল।"

একথা শুনিয়া ভীষ্ম বলিলেন,—“অহে ভূপালগণ! বাক্য শেষ হইবার নহে, উত্তরোত্তর যত কহিবে ততই কথা বাড়িবে, সম্প্রতি আমি যাহা বলিতেছি সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমার পশুবৎ বিনাশই হউক, আর তৃণাগ্নির দ্বারা দাহনই হউক, তোমাদিগের মস্তকে এই সম্পূর্ণ পাদ নিক্ষেপ করিলাম। সত্বসম্পন্ন গোবিন্দের আমরা পূজা করিয়াছি এবং তিনিই উপস্থিত আছেন অতএব মরণের নিমিত্ত যাহার বুদ্ধি ত্বরান্বিতা সে গদাচক্রধর মাধব কৃষ্ণকে অদ্য যুদ্ধার্থে আহ্বান করুক এবং তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইয়া এই দেবের দেহ মধ্যে বিলীন হউক।”

সভাপর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

আমরা দেখিলাম ভীষ্ম কৃষ্ণদ্বেষীকে ক্ষমা করেন না। তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণী কার্য্যে পরিণত হইল, মন্দমতি শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ নিহত হইলেন। রাজগণ একবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞেশ্বরের কৃপায় রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মকৌশলে পুণ্য ইন্দ্রপ্রস্থের মহতী সভাতলে

“নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল”

ভারতে ধর্ম্মময় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। কোটি কণ্ঠে “জয় ভারতের জয়” রবে বিশ্বব্যোম ব্যাপ্ত হইল আর স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর কমলাস্তৃত অঙ্ক হইতে পুরুষসিংহ যোগী দেবব্রত ভীষ্ম মেঘমন্দ্রে প্রচার করিলেন।

“কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং”
কৃষ্ণস্য হিকৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরং
এব প্রকৃতির ব্যক্তা কর্ত্তাচৈব সনাতন॥

কি মহিমাময় দৃশ্য! এস বাঙ্গালি! আমরা বিশ্বেশ্বরকে একমনে প্রণাম করি এবং অন্ধ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হই।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব।

এই অর্ঘ্যাহরণ প্রকরণ ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমূহের সর্ব্ব প্রধান তত্ত্বের প্রচারক কেন তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদবতার এই অধ্যায়ে প্রথম পাওয়া যায়।

বঙ্কিমবাবু এ অধ্যায়ের আলোচনা করিয়াছেন (কৃষ্ণ চরিত্র ৪খণ্ড) এবং তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—শ্রীকৃষ্ণ মৌলিক অর্থাৎ বৈয়াসিক মহাভারতে কখন দেবতা বলিয়া বিবৃত হয়েন নাই, সুতরাং যেস্থানে তাঁহার দেবত্ব প্রতীয়মান হইবে সে অংশ অবৈয়াসিক, আর এই মতের অনুবর্ত্তী হওয়াতে তাঁহাকে গীতা ও মহাভারত প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইয়াছে—কারণ তথায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান রূপে প্রচারিত। প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রশ্ন করিরাছেন যে, কোন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হয়েন—তাঁহার জীবিতাবস্থায় কি পরে? তিনি লিখিয়াছেন যে "দেখিতে পাই বটে যে এই শিশুপাল বধে এবং তৎপরবর্ত্তী মহাভারতর অন্যান্যাংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু এমনও হইতে পারে যে ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।" শিশুপালবধ পর্ব্ব বৈয়াসিক কিনা তাহার প্রমাণ অন্বেষণ করিয়া তিনি বলিতেছেন "পাণ্ডব সভায় কৃষ্ণের হস্তে তাঁহার (শিশুপালের) মৃত্যু হইয়াছিল ইহার বিরোধী কোন কথা পাই না। অনুক্রমণিকায় এবং পর্ব্ব সংগ্রহাধ্যায়ে শিশুপাল বধের কথা আছে, আর রচনা প্রণালী দেখিলেও শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই বোধ হয়। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের

ন্যায় নাটকাংশে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ আছে অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি না।”

আমরা এপর্য্যন্ত তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন “তা না পারি কিন্তু ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যেমন জরাসন্ধ পর্ব্বাধ্যায়ে দুই হাতের কারিগিরি দেখিয়াছি ইহাতেও সেই রকম; বরং জরাসন্ধ বধ অপেক্ষা সে বৈচিত্র শিশুপালবধে বেশী। অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে শিশুপালবধ স্থূলত, মৌলিক বটে কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অন্য পরবর্ত্তী লেখকের অনেক হাত আছে।”

এ সিদ্ধান্তে তিনি কেন আসিতে বাধ্য তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের মূল শিকড় কৃষ্ণের মনুষ্যত্ব, এ অধ্যায়টি মৌলিক স্বীকার করিলে সে শিকড়টি একবারে ছিঁড়িয়া যায়, কাযেই তিনি বাধ্য।

আমরা এখন বঙ্কিমবাবুর উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করি। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বররূপে পূজিত হইয়াছেন এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। বঙ্কিম-বাবু বলেন, ব্যাসের মহাভারতে তিনি ঈশ্বর বলিয়া প্রদর্শিত হয়েন নাই। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্যাসের মহাভারত জন্মেঞ্জয়ের সত্রে পাঠ হইয়াছিল। তাহা হইলে সে সময় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব ভারতে প্রচার ছিল না। জন্মেঞ্জয় ন্যূনকল্পে কৃষ্ণের তিরোভাবের ৫৬ বৎসর পরে সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তবে কে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিল? ব্যাস করেন নাই, ভীষ্ম করেন নাই, ভগবান কপিলের পরে ব্যাসের ন্য জ্ঞানবান সন্তান ভারত জননীর আর কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। বেদান্ত দর্শন তাঁহারই সৃষ্ট, তিনিই বাদরায়ন নামে পরিচিত। তিনি পরম যোগী এবং কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ছিল। হয়, যদি কৃষ্ণে দেবত্ব ছিল

তা হইলে তাঁহারই জানিবার কথা নহে কি? অথচ, তিনি তাহার অদ্ভুত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র বলিলেন। আমরাও তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে তাহা হইলে হয় শ্রীকৃষ্ণে দেবত্ব ছিল না, না হয় ব্যাস তাঁহাকে দেবতা জানিয়াও তাঁহাকে মনুষ্যরূপে প্রকাশ করিলেন।

আর এককথা—যে সমস্ত গ্রন্থে কৃষ্ণ জীবনী উল্লিখিত আছে তাহার মধ্যে মহাভারত প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ নাই, না থাকিবারই কথা। কারণ তাঁহার জীবদ্দশাতেই মহাভারত প্রচারিত। হরিবংশে এবং বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে, সুতরাং তাহারা মহাভারতের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। হরিবংশ ব্যাসের লেখা বলিয়া প্রচলিত, বিষ্ণুপুরাণ তাঁহার পিতা পরাশরের কথিত। হরিবংশ ব্যাসের লেখা হইলে ব্যাস ত কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন, তবে মহাভারতে কৃষ্ণের দেবত্ব পাইয়া সে অংশকে অবৈয়াসিক কি করিয়া বলিব? হরিবংশকার যদি অন্য কেহ হয়েন, তা হইলে যে উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা বলিয়াছেন সে উপাদানের অধিকাংশই ব্যাসের লিখিত অথচ ব্যাস সে উপকরণ গুলিকে দেবত্ববাচক মনে করেন নাই, হরিবংশকার পরবর্ত্তী গ্রন্থকার হইয়া তাহাতে দৈবচিহ্ন কোথায় পাইলেন?

বিষ্ণুপুরাণ ব্যাসের পিতা ঋষি পরাশরের কহিত। তিনিও যোগী এবং শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক ব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব তিনি প্রচার করিয়াছেন। তিনি কি কখন তাঁহার পুত্রকে বলেন নাই যে, "দেখ দ্বৈপায়ন, শ্রীকৃষ্ণে ভগবৎ-বিভূতি আছে তুমি যে তোমার গ্রন্থে তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রচার করিলে না এটি তোমার প্রকাণ্ড ভুল হইয়াছে।" পিতা পুত্রে নিশ্চয়ই একটা বিবাদ হইয়াছিল, কারণ বিষয় বড় গুরুতর।

আর যদি বিষ্ণুপুরাণ পরাশরের কথিত না হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণ-

কার কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিলেন। বলিতে পারেন তাঁহার লীলাপাঠে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু লীলা ত ব্যাসই প্রথম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক প্রমাণের উপর দুই সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে। আজকাল এরূপ প্রায়ই হয়। যাহা হউক, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সন্দেহযুক্ত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের দেবত্বে ত মতদ্বৈধ নাই। বঙ্কিমবাবু স্বয়ং তাঁহাকে জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন।

দশের কথায় ভগবান্ ভূত হইয়াছেন শুনা যায় কিন্তু একটা ভূত ভগবান হইয়াছেন শুনা যায় না। কোন একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তবে তিনি দেবতারূপে গৃহীত হইয়াছেন। একটি মনুষ্যকে ঈশ্বরে পরিণত করা কি সম্ভব? ঈশ্বরজ্ঞ ভিন্ন ঈশ্বরকে প্রচার করিতে পারে কি? ভগবদৈশ্বর্য্য প্রথম হইতেই প্রকাশ পায়, পুস্তক পড়িয়া ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি করিতে হয় না।

ভগবান শাক্যমুণি নিজে বলিলেন বুদ্ধ, জগৎ তাঁহাকে বুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিল। শ্রীচৈতন্য জীবিতাবস্থাতেই ভগবদবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বেলায় অন্যরূপ হইবে কেন?

এখন বিচার করা যাক্—ব্যাস কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন কি না।

অনুক্রমণিকাধ্যায়ে যাহাকে বঙ্কিমবাবু মৌলিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে স্থিত। যদি ইহাতে কৃষ্ণের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রমাণ পাই, তবে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন হইবে না। ইহাতে আছে,—

"যদাশ্রৌষং নরনারায়ণৌ।
তৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ বদনে নারদস্য॥
অহং দ্রষ্টা ব্রহ্মলোকে চ সম্যক
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥ ১।৪

"যখন নারদমুখে শুনিলাম কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নরনারায়ণের অবতার,

তাহাদিগকে তিনি ব্রহ্মলোকে উত্তমরূপে দেখিয়াছেন—হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।"

"যদাশ্রৌষং কর্ণ দুর্য্যোধনাভ্যাং বুদ্ধিং
কৃতাং নিগ্রহস্য কেশবস্য।
তদাত্মানং বহুধা দর্শায়নং তদা
নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম, যে কর্ণ এবং দুর্য্যোধন কৃষ্ণের নিগ্রহ করাতে তিনি তাহাদিগকে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন, তখন হে সঞ্জয়! আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং কশ্মলে নাভিপন্নে রথোপস্থে
সীদমানে অর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকনে বহুধা দর্শয়ানং শরীরে তদা
নাশংসে বিজয়ায়॥

যখন শুনিলাম, রথস্থ অর্জ্জুন মহাভিভূত ও অবসন্ন হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে স্বশরীরে লোক সকল দর্শন করাইয়াছেন তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

গীতাতেও তাহাই রহিয়াছে।

অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং
শশীসূর্য্য নেত্রং।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হুতাষণক্তং
স্ব তেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং॥
দ্যাবা পৃথিব্যোরিবদমন্তরং হি ব্যাপ্তং
ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ॥
দৃষ্টাদ্ভূতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং
প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ১১, ১৮, ১৯, ২০॥

আর সন্দেহের কারণ নাই— ব্যাস কৃষ্ণকে ঈশ্বর নিজেই বলিতেছেন। অতএব কৃষ্ণের দেবত্ববাদ বৈয়াসিক তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি কেহ কৃষ্ণকে চিনিবার শক্তি রাখিতেন, তাহা হইলে ব্যাস ভীষ্ম প্রভৃতি ব্যক্তিই রাখিতেন।

তাই নবীনচন্দ্র ভীষ্মের কথায় প্রতিধ্বনি করিয়া দুজ্ঞে্র্য় মানব বলিয়াছেন।

আশৈশব চিত্রখানি মত করিলাম
অধ্যয়ন, তোমার ঘটনাপূর্ণ বিচিত্র জীবন।

ভীষ্মের ভীষ্মত্ব কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের উপর নির্ভর আছে। দেবব্রতের কৃষ্ণভক্তিই তাঁহার দেবাতীত চরিত্রের প্রধান উপকরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্যুত প্রকরণ।

রাজসূয় যজ্ঞের পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গিয়াছেন, এদিকে যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় সমস্ত রাজ্যধন হারাইয়াছেন। পাশার নেশা এত প্রবল যে অবশেষে সম্রাজ্ঞী দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন।

দুঃশাসন দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় তাঁহাকে সেই গুরুজনপূর্ণসভায় বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত। কৃষ্ণার আর ভয়ের সীমা নাই, তাই তিনি জানিতে চাহিলেন যে, তিনি বাস্তবিক পরাজিতা কি না?

ভীষ্ম বলিলেন, "হে সুভগে! অস্বতন্ত্র ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না। অথচ পত্নীর উপরেও ভর্ত্তার প্রভুত্ব আছে,—ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত তোমার এই প্রশ্নের যথার্থ বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। দেখ, যুধিষ্ঠির সমৃদ্ধিসম্পন্না অখিল বসুন্ধরা ত্যাগ

করিতে পারেন তথাপি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে পারেন না—ইনি স্বয়ং বলিয়াছেন আমি পরাজিত হইলাম তন্নিমিত্ত আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছি না।

কি সুন্দর উত্তর। দ্রৌপদী পরাজিতা, ভীষ্ম তাহাই বলিলেন অপ্রিয় কথা বলা ভাল নয় "সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" সাধুরা কাহার প্রাণে কষ্ট দেন না; তাই তিনি বলিলেন যে, তিনি উত্তর দিতে পারিলেন না।

পুনরায় ভীষ্ম জিজ্ঞাসিত হইয়া আবার সেই কথাই বলিলেন, "হে কল্যাণি, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মের পরমাগতি লোক মধ্যে মহাত্মা বিজ্ঞ মানবেরাও জানিতে পারেন না। সম্প্রতি তোমার এই প্রশ্ন বিষয়ে যুধিষ্ঠির প্রমাণ। তুমি পরাজিতা কি অজিতা তাহা উনিই ব্যক্ত করুন।

দেবব্রত এইবার অপ্রিয় বাক্য বলা হইতে নিস্তার পাইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস স্বীকার করিয়া বনগমন করিলেন। এই দুস্তর অরণ্যপর্ব্বে আমরা ভীষ্মের সাক্ষাৎ পাই না,—কেবল একদিন একটা কথা শুনা যায়, দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ চিত্ররথ গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সপরিবারে বন্দী হইয়াছেন, তখন দ্বৈতবনেস্থিত পাণ্ডবগণ যাইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। ভীষ্ম একথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন "দেখ কর্ণ কি শকুনি ইহাদের উপর নির্ভর করিও না। আমি বলি তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর তবেই একুলের মঙ্গল।"

ভীষ্ম দিব্যচক্ষে দেখিতেছিলেন, এই ভ্রাতৃবিরোধে কুলোচ্ছেদ হইবে যে কুলের জন্য তাঁহার এত চেষ্টা তাহা এই কুরুগণ হইতে উৎসন্ন হইবে।

বনপর্ব্বে ভীষ্মের কথা অধিক কিছুই নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোহরণ প্রকরণ।

পাণ্ডবদিগের সেই প্রতিজ্ঞাত ত্রয়োদশবর্ষ শেষ হইয়া আসিয়াছে। কৌরবদিগের গুপ্তচরেরা তাঁহাদের বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও সন্ধান করিতে পারিল না, তখন অনেকেই ভাবিলেন যে তাঁহারা একবারে বিনষ্ট হইয়াছেন, যাঁহার যে রকম বুদ্ধি, তিনি সেই রকম সিদ্ধান্ত করিলেন। দুঃশাসন বলিলেন তাঁহাদিগকে বোধ হয় ব্যাঘ্রে ভোজন করিয়াছে, না হয় রাজ্যহীন হইয়া তাহারা পলাইয়াছে।

দুর্য্যোধন এ কথায় কিন্তু আস্থা করিতে পারিলেন না। কর্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, "অপর চরগণ অশেষ জনপদাকীর্ণ প্রধান প্রধান দেশ নিচয়ে অবিলম্বে গমন করুক, তত্রত্য যাবতীয় সমস্ত যতিদিগের আশ্রমে রাজপুর তীর্থ ও আকর সমুদয়ে বিচরণ করুক।"

দ্রোণ বলিলেন যে, পাণ্ডবদিগের বিনাশের কথাটা অবিশ্বাস্য, তবে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বাহির করা কর্ত্তব্য। অতঃপর শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন দেশকালজ্ঞ কুরু পিতামহ দ্রোণের বাক্য যথার্থ স্বীকার করিয়া বলিলেন "এই পাণ্ডবেরা মহাপুরুষ মহাসত্ত্ববন্ত কালজ্ঞ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কেশবানুগত সুতরাং কোন ক্রমে অবসন্ন হইবার নহেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে ধর্ম্ম প্রভাবে ও স্বভুজ বলে পরিরক্ষিত হইয়া তাঁহারা সাধুগণের চিরভাব বহন করত প্রতিজ্ঞাত সময় পালন

করিতেছেন, কদাচ বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন নাই।" অতএব যথার্থ কথা বলিতে হইলে অপর লোকেরা এই ত্রয়োদশ বর্ষে ধর্ম্মরাজের যেরূপ নিবাস স্থির করিতেছে, আমি তাহা স্বীকার করি না। যে নগরে বা জনপদে যুধিষ্ঠির বাস করিবেন তত্রত্য রাজাদিগের কোন অকল্যাণ ঘটিবার সম্ভবনা থাকিবে না। এই ত্রয়োদশ বর্ষে পাণ্ডবেরা যে দেশে অবস্থিতি করিতেছেন তত্রত্য দ্বিজাতি সমস্ত নিরন্তর স্ব স্ব ধর্ম্মসেবায় তৎপর থাকিবেন এবং অন্যান্য শ্রীসকল সেই দেশে থাকিবে। অতএব তিনি যে পূর্ব্বোক্ত গুণ সমূহ সমন্বিত কোন প্রদেশে যত্ন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন-ভাবে নিবসতি করিতেছেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার গতিবিধি হইতেছে এতদ্ভিন্ন আমি অন্য কথা বলিতে উৎসাহী হইতে পারি না।"

আমরা কিছু পরেই দেখিব পিতামহের কথাই যথার্থ। পাণ্ডবেরা যে সকল গুণোপেত, তাহাতে তাঁহারা যে রমণীয় স্থানে বা একবারে নির্জ্জন স্থানে যে স্থলে পরহিতের কোন সম্ভাবনা নাই, অথবা খনি সমূহে প্রাকৃত জনের মধ্যে থাকিবেন, এ কথা অশেষ লোক চরিত্র রহস্যজ্ঞ ভীষ্ম কখন স্বীকার করিতে পারেন না। আমরা ক্রমশঃ দেখিব তাঁহার মানুষ চিনিবার ক্ষমতা অসাধারণ। দেখিয়াছি তিনি দ্রোণকে কি করিয়া জানিলেন, রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে কেমন চিনিয়াছেন পরে আরও দেখিব তাঁহার এ শক্তি কত অনুশীলিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গোহরণ যুদ্ধ ও ভীষ্মের পরাভব।

ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা মহারাজ দুর্য্যোধনের বন্ধু তিনি পূর্ব্বে বিরাট রাজের শ্যালক এবং সেনাপতি কীচকের নিকট বহুবার পরাজিত হইয়া

মন কষ্টে কাল যাপন করিতেছেন। প্রকাশ পাইল যে সেই কীচক নিহত হইয়াছে; তখন পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া এবং অবসর বুঝিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন যদি আপনি এবং কর্ণ সাহায্য করেন তবে আমরা বিরাটের সমৃদ্ধশালী রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া ধন-রত্ন-গো অপহরণ করি।

কর্ণ বলিলেন, "অর্থবল ও পৌরুষহীন পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধানে আর প্রয়োজন কি, তাহারা চিরকালের নিমিত্ত নিরুদ্দিষ্ট কিম্বা শমন ভবনের আশ্রিত হইয়া থাকিবে।"

দুর্য্যোধন স্বীকার করিলেন এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা শকুনি প্রভৃতিকে মৎস্যরাজের গো গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা পটুতার সহিত গোবারগণকে বিমর্দিত করিয়া ৬০ হাজার উৎকৃষ্ট গো সকল করায়ত্ত করিলেন।

না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই, ঘটনাও সেইরূপ ঘটিল। গো গ্রহণের কিছু কাল পরে সকলে দেখিল যে, রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে নামিয়া একজন পলাইতেছে আর একজন বিচিত্র ক্লীব বেশধারী তাহার পশ্চাৎ তাহাকে ধরিবার জন্য দৌড়িতেছে। সাধারণ সৈনিকেরা ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে লাগিল, কিন্তু সেনাপতিদের একটা বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইল, তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ছদ্মবেশধারী ব্যক্তি কে, কি অভিপ্রায়েই বা পলায়মান ব্যক্তির দিকে বেগে ধাবিত হইতেছে।"

আকারও বেশ দৃষ্টে ইহাকে ক্লীব বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে অর্জ্জুনের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। দেখ সেই মস্তক, সেই গ্রীবা, সেই পরিঘ তুল্য বাহুদ্বয় এবং গমনের ভঙ্গীও অবিকল সেইরূপ। বোধ হয় ক্লীবরূপধারী অর্জ্জুন হইবেন।"

ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি তাঁহাকে পার্থ মনে করিয়া শঙ্কাযুক্ত হইলেন, চিন্তা

করিলেন একটা বড় গুরুতর ব্যাপারই হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। হইলও তাই।

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।

সন্দেহ ক্রমশঃ নিঃসন্দেহের দিকে চলিয়াছে, দেখিতে দেখিতে সেই রথের উপরে পূর্ব্বপরিচিত "সিংহলাঙ্গুলযুক্ত কাঞ্চনময় বানরধ্বজ" পত পত উড়িতে লাগিল লাগিল, ঐ শুন সেই "দ্বিষতাং লোমহর্ষণং" দেবদত্ত শঙ্খের মহানিঃস্বন পুনরায় ঐ শুন সেই অরিগণ অসহনীয় গাণ্ডীব টঙ্কার, আর সন্দেহ নাই, উনি কে। দ্রোণ অর্জ্জুনের প্রশংসা করিয়া ভবিষ্যৎ পরাভবের আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন; এ নিমিত্ত দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধন ইঁহাদের মধ্যে একটা বিবাদ উপস্থিত হইল। শ্রাদ্ধ গড়াইবার উপক্রম দেখিয়া ভীষ্ম কহিলেন, "কর্ণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধাভিলাষ করিতেছেন, আচার্য্যের প্রতি দোষারোপ করা কোন বিজ্ঞলোকেরই কর্ত্তব্য নয়; তবে আমার বিবেচনায় দেশ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করা উচিত।" তৎপরে দ্রোণ এবং অশ্বত্থামাকে এই বলিয়া তুষ্ট করিলেন, বেদবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা পৃথক পৃথক আচার্য্যেই দৃষ্ট হয় কিন্তু এই দুই বিদ্যা উভয় ব্যক্তিতে সমাবেশ হইয়াছে, দেখুন সংপ্রতি মহৎকার্য্য উপস্থিত, ধনঞ্জয় যুদ্ধার্থ উপনীত হইয়াছেন। অতএব এখন গৃহবিবাদের সময় নয়" দুর্য্যোধন দ্রোণের নিকট ক্ষমা চাহিলেন, বিবাদ মিটিয়া গেল।

এত কর্ম্মকৌশল না থাকিলে কি দলপতি হওয়া যায়। বিবাদ করান বড় সহজ, কিন্তু ভঞ্জন করা বড় কঠিন, নিরপেক্ষতা এবং শীতল মস্তিষ্ক ব্যতীত হয় না।

এদিকে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা—ত এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া দুর্য্যোধনের সন্দেহ হইল। পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাস স্বীকার

করিতে হইবে এই পণ ছিল। সুতরাং তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ ভীষ্মকে আদেশ করিলেন, আপনি গণিয়া বলুন, পার্থ পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়াছেন কিনা?

ভীষ্ম এই ভাবে গণনা করিলেন, "কালচক্রে কলাকাষ্ঠা মুহূর্ত্ত দিবা রাত্রি পক্ষমাস ঋতু বর্ষ গ্রহ নক্ষত্র সকল যোজিত আছে। এইরূপ কাল বিভাগ দ্বারা কালচক্র পরিবর্ত্তন হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্য কর্ত্তৃক লঙ্ঘন প্রযুক্ত প্রতি পঞ্চম বর্ষে দুই মাস করিয়া অধিক হইয়া উঠে, এই প্রকার গণনায় ত্রয়োদশ বর্ষে পঞ্চমাস, দ্বাদশ রাত্রি অধিক হওয়ায় আমার বিবেচনায় পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞা—ত সময় সম্পূর্ণ প্রতিপালিত হইয়াছে।" এই গণনা চান্দ্রমাস অনুসারে হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ গ্রীষ্মে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন সৌরগণনায় বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত প্রত্যাশা করিতেছিলেন। দ্যূত দশমীতে পাশাক্রীড়া হইয়াছিল।

বিরাটপর্ব্ব—৫১ অধ্যায়।

কিছুক্ষণ পরে ভীষ্ম ব্যূহ বদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীষণ যুদ্ধ, ভীষ্মাৰ্জ্জুনের অমানুষিক শর সন্ধান এবং রণচাতুর্য্য দেখিয়া দেবগণ এবং ইন্দ্র তাঁহাদের উপর রাশি রাশি পুষ্প বর্ষণ করিলেন।

ধনঞ্জয় আজ অনিবার্য্য, তাঁহার হস্তলাঘব এবং বহুদিন ন্যস্ত শস্ত্র বৃদ্ধ দেবব্রতকে ক্ষণকালের জন্য পরাভূত করিল। অজেয় ভীষ্ম অদ্য পরাভূত হইলেন। সারথি তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিল, তিনি ব্যথিত হইয়া কিছুকাল রথের উপর যুগবন্ধ ধরিয়া উপবেশন করিলেন।

"স পীড়িতো মহাবাহুর্গৃহীত্বা রথকুবরং।
গাঙ্গেয় যুদ্ধ দুর্দ্ধর্ষ তস্থৌদীর্ঘামিবাতুরঃ॥"

এই অবকাশে অর্জ্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র ত্যাগ করিলেন, সে অস্ত্রের মোহিনী শক্তিতে এক ভীষ্ম ব্যতীত আর সকলেই "বিসংজ্ঞ" হইলেন। গাঙ্গেয় এ অস্ত্রের প্রতিষেধ জানিতেন।

সমস্ত কুরু সেনাপতিগণ হতচেতন হইয়াছিলেন। ভীষ্ম অর্জ্জুনকে পুনরাক্রমণ করিলেন, অর্জ্জুনও তাঁহার হয় চতুষ্টয়কে নিহত করিয়া কুরু ব্যূহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দুর্য্যোধন সংজ্ঞালাভ করিয়া এবং অর্জ্জুনকে ব্যূহমুক্ত দেখিয়া ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতামহ আপনার হস্ত হইতে ধনঞ্জয় কিরূপে পরিত্রাণ পাইল ? এখনও উহাকে এরূপ প্রমথিত করুন, যাহাতে ও মুক্ত হইতে না পারে।"

ভীষ্ম হাস্য করিয়া বলিলেন,——

"ক্বতে গতা বুদ্ধি রভূৎ ক্ববীর্য্যং।"

তোমার এ বুদ্ধি এবং বীর্য্য এতক্ষণ কোথায় ছিল ভাই ?

"অর্জ্জুনের উদার চিত্ত কখনও পাপ বিষয়ে রত হয় না, সুতরাং তিনি কখন নিষ্ঠুর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না, অধিক আর কি বলিব ত্রৈলোক্য রাজ্যের নিমিত্তও তিনি কখন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন না,—"তস্মান্ন সর্ব্বে নিহতা রণে অস্মিন" এই জন্যই আমরা সকলেই এই যুদ্ধে নিহত হই নই।

"যাহা হউক এখন আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই হস্তিনাপুরমুখে গমন কর এবং পার্থও জয়লব্ধ গোধন লইয়া প্রতিগমন করুক।"

বিরাট পর্ব্ব,—৬৬ অধ্যায়।

এই গোহরণ পর্ব্বে ভীষ্ম পরাজয় মহাকবির চরিত্র সৃষ্টির এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। ভীষ্মকে তিনি পরাজিত দেখান নাই, তিনি সর্ব্বজয়ী তাহাই জগৎকে দেখাইলেন। গাঙ্গেয় চিরদিনই জয়যুক্ত, জয়ের অবস্থায় মানব চিত্ত কিরূপ থাকে তাহা আমরা জানি এবং দেখিয়াছি, কিন্তু যখন

পরাজয় হয় তখন চিত্তের কি অবস্থা হয়, তাহাও আমরা জানি, এবং প্রত্যহই জয় পরাজয়ের উৎসে ও অবসাদে মানুষ কিরূপ ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হয় তাহাও আমরা বিশেষ অবগত আছি।

সকলেই পরাভবে অর্থাৎ সঙ্কল্প অসিদ্ধিতে ক্ষুণ্ণ, দীন হিংসাপর বিপক্ষের নিন্দাকারী ও প্রশংসায় অসহিষ্ণু হয়। শারীরিক অসুস্থতা অমনোযোগ শস্ত্রাদির দোষ মধ্যস্থের অনিরপক্ষতা ইত্যাদি বহু প্রকার পরাভব লঘুকরণের উপায় প্রদর্শন করা হয়। পরাজয় স্বীকার করিতে হৃদপিণ্ড ছিন্ন হইয়া যায়।

চিরজয়ী ভীষ্ম আজ পরাজিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তের উপরি উক্ত কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই অজয়ের পরই তাঁহাকে দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন, অর্জ্জুন এখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত যে? তিনি জেতা অর্জ্জুনের বহু প্রশংসা করিলেন এবং "প্রহাস্য" দুর্য্যোধনকে উত্তর দিলেন, দেখ অর্জ্জুন নিষ্ঠুর নহেন বলিয়াই আমরা রক্ষা পাইয়াছি। আত্মশক্তি অক্ষুণ্ণ দর্শাইবার কোন চেষ্টাই তাঁহাতে নাই।

তিনি পুনরায় উদ্যোগ পর্ব্বে এই পরাভবের কথা উল্লেখ করিয়া কর্ণকে ভর্ৎসনা করিতেছেন।

"কিমুরাধেয় বাচাতে কর্ম্ম তৎ স্মর্ত্তুমর্হসি
এক এব যদা পার্থ ষড়্ রথান্ জিতবান যুধি॥"

কি হে রাধেয়, অর্জ্জুন একাকীই যে ষড়রথীকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সে কথাটা কি স্মরণ হয় না।

উঃ প—২১—অঃ—১৫।

ভীষ্মের হার জিতে মান অপমান নাই, জয় অজয় তাঁহার পক্ষে দুই সমান সুখ বা দুঃখ উভয়ই তাঁহার তুল্য। তিনি যে শিখিয়াছেন,——

"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা
লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুয্যস্ব
নৈবং পাপ মবাপ্সাসি॥" গীতা

কবি এই ক্ষুদ্র পরাজয় দ্বারা কি নিরুপম চিত্ত সংযম প্রকাশ করিয়াছেন। দেবব্রতের চিত্তচক্রের অধস্তল পর্য্যন্ত কিরূপ মার্জ্জিত, তাহা এই সামান্য ঘটনা হইতে দেখিতে পাইতেছি। ভাবী যুদ্ধে ভীষ্মার্জ্জুনের যে অশ্রুতপূর্ব্ব সংগ্রাম হইবে এবং অর্জ্জুন তাহাতে জয়ী হইবেন তাহার আভাসও কবি আমাদিগকে প্রদান করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উদ্যোগপর্ব্ব।

পুরোহিত প্রতি ভীষ্মবাক্য।

গোহরণ যুদ্ধের পর বিরাট দুহিতা উত্তরা দেবীর সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হইয়াছে। পাণ্ডবগণ বিরাটের উপপ্লব্য নামক নগরীতে অবস্থান করিতেছেন এবং মহাযুদ্ধের আয়োজন হইতেছে, আয়োজন হইলেও তাঁহারা সন্ধির প্রার্থী। আপনাদিগের অর্দ্ধেক রাজ্য পাইলেই সন্তুষ্ট হয়েন। তাই তাঁহারা মীমাংসার জন্য দ্রুপদরাজের পুরোহিতকে কৌরবদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

পুরোহিত হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া এই মর্ম্মে তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন যে, দেখুন কৌরবগণও যেমন পৈতৃক রাজ্যে অধিকারী পাণ্ডবেরাও তেমনই; উদ্যোগ যেমন কৌরবেরা করিয়াছেন, পাণ্ডবেরাও প্রায় সেইরূপ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ধনঞ্জয় এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধ না হওয়াই ভাল; অর্দ্ধেক রাজ্য প্রত্যর্পণ করুন।”

ভীষ্ম ব্রাহ্মণের বহুতর সম্মান করিয়া বলিলেন “কুরুনন্দন পাণ্ডবেরা যে দামোদরের সহিত কুশলী আছেন, ধর্ম্মে নিশ্চল রহিয়াছেন এবং

বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা না করিয়া সন্ধি করণে অভিলাষী হইয়াছেন ইহা পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়।”

এই কথা এবং অর্জ্জুনের প্রশংসা শুনিয়া কর্ণ বলিলেন, “ও সব কথা রাখিয়া দিন রাজ্য প্রত্যর্পণ কখনই হইবে না।”

কর্ণের আত্মশ্লাঘা এবং কর্কশ বাক্য শুনিয়া দেবব্রত বলিলেন: “ওহে রাধেয়, কেবল কথায় কি হইবে? একাকী অর্জ্জুন যখন ছয়জন রথীকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত কর্ম্মটি একবার স্মরণ কর। যদি এই ব্রাহ্মণের কথা না শুনি তবে পার্থশরে সমরশায়ী হইয়া অবশ্যই পাংশু ভক্ষণ করিব সন্দেহ নাই।”

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিণাম ভীষ্ম তাঁহার অতি দূরদৃষ্টি দ্বারা পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

যুদ্ধের বিপক্ষে ভীষ্মের দৃঢ়মত; যাহাতে এ যুদ্ধ না হয় সততই তাঁহার সেই চেষ্টা এবং তাঁহার সকল উপদেশই এই কুলক্ষয়কারী সংগ্রামের বিরুদ্ধে।

কর্ণ সর্ব্বদাই এই যুদ্ধের উৎসাহী এবং যাহাতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার পরামর্শ দুর্য্যোধনকে অহরহ প্রদান করেন। বাস্তবিক এই মহাসমরের মূলই কর্ণ, একদিন ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে এই যুদ্ধের পরিণাম বিষয়ক উপদেশ দিতেছেন এবং বলিতেছেন যে যদি আমার কথা না শ্রবণ কর, তাহা হইলে অসংখ্য স্বজনগণকে নিহত শ্রবণ করিবে। তুমি সূতপুত্র কর্ণের এবং অন্যান্য দুর্ম্মতি আত্মীয়গণের কথায় অবস্থিত আছ। তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না।

এ কথা শুনিয়া কর্ণ ভীষ্মকে আত্মশ্লাঘাপূর্ণ কিঞ্চিৎ কটু কথা শুনাইয়া দিলেন। তাহাতে ভীষ্ম উত্তর করিলেন যে, কর্ণ পাণ্ডবদিগকে বধ করিব বলিয়া নিত্যই শ্লাঘা করে কিন্তু এ মহাত্মা পাণ্ডবগণের

ষোড়শাংশের একাংশও নহেন। তোমার দুর্ম্মতি পুত্রদিগের যে মহান অনর্থ আগত হইতেছে সে কেবল এই কুমতি সুতপুত্রেরই কর্ম্ম জানিবে। তোমার পুত্র কেবল ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সেই বীরবর অরিন্দম দেব পুত্রগণকে অবমানিত করিয়াছে। বিরাট নগরে ধনঞ্জয় বিক্রম প্রকাশ করিয়া যখন ইহার প্রিয়তম ভ্রাতাকে নিহত করিয়াছিলেন তখন এ কি করিয়াছিল? ধনঞ্জয় সমবেত কৌরবগণকে একাকী আক্রমণ করিয়া সম্যক প্রকারে প্রধর্ষণানন্তর যখন বলপূর্ব্বক সকলের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন তখন কি প্রবাসে ছিল—সে স্থলে কি উপস্থিত ছিল না? ঘোষযাত্রায় গন্ধর্ব্বেরা তোমার পুত্রকে যখন হরণ করিয়াছিল, তখন এই সুতপুত্র কোথায় ছিল, যে এক্ষণে বৃষভের ন্যায় আস্ফালন করিতেছে। তুমি কর্ণের কথা সমস্ত বিবেচনা না করিয়া মঙ্গল চেষ্টা কর।"

উঃ প ৫১ অধ্যায়।

সঞ্জয় উপপ্লব্য হইতে পুনরাগমন করিয়া পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত দুর্য্যোধনকে নিবেদন করিতেছেন, এমত সময় কর্ণ কি প্রকারে রামের নিকট হইতে প্রতারণা দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন তদ্বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন পাণ্ডবদিগকে নিহত করার ভার তাঁহার অন্যান্য সকলে বসিয়া থাকুক।

ভীষ্ম একথা শুনিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন "কর্ণ, কাল প্রভাবে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, তুমি অনর্থক শ্লাঘা করিতেছ কেন? ইহা কি জাননা প্রধান হত হইলেই ধৃত পুত্রেরা নিহত হইবে? ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া খাণ্ডব দাহন করতঃ যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তোমার আত্মাকে নিয়মিত করাই কর্ত্তব্য। ত্রিদশাধিপতি তোমাকে যে শক্তিটি দিয়াছেন সময়ে

কেশবের চক্রাঘাতে তাহাকে বিশীর্ণ ও ভষ্মীকৃত করিবে, অহে কর্ণ যিনি প্রগাঢ় তুমুল সংগ্রামে তোমার সদৃশ এবং তোমা অপেক্ষাও সমধিক শ্রেষ্ঠ শত্রুগণকে নিহত করিয়াছেন, বান ও ভূমিপুত্র নরকের নিগ্রহকারী সেই বাসুদেব অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছেন!"

দেবব্রত পুনশ্চ বলিলেন, "যখন এই নরাধম "আমি ব্রাহ্মণ" এই কথা বলিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে তখনই তাহার ধর্ম্ম ও তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছে।"

কর্ণকে যুদ্ধোদ্যোগ হইতে বিরত করাই ভীষ্মের উদ্দেশ্য। কর্ণ দুর্য্যোধনের কর্ণধার সুতরাং তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই সন্ধি সম্ভব হয়।

উঃ প—৬২ অঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভগবদ্‌যান পর্ব্ব।

যুদ্ধোদ্‌বোগ সম্পূর্ণ প্রায়। সন্ধির সকল চেষ্টাই বৃথা হইয়াছে। তথাপি শেষ পর্য্যন্ত যত উপায় আছে সমস্ত নিঃশেষ না করিয়া একবারে বল প্রয়োগ অবৈধ ও গর্হিত। তাই উপপ্লব্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের দূত হইয়া সন্ধির শেষ চেষ্টার জন্য হস্তিনাপুরে আসিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্রাদি মূঢ় কৌরবগণ তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থদান এবং সম্মান প্রদর্শন দ্বারা পাণ্ডবগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার বাসনা করিয়াছেন। মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন "আপনি অর্থ দ্বারা মহাবাহু বাসুদেবকে হস্তগত করিবেন এই উপায়ে তাঁহাকে পাণ্ডবগণ হইতে বিচ্ছিন্ন

করাইবেন ইহাই আশঙ্কা করিতেছেন; কিন্তু আমি আপনাকে এক সার কথা বলিতেছি, তিনি না ধন না যত্ন না পূজা কিছুতেই পাণ্ডবগণ হইতে পৃথকভূত হইবার নহেন। আপনি সহস্র সহস্র প্রয়াস পাইলেও জনার্দ্দন কেবল বারিপূর্ণ কুম্ভ ও পাদ প্রক্ষালন ব্যতীত আর কোন বস্তুই প্রার্থনা বা স্বীকার করিবেন না।” দুর্য্যোধন বুঝিলেন কেশবকে উৎকোচদ্বারা করায়ত্ত করা অসম্ভব। তিনি স্থির করিলেন যখন সকল উদ্যোগই হইয়াছে তখন আর বিনা যুদ্ধে যুদ্ধ নিবারণের উপায় কি?

ভীষ্মদেব বাসুদেবকে হস্তগত করার কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন “তোমরা জনার্দ্দনের সৎকারই কর, আর অসৎকারই কর তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইবেন না কিন্তু কোন ক্রমেই তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না, কেশব অবজ্ঞা সহনের পাত্র নহেন। তিনি মনে মনে যে কার্য্য অবধারিত করিয়াছেন, কোন উপায়েই কোন ব্যক্তি তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব সেই বীরবর যে কথা বলেন তাহাই অশংসয়ে সম্পন্ন কর; সদুপদেশকারী বাসুদেবের সাহায্যে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিতে উদ্যুক্ত হও। হে রাজন ধর্ম্মাত্মা কেশব যাহা বলিবেন তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্মও অর্থের অনুগত হইবে। অতএব তোমার কর্ত্তব্য এই যে সবান্ধবে মিলিত হইয়া তাহার সন্নিধানে প্রীতিকর বাক্যই বলিবে।” বলা বাহুল্য, ভীষ্মের এই অমৃতময় উপদেশ ভস্মের উপর ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইল। উপরন্তু দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবার পরামর্শ করিলেন এবং পিতামহকে কি উপায়ে বাসুদেবকে আবদ্ধ করিতে পারেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এ প্রস্তাব এত গর্হিত এবং ন্যায় বিরুদ্ধ যে ধৃতরাষ্ট্রও দুঃখিত হইয়া

বলিলেন "তুমি কদাপি আর এ কথার প্রসঙ্গ করিও না, ইহা সনাতন ধর্ম্মের অনুমত নহে। হৃষীকেশ দূত হইয়া আসিয়াছেন তাহাতে তিনি কৌরবদিগের কখন অনিষ্টাচরণ করেন নাই অতএব কি করিয়া তিনি বন্ধনাই হইবেন।"

ভীষ্ম দেখিলেন দুর্য্যোধন উপদেশের বহির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাকে যতই সৎকথা বল ততই তাঁহার মন্দবুদ্ধি উদ্দীপিত হয়। তিনি কোন যুক্তি প্রদর্শন করিলেন না, বলিলেন "ধৃতরাষ্ট্র তোমার এই সুমন্দমতি কুসন্তান নিতান্তই কাল পরীত হইয়াছে, সুহৃতেরা হিতাকাঙ্ক্ষা করিলে এ কেবল অহিত প্রার্থনাই করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমিও ইহার সুহৃৎবর্গের বাক্য অবহেলা করিয়া এই উৎপথবর্ত্তী পাপানুবন্ধী পাপাত্মার অনুবর্ত্তন কর। তোমাকে অধিক আর কি বলিব সুদুর্ম্মতি দুর্য্যোধন যদি কৃষ্ণের কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ করে, তবে ক্ষণকাল মধ্যেই অমাত্য বান্ধবের সহিত সংহার দশা প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।"

ভীষ্মদেব বড়ই ভাবিত হইয়াছেন, দুর্য্যোধনের শ্রীকৃষ্ণ অবমাননায় পাছে শিশুপাল বধের পুনরাভিনয় হয়। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় কৃষ্ণের বন্ধন প্রস্তাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতেছেন না। দুর্যোধন ধর্ম্মত্যক্তা তাহা তিনি জানেন, কিন্তু এই অসম সাহসের পরিণাম ভাবিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন তাই দুর্য্যোধনের কথায় প্রতীক্ষা না করিয়া এ কার্য্যের চরমফল শুনাইয়া দিয়া সভাতল হইতে প্রস্থানই শ্রেয় মনে করিলেন।

উঃ প—৮৮ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোনকে সন্ধিতে সম্মত করিতে পারেন নাই, সুতরাং হস্তিনাপুরে তাঁহার আর কার্য্য নাই। তিনি পিতৃস্বষা কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় উপপ্লব্যে যাইতে উদ্যত। কুন্তীদেবী তাঁহাকে বলিলেন "কৃষ্ণ তুমি কুশলে গমন কর আর তথায় উপস্থিত হইয়া আমার

নাম করিয়া তাহাদের (পুত্রদের) বলিও যে, তাহারা যেন আজন্ম দুর্য্যোধন কৃত অবমাননা মনে রাখে বিশেষত সেই সভামধ্যে পাঞ্চালীর অপমান আর দুঃশাসনের ব্যবহার এ সকল অবশ্য মনে করাইয়া দিও।" কুন্তী ক্ষত্রিয় রমণী ভীমার্জ্জুনের জননী অবমাননা সহ্য করিতে পারেন কি?

ভীষ্ম কুন্তীর কথায় ভীমার্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা যে কত দৃঢ় হইবে, তাহা দিব্য চক্ষে দেখিলেন মাতৃ আজ্ঞা তাঁহারা প্রাণ দিয়াও পালন করিবেন তাহা দেবব্রত জানিতেন যতক্ষণ একবিন্দু শোণিত ভীমার্জ্জুনের ধমনীতে প্রবাহিত হইবে, ততক্ষণ তাঁহারা জননীর আজ্ঞা প্রতিপালনে বিমুখ হইবেন না ভীষ্মের নিকট ইহা ধ্রুব সত্য। তাই তিনি কুন্তীদেবীর ঐ কথা শুনিয়া দুর্য্যোধনকে বলিতেছেন, "হে পুরুষব্যাঘ্র! কেশব সন্নিধানে কুন্তী যে উগ্রতর ধর্ম্মার্থযুক্ত অনুত্তম বাক্য উক্ত করিলেন, তাহা কি তোমার শ্রুতিগোচর হইল? বাসুদেবের প্রীতিপাত্র তদীয় তনয়েরা উক্ত উপদেশ বাক্য অবশ্যই প্রতিপালন করিবেন। হে কৌরব! পূর্ব্বে তাঁহারা ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকিয়া তোমা হইতে বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছেন, এক্ষণে রাজ্যলাভ ব্যতীত কোনক্রমেই শান্ত হইবেন না; সভামধ্যে তুমি যে দ্রৌপদীকে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ দিয়াছিলে শুদ্ধ ধর্ম্ম ভয়ে ভীত হইয়াই তাঁহারা তোমার সেই দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছিলেন। অধুনা আর সে ধর্ম্ম ভয় নাই; এক্ষণে কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয় দৃঢ়সঙ্কল্প বৃকোদর গাণ্ডীব—কোদণ্ড অক্ষয়—তুণীর যুগল কপিধ্বজ রথ অসীম বলবীর্য্য সমন্বিত নকুল সহদেব এবং অকুণ্ঠিতপরাক্রম ত্রিবিক্রম সহায় পাইয়া যুধিষ্ঠির কখনই ক্ষান্ত হইবেন না। হে মহাবাহো! ইতঃপূর্ব্বে বিরাট নগরে ধীমান পার্থবীর একাকাই যে আমাদিগকে যুদ্ধে বিনির্জ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা তোমার প্রত্যক্ষই আছে, তদ্ভিন্ন নিবাত কবচাদি

ঘোর বিক্রম দানবগণ সেই রৌদ্রাস্ত্রধারী বানরকেতনের প্রতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিল। অপিচ ঘোষ যাত্রাকালে কর্ণ প্রভৃতি এই সকল মহারথগণ এবং কবচধারী ও রথারূঢ় তুমি সকলেই তোমরা অর্জ্জুনের বাহুবলে গন্ধর্ব্ব হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলে। এই সমস্ত ব্যাপারই তাঁহার পরাক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন।

অতএব হে ভারত! ভ্রাতৃবর্গেমিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি বন্ধন কর। কৃতান্তের দন্তান্তরগতা এই সসাগরা বসুন্ধরাকে পরিত্রাণ কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, যুধিষ্ঠির তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ধর্ম্মশীল, বৎসল প্রিয়ম্বদ ও পণ্ডিত, অতএব পাপাশয় পরিত্যাগ করিয়া তাদৃশ পুরুষপ্রবরের সহিত সঙ্গত হওয়াই তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির তোমাকে যদি অপনীত শরাসন প্রশান্তভ্রূকুটি ও শান্তমূর্ত্তি দর্শন করেন, তাহা হইলেই কুরুকুলের শান্তি হয়। অতএব হে অরিন্দম নৃপনন্দন! তুমি অমাত্য-বর্গের সহিত সমবেত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন কর। ভীমাগ্রজ কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির তোমাকে অভিবাদন করিতে দেখিয়া স্নেহভরে পাণিযুগলদ্বারা ধারণ করিবেন। আজানুলম্বিত প্রহারিশ্রেষ্ঠ স্থূলবাহু ও সিংহস্কন্ধ ভীমসেন তোমাকে ভুজদ্বয়ে আলিঙ্গন করুন। তদনন্তর কম্বুগ্রীব কমললোচন ধনঞ্জয় অভিবাদন করিবেন এবং পৃথিবীমধ্যে অপ্রতিম রূপসম্পন্ন নরব্যাঘ্র নকুল সহদেব প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক গুরুর ন্যায় আরাধনা করুন। দাশার্হ প্রভৃতি নরপতিগণ তোমাদের মিলন দেখিয়া পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করুন। হে রাজেন্দ্র! তুমি অভিমান ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হও এবং সকলে একত্র হইয়া এই সমগ্রধরা রাজ্য শাসন কর। সমবেত ভূপতিগণ হর্ষভরে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন।

হে বসুধাধিপ! যুদ্ধের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সুহৃৎগণের নিবারণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্তিশূন্য হও। সংগ্রামে ক্ষত্রিয়কুলের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ লক্ষণ সুস্পষ্ট দৃষ্টি হইতেছে। হে বীর! দেখ জ্যোতিঃ পদার্থ সকল প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়াছে, যাবতীয় মৃগ পক্ষীগণ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছে এবং ক্ষত্রিয় ধ্বংসকর অন্যান্য বহুতর উৎপাত সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বিশেষতঃ, আমাদিগের নিবেশন মধ্যেই দুর্নিমিত্ত সকলের অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। প্রদীপ্ত উল্‌কা সমূহ তোমার সেনাগণকে প্রপীড়িত করিতেছে, বাহন সকল হর্ষশূন্য হইয়া যেন নিরন্তর রোদনপরায়ন রহিয়াছে, অশুভ গৃধ্র সমস্ত সেনা নিচয়ের দিকে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিতেছে, নগর ও রাজভবনের আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই, শিবা সকল অশিব শব্দ করিয়া প্রদীপ্ত ত্রিমণ্ডলে আশ্রয় করিতেছে। অতএব হে মহারাজা! জনক জননীর এবং অস্মদাদি হিতৈষীগণের বাক্য প্রতিপালন কর। দেখ, শম ও সময় উভয়েই তোমার আয়ত্ত রহিয়াছে।

হে শত্রুকর্ষণ! যদি একান্তই সুহৃদ্‌গণের বাক্য রক্ষা না কর, তবে নিজ বাহিনীকে পার্থবানে প্রপীড়িতা দেখিয়া অবশ্যই তোমাদের পশ্চাৎ তাপ করিতে হইবে। সংগ্রামে অগ্নিতুল্য তেজস্বী, ভীষণ গর্জ্জনকারী ভীম-সেনের মহানাদ এবং গাণ্ডীবের ভীষণ প্রচণ্ড নিঃস্বন শ্রবণ করিয়া আমা-দিগকে এই বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। যদি ইহা তোমার বিপরীত জ্ঞান কর তবে নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই।” উঃ প—৩৮ অধ্যায়।

ভীষ্ম শুধুই যোদ্ধা এবং ধার্ম্মিক তাহা নয়, তিনি বাগ্মিশ্রেষ্ঠ। এরূপ ভাষা এবং ভাবযুক্ত বক্তৃতা কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। বক্তৃতার হিসাবে এই অভিভাষণ অতুলনীয়, যে সকল গুণ থাকিলে বক্তৃতা চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে তাহা জাজ্বল্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ভীষ্মদেব আর দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠিরের স্বত্ব বিষয়ক কথা বলিতেছেন

না। প্রথম প্রথম পাণ্ডবদিগের কুরুরাজ্যে ন্যায্য অধিকার আছে এবং তাঁহাদিগকে রাজ্যভাগ না দিলে অন্যায় কার্য্য এবং অধর্ম্ম হইবে এরূপ যুক্তিযুক্ত উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল দুর্য্যোধন ন্যায় পথ হইতে ততই দূরে যাইতেছেন দেখিয়া আর ন্যায়ান্যায়ের কথা বলিতেছেন না। উপরিউক্ত অভিভাষণে তিনি দুর্য্যোধনের হিতাহিত জ্ঞান উদয়ের চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার হৃদয়ের দিকেই অধিক লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই প্রথমে পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মভীরুতা উল্লেখ করিলেন; ইহাদ্বারা ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পতন, ইঙ্গিত করিলেন। তৎপরই দ্রোপদীর উপর অত্যাচারের কথা শুনাইলেন, একে স্ত্রী, তাহাতে ভ্রাতৃজায়া, তাঁহার উপর অত্যাচার যে মহাপাপজনক তাহা বলিলেন, স্বকৃত দোষ স্মরণ করিলে সংকল্প পরিত্যাগ হইতে পারে এই আশায়, এই কথার উল্লেখ। পরে যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হইবে তাঁহাদের বীরত্ব এবং অজেয়ত্ব প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের কৃপায় একবার জীবন লাভ করিয়াছেন তাহাও স্মরণ করাইয়া দিলেন। ভাবিলেন হয়ত কৃতজ্ঞতা আসিতে পারে। তাহা হইলে এখনও সন্ধি সম্ভব হয়। সন্ধি হইলে কত সুখ এবং কুরুপাণ্ডব মিলিত হইলে ধরা রাজ্য শাসন সম্ভব ইঙ্গিত করিলেন, শান্তির সুন্দর চিত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। এতদ্‌বিপরীতে কুলক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, সংগ্রামে পরাজয় নিশ্চয় এবং তৎসূচক অরিষ্ট লক্ষণ সমূহ উৎপন্ন দেখাইলেন। শেষে গুরুজনের বাক্য রাখিতে অনুরোধ করিলেন। অন্যথা করিলে সদলে পাংশু ভক্ষণের কথা স্মরণ করাইলেন। এমন হৃদয়স্পর্শীনি বাগ্মিতা জগতে অতি বিরল। আজ কালকার বক্তৃতায় প্রাণ থাকে না। কারণ বক্তা যাহা বলেন, তাহার পূর্ব্বে অনুভব নাই কেবল লপন হইতে উৎপন্ন হয়, হৃদয়ের সহিত কোন সংস্রব নাই।

এই উদ্যোগপর্ব্বে আর একটি অতি উৎকৃষ্ট অভিভাষণ ভীষ্মোক্তি বলিয়া কথিত আছে। সেটি শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্মের উক্ত বলিয়া বলিতেছেন। কুরু সভায় শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করিলে "ধৃতরাষ্ট্র তনয় হাস্য করিয়া উঠিল" তাহাতে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সুযোধনকে যে মর্ম্মে বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই যুধিষ্ঠিরকে শুনাইতেছেন। এ কথাগুলি সঙ্ক্ষেপে ভীষ্ম জীবনী এবং কুরুরাজকে যুদ্ধ সঙ্কল্প ত্যাগের উপদেশ।

ভীষ্ম বলিয়াছেন "হে সুযোধন! কুলের রক্ষা হেতু আমি তোমাকে এই যে কথা বলিতেছি ইহা সম্যকরূপ বোধগম্য কর। তাহা শ্রবণ করিয়া স্বকুলের হিতসাধনে যত্নবান হও। হে তাত! আমার পিতা শান্তনু লোকবিখ্যাত ছিলেন, প্রথমে আমিই তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলাম। পণ্ডিতেরা এক পুত্রকে পুত্র বলিয়াই গণনা করেন না, এ কারণ আর একটি পুত্রের নিমিত্ত পিতার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। কিসে "আমার কুলের উচ্ছেদ না হয়, কি প্রকারেই বা আমার যশ বিস্তৃত হয়"। এইরূপ চিন্তাই তাঁহার ঐ ইচ্ছার কারণ। জনকের উক্ত মনোরথ জানিতে পারিয়া আমি ব্যাসদেব-জননী কালীকে আপন মাতৃস্বরূপে আহরণ করিলাম। কুলরক্ষা এবং পিতার অভিলাষ পূর্ণার্থ আমি দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াও ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে আমি যে রাজা হইতে পারি নাই এবং চিরকাল ঊর্দ্ধরেতা হইয়া আছি. তাহা তোমরা বিলক্ষণ বিদিত আছ। স্বকৃত প্রতিজ্ঞা পালন করতঃ আমি হৃষ্ট ও সন্তুষ্টচিত্তে জীবন ধারণ করিতেছি। হে রাজন! কালক্রমে ঐ সত্যবতী জননীর গর্ভে কুরুকুলধুরন্ধর ধার্ম্মিকবর মহাবাহু বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হইল; পিতার স্বর্গলাভ হইলে আমি ঐ অসীম শ্রীসম্পন্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইলেন, আমি অধশ্চর থাকিয়া তাঁহার পোষ্য হইয়া রহিলাম। হে রাজন! তাঁহার বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে উপযুক্ত কন্যা আহরণ করিয়া বিবাহ দিলাম। সেই বিবাহ উপলক্ষে আমাকে যে সব পার্থিবগণকে পরাজিত করিতে হইয়াছিল, তাহা তুমি বহুবার শ্রবণ করিয়াছ। অনন্তর আমি পরশুরামের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে প্রজাকুল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বিচিত্রবীর্য্যকে প্রবাসিত করিল। অবোধ ভ্রাতা স্ত্রী সঙ্গে সাতিশয় আসক্ত হওয়ায় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। এইরূপে কুরুরাজ্য অরাজক হইলে যখন সুরেশ্বর বারিবর্ষণে বিরত হইলেন তখন প্রজাগণ ভয় ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া মৎসন্নিধানে সত্বর প্রধাবিত হইল। সকলে সমবেত হইয়া আমাকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল "হে শান্তনুকুলবর্দ্ধন, রাজবিবর্জিত হওয়ায় আপনার প্রজা সমুদায় সংহার দশায় উপনীত প্রায় হইল, অতএব আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত অধুনা আপনিই রাজ্যভার গ্রহণ করুন। আপনার প্রসাদে আমাদিগের ঈতী অর্থাৎ শস্যহানিকর অনাবৃষ্টি প্রভৃতির অপনোদন হউক। হে গাঙ্গেয়! সুদারুণ ব্যাধি নিকর দ্বারা প্রপীড়িত হওয়ায় সমস্ত প্রজাপুঞ্জ অল্পাবশিষ্ট হইয়াছে, যাহারা এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে তাহাদের পরিত্রাণার্থ মনোনিবেশ করুন। হে বীর! অধুনা আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাদিগের মনোবেদনার উপশম হইবার আর উপায়ান্তর নাই, অতএব কৃপাপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করুন। আপনি জীবিত থাকিতে যেন সমস্ত সাম্রাজ্যের বিনাশ উপস্থিত না হয়।" প্রজাগণ এইরূপ বহুতর কাতরোক্তি প্রকাশ করিলে, জননী সত্যাও আমাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি নিবেদন করিলাম, হে অম্ব, কুরু-বংশে সম্ভূত, বিশেষত শান্তনুর ঔরসে উৎপন্ন হইয়া, আমি কি বলিয়া প্রতিজ্ঞা

ভঙ্গ করিব। শুদ্ধ আপনার নিমিত্তই যখন এ প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হইয়াছি, তখন আপনিই বা কি বলিয়া ইহা উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্তি দেন? অতএব হে সুবৎসলে! আপনার প্রেষ্য ও দাস স্বরূপ হইলেও আমি এ আজ্ঞাটি কোন মতেই প্রতিপালন করিতে পারিব না। মহারাজ! আমি মাতা ও পৌরজনবর্গকে এইরূপে অনুনয় করিয়া অবশেষে ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসকে প্রার্থনা করিলাম। সে জন্য জননীও তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। হে ভরতসত্তম, মুনিবর আমাদিগের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তিনটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে তোমার পিতা অন্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং জ্যেষ্ঠ হইলেও ইন্দ্রিয় বৈকল্যহেতুক রাজা হইতে পারেন নাই। সকল লোকবিশ্রুত মহাত্মা পাণ্ডুই রাজা হইয়াছিলেন। তিনি যখন রাজা হইয়াছিলেন তখন তাঁহার পুত্রেরা অবশ্যই তাঁহার উত্তরাধিকারী। অতএব হে বৎস! অনর্থক কলহ করিও না, রাজ্যের অর্দ্ধেক অংশ পাণ্ডবদিগকে প্রদান কর। বিবেচনা করিয়া দেখ আমি জীবিত থাকিতে কোন্ ব্যক্তি রাজ্যশাসনে সমর্থ হইতে পারে? অতএব কদাচ আমায় সকলে অনুরোধ করিলেও আমার সুস্থির চিত্ত কিছুমাত্র ক্ষোভিত বা বিচলিত হইল না। সাধুগণ চরিত সদাচার স্মরণ করিয়া আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষণেই তৎপর থাকিলাম। তখন সমস্ত পুরবাসিবর্গ আমার বিমাতা কল্যাণময়ী কালী, ভৃত্য পুরোহিত আচার্য্য ও বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সকলেই অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া আমাকে রাজ্যপদ গ্রহণে অনুরোধ করতঃ কহিলেন, হে মহামতে আমাদিগের হিতার্থে তুমি রাজসিংহাসনে আরোহণ কর। তুমি বিদ্যমান থাকিতে তোমার পিতামহ প্রতীপের রক্ষিত এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ইহা অতি পরিতাপের বিষয়।

তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত ও কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলাম,—আমি পিতার গৌরব এবং কুলের রক্ষার্থে রাজত্বরহিত ও ঊর্দ্ধরেতা হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পুনরায় কি প্রকারে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারি। সামান্তত সকলকে এইরূপ কহিয়া পরিশেষে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক মাতাকেও এই বলিয়া বারংবার প্রসাদিত করিলাম,—জননী. আপনার নিমিত্তই আমি উক্তরূপ দুশ্ছেদ্য প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, অতএব আপনি আর আমাকে রাজ্যভার গ্রহণের আজ্ঞা করিবেন না। অনাস্থা করিও না, আমি সর্ব্বদাই কেবল তোমাদিগের শান্তি ইচ্ছা করিতেছি। তোমার ও তাহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিশেষ নাই; নিরর্থক সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হওয়া কোনমতেই বিধেয় নহে"।

অবশ্য এই বক্তৃতা পূর্ব্ব বক্তৃতার পূর্ব্বে হইয়াছিল। ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম কুরুরাজ্যে ভীষ্মের স্থান দাসত্ব। তিনি "নিজবাসে পরবাসী" হইয়াছেন। চিন্তা করিতে চক্ষে জল আসে, তবে আমরা মনে রাখিব যে দাসত্ব এবং রাজত্ব তাঁহার নিকট দুইই তুল্য; তিনি যে মান অপমানের অতীত।

মহারাজ জনক বলিয়াছেন, "মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে লাভ নমে ক্ষতিঃ।" শ্রীভীষ্মও সেই মর্ম্মে বলিয়াছেন।

"প্রতীতো নিবসাম্যেবাং প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন।" প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আমি হৃষ্টচিত্তে বাস করিতেছি। রাজ্যপদ পাওয়া না পাওয়ায় তাঁহার হর্ষ ও বিষাদ কিছুই নাই। আমরা দেখিব ভীষ্ম জীবনে কখন এই দাসত্বভাব অতিক্রম করেন নাই। রাজধর্ম্ম প্রকরণে এ কথা পরিস্ফুট হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেনাপতি নির্ব্বাচন।

যুদ্ধ নিবারণের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। পুষ্যানক্ষত্রে দুর্য্যোধন তাঁহার বিশালবাহিনীকে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিবার আদেশ করিলেন।

এই একাদশ অক্ষৌহিনীর সেনাপতি কে হইবেন? দুর্য্যোধন মহীপালগণের সহিত মিলিত হইয়া দেবব্রতকে নিবেদন করিলেন, "পিতামহ, সেনাপতি ভিন্ন সুমহতী সেনাও সমরে পিপিলীকা বংশের ন্যায় বিদার্য্যমানা হয়। আপনি দেবসৈন্যের অগ্রগামী কুমারের ন্যায় আমাদিগের অগ্রে অগ্রে প্রয়ান করুন, আমরা মহাবৃষভের অনুগামী বৎসগণের ন্যায় আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি।"

ভীষ্ম কহিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার পক্ষে তোমরাও যেরূপ পাণ্ডবেরাও সেইরূপ; অতএব হে নরাধিপ আমাকে তাহাদিগের শ্রেয়ো বাক্য বলিতে হইবে এবং স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে তোমার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে হইবে। একমাত্র ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আমার তুল্য যোদ্ধাও পৃথিবী মধ্যে আর দেখিতে পাই না। তিনি অনেক দিব্যাস্ত্রে অভিজ্ঞ সুতরাং আমার সদৃশ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধ স্থলে প্রকাশিত হইয়া আমাকে নষ্ট করিতে পারিবেন না।

"শস্ত্রবল সহকারে আমি ক্ষণকাল মধ্যেই সুরাসুর রাক্ষস সম্বলিত এই সমস্ত জগৎকে নির্ম্মনুষ্য করিতে পারি, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রদিগকে উৎসাদিত করা আমার কোন ক্রমেই সাধ্য নহে। অতএব আমি শস্ত্র বিয়োগ দ্বারা অন্য দশ সহস্র যোধগণকে প্রতিদিন নিহত

করিব। সম্মুখসংগ্রামে যদি তাহারা পূর্ব্বেই আমাকে আহত না করে, তবে এই রীতিক্রমে তাহাদের নিধন সাধন করিব। হে রাজন, আমি অপর এক নিয়মের সহিত ইচ্ছানুসারে তোমার সেনাপতি হইব; সে নিয়মটি এই—হয় কর্ণ অগ্রে যুদ্ধ করুন, না হয় আমি করি, কেন না এই সুতপুত্র আমার সহিত সমরে নিত্যই স্পর্দ্ধা করেন"। উঃ প ১৫৫ অধ্যায়।

কর্ণ যুদ্ধ করিবেন না ভীষ্মই সেনাপতি হইলেন। কর্ণকে যুদ্ধে না লওয়ায় কারণ তিনি যুদ্ধে ভীষ্মের আদেশ পালন করিবেন না, তাহাতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে।

কেহ হয়ত বলিবেন, ভীষ্ম এখানে কিছু আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিলেন কেন? তাহা নহে, দুর্য্যোধনের প্রত্যাশা রক্ষা করিয়া পাণ্ডববধের গুরুত্ব দেখাইলেন এবং নিজের অপারগতা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ক্ষমতায় যাহা হইতে পারে, তাহাই বলিলেন। কোন কোন স্থলে ভীষ্ম নিজের পরাক্রম এবং বীরত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল স্থলে দুর্য্যোধনকে আশ্বস্ত করাই উদ্দেশ্য। সেনাপতি যদি প্রথম হইতেই ভগ্নহৃদয় হয়েন, তবে সৈন্যগণও হইবেই। বিশেষতঃ রাজা ত হইবেনই। পাছে কেহ ভীষ্মের শ্লাঘা করণ মনে করেন কবি এজন্য বলিয়াছেন—

"সৈনাপত্যমনুপ্রাপ্য ভীষ্ম শান্তনবো নৃপ।
দুর্যোধনমুবাচেদং বচনং হর্ষয়ন্নিব॥"

উ প ১৬৪ অ-৬০

আত্মশ্লাঘা ভীষ্মে নাই, কারণ জগতে তাঁহার কিছু প্রত্যাশা নাই কর্ত্তব্যই জীবনের এক স্থির লক্ষ্য।

অনেকে বলিবেন, এ কি রকম। তিনি কৌরবদিগের সেনাপতি গ্রহণ করিলেন অথচ পাণ্ডবদিগকে "শ্রেয়ো বাক্য" বলিতে স

বলিবেন। অতি গুরুতর কথা। এক ব্যক্তিতে এরূপ বিরুদ্ধ ব্যবস্থা হইলে কোন পক্ষেরই হিতকর হয় না, বিশেষতঃ যেখানে যুদ্ধবিগ্রহাদি রাজনৈতিক সম্পর্ক; মন্ত্রগুপ্তি আসিতেই পারে না এবং বিপক্ষের শ্রেয় জ্ঞান হেতু যুদ্ধাদি ও সৈন্য সমাবেশ উপযুক্ত প্রকারে হওয়া সম্ভব নয়।

সাধারণ মনুষ্যে অসম্ভবই বটে, কেবল ভীষ্মে এবং ভীষ্ম সদৃশ নরদেবতায় সম্ভব। যে পুরুষে অহং ভাবের আত্যন্তিক ধ্বংশ তাঁহাতেই এরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে, যে চিত্তে স্বপক্ষ বিপক্ষ বৃত্তি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে সেই চিত্তযুক্ত ব্যক্তি এ অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করিতে পারেন। যিনি কোন প্রকার কর্ম্মের ফল প্রত্যাশা করেন না কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম্মাচরণ করেন, তিনিই অতিদুরূহ কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারেন। যাঁহার সর্ব্বকর্ম্মই ভগবতে নিবেদিত হইয়াছে এবং নিমিত্তমাত্র জ্ঞানে যিনি কর্ম্মানুসরণ করেন, তিনিই কেবল এই অবিশ্বাস্য বিরোধ ভাব জয় করিতে পারেন। গুণাতীত না হইলে এ গুণ অর্জন হয় না।

ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের শ্রেয়প্রার্থী জানিয়াও দুর্য্যোধন তাঁহাকে আপনার সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন ইহা অপেক্ষা দেবব্রতের কর্ত্তব্য জ্ঞানের পরিচয় আর কি হইতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রথাতিরথসংখ্যান পর্ব্ব।

ভীষ্ম সেই বিশাল অনিকীনির অধিনায়কত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। র্য্যোধন তখন পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আত্মপর উভয়

পক্ষেরই অভিজ্ঞ, আমি এই কারণ এই সকল রাজবর্গের মধ্যে কে রথী মহারথী বা অতিরথী আছেন শুনিতে ইচ্ছা করি।

তাঁহার প্রশ্নানুসারে ভীষ্ম কে কেমন যোদ্ধা তাহাই বলিতেছেন। অবশ্য প্রধানগণেরই উল্লেখ করিতেছেন।

১। তোমার পক্ষে তুমি শত ভ্রাতার সহিত এক প্রধান রথী।

২। আমি আমার বিষয় কিছু বলিব না তুমি সমস্তই জান।

৩। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা—একজন অতিরথ।

৪। মদ্ররাজ শল্য—ইনিও অতিরথ।

৫। সোমদত্ত পুত্র ভুরিশ্রবা—রথযুথপতি অনেক শত ধ্বংশ করিবেন।

৬। জয়দ্রথ সিন্ধুরাজ ইনি দ্বিগুণরথ।

৭। কাম্বোজরাজ—এক গুণ রথী।

৮। নীলবর্ম্মা—একজন রথী।

৯। অবন্তী দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ রথোত্তম।

১০। ত্রিগর্ত্ত, পঞ্চভ্রাতা—রথশ্রেষ্ঠ।

১১। তোমার পুত্র লক্ষ্মণ—রথ-সত্তম।

১২। দণ্ডধার—এক গুণ রথ।

১৩। কোশলরাজ বৃহদ্বল—এক রথ।

১৪। কৃপাচার্য্য রথযুথপতির যুথপতি।

১৫। তোমার মাতুল শকুনি একরথ।

১৬। মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থমা—ইঁহার গুণসমূহ বলিয়া শেষ করা যায় না। অর্জ্জুনের ন্যায় ইহার শিক্ষা দিব্যাস্ত্রে অনুগৃহীত, তবে ইঁহার একটি মহাদোষ আছে। তাহাতে ইহাকে রথ বা অতিরথ বলিয়া মনে করিও না। এই ব্রাহ্মণ নিত্যই আয়ুষ্কামী, সুতরাং জীবন ইহার

অত্যন্ত প্রিয়।" (বাঙ্গালী জাতির এই দোষটি পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান সর্ব্বদা প্রাণটা লইয়াই বিব্রত। বাঙ্গালীর আশীর্ব্বাদ "চিরজীবী হও এবং সোণার দোয়াত কলম হউক।)"

১৭। দ্রোণাচার্য্য বৃদ্ধ হইয়াও যুবকগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, ইনি রথযূথপতি সমূহের যুথপতি। কিন্তু ধনঞ্জয় ইঁহার অতিশয় প্রিয়, ইনি পার্থকে বিনষ্ট করিতে পারিবেন না। দিব্যাস্ত্রে প্রবীণ পাঞ্চালগণের ধ্বংশ করিবেন।

১৮। কর্ণপুত্র বৃষসেন একজন প্রধান রথী।

১৯। মধুবংশীয় জলমন্দ—রথী।

২০। বাহ্লিক একজন অতিরথ।

২১। অলম্বুষ রাক্ষস রথসত্তম।

২২। ভগদত্ত গজাঙ্কুশ ধারণে শ্রেষ্ঠ এবং রথেও বিশারদ।

২৩। তোমার এই প্রিয়তম সখা, মন্ত্রী নায়ক বন্ধু অভিমানী অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী আত্মশ্লাঘাকারী, নিত্য রণকর্কশ, নীচপুরুষ কর্ণ, ইহাকে না রথ না অতিরথ কিছুই বলা যায় না। ইহাকে আমি অর্দ্ধরথ বলি।

অতঃপর পাণ্ডবদিগের বলাবল বলিতেছেন।

১। যুধিষ্ঠির রথশ্রেষ্ঠ।

২। ভীমসেন অষ্ট গুণ রথী, তিনি অযুত হস্তীর বলধারণ করেন, তেজে অমানুষ।

৩। মাদ্রীপুত্রেরা উভয়েই রথ।

৪। নারায়ণসহায়সম্পন্ন লোহিতনয়ন অর্জ্জুন—উভয় সেনা মধ্যে এরূপ ধনুর্দ্ধর আর নাই। মনুষ্যে কি দেব যক্ষ রাক্ষস বা ভুজঙ্গগণ মধ্যে তাদৃশ যোদ্ধা হইয়াছে, কি উত্তরকালে হইবে এরূপ

শ্রবণ করি নাই। এই মহাবাহু তোমার সৈন্যদিগকে নিহত করিবেন। আচার্য্য কিম্বা আমি ব্যতীত ইঁহার সহিত যুদ্ধে উদ্যুক্ত হইতে পারে, উভয় সৈন্য মধ্যে এমত কেহই নাই। তিনি যুবা আর আমরা জীর্ণ।

৫। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সকলেই মহারথ।

৬। মহাবাহু অভিমন্যু রথযুথপতির যুথপতি, ইনি পার্থ ও বাসুদেবের সমকক্ষ।

৭। সাত্যকি রথযুথপতির যুথপতি।

৮। যুধামন্যু এবং উত্তৌমজা রথিশ্রেষ্ঠ।

৯। বিরাট ও দ্রুপদ মহারথ, তবে—বয়সে বৃদ্ধ।

১০। শিখণ্ডী একজন রথ প্রধান।

১১। ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিরথ, ইনি পাণ্ডবদিগের সেনানী।

১২। ক্ষত্রবর্ম্মা অর্দ্ধরথ।

১৩। শিশুপাল পুত্র ধৃষ্টকেতু—মহারথ।

১৪। ক্ষত্রদেব—রথোত্তম।

১৫। সত্যজিত—অষ্ট গুণ রথ।

১৬। অমিতৌজা—মহারথ।

১৭। অজ ও ভোজ—মহারথ।

১৮। কৈকয় রাজপুত্র পঞ্চভ্রাতা—রথী শ্রেষ্ঠ।

১৯। কাশিক, সুকুমার নীলধ্বজ সূর্য্যদত্ত শঙ্খ ও মদিরাশ্ব—রথ প্রধান।

২০। বর্দ্ধক্ষেমি—মহারথ।

২১। চিত্রায়ুধ—রথোত্তম।

২২। চেকিতান ও সত্যধৃতি—মহারথ।

২৩। ব্যাঘ্রদত্ত চন্দ্রসেন সেনবিন্দু—রথসত্তম।

২৪। চিত্রায়ুধ—রথোত্তম।

২৫। কাশীরাজ—এক গুণ রথ।

২৬। পাণ্ডবরাজ—মহারথী।

২৭। দৃঢ়ধন্বা—মহারথ।

২৮। শ্রেণিমান—অতিরথ।

২৯। বসুদান—অতিরথ।

৩০। রোচমান—মহারথ।

৩১। পুরুজিৎ—অতিরথ।

৩২। চিত্রযোধী—বীরবর, উৎকৃষ্ট যোদ্ধা।

৩৩। ঘটোৎকচ—রথযূথপতির যূথপতি।

ভীষ্ম বলিলেন যে, তিনি শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধ করিবেন না এবং পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত আর সকলকেই যমালয়ে পাঠাইতে পারিবেন।

কর্ণকে অর্দ্ধরথ গণনা করায় তিনি ভীষ্মকে অনেক কটুকথা শুনাইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ভীষ্ম অতি অল্পবুদ্ধি তাহার রথী পরিজ্ঞান কোথায়? আমি একাকীই পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিতে পারি। যুদ্ধ বিমর্দ্দ অস্ত্র ও সুভাষিত ইহার সহিত অতিবৃদ্ধ মন্দাত্মা এবং কালপ্রেরিত ভীষ্মের কি সম্বন্ধ? ইনি একাকী সমস্ত জগতের সহিত নিত্যই স্পর্দ্ধা করেন এবং এরূপ মিথ্যাদর্শী হন যে কাহাকেও আর পুরুষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। বৃদ্ধের কথা গ্রাহ্য করা উচিৎ বটে কিন্তু অতি বৃদ্ধগণের নহে, কারণ তাহারা পুনরায় বালকত্ব প্রাপ্ত হয়। যশ সেনাপতিতেই গমন করে,—আমি একাকীই পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমস্ত নিহত করিব আর ভীষ্ম তাহার যশোভাগী হইবেন, অতএব আমি যুদ্ধ করিব না।"

ভীষ্ম উত্তর করিলেন, "রে সূতপুত্র! দুর্য্যোধনের সংগ্রামে আমার এই সাগরোপম সুমহান ভার সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ইহার চিন্তা করিতেছি, অতএব সেই লোমাঞ্চকর প্রতপ্ত সমর সময় সমাগত হইলে পরস্পর ভেদ করা আমার বিধেয় নহে, এই নিমিত্তই তুমি জীবিত আছ। আমি বৃদ্ধ হইয়াও শিশু স্বরূপ তোমার প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিতে পারি কিন্তু এই জন্যই করিলাম না। তুমি আমার কি করিবে? তোমার গুরু জামদগ্ন্য পরশুরাম মহাস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়াও আমার কিছুমাত্র ব্যথা জন্মাইতে পারেন নাই। রে নিকৃষ্টকুল পাংশুল? সাধুরা কখন ইচ্ছা করিয়া নিজ বলের প্রশংসা করেন না। কিন্তু আমি সন্তপ্ত হইয়া তোমাকে বলিতেছি, স্বয়ম্বরে সমবেত পার্থিবকুলকে এক রথেই জয় করিয়া কন্যা হরণ করিয়াছিলাম।"

ভীষ্ম সেনাপতি, অন্যান্য সেনানীগণের সমক্ষে কর্ণ তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি যুদ্ধ করিতে জানেন না কেবল মিথ্যা কথা বলেন,—ফাঁকি দিয়া নাম করিবার চেষ্টায় আছেন, সুতরাং ভীষ্মকে সময়োচিত বাক্য এবং আপনার পূর্ব্বের বিক্রম বলিতে হইল। পাছে অন্যান্য যোদ্ধাগণ তাঁহার সৈনাপত্যে সন্দিহান হয়েন, এই নিমিত্ত আপনার শক্তি বর্ণনা অতীব যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। প্রতিবাদ না করিলে কর্ণের কথা হয়ত অনেকে বিশ্বাস করিতে পারিতেন। কর্ণকে লঘু করিবার চেষ্টা ভীষ্মে প্রায়ই দেখা যায়—তাহার কারণ, পরাধ্যায়ে আমরা ভীষ্ম মুখেই শ্রবণ করিব।

এই রথাতিরথ বিবেচনায় আমরা ভীষ্মের স্বপক্ষ বিপক্ষ বলাবল জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম তিনি যে উৎকৃষ্ট সমরসচিব এবং সেনা-নায়ক তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অম্বোপাখ্যান।

দুর্য্যোধন পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি শিখণ্ডীকে কেন বধ করিবেন না? উত্তরে ভীষ্ম আদ্যোপান্ত শিখণ্ডীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "যে পূর্ব্বে আমি কাশীরাজের তিনটি কন্যা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলাম. তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা অম্বা শল্যগতপূর্ব্বা প্রকাশ করায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম। তদনন্তর অম্বা শল্যের নিকট গমন করিলে তিনিও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

তখন কাশীরাজ 'তনয়া' আপনাকে বিশেষ অবমানিতা বোধ করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। বনস্থিত ঋষিরা তাঁহার অবস্থা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, আপনি পরশুরামের শরণাপন্ন হউন, তিনি ইহার প্রতিকার করিবেন।

কন্যার কাহিনী শুনিয়া ভৃগুরাম আমাকে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার সে আদেশ পালন করিতে অসমর্থ হইলাম, তখন রাম আমাকে অমাত্যসহ নিধন করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। "তখন আমি সেই ব্রাহ্মণ সত্তম ভৃগুনন্দনকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলাম, যে আপনি বাল্যকালে আমাকে চতুর্বিধ ধনুর্বিদ্যায় উপদেশ দিয়াছেন, আমি আপনার শিষ্য, কিন্তু ভার্গব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন"।

তখন আমি পুনরায় নিবেদন করিলাম,—"হে ব্রহ্মর্ষে, আপনি অনর্থক শ্রম করিতেছেন, হে জামদগ্ন্য। আপনি আমার পুরাতন গুরু সেই

প্রতীক্ষাতেই আমি আপনাকে প্রসাদিত করিতেছি। হে ভগবান্ ইহাকে আমি পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছি। স্ত্রীদিগের দোষ মহা অনর্থের হেতু, ইহা অবগত থাকিয়া কোন্ মানব সাক্ষাৎ সর্পিনীর ন্যায় অন্যাসক্তা রমণীকে নিজগৃহে বাস করাইতে পারে? হে মহাব্রত! আমি বাসবের ভয়েও ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারি না অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, অথবা আপনার যেরূপ কর্ত্তব্য হয় তাহা অচিরেই সম্পন্ন করুন। হে বিভো, পূরাণে মহাত্মা মরুত্তের কীর্ত্তিতে এই শ্লোকটি শ্রবণ করা যায় —

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকর্ম্মসজানতঃ।
উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের অনভিজ্ঞ উৎপথে প্রধাবিত, গর্ব্বপরীত গুরুকেও পরিত্যাগ করা বিধেয়। আপনি আমার গুরু, এই নিমিত্তই আমি প্রেমবশতঃ পুনঃ পুনঃ আপনাকে সম্মানিত করিলাম, কিন্তু আপনি গুরুর ধর্ম্ম জানিতেছেন না, এ কারণ আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। গুরু বিশেষতঃ তপোবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সমরে নিহত করিতে পারি না, এই মনে করিয়াই আমি আপনাকে ক্ষমা করিয়াছি। পরন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে এই নিশ্চয় আছে যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে, কুৎসিত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উদ্যতাস্ত্র ক্রুদ্ধ ও অপরাঙ্মুখে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিনষ্ট করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা হয় না। হে তপোধন! আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত ক্ষত্রিয়। যে ব্যক্তি যাহার প্রতি যাদৃশ আচরণ করে, তাহার প্রতি তাদৃশ আচরণ করিলে অধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না এবং অকল্যাণেও পতিত হয় না। ধর্ম্মার্থ বিচারে সমর্থ দেশকালজ্ঞ পুরুষ যদি অর্থ এবং ধর্ম্ম বিষয়ে সংশয়াপন্ন হয়েন অর্থাৎ অর্থ রাখিব কি ধর্ম্ম রাখিব এইরূপ দ্বৈধে উপস্থিত হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠানই প্রশস্ত।

অতএব হে রাম! সংশয়িত অর্থেও আপনি যখন অযথা অন্যায়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন আপনার সহিত আমি অবশ্যই মহাসমরে প্রবৃত্ত হইব।

হে ভৃগুনন্দন! আমার বহুবীর্য্য ও অলৌকিক বিক্রম দর্শন করুন। এরূপ অবস্থায় আমি যাহা করিতে পারি তাহা অবশ্যই করিব। কুরুক্ষেত্রে আপনার সহিত যুদ্ধে উদ্যুক্ত হইব। অতএব হে মহাদ্যুতে! দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থে ইচ্ছানুসারে সজ্জীভূত হউন। হে রাম! যে স্থলে আমার শত শত শরনিকরে পীড়িত হইয়া আপনি নিধন প্রাপ্ত হইবেন এবং মহারণে শস্ত্রপূত হইয়া নির্জ্জিত লোক সমস্ত লাভ করিবেন সেই কুরুক্ষেত্রে গমন করুন। হে মহাবাহো! তথায় আমি যুদ্ধপ্রিয় আপনার সহিত যুদ্ধার্থে সমাগত হইব। পূর্ব্বে যেস্থলে আপনার পিতার শুদ্ধি (ক্ষত্রিয় বধ দ্বারা) করিয়াছিলেন, আমিও সেই স্থলে আপনাকে বিনষ্ট করিয়া ক্ষত্রিয়কুলের বৈরি শুদ্ধি করিব। হে বিপ্রাভিমানিন্ যুদ্ধদুর্ম্মদ! তথায় সত্বর প্রস্থান করুন আমি আপনার পুরাতন দর্পের অপনোদন করিব। হে ভার্গব! 'আমি একাকীই পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে নির্জিত করিয়াছি' বহুকাল পর্য্যন্ত আপনি যে এই গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহার হেতু শ্রবণ করুন; তৎকালে ভীষ্ম বা "মদ্বিধ" কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই। হে তপোধন! আপনি কেবল তৃণরাশি মধ্যেই প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন। তেজঃ-পুঞ্জ ক্ষত্রিয় সকল পশ্চাৎ জন্মিয়াছে। হে মহাবাহু! যে ব্যক্তি আপনার যুদ্ধময় দর্প ও অভিলাষের অপনোদন করিতে পারে, সেই পরপুরঞ্জয়ী ভীষ্ম এখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। হে রাম! সমরে আমি অবশ্যই আপনার দর্প হরণ করিব সংশয় নাই।"

"যচ্চাপি কথসেরাম বহুশঃ পরিবৎসরে।
নির্জ্জিতাঃ ক্ষত্রিয়ালোকে ময়ৈকেনেতি তচ্ছৃণু॥

ন তদা জাতবান ভীষ্মঃ ক্ষত্রিয়োবাপি মদ্বিধঃ
পশ্চাজ্জাতানি তেজাংস তৃণেষু জ্বলিতংত্বয়া ॥
সোহং জাতো মহাবাহো ভীষ্ম পরপুরঞ্জয়ঃ
ব্যপনেষ্যামি তে দর্পং যুদ্ধে রাম ন সংশয়ঃ। উঃ পঃ ১৭৯ অধ্যায়—

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে গঙ্গাদেবী আসিয়া ভীষ্মকে রামের সহিত যুদ্ধ করিতে বারণ করিলেন, কিন্তু ভীষ্ম ক্ষত্রিয় সন্তান—পরাঙ্মুখ হইবেন না ভার্গবও নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন, সুতরাং কুরুক্ষেত্রে তাঁহাদের দ্বৈরথ আহব আরম্ভ হইল।

ভীষ্ম শরক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে রামকে অভিবাদন করত নিবেদন করিলেন "হে রাম! আপনি সদৃশই হউন বা অধিকই হউন, আপনার সহিত আমি যুদ্ধ করিব; আপনি গুরু ও ধর্ম্মশীল অতএব আমাকে জয়াশীর্ব্বাদ করুন।" রাম ভীষ্মের সৌজন্যে বিশেষ প্রীত হইয়া কহিলেন যে, তিনি যখন তাঁহাকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে পারেন না, তবে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে এবং সাবধানে শরচালনা করিতে উপদেশ দিলেন।

অতঃপর ভৃগুরাম ভীষ্মের প্রতি শরক্ষেপ করিয়া তাঁহার সারথি ও হয় চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলে তিনি বলিলেন, "আপনি মর্য্যাদাশূন্য হইলেও আমি আপনার গুরুত্বের সম্মান করিতেছি এবং ধর্ম্মসংগ্রহ বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। আপনার শরীরস্থ যে সমস্ত বেদ ও মহৎ ব্রাহ্মণ্য আছে এবং তাহা দ্বারা আপনার যে মহতী তপস্যা সঞ্চিত রহিয়াছে তৎসমুদয়ের প্রতি আমি প্রহার করিতেছি না, আপনি যে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন আমি তাহারই প্রতি প্রহার করিতেছি, যেহেতু শস্ত্রোদ্যম করিলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হন।"

ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে দেবগণ গগন মার্গে ভীষ্ম ভার্গবের অমানুষিক অস্ত্র সঞ্চালন আনন্দের সহিত অবলোকন করিতেছেন।

কয়েক দিবস এই ভাবে যুদ্ধের পর ভীষ্ম রজনীতে শয়ন করিয়া একাগ্র মনে চিন্তা করিতেছেন, এত যুদ্ধ করিয়াও রামকে তিনি পরাস্ত করিতে পারিলেন না তখন দেবগণকে নমস্কার পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যদি তাঁহার দ্বারা রামের পরাভব সম্ভব হয়, তবে তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন দান করুন। রজনীর শেষভাগে তাঁহারা ভীষ্মকে দর্শন দিলেন এবং প্রস্বাপ নামে এক প্রজাপত্য তাঁহাকে অস্ত্রের সন্ধান জ্ঞাত করাইলেন। তবে রামের মৃত্যু নাই তাহাও প্রকাশ করিলেন। পরদিন নারদাদি ঋষিগণ মধ্যস্থ হইয়া এই ভীষণ যুদ্ধের অবসান করাইলেন। পরশুরাম অতি প্রীত হইয়া ভীষ্মকে বলিলেন, "এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক মধ্যে তোমার সমান ক্ষত্রিয় পুরুষ আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই; এই যুদ্ধে তুমি আমাকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিলে সম্প্রতি গমন কর"।

সপ্তাহকাল যুদ্ধ হইল, শরীর হইতে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল, ব্যাথায় কত পীড়া বোধ হইল, তথাপি মনোমালিন্য নাই এ সন্তোষ ভাবটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে কি?

অতঃপর আর কোন উপায় না দেখিয়া কাশীরাজতনয়া ক্ষোভে ভীষ্মবধার্থ শিবে সমাহিত হইলেন। মহাদেব তাহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাহাকে এই বর দিলেন যে "তুমি ভীষ্ম বধ করিবে। জন্মান্তরে স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি দ্রুপদের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারথ শীঘ্রাস্ত্র তীক্ষ্ণযোধী ও সুসম্মত যোদ্ধা হইবে"। বর পাইয়া অম্বা অগ্নিপ্রবেশ করিয়া দেহের অবসান করিলেন।

এ পর্য্যন্ত এ উপাখ্যানে কাহার কিছু বিশেষ বলিবার আছে বলিয়া

বোধ হয় না। দেবতার অনুগ্রহে বরপ্রাপ্তি কিছু নূতন কথা নহে সকল জাতির ভিতরেই প্রচলিত আছে এবং সকল জাতিই ইহাতে বিশ্বাস করেন। মনের তীব্র একাগ্রতায় ভূত ভবিষ্যতের জ্ঞান হয়; এ কথা আমরা পরে বিচার করিব।

ইহার পরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে অনেকে অনৈসর্গিকতার আপত্তি করিবেন।

পূর্ব্ববরের প্রসাদে অম্বা দ্রুপদ রাজার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন —কিন্তু কন্যারূপে।

পূর্ব্বে দ্রুপদ ভীষ্মের হস্তে একবার যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন তাহাতে তিনিও মহাদেবের আরাধনা করিয়া বধার্থ বর প্রার্থনা করিলে এই বর পাইয়াছিলেন যে তাঁহার এক স্ত্রী অথচ পুরুষ সন্তান হইবে। ইহার অন্যথা হইবে না।

অতঃপর দ্রুপদরাজমহিষী যথাকালে এক কন্যা প্রসব করিলেন, কিন্তু মহাদেবের বর স্মরণ করিয়া সেই কন্যাকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সেই পুংরূপিনী কন্যা * দ্রোণের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিল এবং অন্য এক রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইল। ঐ রাজকন্যার পিতা যখন জানিলেন তাঁহার জামাতা স্ত্রীজাতীয় তখন তিনি একেবারে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া দ্রুপদকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন পুংবেশিনী কন্যা তাহার জন্য এত উৎপাত উপস্থিত দেখিয়া এক বনে প্রবেশ করিল এবং স্থূনাকর্ণ নামক যক্ষকে তপস্যায় প্রীত

---

* ১৮৯১ সালে এলাহাবাদের নাইনি সেণ্ট্রাল জেলে একজন ব্রহ্মদেশবাসী কয়েদীর স্ত্রী এবং পুং চিহ্ন একত্রে ছিল। লোকটা কুম্ভকারের কায করিত, বয়স তখন ২০।২২ বৎসর ছিল—গ্রন্থকার।

করিয়া পুংত্ব অর্জন করিল। সব গোলমাল মিটিয়া গেল। ইনিই শিখণ্ডী, পূর্ব্বজন্মে ইনি স্ত্রী ছিলেন। সুতরাং ভীষ্ম বলিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞানুসারে আমি তাহাকে অবলোকন করিব না এবং প্রহারও করিব না। আমি স্ত্রীপূর্ব্বক, স্ত্রীস্বরূপ, অথবা স্ত্রীনাম যুক্ত পুরুষে বাণ প্রয়োগ করি না।"

আজকাল যাঁহাদের নাম রমণীমোহন, কামিনীকুমার, যামিনীপতি, তাঁহাদের ভীষ্মের স্থায় ব্যক্তির হাতে প্রহারের ভয় নাই।

বঙ্কিমবাবু এই শিখণ্ডী ব্যাপারটা একবারে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন কিন্তু অনুক্রমিনাধ্যায়ে এবং পর্ব্বাধ্যায়ে এই শিখণ্ডীর উল্লেখ আছে; কাযেই একবারে নস্যাৎ করিবার উপায় নাই। "শিখণ্ডিনং পুরতঃ স্থাপয়িত্বা" আঃ ১অ, ১৮৪।

শিখণ্ডীর উপাখ্যান সত্য কি মিথ্যা তাহাতে ভীষ্ম চরিত্রের কিছু যায় আসে না। ভীষ্ম এই ভাবে তাহার জন্ম বিষয় নারদ এবং চার মুখে শুনিয়াছেন এবং শিখণ্ডী স্ত্রীপূর্ব্বা তিনি তাহা বিশ্বাস করিতেন।

প্রাকৃতিক উদ্ভ্রান্ততায় বা যথেচ্ছচারিতায় স্ত্রী এবং পুরুষ চিহ্নের আবির্ভাব তিরোভাব ও রূপান্তর আশ্চর্য্য নহে। নপুংসকত্ব প্রকৃতি যথেচ্ছচারিতার দৃষ্টান্ত। ছাগ জাতিতে স্ত্রী এবং পুং চিহ্ন একত্রে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। ছাগাদি ঘৃতের নিমিত্ত কবিরাজ মহাশয়েরা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। শিখণ্ডীরও এইরূপ একটা প্রাকৃতিক উৎপাত ছিল, কোন উৎকৃষ্ট ভিষক তাহাকে পুরুষত্ব দিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুর্য্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য কতদিনে ধ্বংশ করিতে পারেন?"

ভীষ্ম উত্তর করিলেন "সমর ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত এই যে, ইতর লোকের সহিত সরল যুদ্ধে এবং মায়াবীর সহিত মায়া যুদ্ধে যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। আমি প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে দশ সহস্র যোধী এবং এক সহস্র রথী এইরূপ ভাগ কল্পনা করিয়া পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করিতে পারি। অথবা সমরে অবস্থিত হইয়া যদি শতঘাতী সহস্রঘাতী প্রভৃতি মহাস্ত্র সমস্ত প্রয়োগ করি তবে এক মাসেই সমস্ত সৈন্য নিঃশেষ করিতে পারি।"

কর্ণ বলিলেন, "আমি পাঁচ দিবসেই এ কার্য্য করিতে পারি"—ভীষ্ম হাস্য করিয়া বলিলেন "রাধেয়! তুমি যে পর্য্যন্ত সংগ্রামে শঙ্খ শরাসনধারী বাসুদেবসহকৃত ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে সমাগত না হইতেছ, ততদিন এইরূপ মনে করিতেছ। তুমি ইচ্ছা করিলে এতদপেক্ষা আরও অধিক বলিতেও পার।"

উঃ পঃ ১৯৫ অঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভীষ্ম পর্ব্ব।

কুরুক্ষেত্র।

যে কুরুপাণ্ডবের মহাসমরের অপেক্ষায় ভারতবাসী বহুদিন হইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, সেই লোমাঞ্চকর, সেই ভারতের পুরুষ শূন্যকারী মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সেই বিশালক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান।

এক অক্ষৌহিনী সৈন্যের সংখ্যা এইরূপ—এক রথ এক হস্তী পঞ্চজন পদাতি ও তিন অশ্ব ইহাতে এক পত্তি হয়। তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃতনা হয়। তিন পৃতনাতে এক চমু, তিন চমুতে এক অনিকিনী হয়, আর দশ অনীকিনী মিলিত হইলে এক অক্ষৌহিনী হয়। অঙ্কপাতে ২১৮৭০ রথ ২১৮৭০ গজ ১০,৯৩৫৩ পদাতি এবং ৬০৬১০ অশ্বে এক অক্ষৌহিনী হয়। কি বিরাট ব্যাপার! রুষ জাপান সংগ্রামের মুকদেন যুদ্ধ, যাহা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত, কুরুক্ষেত্রের নিকট তাহা খণ্ডযুদ্ধ মাত্র। অবশ্যই অনেকে বলিবেন, পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের এত সৈন্য একত্র করিবার ক্ষমতা কখনই ছিল না, এ সংখ্যাটা কবি কল্পনা মাত্র—এ কথা বলিয়া যদি কেহ সুখী হয়েন হউন, আমরা তাঁহার সুখের কণ্টক হইতে চাই না।

কুরুক্ষেত্র এখনও বর্ত্তমান আছে। দেখিলেই বোধ হয় প্রকৃতিদেবী

এই ভূভাগকে ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যায়ী রণাঙ্গন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ত্তমান দিল্লীর পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া অম্বালা পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ পশ্চিম কাইথল, থাণ্ডবা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। পানিপথ কর্ণাল ট্রাস্তরি থানেশ্বর প্রভৃতি নগব সমস্ত কুরুক্ষেত্রেরই অন্তর্গত।

ভীষ্ম-রক্ষিত কুরুসৈন্য হস্তিনাপুর হইতে আসিয়া যমুনা পার হইয়া কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে পশ্চিম মুখ হইয়া দণ্ডায়মান হইল, আর পাণ্ডবসেনা তদ্বিপরীতে পূর্ব্বমুখ হইয়া অবস্থিত রহিল। যাঁহারা বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্র দেখিয়াছেন, তাঁহাদের যুদ্ধ স্থানের অবধারণ করিতে কোন কষ্ট হইবে না। এখন যেখানে হ্রদ আছে তাহার এক ক্রোশ পশ্চিমে একটা রণাঙ্গন ছিল, অবশ্য বহু রণাঙ্গন ছিল; আজকাল যথায় স্থানুদেবের মন্দির, ভদ্রকালীর মন্দির নির্ম্মিত, ঐ সমস্ত রণক্ষেত্র ছিল, উত্তরদিকে অতি অল্পদিকে সরস্বতী নদীর জলহীন খাদ আছে। (শল্য পর্ব্বের ২৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এই প্রকাণ্ড ভূভাগ মরুভূমি, জঙ্গলাকীর্ণ শস্যক্ষেত্রের উপযোগী নহে, বহুতীর্থ এই কুরুক্ষেত্রে আছে, অধিকাংশই লুপ্তপ্রায়, তবে এখনও অনেক বিদ্যমান আছে। হিন্দুব নিকট এস্থান মহাতীর্থ। আজকাল হ্রদের উপরেই কুরুক্ষেত্র রেল ষ্টেশন হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভগবদ্গীতা প্রকরণ।

কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডব দিগের মহাযুদ্ধে কি ফল ফলিল, তাহার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই; ভারত পুরুষশূন্য হইয়া কি দশায় অবস্থিত

হইলেন—অসংখ্য ভারতবাসী আপনার জীবনযাত্রা কিভাবে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন—তার জন্য আমরা এখন উৎকণ্ঠিত নহি। ভারতরমণীগণ, পতি পুত্র ভ্রাতা পিতা জ্ঞাতি এবং বন্ধু সকলকে হারাইয়া যে গগনভেদী আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই করুণ ধ্বনিতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না। দেশের সামর্থ্য ধ্বংশ হওয়ায় মহাযুদ্ধের পরিণাম দুর্ভিক্ষ ব্যাধি অশান্তি ও দারিদ্র্য ভারতভূমিকে ভীষণ পীড়িত করিয়াছিল, তাহা আমাদিগকে আর ব্যথিত করিতেছে না। অতীতের বিস্মৃতির ঘন আবরণে সমস্তই এখন দৃষ্টির বাহিরে। কুরুক্ষেত্র হস্তী অশ্ব ও নরমুণ্ড প্রোথিত 'রুধির কর্দ্দম হইতে বিমুক্ত হইয়া আবার শ্যামল হইয়াছে। অস্ত্রধারী মস্তকহীন কবন্ধের স্থানে শান্তমূর্ত্তি হলধারী কৃষক শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ায় পরিশ্রান্ত দেহের শ্রান্তি দূর করিতেছে। অগণ্য জীব দেহের মেদাস্থি সমুদ্ভূত পূতিগন্ধময় প্রাণহর বায়ুর স্থানে শেফালিকা শিরীষ পলাশ কেতকী কুঞ্জের পুণ্য ঘ্রাণ পূরিত মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতেছে। ধূলিপটল পাংশুল গৃধ্র শ্যেন কঙ্ক প্রভৃতি অশিব জীবগণের স্থানে বহুল লতাগুল্ম শোভিত শ্যামল বনভূমি মৃগ ময়ূর বানর গো মহিষাদি আনন্দময় পশু পক্ষীর নিবাস স্থান হইয়াছে। গজ বাজীর বীভৎস নাদযুক্ত কর্কশ কোদণ্ড রবের স্থানে কোকিল কুজন ও ভ্রমর গুঞ্জনে কর্ণকুহর পবিত্র হইতেছে।

এই আশ্রম নিষেবিত পবিত্র ক্ষেত্রের সহিত আমাদের দেহ প্রাণ মনের অতিনিকট সম্পর্ক আছে। এই মহাক্ষেত্রে বিশ্বতোমুখ চরাচর গুরুর শ্রীমুখ হইতে যে মোহন মন্ত্র নিঃসৃত হইয়াছিল, আমরা তাহার উত্তরাধিকারী। সেই মহা সংগ্রামের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে শান্তির অমর প্রস্রবণ হইতে সঞ্জীবনী সুধার ধারা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, আমরা তাহার একান্ত পিপাসী। কশ্মলময় বিসিদন্ত ধনঞ্জয়কে বাসুদেব যে

অমৃতধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন সেই জরামরণভয়বারণ পীযুষস্রোতের আমরা প্রার্থী।

এই জ্ঞানময় মন্ত্রপদকে ব্যাসদেব গীতা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই বিশ্বসঙ্গীত সেই কুরুক্ষেত্রে গীত হইয়াছিল। সাধকবর অর্জ্জুন শ্রোতা আর বিশ্বপিতা তাহার গায়ক। কবে আমাদের অর্জ্জুনের মত কাণ হইবে, কবে আমরা সে গান শুনিব?

অনেকেই বলেন ভগবদ্গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। তাঁহাদের বলিবার একটি কারণ আমরা পূর্ব্বে বিচার করিয়াছি, অপর কারণ গুলি এই :—

১ম। সময় বড় অনুপযোগী, যুদ্ধের সময় এত লম্বা ধর্ম্মকথা বলা অসম্ভব।

২য়। অর্জ্জুনের এরূপ সময়ে যুদ্ধ পরাঙ্মুখতা কি সম্ভব? তিনি আজন্ম যুদ্ধবিদ্যায় রত আছেন, কত কত শূরবীর তাঁহার হাতে নিপাত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই; এ যুদ্ধের উদ্যোগও বহুদিন হইতে চলিতেছে তবে শেষকালে তিনি কেন পশ্চাৎপদ হইবেন?

৩য়। বঙ্কিমবাবুপ্রমুখ দলের আপত্তি যে শ্রীকৃষ্ণ কখন মহাভারতে ঈশ্বর বলিয়া উল্লিখিত ছিলেন না এবং গীতায় যখন তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন, তখন সে গীতা অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত। এ আপত্তির কথা আমরা পূর্ব্বে বিচার করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না, ইহা বৈয়াসিক।* মোক্ষধর্ম্ম প্রকরণে আরও দেখিব যে, ভীষ্মকথিত ধর্ম্মই এই গীতোক্তধর্ম্ম এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় এ ধর্ম্মের বহুল প্রচার হইয়াছে। একথা যদি সত্য হয়, তবে গীতা কেন প্রক্ষিপ্ত হইবে। বঙ্কিমবাবুও স্বীকার করিয়াছেন যে, গীতা শ্রীকৃষ্ণের

---

* ৩য় অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মমত, তবে সে মত তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশ না হইয়া বহুকাল পরে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির দ্বারা মহাভারতে ফোরণ স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে এ কথা কি যুক্তিযুক্ত ?

গীতাতেই ত রহিয়াছে——

"ব্যাস প্রসাদাচ্ছ্রুতবানমিদং গুহ্যতমংপরং !
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃস্বয়ং।

এই গীতাজ্ঞান কি যে সে ব্যক্তির আয়ত্তাধীন। কলম ধরিলাম, আর লিখিয়া ফেলিলাম। কেবল কাব্য হিসাবেও জগতে ইহা অতুলনীয়। ভিতরে কি আছে তাহা "ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তিবা।"

এখন আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় আপত্তির কিছু বিচার করিয়া দেখি, কোথায় উপস্থিত হই।

আমি কেন আসিয়াছি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় ছিলাম, কোথায় যাইব, ছিলাম কিনা, থাকিব কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের উপযুক্ত সময় যখন এই দেহের অবসান আগতপ্রায় হয়। ভিষকগণ হতাশ হইয়াছেন, গুন গুন স্বরে রোদন লহরী উঠিতেছে। চরণ আর চলে না, হস্ত আর ধরে না রসনা বলে না, চক্ষু আর দেখে না, যাহাদের লইয়া আজীবন ব্যস্ত ছিলাম—সেই ইন্দ্রিয়গণ পুত্র পৌত্রাদির ন্যায় আর কোন সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহে। তখন কেবল একলা আমি। তখনই নিজের পরিচয়ের কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। যুদ্ধ ও জীবন মরণের সন্ধি সময় এই দাঁড়াইয়া আছি, গুড়ুম ! বাস সবস্থির। এরূপ অবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বই ত মনে আসিবে। অবশ্য জীবনে যাহারা কখন ধর্ম্ম বলিয়া কোন পদার্থের সন্ধান পায় নাই, তাহাদের হয়ত এ সকল প্রশ্ন না আসিতে পারে কিন্তু অর্জ্জুনের মত ব্যক্তির মনে এ সকল প্রশ্ন অবশ্যই উপস্থিত হইবে। আমাদের মত সাধারণ ব্যক্তিরা

হয়ত উইল করিতে অথবা স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা লইয়া বড়ই বিব্রত হইবে। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞেরা ধর্ম্মরক্ষা লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। সুতরাং যুদ্ধের সময় ধর্ম্মকথা উত্থাপনের অসম্ভবতা আছে স্বীকার করিতে পারি না।

আধুনিক যুদ্ধের মধ্যেই ঈশ্বরকে প্রার্থনার জন্য সেনাদলে পাদরি সাহেব নিযুক্ত থাকেন এবং ভীষণ গোলাবর্ষণের সঙ্গে সেনাগণের ভগবৎ আরাধনার কথা প্রায়ই পড়া যায়। যাঁহারা মনে করেন, আকণ্ঠ উদর পূর্ণ করিয়া আহারের পর মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া ধূমপান করিতে করিতে হারমোনিয়ম যন্ত্রের পর্দ্দারধ্বনির সহিত অহং তত্ত্বের আবির্ভাবের সময় তাহারা অবশ্য বলিবেন বই কি, কোথায় যুদ্ধ আর কোথায় ধর্ম্ম ?

দ্বিতীয় আপত্তি—এরূপ সময়ে অর্জ্জুনের বিষাদ হওয়া স্বাভাবিক কিনা ?

একথার উত্তর অর্জ্জুন নিজেই দিতেছেন, সে উত্তরের অর্থ এই —স্বার্থের জন্য এত লোকের ধ্বংশ সাধন কি কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন দেখিলেন তাঁহার লাভ রাজ্য কিন্তু তাহা ত চিরদিনের জন্য নহে, এ রাজ্য তাঁহাকে একদিন ত্যাগ করিতে হইবেই, তবে এই সামান্য দিনের ঐহিক সুখের জন্য এই অসংখ্য প্রাণিহত্যা কি ধর্ম্ম ? বিশেষতঃ, যাহাদের লইয়া রাজ্য করিলে সুখ হইবে তাহাদিগকেই বিনাশ করিয়া এই শ্মশান রাজ্য লইতে হইবে ইহা অপেক্ষা আর কিছুদিন বনে বনে কাটানই ত শ্রেয় !

এরূপ প্রশ্ন ত আমাদের মধ্যে সামান্য লোকের মনেও হয়। জ্ঞাতিকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া বিষয়ের অংশ লইতে অতি পাপাত্মা ভিন্ন আর কাহার রুচি হয় কি ? অর্জ্জুন ত সাধক ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মের জন্য কত কষ্টই না সহ্য করিয়াছেন।

তবে পুনরাপত্তি হইবে, তিনি ত এ অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তবে কার্য্যকালে এত বিষণ্ণ কেন ?

এ কথা সত্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, অনাগত বিষয়ের চিন্তা এবং আগত বা উপস্থিত বিষয়ের গ্রহণ বা কার্য্যে পরিণতি এ দুইটি অবস্থা অতিশয় পৃথক। আমি যুদ্ধ করিব, কত লোককে মারিব, এইভাবে মারিব এ সকল উদ্যোগাবস্থা—আর যখন সেই কার্য্যটি সাধন করিতে হইবে তখন আর মন তত সতেজ থাকে না, ক্লৈব্য বা দুর্ব্বলতা প্রায়ই উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ যখন কার্য্যটি অতি মন্দ যথা—নরহত্যা বা স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার ইত্যাদি।

সেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেত, ডনকান যতদিন তাহার গৃহে আসেন নাই, তাঁহাকে বিনাশ করিবার কত পরামর্শই করিলেন। মন যথেষ্ট দৃঢ় বোধ হইল—কিন্তু যেদিন সেই ডনকান তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইয়াছেন, তাঁহারই পিঞ্জরে নিদ্রিত আছেন তখন ম্যাক্‌বেতের মানসিক দৃঢ়তা পলায়ন করিয়াছে। অভাবনীয় ক্লৈব্য বা দৌর্ব্বল্য আসিয়া চিত্তকে অধিকার করিয়াছে, হাত উঠিল না তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন; ম্যাকবেত জানিতেন যে কার্য্য তিনি করিতেছেন তাহা হেয় স্বার্থ প্রণোদিত!

অর্জ্জুনের কিছুই নূতন হয় নাই, যখন দেখিলেন যে এত জীব এবং জ্ঞাতিগণকে স্বার্থের জন্য বধ করিতে হইবে, অমনি গাণ্ডীব হাত হইতে খসিয়া পড়িল, মুখ শুকাইয়া গেল, শরীর কাঁপিতে লাগিল—বলিলেন,—

"ন কাঙ্খে বিজয়ংকৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ।"

এরূপ ঘটনা দৈনিক।

কেবল সময়ের অনুপযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণকে অবিশ্বাস করিতে আমরা অপারগ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভীষ্ম বধ প্রকরণ।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে বিগতবিষাদ হইয়া মেঘমুক্ত মাতণ্ডের ন্যায় পুনরায় গাণ্ডীবধারী হইয়া সেই সাগরসম কুরুসৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তুরী ভেরী ঢক্কা শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি রণবাদ্য সমূহ তুমুল শব্দে দিক সকল নিনাদিত করিল। শরাসনে শরযোজনা করিয়া সকলেই আক্রমণের জন্য অবস্থিত, আর বিলম্ব নাই নিমেষ মধ্যে উভয় দল উৎপতিত হইবে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের কাণ্ড দেখিয়া সকলে অবাক, তিনি সমর বেশ পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদব্রজে শত্রুসেনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সকলেই শশব্যস্ত—একি ব্যাপার, স্বয়ং রাজা বিপক্ষের সৈন্য মধ্যে যাইতে-ছেন; সেনারা বলাবলি করিতে লাগিল;—হইয়াছে, ইনি ভয় পাইয়াছেন, তাই ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যাইতেছেন; কেহ বলিল, ধিক্ এ ক্ষত্রিয় নহে। কিন্তু যুধিষ্ঠির দৃষ্টি স্থির করিয়া একবারে পিতামহের পদযুগল ধারণ করিলেন এবং বিনীত হইয়া নিবেদন করিলেন, "আপনার সহিত যে আমরা যুদ্ধ করিব, তাহাতে আপনি অনুমতি করুন এবং আশীর্ব্বাদ করুন।" ভীষ্ম বলিলেন, "হে পৃথিবীপতি ভারত! যদি তুমি আমার নিকট এইরূপে না আসিতে, তাহা হইলে আমি তোমার পরাভবের নিমিত্ত অভিশাপ করিতাম, হে বৎস, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, তুমি যুদ্ধ কর, যুদ্ধে জয়লাভ কর; অন্য যাহা কিছু তোমার অভিলাষ থাকে তাহাও ব্যক্ত কর তুমি আমার নিকট কি বর প্রার্থনা

করিবে তাহাও প্রকাশ কর। এরূপ হইলে তোমার আর পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই।

মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নয়, ইহাই সত্য; আমি অর্থ দ্বারা কৌরবদিগের নিকট বদ্ধ রহিয়াছি, অতএব তোমার নিকট আমার বর দিতে অঙ্গীকার বাক্য নিরর্থক। আমি কৌরব-দিগের অর্থে ভৃত্য হইয়াছি, তুমি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কি ইচ্ছা কর প্রকাশ করিয়া বল"। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাকে সুমন্ত্রণা দিন। ভীষ্ম তাহা দিতে স্বীকৃত হইলেন। যুধিষ্ঠির তখন তাঁহাকে তাঁহার পরাজয়ের উপায় বলিতে অনুরোধ করিলেন, ভীষ্ম তাহাতে উত্তর করিলেন "এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় নাই, তুমি পুনর্ব্বার আমার নিকট আসিও"।

এ দৃশ্যের সমালোচনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই,—দেবব্রত-চরিত্র এতই উচ্চ হইয়াছে যে, আমাদিগের কলুষিত বুদ্ধিতে তাহার ধারণা হয় না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, ভীষ্মচরিত্র ক্রমশঃ এত মহৎ হইয়াছে যে সাধারণের বিশ্বাসগণ্ডীর বাহিরে গিয়াছে। পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ দৃশ্যের বিবরণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ভীষ্মার্জ্জুনের সংগ্রাম ভীষ্মার্জ্জুনের মতই হইতেছে। প্রাণীক্ষয় অতি ভয়ঙ্কর ভাবে চলিতেছে, দুই দিন এইভাবে কাটিয়া গেল, তৃতীয় দিবসে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আছে।

মহাভারতে যুদ্ধাংশগুলিতে কিছু বিশেষ লক্ষ্য করিবার নাই। বঙ্কিম বাবু এই পর্ব্বসমূহকে নিকৃষ্ট রচনার মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। অত্যন্ত পুনরুক্তি দোষ এ সকলে বর্ত্তমান থাকিবারই কথা, কারণ যুদ্ধ ব্যাপার একভাবেই হয়, কাজেই বিচিত্রতাহীন সভ্যসমাজে তত রুচিকর হইবে না কিন্তু সাধারণ লোকের হৃদয়গ্রাহিতার পক্ষে এ অংশ গুলি অতি উত্তম। কথক পাঠক মহাশয়রা এই বর্ণনাগুলি অতি সুললিত করেন।

অর্জ্জুন আজ মৃদু যুদ্ধ করিতেছেন। আজ ভীষ্ম সংগ্রামে তপন্ত আদিত্যতুল্য হইয়া পাণ্ডব সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতেছেন, যেন তাহাদিগের ভিতর যুগপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং প্রতোদ হস্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণভক্ত ভীষ্মের আর আনন্দ ধরে না। রথীর হাতে না মরিয়া তাঁহার সারথীর হাতে নিহত হইবার বড় আগ্রহ, তাই তিনি মহানন্দে বলিলেন,—

"এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস নমস্ততে মাধব চক্রপাণে।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ রথোত্তমাৎ সর্ব্ব শরণ্য সংখ্যে॥
ত্বয়া হতস্যাপি মমাদ্য কৃষ্ণ শ্রেয়ঃ পরস্মিন্নিহ চৈব লোকে।
সম্ভাবিতস্ম্যন্ধকবৃষ্ণিনাথ লোকৈস্ত্রিভিবীর তবাভিযানাৎ॥"

"এস এস হে জগন্নিবাস, তোমাকে নমস্কার; হে মাধব হে গদাসিধর হে লোকনাথ হে সর্ব্বশরণ্য, তুমি রণে আমাকে এই রথোত্তম হইতে নিপাতিত কর। হে কৃষ্ণ, আজ তুমি আমাকে নিহত করিলে আমার ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয় হইবে, হে অন্ধকবৃষ্ণিনাথ, হে বীর তোমা কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলে আমি লোকে বহু মান্য হইব ও আমার প্রতাপ ত্রিলোক বিখ্যাত হইবে।"

উপরোক্ত বৃত্তান্তটি নবম দিনের যুদ্ধেও উল্লিখিত হইয়াছে ঘটনা এবং ভাষা একই ভাবের। বিশেষতঃ এ ঘটনাটি নবম দিনের যুদ্ধেই হওয়া

সম্ভব। লিপিকারের ভ্রম বশতঃ দুই দিনেই লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

যুদ্ধের অষ্টম দিবসে দুর্য্যোধন পিতামহের শিবিরে আসিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "আপনি কত বার বলিয়াছেন যে সোমক পাঞ্চাল কৈকয় ও করুষদিগকে সংহার করিব আপনার সেই কথা সত্য হউক আপনি সমাগত পার্থ ও সোমকদিগকে নিহত করিয়া সত্যবাদী হউন। আর যদি পাণ্ডবদিগের প্রতি আপনার দয়া বা আমার মন্দ ভাগ্যবশতঃ আমার প্রতি আপনার দ্বেষপ্রযুক্ত আপনি পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করেন তবে যুদ্ধ শোভী কর্ণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করুন তিনি পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিবেন।"

ভীষ্মপর্ব্ব—৯৪ অঃ।

এ কথা শুনিয়া লোক স্বভাবজ্ঞদিগের অগ্রণী মহামনা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের বাক্যবানে অতি বিদ্ধ ও তৎপ্রযুক্ত মহাদুঃখে সমাবিষ্ট হইয়া অনুমাত্রও অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না। তিনি তাহার বচন-শলাকায় ক্ষুণ্ণ হইয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন, পরে দুর্য্যোধনকে সামবাক্যে বলিলেন, "দুর্য্যোধন! আমি যথাশক্তি তোমার প্রিয়কার্য্যের চেষ্টা করিতেছি এবং অনুষ্ঠানও করিতেছি, তোমার প্রিয় কামনায় সমরানলে প্রাণ আহুতি দিতেও উদ্যত হইয়াছি তবে তুমি কি জন্য আমাকে বাক্যশল্যে বিদ্ধ করিতেছ? অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রেরা যে রণে অজেয় তদ্বিষয়ে আর অধিক কি বলিব। শৌর্য্য সম্পন্ন অর্জ্জুন যখন খাণ্ডবে ইন্দ্রকে রণে পরাজয় করিয়া অগ্নির তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন তাহাই উহার যথেষ্ঠ নিদর্শন। হে মহাবাহো গন্ধর্ব্বেরা তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলে অর্জ্জুন তাহাদিগের হস্ত হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলেন তাহাই নিদর্শন।

হে প্রভো, তোমার শূর ভ্রাতৃগণ ও সুতপুত্র কর্ণ যে পলায়ন করিয়াছিল তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। বিরাট নগরে গো গৃহে আমরা সকলে মিলিত হইলেও আমাদিগকে যে একমাত্র অর্জ্জুন আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। সেই যুদ্ধে অর্জ্জুন পৌরুষাভিমানী কর্ণকে যে পরাজয় করিয়া বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন।"

* * * দুর্য্যোধন তুমি মোহ প্রযুক্ত কার্য্যাকার্য্য বুঝিতে পার না, মুমূর্ষু ব্যক্তি যেমন সমুদয় বৃক্ষকে কাঞ্চনময় দর্শন করে তুমিও সেই প্রকার বিপরীত দর্শন করিতেছ।" এরূপ ভাবে সম্বোধন করিয়া শেষে দুর্য্যোধনের প্রীতিউৎপন্ন করিয়া বলিলেন "হে গান্ধারীনন্দন! তুমি সুখে নিদ্রা যাও আমি কালমহাসংগ্রাম করিব, যাবৎকাল পৃথিবী থাকিবে তাবৎকাল পৃথিবীতে আমর এ যুদ্ধের খ্যাতি থাকিবে।"

"সুখংস্বপিহি গান্ধারে শ্বোস্মিকর্ত্তা মহারণং।
যং জনাঃ কথয়স্যন্তি যাবৎ স্থাস্যতি মেদিনী॥

ভীষ্মপর্ব্ব—৯৮ অঃ—২৩।

হইয়াছিলও তাহাই। নবম দিনে ভীষ্ম যুদ্ধ এই রূপেই বর্ণিত আছে, তাই সেই রাত্রিতে ভীষ্ম বধের পরামর্শ হইয়াছিল। নবম দিনের ভীষ্মোক্তি এইরূপ—

"এহ্যেহি পুণ্ডরীকাক্ষ দেব দেব নমস্ততে॥
মামদ্য সত্বতশ্রেষ্ঠ পাতয়স্ব মহাহবে॥
ত্বয়াহি দেব সংগ্রামে হতস্যাপি মমানঘ॥
শ্রেয় এব পরংকৃষ্ণ লোকে ভবতিসর্ব্বতঃ॥
সম্ভাবিতোস্মি গোবিন্দ ত্রৈলোক্যেনাদ্যসংযুগে॥

পূর্ব্ব বাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র।

ভাগবতকার এ ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া ভক্তের জন্য ভগবানের কত

ভাবনা তাহাই দেখাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন "শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন আর ভীষ্মের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করাইবেন সুতরাং ভক্তবৎসল ভগবান আর প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিলেন না।"

ভাগবত প্রথম স্কন্ধ—৯ম অধ্যায়।

ভীষ্মের এরূপ ইচ্ছার মহাভারতের কোন স্থানে প্রকাশ নাই। আর কৃষ্ণভক্ত ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা ভক্তির চিহ্ন নহে। তবে কথাটা বেশ মুখরোচক গোস্বামীদিগেরও কথক মহাশয়দের ব্যবসায়ের অনুকূল।

যাহাহউক এই নবম দিনের যুদ্ধের অন্তর্গত এই ঘটনাটি ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

অন্যান্য দিনের যুদ্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। কে কেমন যুদ্ধ করিতেছে তাহারই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

চতুর্থ দিবসের যুদ্ধে ভীমসেন এবং তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ কৌরবগণকে পরাজিত করিয়াছেন এবং রাজা দুর্য্যোধনের কয়েক ভ্রাতা হত হইয়াছেন। তিনি অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আমার মতে ত্রিলোক মধ্যে আপনাদের ন্যায় যোদ্ধা কেহ নাই তথাপি যখন পাণ্ডবেরা জয়যুক্ত হইতেছে তখন নিশ্চয়ই উহারা কাহাকেও আশ্রয় করিয়াছে, যাহাতে তাহারা এতাদৃশ জয়লাভ করিতেছে আপনি সেই ব্যক্তি কে তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম অবসর বুঝিয়া দুর্য্যোধনকে বলিতে লাগিলেন "আমি বহুবার তোমাকে বলিয়াছিলাম কিন্তু তুমি আমার বাক্য কখনও গ্রহণ কর নাই, এখনও বলিতেছি, তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর, আমার মতে সন্ধি করাই তোমার এবং পৃথিবীর মঙ্গলজনক। তুমি পাণ্ডবদিগের

সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখী হইয়া সকল সুহৃদ ও বান্ধবগণকে আনন্দিত করতঃ এই পৃথিবী উপভোগ কর। হে বৎস! তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগকে অবমানিত করিয়াছিলে, আমি তোমাকে মুক্তকণ্ঠে নিবারণ করিলেও তুমি তাহা শুন নাই তাহারই ফল এক্ষণে উপলব্ধি হইতেছে। অক্লিষ্টকর্ম্মা পাণ্ডবেরা যে অবধ্য তাহার কারণ বলিতেছি, অবধান কর। কৃষ্ণ রক্ষিত পাণ্ডবদিগকে যে কেহ রণে পরাজিত করে এতাদৃশ প্রাণী লোক মধ্যে কেহ নাই ও ছিলও না, কখনও ভবিষ্যতে হইবেও না।" অতঃপর কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব কীর্ত্তন করিয়া পরিণামে বলিলেন, দেখ, "যে পক্ষে কৃষ্ণ" সেই পক্ষে ধর্ম্ম, যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয়।" অতএব তুমি সন্ধি কর।

পূর্ব্বের ন্যায় এ সকল কথা বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত দুর্য্যোধনের দৃঢ়হৃদয়ে কোন কার্য্যই করিল না। তিনি দৃঢ়তর হইয়া পঞ্চমদিবসের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দশম দিনের যুদ্ধ।

অতিবৃদ্ধ দেবব্রত সংগ্রামে অনিবার্য্য হইয়াছেন, গত দিবসের লোমাঞ্চকর যুদ্ধে বাহিনীকে "ভয় বিহ্বলং" "পরাবৃত্তং" ও "পলায়ন-পরায়ণং" দেখিয়া পাণ্ডবেরা শান্তিহীন হইলেন এবং সেই রজনীতেই সৃঞ্জয়, বৃষ্ণিগণ এবং অন্যান্য যোদ্ধ গণ সমবেত হইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির একেবারে হতাশ হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "বনং যাস্যামি দুর্দ্ধর্ষ শ্রেয়োমেতত্র বৈ গতং।" আমার বনে যাওয়াই ভাল, তথায়ই আমার মঙ্গল দেখিতেছি। কৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন, শেষে বলিলেন যদি অর্জ্জুন ভীষ্মকে বধ করিতে ইচ্ছা না করেন তা হলে আমাকে নিযুক্ত করুন। আমি ভীষ্মকে যমালয়ে প্রেরণ করি,—তবে অর্জ্জুন উপপ্লব্যে সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি সময়ে ভীষ্মকে পাতিত করিবেন। তাঁহার পক্ষে ভীষ্ম বিনাশ অসম্ভব নহে। যুধিষ্ঠির বলিলেন, তোমার আর অস্ত্রধারণ করিয়া মিথ্যাবাদী হইবার আবশ্যক নাই, তুমি আমাদিগকে সুপরামর্শই দাও।

এ কথার পর যুধিষ্ঠিরের মনে পড়িল, যে ভীষ্ম তাঁহাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পাণ্ডবদিগকে সুপরামর্শ দিবেন এবং দুর্য্যোধনের জন্য যুদ্ধ করিবেন। অতএব চল আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার নিধনোপায় কি, তিনি নিজেই তাহা প্রকাশ করিবেন এবং আমরা সেই মত কার্য্য করিব। এই পরামর্শই স্থির হইল, আর সেই রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ এবং পঞ্চভ্রাতা ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

অনেকে হয়ত বলিবেন যে ইঁহারা কৌরবশিবিরে গেলেন আর তাহারা তাঁহাদিগকে কিছু বলিল না, বড় আশ্চর্য্য।

আজকাল আশ্চর্য্যই বটে। এইখানেই জগতের অন্যান্য জাতি হইতে হিন্দুদিগের পার্থক্য। সে সময়ে লোক সকল স্বধর্ম্মরত ছিল; "বিমুক্তশস্ত্রকবচাঃ" হইয়া শত্রু সৈন্য মধ্যে যথেচ্ছা যাইতে পারিতেন, যেন তেন প্রকারেণ শত্রুবধ অতিঘৃণিত কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত।

পাণ্ডবগণ পিতামহকে "প্রণম্যশিরসা" তাঁহার শরণাগত হইলেন। পিতামহ প্রথমেই কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "স্বাগতং তব বার্ষ্ণেয়।" শ্রীকৃষ্ণ কুটুম্ব, পাণ্ডবেরা জ্ঞাতি কৃষ্ণের কোন স্বার্থ নাই, পাণ্ডবেরা

অর্থী হইতে পারে। পরে অর্জ্জুন এবং যুধিষ্ঠিরদিগকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "আমি তোমাদের প্রীতিবর্দ্ধন কি কার্য্য করিতে পারিব— যত দুষ্কর কর্ম্মই হউক আমি সর্ব্বাত্মাদ্বারা করিব।"

যুধিষ্ঠির ক্রমশঃ তাঁহার সেই ছোট প্রশ্নটি প্রকাশ করিলেন, "কথং জয়েম ধর্ম্মজ্ঞ কথং রাজ্যং লভেম।" হে ধর্ম্মজ্ঞ কি করিয়া জয়লাভ করি কি করিয়াই বা রাজ্যলাভ করি?

আর "প্রজানাং সংক্ষয় নস্যাৎ" প্রজাগণের ক্ষয় কিসে না হয় তাহার উপায় বলুন। আর "ভবান হিনো বধোপায়ং ব্রবীতু স্বয়মাত্মনঃ" আপনি আপনার বধোপায় ব্যক্ত করুন।

আজকাল এরূপ প্রশ্ন হাসিতে হাসিতে করিলেও গণ্ডদেশ মহাকপটিকার আশ্রয় হয় না হয় শ্রবণ যুগল দৃঢ় মর্দ্দনে লোহিতাভ হইয়া শোভা পায়। ভীষ্মদেব দ্বিধাহীন যেমন প্রশ্ন অমনি উত্তর তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন "দেখ আমি জীবিত থাকিতে তোমার কোন প্রকারে জয় হইবার সম্ভবনা নাই, আমি যুদ্ধে পরাজিত হইলে তোমরা জয়ী হইতে পারিবে, অতএব যদি তোমরা রণে জয়ী হইতে ইচ্ছাকর তবে আমাকে শীঘ্র প্রহার কর। আমি অনুমতি করিতেছি তোমরা যথাসুখে আমাকে প্রহার কর। তোমরা যে আমাকে আমার বধোপায় জ্ঞাত হইতে আসিয়াছ আমি ইহাকে আমার ভাগ্য মনে করি। আমি হত হইলেই সকলেই হত হইবে অতএব যেরূপ বলিলাম সেইরূপ কর।" তিনি আরও বলিলেন "আমি রণে সযত্ন হইয়া কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শস্ত্রধারী হইলে ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরও আমাকে জয় করিতে সমর্থ নয়, আর আমি ন্যস্ত শস্ত্র হইলে এই মহারথেরাই আমাকে নিহত করিতে পারেন। শস্ত্রত্যাগী পতিত বিমুক্ত-কবচ, বিমুক্তধ্বজ পলায়মান ভীত তোমারই আমি এইরূপ বলিয়া শরণাপন্ন, স্ত্রীজাতি স্ত্রীজাতির নাম ধারী বিকল

এক পুত্রক নিঃসন্তান ও পাপী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে আমার অভিরুচি হয় না। আমার পূর্ব্বকৃত সংকল্প শ্রবণ কর, কাহার অমঙ্গল্য ধ্বজ দেখিলে আমি কোন প্রকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিব না। দ্রুপদ রাজার পুত্র মহারথ শিখণ্ডী যিনি তোমার সৈন্য মধ্যে অবস্থিত তিনি পূর্ব্বে স্ত্রীছিলেন পরে পুরুষ হয়েন ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ। অর্জ্জুন বস্মিত হইয়া সেই শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তীক্ষ্ণ বান সমূহ দ্বারা আমাকে নিহত করিবেন। সেই শিখণ্ডীর রথধ্বজ অমঙ্গল্য বিশেষতঃ তিনি স্ত্রীপূর্ব্বা সুতরাং আমি শস্ত্রধারী হইয়া কোন প্রকারে তাঁহাকে প্রহার করিতে অভিলাষ করি না। পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় ঐ শিখণ্ডীর অন্তরালে থাকিয়া চতুর্দ্দিক হইতে শরনিকরে সত্বর আমাকে আঘাত করিবেন। আমি রণ সমুদ্যত হইলে মহাভাগ কৃষ্ণ এবং ধনঞ্জয় ব্যতীত কেহ আমাকে নিহত করে জগতে এমন কাহাকেও দেখিতে পাইনা, অতএব এই ধনঞ্জয় আত্তশস্ত্র ও যত্নবান হইয়া সেই পাঞ্চাল রাজপুত্র শিখণ্ডীকে সম্মুখস্থ করিয়া আমাকে নিপাতিত করুন, তাহা হইলেই নিশ্চয় তোমার জয় হইবে।" শেষে বলিলেন "এতৎ কুরুধ্ব কৌন্তেয় যথোক্তং বচনং মম।"

এ আত্ম বলিদানকে কি বলিব; এমন ভাষা নাই যাহার দ্বারা দেবব্রতের এই চিত্তানুশীলন প্রকাশ করা যায়। দেবগণের উপরে তিনি উঠিয়াছেন, দেবত্বপদ তাঁহার কর্ম্মের নিকট সামান্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

ভীষ্মের এই কার্য্যে দুইটি আপত্তি হইতে পারে।

১ম। তিনি একের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া এরূপ সন্ধান অপর পক্ষকে জ্ঞাত করাইয়া কর্ত্তব্যচ্যুত হইলেন কি না?

২য়। নিজের বধোপায় ব্যক্ত করা ধর্ম্ম সঙ্গত কি না?

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র শিখণ্ডী ব্যাপার প্রক্ষিপ্ত বলিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিতে সাহস করি নাই। কেন করি নাই তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে শিখণ্ডীর কথা স্পষ্ট রহিয়াছে তাহা ব্যতীত ভীষ্ম নিজে কতবার শিখণ্ডীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও আমরা দেখিয়াছি এ সকল কারণে আমরা প্রক্ষেপের পক্ষপাতী নহি। আমরা ক্রমশঃ দেখিব শিখণ্ডীর একটা গুরুতর উপযোগিতা রহিয়াছে। যদি শিখণ্ডী ব্যাপার প্রক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে যে কবি এ কার্য্য করিয়াছেন তাঁহার কবিত্ব এবং শিল্প তুলনাহীন।

ভীষ্ম বধে শিখণ্ডীর প্রয়োজনীয়তা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন, অর্জ্জুন ভীষ্মবধের শক্তি রাখেন এবং তিনি উপপ্লব্য নগরে পিতামহকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহাকে তিনিই শরাশায়ী করিয়াছেন, শিখণ্ডী করেন নাই। পাছে কেহ মনে করেন যে শিখণ্ডী যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে পরাভূত করিলেন তাই সে ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য মহাকবি ভীষ্মের মুখে এই কথা দিয়াছেন।

অর্জ্জুনস্য ইমে বানাঃ নেমে বানাঃ শিখণ্ডিনঃ।
কৃন্তন্তি মম গাত্রাণিমাঘমাং সেগ্বাইব।"
সর্ব্বেহাপি ন মে দুঃখং কুর্য্যবন্যো নরাধিপা। ভী: পঃ ১১৯।৬৫।৬৬।

এই যে অশনি সম মর্ম্মভেদী যমদূত সম দৃঢ়াবরণছেদী শর সকল আমার শরীরকে মাঘসাকে (কাঁকড়াকে) সেগ্বার (উদরস্থ কাকড়া শাবক) ন্যায় কর্ত্তন করিতেছে এত কখনই শিখণ্ডীর বান নয়। ইহারা অর্জ্জুনেরই বান।

ইহাতেও যদি কাহারও সন্দেহ থাকে তাহাও মহাকবি শিবারণ করিয়াছেন। ভীষ্ম তনুত্যাগ করিলে, তাঁহার জননী গঙ্গাদেবী এ কথা শুনিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই বলিয়া বিলাপ করিতে

লাগিলেন যে পরমযোদ্ধা জামদগ্ন্য যাঁহার যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারেন নাই, তাঁহাকে আজ শিখণ্ডী পাতিত করিয়াছে ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখ কি হইতে পারে। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—

"স এব ক্ষত্রধর্ম্মেণ অবধ্যত রণাজিরে।
ধনঞ্জয়েন নিহতো নৈব দেবি শিখণ্ডিনা॥

তিনি ক্ষত্র ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া রণাঙ্গনে ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন শিখণ্ডী দ্বারা নহে। অনুশাসন প ১৬৮।৩২

স্থির হইল অর্জ্জুনই পিতামহকে নিহত করিয়াছেন। তবে শিখণ্ডীর আবরণ কেন? এ কথার উত্তরে পাঠককে কিছু পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সংখ্যা কৌরবদিগের অপেক্ষা অনেক কম; তাঁহাদের সপ্ত অক্ষৌহিনী এবং দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিনী। নবম দিবস, যুদ্ধেতে পাণ্ডবদিগেরই বহু সৈন্যক্ষয় হইয়াছে। ভীষ্ম দশদিন যুদ্ধ করেন তাহাতে কৌরবগণের মাত্র এক অক্ষৌহিনী সেনাধ্বংশ হয় আর দশদিনে পাণ্ডবদিগের সৈন্য একা পিতামহই এক অক্ষৌহিনীর উপর নিহত করিয়াছিলেন তাহার উপর অন্যান্য যোদ্ধারাও বহু সেনা মারিয়াছেন। এরূপ ভাবে যুদ্ধ চলিলে যুধিষ্ঠিরের জয়াশা স্বপ্নমাত্র হইবে। ভীষ্ম এমন যুদ্ধ করিতেছেন যে অর্জ্জুন তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিতেছেন না। ভীষ্মের কিছুমাত্র ছিদ্র লক্ষ্য হয়না তখন উপান্তর না দেখিয়া যুধিষ্ঠির ভীষ্মের শিবিরে তাঁহার বধোপায় জানিতে গিয়াছেন। ভীষ্ম বধোপায় ব্যক্ত করিলেন কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহাকে বধ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন—

"ক্রীড়তা হি বাল্যে বাসুদেব মহামনা।
পাংশু রুধিত গাত্রেণ মহাত্মা পরুধীকৃতঃ॥"

বালককালে ধূলি লগ্নগাত্রে ক্রোড়ে উঠিয়া তাঁহার অঙ্গ কত মলিন করিয়া দিয়াছি এখন তাঁহাকে কেমন করিয়া বধ করিব? আমার জয় হউক বা না হউক আমি উহাকে বধ করিতে পারিব না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন ভীষ্ম কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন হইয়াছেন এবং তিনি আততায়ী হইয়াছেন তাঁহাকে অবশ্য বধ করিতে হইবে নচেৎ তোমাদের রাজ্য প্রাপ্তি হইবে না। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মে অবস্থিত আছ "আততায়িনং আয়ান্তং হন্যাৎ" অতএব তুমি মমতা পরিত্যাগ কর এবং ভীষ্মকে নিপাত কর।

ঐ মমতাই অর্জ্জুনকে ভীষ্ম বধ করিতে দিতেছেনা শক্তি থাকিলেও অর্জ্জুন ভীষ্মের সম্মুখে মৃদু হইয়া যায়েন তাঁহার যুদ্ধে একাগ্রতার অভাব হয় সুতরাং ভীষ্মকে তিনি পরাস্ত করিতে সমর্থ হইতেছেন না। অথচ ভীষ্ম নির্ম্মম তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান মমতাকে সম্পূর্ণ তিরোহিত করিয়াছে, অর্জ্জুনকে তিনি প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসেন এমন কি তাঁহাদের জয় হউক সে ইচ্ছাও রাখেন কিন্তু তাহাতে কর্ত্তব্যের ত্রুটি প্রবেশের অবসর নাই। মমতা থাকিলে একাগ্রতা হয়না তাহার দৃষ্টান্ত বভ্রুবাহনের হস্তে অর্জ্জুনের পরাভব এবং লবের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের পরাজয়।

অর্জ্জুন মমতায় ভীষ্ম অপেক্ষা রণে যে পরিমাণে লঘু হইয়াছেন শিখণ্ডীর সাক্ষাৎ তাহা অপেক্ষা ভীষ্মকে অধিকতর লঘু করিল, তবে অর্জ্জুন তাঁহাকে নিপাত করিতে সমর্থ হইলেন। শিখণ্ডীর উপযোগিতা এই স্থানে, নচেৎ অর্জ্জুন বোধহয় ভীষ্ম বধে সমর্থ হইতেন না আরও কিছুদিন তিনি যুদ্ধ করিলে পাণ্ডব সৈন্য নির্ম্মূল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল; অষ্টাদশ দিবসে তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইত না ব্যাসকে মহাভারত অন্যভাবে লিখিতে হইত। শিখণ্ডী ব্যাপার প্রক্ষিপ্ত নহে বলিয়াই বোধ হয়।

প্রক্ষিপ্তবাদীরা বোধহয় বলিবেন যাঁহারা ভীষ্মের পক্ষপাতী তাঁহারা

দেবব্রতের অর্জ্জুন হস্তে পরাভব লাঘবের জন্য একটা গল্প খাড়া করিয়াছেন। অর্জ্জুনের শিখণ্ডীকে সহায় করা উচিৎ হয় নাই। সম্মুখ সমরে তাঁহাকে নিপাত করিলে তাঁহারি গৌরব আরও অধিক হইত। আর ভীষ্ম যে পার্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ধনুর্দ্ধর তাহা প্রমাণ হইত। শিখণ্ডীর সাহায্য লওয়ায় উভয়ের মধ্যে কে বড় তাহার নিশ্চয়তা নাই কারণ যুদ্ধের অবস্থা উভয় পক্ষের সমান ছিল না। ভীষ্ম শিখণ্ডীকে আঘাত করিবেন না অথচ শিখণ্ডী তাঁহাকে যথেচ্ছা প্রহার করিবেন কিন্তু এরূপ অবস্থার জন্য ত অর্জ্জুন দায়ী নহেন, ভীষ্ম নিজেই এ অবস্থা উৎপন্ন করিয়াছেন। এ ন্যূনতা তাঁহার স্বকৃত।

আর এক কথা যদি প্রক্ষেপকারীর উদ্দেশ্য ভীষ্মকে অর্জ্জুন অপেক্ষা বড় বা সমকক্ষ দেখান হয় তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয় নাই কারণ অর্জ্জুনের হস্তে ভীষ্মের এই প্রথম পরাভব নহে, পূর্ব্বে গোহরণ যুদ্ধেও অর্জ্জুন তাঁহাকে পরাভূত করিয়াছেন এবং এ কথা ভীষ্মদেব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। অধিকন্তু ভীষ্ম আরও বলিয়াছেন, যে তিনি জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর অর্জ্জুন যুবা, উভয়ের শিক্ষা সমান হইলেও বয়সের জন্য রণক্ষেত্রে তারতম্য হইবেই হইবে। তাহা হইলে দেখা যায় প্রক্ষেপে কেবল পণ্ডশ্রম হইয়াছে।

অবস্থা এইরূপ,—ভীষ্ম যখন দুর্য্যোধনের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে তিনি তাঁহার হইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু পাণ্ডবদিগকেও সুপরামর্শ দিবেন,—আর দ্বিতীয়ত তিনি শিখণ্ডীকে প্রহার করিবেন না। কথাটা অনুক্রমণিকাতেও উল্লিখিত আছে যথা—

"যদা শ্রৌষং মন্ত্রিণং বাসুদেবং তথা
ভীষ্মং শান্তনবং তেষাং——"

দুর্য্যোধন ইহা স্বীকার করিয়াছেন, তবে আর ভীষ্মের দোষ কোথায়? যুধিষ্ঠির সুপরামর্শ পাইবার অধিকারী জানিয়া, পিতামহের নিকট গিয়াছেন এবং যুধিষ্ঠিরের বিবেচনায় যাহা সুপরামর্শ বলিয়া স্থির হইয়াছে তাহাই তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন। ভীষ্ম তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন কি? ভীষ্মের চক্ষে তাঁহার পরাভবের উপায় সুপরামর্শের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমাদের চক্ষে বধোপায় জিজ্ঞাসা বিনা বাক্যব্যয়ে সপাদুকা পদাঘাতকে বক্ষঃদেশে আহ্বান করা মাত্র।

ভীষ্ম বধোপায় বলিয়াছেন, কিন্তু সে উপায় সাধনের বা কার্য্যে পরিণতির কোন কথা যুধিষ্ঠিরকে বলেন নাই। তাঁহার বলার অর্থ এই, যদি সক্ষম হও তবে শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে আসিও আমার ছিদ্র দেখিতে পাইবে ইহাতে পূর্ব্ব কথিত প্রতিজ্ঞা না থাকিলেও কোন দোষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

দশম দিনের সমর ব্যাপার অধ্যয়ন করিলে বেশ দেখা যায় অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সঙ্গে করিয়া যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন। সকল কৌরবগণই জানিতেন যদি শিখণ্ডী ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে, তবেই বড় বিপদ সেইজন্য অন্য কৌরবগণ প্রাণপণ করিয়া শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখ হইতে অপসৃত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অপর দিকে যাহাতে শিখণ্ডী ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী থাকিতে পারেন তাহার চেষ্টা হইতেছে। ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে ভীষ্মও অমানুষিক তেজে পাণ্ডব সৈন্য নিপাত করিতেছেন। ভীমার্জ্জুনের সমক্ষে কেহ স্থির হইতে পারিতেছে না, অবশেষে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে অর্জ্জুন কৌরব সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া শিখণ্ডীকে লইয়া পিতামহের সহিত রণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্মও অমিত বিক্রমে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। সুতরাং ভীষ্মের

কর্ত্তব্যচ্যূতি দেখা যায় না, তিনি অর্জ্জুনকে কিছুমাত্র অনুগ্রহ করেন নাই।

নবম দিন রাত্রিতে পাণ্ডবগণ পিতামহকে "প্রণম্য শিরসা" তাঁহার শরণাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে আসিয়াছেন। তিনি প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বাগতং তে বাষ্ণের্য়" ? শ্রীকৃষ্ণ কুটুম্ব, পাণ্ডবেরা জ্ঞাতি, শ্রীকৃষ্ণের কোন স্বার্থ নাই, পাণ্ডবেরা অর্থী তাই যুধিষ্ঠির বড় হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই প্রথম সম্ভাষণ করিলেন। এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ভীষ্ম জানিতেন, যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই ধর্ম্ম তাঁহার নিকট ইহা অব্যভিচারী সত্য যুধিষ্ঠির তাঁহার সেই বধোপায় এবং কি করিলে রাজ্য লাভ হয়, প্রশ্ন করিলে ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্ম বুঝিলেন, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে বিলম্ব হইতেছে, আর সেই বিলম্বের কারণ তিনি এবং তাঁহার রক্ষিত কৌরবগণ। শ্রীকৃষ্ণ কোন কথাই বলেন নাই, ভীষ্মের নিকট তাঁহার যুধিষ্ঠিরের সহিত আগমনই যথেষ্ট। ভীষ্মের চৈতন্য হইল, তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে অনুভব করিলেন, তিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। যে বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রতী হইয়াছেন, পরমবৈষ্ণব দেবব্রত তাহার প্রধান আততায়ী। তাঁহার সমক্ষে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নটি এই মর্ম্মে প্রতিভাত হইল।

"ভারতে শান্তিময় ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিৎ কি ভীষ্মের সমগ্র-শক্তি সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে প্রযুক্ত হওয়া বিধেয় ? তাঁহার বিবেক উত্তর করিল, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়াই উচিৎ।

কর্ত্তব্য জ্ঞানের উদয়ে হৃদয়ে অপার আনন্দ হইয়াছে, তাই তিনি যুধিষ্ঠির বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—"এবং হি সুকৃতং মন্যে ভবতাং বিদিতোঽহং" আমার বড় সৌভাগ্য যে আমি তোমাদের নিকট

(বধোপায় বিষয়ে) বিদিত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের শিবিরে তাঁহার বধোপায় জানিতে আগমনের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—

"বিপরীতো মহাবীর্য্যো গতসত্ত্ব হৃচেতন।
ভীষ্মঃ শান্তনবো নূনং কর্ত্তব্যং নাববুধ্যতে॥"

মহাবীর্য্য ভীষ্ম বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তিনি গতসত্ত্ব অচেতন প্রায় (বুদ্ধিহীন) এই নিমিত্ত তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন না।

সাধারণের উপকারার্থ তাঁহার মৃত্যুই এখন 'কর্ত্তব্য', শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে যাইয়া সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগাইয়া দিলেন। কিন্তু কি উপায়ে সে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তিনি ত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কারণ যুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্ম এবং যুদ্ধ করিতে তিনি প্রতিজ্ঞাত। সুতরাং যুদ্ধে মৃত্যুই এক উপায় অন্য পন্থা নাই। দেশের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ হওয়াই ধর্ম্ম। কাজেই ভীষ্মের ধর্ম্মচ্যুতি হয় নাই।

ভীষ্ম ভারতের হিতার্থে বধার্হ হইয়াছেন, তাই কৃষ্ণ অর্জ্জুন তাঁহাকে বিনাশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে বুঝাইলেন, ধর্ম্মের চক্ষে ভীষ্ম হন্তব্য পিতামহ বলিয়া তোমার মমতা বিস্মৃত হইতে হইবে।

দেশের সমক্ষে পিতা মাতা ভ্রাতা কেহই গুরুতর নহে। কর্ত্তব্য কখন প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। তুমি কৃতার্থ হও বা না হও, সিদ্ধি হউক বা না হউক, যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবশ্য অনুসরণীয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাই আদেশ করিলেন, "জহি ভীষ্মং স্থিরোভূত্বা।" অর্জ্জুন ধর্ম্ম বুঝিয়া স্বীকার করিলেন।

শিখণ্ডীকে অগ্রে স্থাপন করিয়া যুদ্ধ কি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে? ভীষ্ম স্বয়ং এইরূপ করিতে বলিয়াছেন, ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য হইলে তিনি

কথনই অর্জ্জুনকে এরূপ উপদেশ দিতেন না। তাহা হইলে সুপরামর্শ না হইয়া কুপরামর্শ দেওয়া হইত। শ্রীকৃষ্ণও এ কার্য্যটা অন্যায় বলিতেছেন না বরং অনুমোদনই করিলেন, তা হইলে এ কর্ম্ম কথনই অন্যায় ছিল না। যুদ্ধে বিপক্ষের তেজহানি এবং ছিদ্রান্বেষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভীষ্মের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়াছে, যুদ্ধের নিয়মানুসারে সে দৌর্ব্বল্যের সদ্ব্যবহার করা অপর পক্ষের উচিৎ, নচেৎ পর পক্ষ উত্তম যুদ্ধবিৎ নহেন। যিনি বিপক্ষের ছিদ্র জানিয়া তাহার অনুগমন না করেন, তাহা হইলে যত সৈন্য হত হইবে তাহার জন্য ছিদ্রে ক্ষমাকারীর দায়ী হইতে হইবে। যদি অর্জ্জুন পূর্ব্বে জানিতেন যে, পিতামহ শিখণ্ডীকে দেখিলে বিমুখ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার প্রথম দিনই এই উপায় অবলম্বন করা উচিৎ ছিল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উপায়ের অন্যায্যত ন্যায্যতা নাই, বিশেষত্ব এই যে উপায়টি ভীষ্মের মুখ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে দেবব্রতের দেবচরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, কৃষ্ণার্জ্জুনের চরিত্রে কোন কলঙ্ক দেখা যায় না।

এরূপ ঘটনা কর্ণের সহিত যুদ্ধেও বর্ণিত রহিয়াছে। কর্ণ যুদ্ধ করিতে করিতে এমত স্থানে উপস্থিত হইলেন, যে তাঁহার রথচক্র ভূমিতে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে, তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন, "মুহূর্ত্তং ক্ষম পাণ্ডব" আমি রথচক্র উঠাইয়া লই, পরে যুদ্ধ করিব, কর্ণ চক্রোত্তলন করিতেছেন, সেই অবসরে কর্ণকে বিনাশ করিলেন। ইহাতে অর্জ্জুনের কি দোষ তুমি আপনাকে সামলাইতে পারিলে না, ইহা তোমার ত্রুটি শত্রু সে ছিদ্র ক্ষমা করিবে কেন?

শিখণ্ডীর পার্শ্বে থাকায় পিতামহ অর্জ্জুনকে নিবাচরণ করিতে পারিতেছেন না, দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে ক্রমশঃ হীন তেজ হইতেছেন,—তা বলিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই। অন্য কৌরবগণ

তাঁহাকে সাহায্য করিতে অক্ষম সকলেই অর্জ্জুনের শরে মহাপীড়িত। তখন চতুর্দ্দিক হইতে দেবব্রতের উপর শরবর্ষণ হইতে লাগিল।

"বাদলের বারিধারা প্রায়।

পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।" এইরূপ ভাব হইল।

অবশেষে দিন শেষে তাঁহার এমত অবস্থা হইল, যে তাঁহার শরীরে "দ্ব্যঙ্গুলমন্তরং" দুই অঙ্গুল অবিদ্ধ স্থান রহিল না। তখন সেই অতিবৃদ্ধ পিতামহ "প্রাকশিরঃ প্রাপদ্রথাৎ" পূর্ব্বশির হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন। পতিত হইলেন বটে কিন্তু "ধরণীং ন স পস্পর্শ" ধরণী স্পর্শ করিলেন না শরীরে এত শর বিদ্ধ হইয়াছিল যে তিনি শরের উপরই শায়িত রহিলেন। তাঁহাতে এখন দিব্য ভাব উপস্থিত। "অভ্যবর্ষচ্চ পর্জ্জন্য প্রাকম্পত চ, মেদিনী" ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিলেন পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল।

পতিত হইয়াই দেখিলেন দক্ষিণ মার্গস্থ ভাস্কর। দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ করিলে পুনরাগমন হয়। দিব্য শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল ঐ শব্দ বলিতেছে "কথং দক্ষিণায়নে সম্প্রাপ্তে স্থিতোঽস্মিতি।" এ কথা শুনিয়া দেবব্রত প্রাণধারণ করিয়া উত্তরায়নের অপেক্ষায় যোগাবলম্বন করিলেন।

লিখিত আছে এই সময়ে হংসরূপে মহর্ষিগণ আসিয়া তাঁহাকে মনে করাইয়া দিলেন, ভীষ্ম দক্ষিণায়নে কেন দেহত্যাগ [illegible]বে তুমি মহাত্মা ভীষ্ম উত্তর করিলেন, "ধারয়িষ্যামি প্রাণান উত্তরায়ন কাঙ্ক্ষয়া" উত্তরায়ন পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিব। এই উত্তরায়ন পথ যোগাধ্যায়ে বিচার করিব।

পূর্ণিমার রজনীতে যদি কেহ চন্দ্রটি পুঁছিয়া দেন অথবা মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্যদেবকে স্থানান্তরিত করিয়া দেয়, তা হইলে মনে যে ভাব

হয় ভীষ্মের পতনে সেইরূপ ভাব আসিয়া কুরুপাণ্ডবকে আচ্ছন্ন করিল, কি এক অনির্দিষ্ট উৎকণ্ঠা সকলকে অবিভূত করিতে লাগিল বোধ হইল যেন ভীষ্মের সঙ্গেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান হইল। যাহারা জীবিত আছেন তাঁহারা সকলেই মৃত বোধ হইতে লাগিল। কৌরবগণের হাহাকার সহজেই অনুমেয়, তাঁহাদের আশাতরীর মগ্ন হইতে অধিক বিলম্ব নাই সকলেই স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শরশয্যা।

আমরা এতদিন কর্ম্মী দেবব্রতকে দেখিলাম আশৈশব তাঁহার অমানুষিক কার্য্য সমূহ পরম ঋষির কথায় পর্য্যালোচনা করিলাম। আর দুই মাস আমাদের সেই পুরুষ শার্দ্দূলের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তালধ্বজ চ[illegible]চাপ হস্ত অরিনিসূদন, পরিহিত কবচ দেবব্রতকে আর দেখিব না। বীরসিংহ বীরশয্যায় শায়িত আছেন। আর যে কয়েক দি[illegible]হার সহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহাতে যে কর্ম্ম করিতে দেখিব তাহা তাঁহার কুরুক্ষেত্রে কার্য্যের অপেক্ষা উচ্চতর। কুরুক্ষেত্রে যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে কিন্তু শর-শয্যায় যাহা করিবেন তাহা অমর, জগতের হিতে তাহা উৎসৃষ্ট। আমরা এখন পরমজ্ঞানী ও ভক্ত ভীষ্মকে দেখিবার জন্য সংযত মনে প্রস্তুত হই।

ভীষ্মদেব সেই কোটি শরবিদ্ধ শরীরে শায়িত আছেন, আমরা সামান্য একটা কণ্টকবেদ সহ্য করিতে পারি না, তিনি অগণ্য বাণ ভেদ যাতনা হাঁসিমুখে সহ্য করিতেছেন, দেখিতে একটি শাজারুর ন্যায় হইয়াছেন কিন্তু কষ্টের কোন চিহ্ন প্রকাশ নাই।

যে স্থানে এই অশ্রুতপূর্ব্ব বীরশয্যা রচিত হইয়াছিল সে স্থল ভারতের কি মহাতীর্থ। কয়জন সেই ভূমির তত্ত্ব লয়েন কয়জন সেই বীরমূর্ত্তির উপাসনা করেন। যদি বীর হইতে বাসনা রাখ তবে বীরের চিন্তা কর যদি জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা কর তবে জ্ঞানীর সেবা কর যদি ভক্ত হইতে অনুরাগ থাকে তবে ভক্তের চরিত্র কীর্ত্তন কর,—আর যদি একাধারে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতে চাহ তবে দেবব্রত ভীষ্মের মন্দির প্রতি গৃহে স্থাপন কর, প্রতি বালিকাকে ভাবিতে শিখাও সে যেন দেবব্রতের ন্যায় সন্তানের জননী হয়, প্রতি বালককে তাঁহার ব্রহ্মার্য্য তাঁহার সত্য প্রতিষ্ঠা তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান তাঁহার বিরাট আত্মবিসর্জ্জনের মোহন মন্ত্রে দীক্ষিত কর। যখন সমগ্র বালক বালিকা নরনারী আবালবৃদ্ধবণিতা এক মহাধ্যানে অনুপ্রাণিত হইবে তখন দেখিবে এই চিন্তার কি শক্তি সমবেত ধ্যান ভীষ্মাকারে পরিণত হইবে মূর্ত্তিধারণ করিয়া আবার কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির প্রাণময় পথে তোমাকে চালিত করিবেন। মহাপুরুষ কখন তিরোহিত হয়েন না যতদিন দেহ থাকে ততদিন এক থাকেন দেহান্তে বহু হয়েন সর্ব্বব্যাপী আকাশের ন্যায় সকল স্থানেই বর্ত্তমান থাকেন; লোকান্তরে লোকান্তরে প্রবেশ করেন।

ভীষ্ম শরতল্পে শায়িত আছেন কুরুপাণ্ডব সকলে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, শান্তনব তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "অমরোপম আপনাদের দেখিলে বড় সুখী হই"।

তাঁহার মস্তক ঝুলিতেছে, "শিরঃমেবলম্বতে" উপাধান প্রার্থনা করায় রাজগণ একটি স্ফীত এবং কোমল (বাঙ্গালীদের মত) ও বহু মূল্য "তাকিয়া" আনিয়া দিলেন। ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

"নৈতান্তি বীরশয্যাসু যুক্ত রূপানি"

ইহা বীরশয্যায় উপযুক্ত নহে।

অর্জ্জুনকে আজ্ঞা করায় পার্থশর রচনা দ্বারা উপাধান প্রস্তুত করিয়া দিলেন, হৃষ্টান্তকরণে সন্নিহিত রাজগণকে বলিলেন আপনারা দেখুন পার্থ আমার কেমন উপাধান দিয়াছেন, এই শয্যায় আমি যতদিন তপনদেব অন্য মুখ না হয়েন ততদিন শয়ন করিয়া থাকিব আপনারা আমার চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিয়া দিন আর শেষ কথা বলিলেন, "আপনারা বৈর পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হউন।"

অন্যদিন পুনরায় ভীষ্মকে দেখিতে বহুলোক আসিয়াছেন, গত দিনের যুদ্ধে এবং ক্ষত হইতে বহু রক্ত শ্রাব হওয়ায় "তাঁহার পিপাসা হইয়াছে, রাজগণকে পানীয় জল আহরণ করিতে বলায় তাঁহারা শীতল সুগন্ধ যুক্ত জল আনয়ন করিলেন—ভীষ্মদেব অর্জ্জুনকে ইঙ্গিত করায় সব্যসাচী মন্ত্রপুত বাণ দ্বারা—

"অভিদ্যৎ পৃথিবীং পার্থ ভীষ্মস্য দক্ষিণে।"

পৃথিবীভেদ করিয়া সুশীতল বারিধারা ভীষ্মের দক্ষিণদিকে উৎপতিত করিলেন। সেই জল পান করিয়া শান্তনব তৃপ্ত হইলেন, রাজগণ এই অমানুষিক কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, আমরাত বিশ্বাস করিবই না।

পিতামহ অর্জ্জুনের বহুতর প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "শ্রেষ্ঠ স্তমসি ধান্বনাং" তুমি ধনুর্ধরের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুর্য্যোধনকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর এই "যুদ্ধং

মদন্তমেবস্তু” আমার সঙ্গেই এই যুদ্ধ অন্তপ্রাপ্ত হউক। ভীষ্মের মৃত্যুতে তোমাদিগের সৌহাদ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হউক, অবশিষ্ট যাঁহারা আছেন তাঁহারা জীবিত থাকুন। রাজ্যের অর্দ্ধেকাংশ পাণ্ডবগণকে দাও তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থিত হউন। দেখ দুর্য্যোধন এখনও আমার কথা শ্রবণ কর।” সাধুদিগের কখনই পরহিত চিন্তায় বিরতি হয় না, ভীষ্ম দেখিলেন তাঁহার মৃত্যুতে দুর্য্যোধন সন্ধির প্রার্থী হইতে পারেন— ধনঞ্জয়ের ক্ষমতাও তাঁহাকে উপাধান এবং পানীয় জলের ব্যপদেশে দেখাইলেন, মুমূর্ষু পিতামহের কথা হয়ত রাখিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে তাই এই সন্ধির প্রস্তাব। ভীষ্মপর্ব্ব—১২১ অ।

একে একে সকলেই সেই নর কার্ত্তিকেয়র নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন পিতামহ নিমীলিত নেত্র হইয়া শায়িত আছেন। মহাবীর কর্ণ ধীরে ধীরে আসিয়া শান্তনবের পাদ স্পর্শ করিয়া সাশ্রুকণ্ঠে নিবেদন করিলেন, “কুরুশ্রেষ্ঠ আপনার চক্ষের শূল এবং দ্বেষের পাত্র আমি সেই কর্ণ আসিয়াছি”।

পিতামহ এই কথা শুনিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়া এবং রক্ষীগণকে অপসৃত করাইয়া পিতার ন্যায় এক হস্ত দ্বারা পুত্রবৎ তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া সস্নেহে কহিলেন, “এস এস আমার স্পর্দ্ধাকারী বিপক্ষ, যদি তুমি আমার কাছে না আসিতে তবে তোমার শ্রেয় হইত না। জান তুমি রাধেয় নহ তুমি কৌন্তেয় অধিরথ তোমার পিতা নহে তুমি সূর্য্যজ, এ কথা আমাকে নারদ এবং ব্যাস বলিয়াছেন। হে তাত আমি সত্য বলিতেছি, তোমার উপর আমার কোন দ্বেষ নাই। তোমার তেজ হানি নিমিত্ত তোমাকে অনেক পরুষ বাক্য বলিয়াছি, তুমি অকস্মাৎ পাণ্ডব এবং অন্যান্য রাজগণকে যুদ্ধে অবক্ষেপ করিতেছিলে। ধর্ম্মলোপ হেতু তোমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে, নীচাশ্রয় হেতু তুমি

গুণীগণে দ্বেষ বুদ্ধিযুক্ত হইয়াছিলে এই কারণেই তোমাকে কুরুসভায় অনেক রুক্ষ বাক্য বলিয়াছি"। "সমরে তোমার শত্রু-দুঃসহ, বীর্য্য আমি জানি, তোমার ব্রহ্মণ্য, শৌর্য্য এবং দানে পরম স্থিতিও জানি, তোমার সদৃশ কোন পুরুষ নাই তাহাও জানি, কেবল কুলভেদ ভয় প্রযুক্তই তোমাকে সর্ব্বদা পরুষ বাক্য বলিতাম। রণক্ষেত্রে অস্ত্রে অস্ত্র সন্ধানে হস্তলাঘবে তুমি কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনের সমকক্ষ। তুমি কাশীপুরে কন্যাহরণ যুদ্ধে একাকীই সকলকে নিবারণ করিয়াছিলে, জরাসন্ধও তোমার সদৃশ হইতে পারেন নাই। ব্রহ্মণ্যে সত্যবাদিতায় এবং তেজে ও বলে তুমি দেবতা সম এবং যুদ্ধে মনুষ্যাতীত তোমার প্রতি আমার যাহা কিছু বিরক্তি ছিল তাহা অদ্য অপনীত হইল। দৈব পুরুষকার দ্বারা অতিক্রম করা যায় না (যা হইবার তা হইয়াছে) এখন তোমার সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হও। হে আদিত্যনন্দন আমাকে দিয়াই এ যুদ্ধের নিবৃত্তি হইয়া যাউক।"

কর্ণ উত্তর করিলেন তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করিতে পারিবেন না। পাণ্ডব এবং বাসুদেবকে তিনি জানেন তাঁহারা অজেয় কিন্তু তিনি যুদ্ধের জন্য কৃত নিশ্চয় "যাহা কিছু আপনাকে বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছি "ত্বৎক্ষন্তুমর্হসি।" আমাকে তাহার জন্য ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম বলিলেন যদি একান্তই এই বৈরিতা পরিত্যাগে তুমি অশক্ত তবে স্বর্গকামনা করিয়া যুদ্ধ কর। সাধুগণের চরিত্রে অবস্থিত হইয়া বিদ্বেষ বিহীন এবং অভিমান শূন্য হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ কর, বলবীর্য্য ব্যপ্রশ্রয় হইয়া যুদ্ধ করিলে ক্ষত্রধর্ম্ম প্রাপ্য লোক সকল প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মযুদ্ধ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের অপর মঙ্গল আর নাই।" শেষে বলিলেন "যুদ্ধ নিবারণের সুমহান যত্ন করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।"

আমরা এখন ভীষ্ম কেন কর্ণকে ধর্ষণা করিতেন তাহার কারণ জানিয়া হৃষ্ট হইলাম। সেই চির প্রার্থিত শান্তিই উদ্দেশ্য। যোদ্ধা হইলেই যুদ্ধ বাধাইতে হইবে প্রকৃত বীর তাহা ভাবেন না। মরণকালে ও শান্তির চেষ্টা তাঁহার হৃদয় হইতে দূর হয় নাই। এই যুদ্ধ নিবারণ বিষয়ে তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন দৈব অনতিক্রম্য কিন্তু তিনি পুরুষকারেরই পক্ষপাতী।

ভীষ্মোক্তির শেষাংশ গভীর কবিত্বপূর্ণ অতুলনীয় কাব্যসৃষ্টি। পিতামহ কর্ণকে বলিতেছেন "ধর্ম্ম যুদ্ধ কর" কবি দেখাইতেছেন ভীষ্মের সহিত কৌরবপক্ষের ধর্ম্মযুদ্ধের শেষ হইল। ইহার তিনদিন পরেই অধর্ম্মযুদ্ধে সুভদ্রাতনয় বীরকেশরী অভিমন্যুর হত্যাকাণ্ডের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিতেছেন। যাঁহারা সেই হৃদয় বিদারক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার মধ্যে কর্ণ একজন প্রধান রথী। দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন গাঙ্গেয় কর্ণকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়া দিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শান্তি পর্ব্ব।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" গীতা—

আজ এক মাস হইল পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে শেষ হইয়াছে। দ্রোণ কর্ণ শল্য প্রভৃতি মহাবীরগণ মহানিদ্রায় অভিভূত। যে রাজ্যের নিমিত্ত এত যত্ন এত চেষ্টা, যাহার জন্য এত জীব হত হইল যে কুরু প্রদেশ মহাশ্মশানে পরিণত হইল সে রাজ্য কৌরবদিগের হস্তগত হইল না।

যুদ্ধাবসানে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও দেবী গান্ধারী যাঁহারা শত পুত্রের জনক জননী হইয়াও আজ পুত্রহীন হইয়াছেন, অগণ্য অপনীত ললাট সিন্দুর বিমুক্তবেশভূষণ রুদ্যমানা অনাথিনী কুরুনারীগণকে সঙ্গে লইয়া নিহত পতি পুত্র ভ্রাতা ও জ্ঞাতিবর্গের উদকক্রিয়া সমাপন করিলেন।

কি ভীষণ দৃশ্য কি হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ কি কঠোর কর্ত্তব্য। কঠোরতাই আর্য্যধর্ম্মের মেরুদণ্ড। পুত্রহারা হইয়াছ রোদন কর শোক কর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর কিন্তু কর্ত্তব্যের কঠিন ব্যবস্থায় শিথিলতার অবকাশ নাই। রাজ চক্রবর্ত্তী হও অথবা পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হও ব্যবস্থার ব্যভিচার নাই।

তোমাকে গলদশ্রুনয়নে উঠিতে হইবে সেই ফুল্লকমল নিন্দিত নিস্কলঙ্ক চন্দ্র মুখে অগ্নিসংযোগ করিতে হইবে। উপবেশন করিয়া এই বলিয়া পুত্র আবাহন করিতে হইবে "এহি প্রেত সৌম্য"—বুঝিলাম কর্ত্তব্য যত কঠিনই হউক পালনে বিমুখ হইলে উদ্ধারের উপায় নাই।

প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর পরে পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে আসিয়াছেন। ইন্দ্র প্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার পুনোরুদ্বোধন হইল। ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মরাজ্যের অমলধবল ছত্র লইয়া বিশ্বরাজ বাসুদেবের অনুকম্পায় ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদের ভার লইয়া ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

সাধুগণের পরিত্রাণ হইয়াছে, দুস্কৃতগণের বিনাশ হইয়াছে, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল এখন ধর্ম্ম সংস্থাপন হওয়া চাই। ধর্ম্মপ্রাণ না হইলে ধর্ম্ম সংস্থাপন হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন "ধার্ম্মিক প্রবর ভীষ্মকে ভূতভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া জানিবেন। মহারাজ পুরুষ শার্দ্দূল ভীষ্ম স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে এই পৃথিবী নষ্টচন্দ্রা শর্ব্বরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইবে, অতএব আপনি সেই ভীম পরাক্রম গঙ্গানন্দনের সমীপে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষ যজ্ঞাদি ও আশ্রম চতুষ্টয় বিষয়ক এবং নিখিল রাজধর্ম্ম এতদ্ব্যতীত যাহা আপনার জিজ্ঞাস্য থাকে তৎসমস্ত জিজ্ঞাসা করুন। মহারাজ কৌরবকুল ধুরন্ধর ভীষ্ম লোকান্তরিত হইলে পৃথিবী হইতে সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্র একবারে অস্তমিত হইবে এই নিমিত্তই আমি আপনাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিতেছি।" শান্তি পর্ব্ব ৪৬ অঃ।

ক্রমশঃ তাঁহারা প্রবাহবতী নদী তটে যথায় ভীষ্মদেব শরতল্পগত ছিলেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যাবতীয় ধর্ম্ম উপদেশ করিতে আদেশ করিলেন।

ভীষ্মদেব কৃষ্ণের স্তব করিয়া নিবেদন করিলেন

"ত্বৎ প্রপন্নায় ভক্তায়গতি মিষ্টাং জিগীষবে।
যচ্ছ্রেয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তদ্ধ্যায়স্ব সুরোত্তম॥"

আমি তোমার শরণাগত ভক্ত সদ্গতি প্রার্থনা করি যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহাই কর।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "ভীষ্ম যেখানে গেলে আর পুনরার্ত্তন হয় না তুমি সেই স্থানে যাইবে।" কোথায় গেলে পুনরার্ত্তন হয়না ভগবান তাহা গীতায় বলিয়াছেন।

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

আব্রাহ্ম সকল পদার্থই পুনরাবর্ত্তনের অধীন কেবল আমাকে পাইলেই আর পুনর্জন্ম নাই "বুড়ী" ছুইতে পারিলেই আর খেলা থাকে না।

"এখন তোমার জীবনের ত্রিংশৎ দিবস অবশিষ্ট আছে তুমি সকলকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর।"

ভীষ্মদেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে ও নম্রতায় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও আমি কিছু বলিতে পারিব না, বিশেষতঃ তোমার নিকট কথা কহিতে বৃহস্পতি ও অবসন্ন হন। আমার মন এতদূর ভ্রান্ত হইয়াছে যে আকাশ পৃথিবী বাহ্যিক কিছুই জানিতে পারিতেছি না কেবল তোমার তেজোপ্রভাবে জীবন ধারণ করিয়া আছি। অতএব তুমিই যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিতে হয় উপদেশ কর। তুমি নিকটে থাকিতে মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মবক্তা হইবে?"

শান্তি প—৫১ অঃ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ শ্রুত্যাচার সম্পন্ন এবং রাজধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মেই কুশল, জন্মাবধি কোন ব্যক্তিই তোমার

কোন প্রকার দোষ দেখিতে সমর্থ হয় নাই বিশেষত পৃথিবীর সমস্ত রাজগণ তোমাকে সর্ব্বধর্ম্মের অভিজ্ঞাতা বলিয়া জানেন কেন না তুমি জন্মাবধি সর্ব্বদা দেবও ঋষিগণের উপাসনা করিয়াছ অতএব পিতার ন্যায় ইঁহাদিগকে উপদেশ কর।”

শান্তি প—৫৪ অধ্যায়।

ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রশংসাপত্র হইতে পারে না। ভীষ্মদেব স্বীকার করিলেন এবং পরদিন হইতে রাজধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন। কি নিয়মে রাজ্য শাসন করিলে রাজ্য শান্তি এবং ধর্ম্মময় হয় তাহাই প্রথমে বলিতে আরম্ভ করিলেন। যুধিষ্ঠির নবসম্রাট তাঁহার এখন ঐ উপদেশই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজধর্ম্ম প্রকরণ।

মনুষ্য সামাজিক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই সে বহুপ্রকার সম্বন্ধের কেন্দ্র হয়। বাস্তবিক সে একটি সম্বন্ধের পুঞ্জ লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়। পিতা পুত্র ভ্রাতা ভগ্নী ইত্যাদি জন্ম সম্বন্ধীয় সম্বন্ধ, শত্রুমিত্র গুরুশিষ্য প্রভূ ভৃত্য প্রভৃতি কর্ম্মসম্বন্ধীয় সম্বন্ধ, রাজা প্রজা পালক পালিত ইত্যাদি সামাজিক সম্বন্ধ।

ইহাদের মধ্যে রাজাপ্রজা সম্বন্ধ অতি গুরুতর। রাজাপ্রজা সম্বন্ধ স্থাপক এবং তদ্ব্যাঘাতক কর্ম্মাবলি রাজ ধর্ম্মের অন্তর্গত। পর রাষ্ট্রের

সহিত কি ভাবে চলিলে স্বরাষ্ট্রের প্রজাবর্গ নিরুদ্বিগ্ন এবং ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হয় এ বিষয়ও রাজধর্ম্মের অন্তর্গত। কারণ মিত্রতা এবং বিগ্রহ ব্যতীত আত্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।

প্রাচীন হিন্দুদিগের এই সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাহারই বিবরণ এই পরিচ্ছেদে লিখিত হইতেছে। পরাধীন জাতির রাজনীতি থাকিতে পারেনা এবং এবম্বিধের রাজনৈতিক সংশ্লেষ প্রায়ই বিপদের কারণ। সুতরাং বিস্তৃতভাবে লিখিবার কোন আবশ্যক নাই সংক্ষেপত ভীষ্মের রাজনৈতিক মত প্রকাশ করিতেছি।

রাজার উৎপত্তি এবং আবশ্যকতা বিষয়ে ভীষ্ম বলিতেছেন "পূর্ব্বে রাজা বা রাজ্য দণ্ডকর্ত্তা বা দণ্ড কিছুই ছিলনা প্রজাগণই ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিত, ক্রমে তাহারা পরিশ্রান্ত হওয়ায় তাহাদের চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত হইল। এইরূপে জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া তাহাদের ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল। ক্রমে লোভ এবং মোহ উপস্থিত হইল তাহারা অপ্রাপ্ত বস্তু সকল পাইবার ইচ্ছা করিতে লাগিল সুতরাং বিষয়াভিলাষ এবং ইন্দ্রিয় প্রীতি ও কামনা সকল তাহাদের চিত্তকে আক্রমণ করিল, এইরূপে নানারূপ সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইতে লাগিল।"

অতঃপর সেই সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণের উৎপত্তি হইল। কিন্তু মনুষ্য সকল এই বর্ণ ধর্ম্মের মর্য্যাদাও রক্ষা করিল না। সমস্তই একাকার হইতে চলিল। ভীষ্ম বলিতেছেন "পূর্ব্বে যখন দানবরূপে একার্ণব স্বীয় মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া দেবগণের পীড়াকর হইয়াছিল সেই সময় মান্ধাতা নামে একজন নরপতি ছিলেন তিনি স্তব দ্বারা ইন্দ্রকে তুষ্ট করিলে ইন্দ্র তাঁহাকে "ক্ষত্রধর্ম্ম" অবলম্বন করিতে আদেশ করিলেন। ক্ষত্রধর্ম্মই প্রথম নারায়ণ হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহারই দ্বারা তিনি শক্র হইতে ঋষিগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।"

ক্ষত্র ধর্ম্মই পালন ধর্ম্ম ইহাই রাজধর্ম্ম ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিলেন। আরও কহিলেন "যাহারা কাম ক্রোধে বশীভূত হইয়া পুরাতন ধর্ম্ম সকলের গতিতে অবজ্ঞাদর্শণ করত অসৎ পথ অবলম্বন করিবে দণ্ডনীতি দ্বারা তাহাদিগকে নিরাকৃত করিতে হইবে" এই দণ্ডনীতির আশ্রয় নরাধিপ বা রাজা রাজার অভিষেচন করাই রাজ্যবাসী লোক সকলের কর্ত্তব্যতম।" রাজা না থাকিলে সমাজে এবং রাজ্যে যে সমস্ত বিপ্লব হয় তাহা বর্ণনা করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিলেন।

"প্রজাগণ যে ধর্ম্ম আচরণ করে রাজাই তাহার মূল কারণ তাহারা রাজ ভয়েই পরস্পরকে হিংসা করিতে পারে না।" "যদি রাজা রক্ষা না করিতেন তাহা হইলে যোনিদোষ, কৃষি, অথবা বণিক পথ কিছুই থাকিত না যজ্ঞ বিবাহ এবং সমাজ কিছুই থাকিত না।" যে পুরুষ মনো মধ্যেও রাজার অনিষ্টাকাঙ্ক্ষা করিবে সে নিশ্চয়ই ইহলোকে ক্লেশ ভোগ করিয়া পরলোকে নরকে পতিত হইবে। ভূপতিকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া কখনই অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে কারণ এই মহতী দেবতা নররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করেন।"

শান্তি পঃ—৬৮ অধ্যায়।

রূপক বাদ দিয়া ভীষ্মের এই কথা গুলি ধীর চিত্তে বিবেচনা করিলে একটি অতি সুন্দর ও সুসঙ্গত রাজার উৎপত্তি, শক্তি ও পালন বিষয়ক মত পাওয়া যায়।

যদি সমাজের বা জাতির সকল ব্যক্তিই এক ভাবে সুশিক্ষিত একরূপ কর্ম্মানুলম্বী এবং সর্ব্বাংশে সম প্রকৃতিক ও সর্ব্ব ভূতহিত রত হইত তা হলে রাজা বলিয়া কোন বিশেষ শক্তিধরের আবশ্যক হইত না। কিন্তু তাহা হয় না; মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই

প্রকৃতি পার্থক্যের হেতু প্রবৃত্তির বিভিন্নতা। প্রবৃত্তি সকল মনুষ্যে এক কেন হয়না সে বিবেচনার স্থল এ নহে তবে একথা সত্য যে সকল মনুষ্যের প্রবৃত্তি সমূহ কখন এক দেখা যায় না। প্রবৃত্তিগণ কর্ম্ম প্রেরণার কারণ। কাম এবং তজ্জনিত ক্রোধাদি বৃত্তি সমূহ মনুষ্যকে বলপূর্ব্বক কর্ম্ম করায়। প্রবৃত্তিগণের প্রকৃতি এবং বলের তারতম্যে তাহাদের আধারভূত মনুষ্যগণের মধ্যেও একটা পার্থক্য আসিয়া উপস্থিত হয়, এভাব যে কেবল হতভাগ্য হিন্দুগণের ভিতরেই হয় তাহা নয় এরূপ ঘটনা প্রাকৃতিক সুতরাং সার্ব্বভৌম।

প্রবৃত্তি অনুসারে বিভাগ করিলে মনুষ্যগণকে প্রধানত চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। এক ধরণের প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানবগণ একই রকম কর্ম্মের অনুসরণ করিবে। অনুরূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেই প্রবৃত্তিগণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় আর অননুরূপ বা প্রতিকূল কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে বৃত্তি সমূহ উন্মার্গ হয় এবং বৈধর্ম্ম বশত কর্ম্ম সকলও অঙ্গহীন হয়। যাহার প্রবৃত্তি সতত মদ্যপানে আসক্ত তাহাকে তপোবনে পাঠাইলে কি হইবে? সে কোশাকুশী শৌণ্ডিকালয়ে না দিয়া করে কি।

সকল সমাজেই দেখা যায় কতকগুলি লোক আছে যাহারা শান্ত স্বভাব মধুরভাষী, দয়াবান ও স্বার্থহীন আবার কতকগুলি লোক দেখা যায় অতিশয় কোপন স্বভাব হিংসাপর মারকাট করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং সকলকে আপনবশে রাখিতে চায়। আর কতকগুলি আছে যাহারা অতি স্বার্থপর সঞ্চয়ী এবং বিষয়প্রিয়। অবশিষ্ট একদল আছে যাহারা অন্যের বশে থাকিয়া সুখী হয় পরের সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করে। এই চারিটি বিভাগকে হিন্দুরা নাম দিয়াছেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যও শূদ্র এ বিভাগ সকল দেশেই আছে যেখানে মানুষ আছে সেই খানেই আছে। অনেকেই আজকাল বলেন ব্রাহ্মণেরা স্বার্থ সিদ্ধি

জন্য এই ভাগ চতুষ্টয়, কল্পনা করিয়াছেন, একথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাঁহারা বিভাগ কর্ত্তা নহেন আবিষ্কর্ত্তা মাত্র।

প্রকৃতির প্রতিকূলে যাওয়া বুদ্ধি মানের কার্য্য নহে তাহাতে কষ্ট এবং ধ্বংশ পাইতে হয় এ কথাটা আজকাল সাহেবরাও স্বীকার করেন। যখন এই বর্ণ চতুষ্টয় আপন আপন প্রকৃতি ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যবর্গের কর্ম্মকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় তখনই সমাজে একটা বিপ্লবের আবির্ভাব হয়।

ক্ষত্রিয় যখন শূদ্র হইয়া সেবাবৃত্তি আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহার প্রভুর প্রাণ দেহ হইতে বাহির হইয়া হাতের ভিতর লুকাইল এবং শূদ্র যখন ক্ষত্রিয়ের কার্য্য আরম্ভ করিলেন তখন প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের আকৃতি দেখিয়াই তিনি তৈজস পত্র পরিত্যাগ করিয়া দেদৌড়। সুতরাং স্বস্ব প্রকৃতির অনুকূল কর্ম্মে রত রাখিবার নিমিত্ত একটি অন্য শক্তির আবশ্যক হইল।

ভীষ্মদেব বলিয়াছেন যখন একার্ণব দস্যু বা সহজ কথায় বর্ণধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে একাকার ভাব উপস্থিত হইল তখন "ক্ষত্র ধর্ম্মের" সৃষ্টি হইল। এই ক্ষত্রধর্ম্ম কি তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় প্রস্তারিত বিষয় হইতে সামান্য দূরে যাইতে হইবে নচেৎ ভীষ্মদেবের কথার অর্থগ্রহণ হইবে না।

প্রকৃতি, নিসর্গ স্বভাব প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ যখন তখন যার তার মুখে এবং যেসে পুস্তকে দেখিতে পাই কিন্তু ঐ শব্দ গুলির বাস্তবিক অর্থ কি তাহা অনেকেই বুঝেন না; আমরাও বুঝিনা তবে যতটুকু বুঝি তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

বিশ্বে যত পদার্থ আছে সমস্তই পরিণাম শীল; এক অনুক্ষণ ও নাই যখন পদার্থ সমূহ পরিণতিকে পরিত্যাগ করিতে পারে। অনবরত

পরিবর্ত্তনই পদার্থের স্বভাব। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাওয়ার নামে ক্রিয়া। ক্রিয়া অবশ্য একটি কার্য্য, তখন তাহার কারণ নিশ্চয়ই আছে। কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি কল্পনা বিরুদ্ধ। তাহা হইলে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ "না" হইতে "হাঁ"র উৎপত্তি মানিতে হয়। সুতরাং ক্রিয়ারও কারণ আছে, তাহার নাম শক্তি; ক্রিয়ার কারণ যে শক্তি তাহা অনুভবনীয় নহে। যেমন চুম্বকে লৌহাকর্ষণ শক্তি আছে তন্ত্রীতে ধ্বনি প্রকাশের শক্তি আছে অগ্নিচূর্ণে বিস্ফোটক শক্তি আছে কিন্তু যতক্ষণ শক্তি ক্রিয়ায় পরিণত না হয় ততক্ষণ শক্তির অস্তিত্ব অনুভব হয়না; ক্রিয়া না থাকিলেই শক্তি নাই তাহা বলিতে পারিনা, যথা যতক্ষণ লৌহ চুম্বকের সন্নিহিত না হইয়াছিল বা বারুদে অগ্নিসংযোগ না হইয়াছিল বা তারে আঘাত না হইয়াছিল ততক্ষণ আকর্ষণ স্ফোটন এবং শব্দ শক্তি একবারে ছিলনা তাহা হইতে পারেনা কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে না হইতে হাঁ হইতে পারে না। তা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে শক্তি সমূহ ছিল কিন্তু অপ্রকাশিত বা অব্যক্তভাবে ছিল। শক্তি যখন কোন বিশেষ আশ্রয়কে গ্রহণ করে তখনই অনুভবনীয় হয় তখন তাহাকে সলিঙ্গ বা ব্যক্ত শক্তি বলা যায়। বুঝা গেল জগতে যত ক্রিয়া আছে তাহাদের পূর্ব্বরূপ এক অব্যক্তাবস্থা আছে। এই আশ্রয়হীন শক্তি সমুদ্রের নাম অব্যক্ত বা প্রকৃতি নিসর্গ বা স্বভাব। এখন প্রকৃতিকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে তাহাতে তিনটি শক্তি বা গুণ আছে। আপত্তি হইতে পারে প্রকৃতি যখন অব্যক্তশক্তি তখন তাহার বিশ্লেষণ কিরূপ? প্রকৃতির কার্য্যকে বিশ্লেষণ করিলেই জানা যাইবে প্রকৃতিতে কি গুণ আছে। যে হেতু কার্য্যে কারণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান কার্য্যে যে পদার্থ পাইব কারণে অবশ্যই সেই পদার্থ পাইব নচেৎ কার্য্য কারণ ভাব থাকে না।

প্রকৃতির যত কার্য্য, তৎসমুদয়ে অব্যভিচারী ভাবে তিনটি গুণ পাওয়া যায়। গুণত্রয়ের নাম হিন্দুমতে সত্ত্ব, রজ ও তম। গন্ধক সোরা এবং কয়লা হইতে ভাগ অনুসারে বহুপ্রকার বারুদ প্রস্তুত হয়, তেমনি এই গুণত্রয় হইতে ভাগ অনুসারে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। পরন্তু এই গুণ তিনটির একটি ভাগ এমন ভাবে আছে যে, সে ভাগটি হইলে ইহাদের কোন কার্য্যকারিণী ক্ষমতা থাকে না। সূর্য্যের (সাদা) আলোক ত্রিশির কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে সপ্তবর্ণ যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সূর্য্যরশ্মিতে সপ্তবর্ণ বর্ত্তমান আছে কিন্তু এমন ভাবে আছে যে তাহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। সত্ত্ব রজ তম যখন এইরূপ ভাবে মিশ্রিত হয়, তখন তাহারা অব্যক্ত হয়। আবার যখন ভাগের বৈষম্য হয়, তখনই প্রকৃতিতে সাবিত্রী শক্তি উপস্থিত হয়।

ভাগের বৈষম্য কেন হয় এবং কাহার দ্বারা হয়, তাহার আলোচনার এ স্থল নহে, মোক্ষ ধর্ম্ম প্রকরণে করা যাইবে। উপরি উক্ত গুণ তিনটির বিভিন্ন স্বভাব আছে যথা,—সত্ত্ব প্রকাশক এবং লঘু রজ ক্রিয়াশীল এবং প্রবর্ত্তক এবং তম গুরু ও আবরক।

রজোগুণ হইতে অধ্যবসায় বা চেষ্টার আবির্ভাব হয়। ইহা হইতেই প্রকৃতিতে প্রসব ধর্ম্ম উপস্থিত হয়। প্রসব ধর্ম্ম হইলে উৎপত্তি এবং স্থিতিভাব হইবে। এই দুই ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে পালন শক্তি আবশ্যক, নচেৎ স্থিতি হয় না। পালন করিতে হইলে পালনের ব্যাঘাতক শক্তিকে নিরস্ত করিতে হইবে, অন্যথা হইলে পালন অব্যাহত হইবে না। এই রজোগুণই ভীষ্মকথিত "ক্ষত্রধর্ম্ম"। পালন এবং তাহার প্রতি-পক্ষকে নিরস্ত করিবার যে শক্তি তাহাই "ক্ষত্রধর্ম্ম"। ক্ষতাৎ ত্রায়তে, আপদ হইতে ত্রাণ করে বলিয়া ক্ষত্রিয়। ত্রাণ করিতে হইলে রক্ষা এবং পালন করিতে হয়। সুতরাং ইহাই রাজধর্ম্ম সৃষ্টির সময়ে

নারায়ণ সত্ত্ব বা রজগুণকেই আশ্রয় করেন। ভীষ্ম তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জগতে যত পদার্থ আছে তাহাদিগের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে সকলেই উৎপত্তি স্থিতি এবং লয়—এই তিন অবস্থার বাধ্য। উৎপত্তি সৃষ্টিধর্ম্ম, স্থিতি রক্ষা বা পালন ধর্ম্ম এবং লয় পরিবর্ত্তন ধর্ম্ম।

মানুষ এবং তাহার সমাজও এই তিন অবস্থার অনুগত। স্থিতি বা রক্ষা ও পালন ধর্ম্ম ক্ষত্রধর্ম্মের অন্তর্গত। সমাজে রাজা এই পালন ধর্ম্মের আশ্রয়। সৃষ্টি স্থিতি লয়, এ তিনটি ভগবৎ নিয়ম; সেই ভগবৎ নিয়মের আশ্রয় বলিয়া রাজা ভগবৎঅংশ বলিয়া হিন্দুর চক্ষে পূজনীয়। রাজার পূজা দেব পূজা, তাঁহার অবমাননা দেবতার অবমাননা, হিন্দুর বিশ্বাসই এই। তাই মনু বলিতেছেন——

"বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপ।
মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।"

বালক হইলেও তাঁহাকে মনুষ্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি মহতীদেবতা নররূপে অধিষ্ঠান করেন।

রাজার দেবত্ব সূচনা গীতাতেও রহিয়াছে।

ভগবান বলিতেছেন——

"ঐরাবতং গজেন্দ্রানাং নরানাঞ্চ নরাধিপং।"

গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং নরের মধ্যে আমি নরাধিপঃ।

নরাধিপ শব্দটি লক্ষ্য করিতে হইবে। অধিপ=অধি+প এই "প" পূর্ব্বোক্ত পালনার্থ বাচক ধাতু। পালন শক্তি না থাকিলে রাজা হয় না। ভগবান রাজা শব্দ ব্যবহার করেন নাই কারণ রাজা শব্দ পালনার্থ জ্ঞাপক নহে তাই অধিপ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র বলিয়া আজ কাল রাজার স্থলাভিষিক্ত রাজশক্তির

কথা পুস্তকে নয়নগোচর হয়। ফ্রান্স আমেরিকার যুক্ত রাজ্য ব্রেজিল মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে এই প্রকার রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে। প্রজা তন্ত্রের অর্থ এইরূপ—যে সকল প্রজার সম্মতিক্রমে এক ব্যক্তিকে রাজশক্তি পরিচালনের ভার দেওয়া হয় অর্থাৎ কিছুকালের জন্য এক ব্যক্তিকে রাজা তৈয়ার করা পুনরায় নিরূপিত সময় উত্তীর্ণ হইলে রাজশক্তি পুন প্রত্যাহার করা হয়, হিন্দুদিগের এরূপ প্রজাতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং উপরিউক্ত বাক্য সকল হইতে এরূপ ব্যবস্থা ভাষ্যানুমোদিত হইতে পারে না। দশে মিলিয়া একজনকে রাজা প্রস্তুত করিতে পারে না, যিনি রাজা তিনি স্বশক্তিতে রাজা; তবে প্রজারা তাঁহাকে ক্ষমতার আধিক্যহেতু রাজপদে বরণ করিতে পারে। ইহাই তাঁহার অভিষেক।

আধিপত্য ঈশ্বরদত্ত শক্তি; প্রজার কথায় সে শক্তি অর্জ্জন হয় না। প্রজাদের সম্মতিক্রমে ও অনুগ্রহে অধিপ হওয়া ভারতে আদৃত হয় নাই। কোন দেশেই তাহা হয় না। প্রজার অনুগ্রহে রাজা তাহার উপর ভক্তি হয় কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজার গুণাগুণ।

অতঃপর রাজার কি গুণ থাকা কর্ত্তব্য ভীষ্ম তাহা বলিতেছেন। অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে গুলি সাধারণ গুণ সেই গুলির উল্লেখ করিতেছি।

যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "পুত্র যুধিষ্ঠির তুমি সর্ব্বদা

পুরুষকারার্থ যত্নবান হও পুরুষের উদ্যোগ ব্যতীত কেবল দৈব রাজাদিগের কার্য্য সংসাধনে সমর্থ হয় না। দৈব এবং পুরুষকার তুল্য হইলেও (সমান ফলপ্রদ হইলেও) আমি পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি যেহেতু পুরুষকার লোকের প্রত্যক্ষীভূত এবং দৈবও সেই পুরুষকার দ্বারা প্রবর্ত্তিত।"

"পৌরুষং হি পরং মন্যে দৈবং নিশ্চিত্যমুচ্যতে।"

অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ভীষ্মের এই মহোপদেশ বাঙ্গালীর জপমন্ত্র কতদিনে হইবে।

দুগ্ধের নবনীত স্বরূপ প্রজারক্ষাই রাজধর্ম্মের সার। রাজা যখন প্রজারক্ষা করিতে অসমর্থ হয়েন তখন আর তিনি রাজা থাকেন না, প্রাণহীন দেহের ন্যায় বিলাসভূষিত নিশ্চেষ্ট মনুষ্যমাত্র থাকেন রাজশক্তি তিরোহিত হইলে তিনি পরিত্যাগের উপযুক্ত হন।

"মনুষ্য অবাক্তা আচার্য্য, অধ্যয়ন বিহীন ঋত্বিক, অরক্ষক ভূপতি অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা গ্রামাভিলাষী গোপাল এবং বনবাসাভিলাষী নাপিতকে অর্ণব মধ্যগত ভগ্নতরীর ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।"

শাঃ প অঃ ৪৫।

অনেকে হয়ত আক্ষেপ করিয়া বলিবেন যদি ভীষ্মদেবের কথামত চলিতে হয় তাহলে আর সংসার চলেনা কারণ প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা খুজিয়া পাওয়া যায় না, শিক্ষার এমনই গুণ।

দণ্ডনীতি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি পালন ধর্ম্ম দুইভাগে বিভক্ত প্রথম স্থিতির অনুকুল কর্ম্ম যথা আহারাদির সংস্থান সামাজিক জনন ধর্ম্মের প্রাচুর্য্য সাধন, ও বিদ্যাদি গুণের যাহাতে আবির্ভাব হয় তাহার ব্যবস্থা ইত্যাদি। দ্বিতীয় সামাজিক স্ফুর্ত্তির প্রতিকুল শক্তির নিবারণ। ত্রাণ শক্তিই

ইহার মজ্জা। এই ত্রাণাত্মিকা শক্তির ব্যক্তরূপ দণ্ডনীতি বা শাস্তিতত্ত্ব। ভীষ্ম বলিতেছেন—

"সুমহান দণ্ডই সকলের নিয়ন্তা যেহেতু দণ্ডেই সমুদয় বিষয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহলোকে যদ্দারা সমুদয় আয়ত্ত রহে তাহাকেই দণ্ড বলা যায়। দণ্ডই রাজ্যের আদি এবং দণ্ডই রাজ্যের কারণ। ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রযত্ন সহকারে ক্ষত্রিয়ের কারণ এই দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে।"

দণ্ড প্রধানত দুই প্রকার, দৈব এবং অদৈব। "দৈবদণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার রূপ প্রজ্জলিত অগ্নির তুল্য, দণ্ডের আন্তররূপ দুষ্ট সন্তাপ-জনক সুতরাং ক্রূরত্ব হেতু অগ্নি সাদৃশ্য ধারণ করে।"

"অদৈব দণ্ড দুই প্রকার ভর্তৃপ্রত্যয় লক্ষণ ও ব্যবহার দণ্ড। ব্যবহার দণ্ড দুইপ্রকার যথা মৌল এবং শাস্ত্রোক্ত।"

"ইহার মধ্যে ভর্তৃপ্রত্যয় দণ্ডই ক্ষত্রিয়াধীন" নৃপতির মাতা পিতা ভ্রাতার মধ্যে কেহই অদণ্ড্য নাই।" "সুপ্রণীত দণ্ডে ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গ অবস্থিত।"

সংক্ষেপে এই হিন্দুদিগের দণ্ডতত্ত্ব। উপরি উক্ত দণ্ড বিভাগের মধ্যে ভর্তৃপ্রত্যয় দণ্ডই বিশেষ বিবেচ্য, কারণ এই দণ্ডই রাজার প্রদত্ত দণ্ড অন্য দণ্ড কুলাচার ও শাস্ত্রবিধির ব্যতিক্রমে প্রয়োজ্য। ভর্তৃপ্রত্যয় শব্দটা কটমট ইহার অর্থ প্রভুপ্রেরিত দণ্ড, অর্থাৎ রাজদণ্ড ইহাই ক্ষত্রিয়াধীন বা ত্রাণাত্মিকা শক্তি। দণ্ড না থাকিলে পালন শক্তি জীবিত থাকিতে পারে না এ কথা বলাই বাহুল্য।

দেখা যাইতেছে হিন্দুর দণ্ডবিধি জগতের অন্য সব্ব দেশের দণ্ডবিধি অপেক্ষা প্রচুর কারণ নৈতিক দণ্ড অন্য দেশে নাই। অভক্ষ্য আহারে বা অগম্যাদি ব্যবহারে বা অন্যান্য অনাচারে দণ্ডার্হ হইতে হয়, এ জ্ঞান হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিতে হয় নাই। আচার ব্যবহারের লঙ্ঘন

হেতু দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া আর্য্য ঋষিগণ আধুনিক বিচারে দণ্ডার্হ হইয়াছেন। এ কথার বিচারে আর কোন ফল নাই, কারণ আচার ব্যবহার বলিয়া আজকাল কোন পদার্থ নাই। দৈবদণ্ডে লোকের বিশ্বাস নাই, দেবতাতেই বিশ্বাস নাই—তার দণ্ডে কোথা হইতে বিশ্বাস হইবে। রাজদণ্ড এড়ান যাইতে পারে কিন্তু দৈবদণ্ড হইতে নিস্তার নাই। রোগ শোক বিকলাঙ্গতা অকালমৃত্যু প্রভৃতি দৈবদণ্ড। দৈবদণ্ড হইতে নিস্তার পাইতে চাহিলে ঋষিগণের বাক্য প্রতিপালন করিতে হয়।

দণ্ড বিষয়ে ভীষ্মদেবের শেষ কথা সুপ্রণীত দণ্ডে ধর্ম্ম অর্থ কাম অবস্থিত। সুপ্রণীত শব্দের অর্থ কি। সুপ্রণীত অর্থে "মনুমুখাৎ শ্রুত" মনু যাহা বলিয়াছেন নচেৎ দণ্ডের অভীষ্ট ফল না হইয়া বিপ্লব উপস্থিত হয়। মনু বলিতেছেন—

"তৎ দেশকালৌ শক্তিঞ্চ বিদ্যাঞ্চাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ।
যথার্হতঃ সম্প্রয়েন্নরেষ্বন্যায়বর্ত্তিষু॥"
"সমীক্ষ্য সধৃতঃ সম্যক সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রনীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ॥

দেশ কাল শক্তিও বিদ্যা সম্যক আলোচনা করিয়া অন্যায়কারীর প্রতি রাজা যথাযোগ্য দণ্ডাবধান করিবেন। দণ্ড যদি সম্যক বিবেচিত হইয়া ধৃত হয় তবে প্রজা সহৃদয় অনুরক্ত থাকে পরন্তু অন্যথা হইলে অর্থাৎ অবিচার পূর্ব্বক সেই দণ্ড বিহিত হইলে সকলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়।" মনু সং ৭ অঃ ১৫।১৮

বর্ণভেদে শাস্তির তারতম্য মনুতে ব্যবস্থা আছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের প্রতিবিধি অনেকাংশে পৃথক, এবং কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য জাতির ও দণ্ডের তারতম্য আছে, তবে অপরাধের জ্ঞানানুসারে ব্রাহ্মণের দণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবস্থাও আছে। আধুনিক দণ্ডবিধিতে রাজার

দণ্ড নাই। তিনি অপরাধের অতীত। পাশ্চাত্য মতে রাজাই দণ্ড-বিধির প্রণেতা সুতরাং তাঁহার দণ্ড নাই; হিন্দুমতে রাজা প্রণেতা নহেন দণ্ডদাতা। অপরাধ কি এবং তাহার দণ্ড কি ভাবে হওয়া উচিৎ এ ব্যবস্থা ঋষিদিগের প্রণীত। যাঁহারা স্বার্থহীন অনুক্ষণ জীব মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত তাঁহাদের ব্যবস্থাই চরম উৎকৃষ্ট নহে কি? ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ জাতিধর্ম্ম আসক্তি ও বহুবিধ স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিলে ব্যবস্থা সর্ব্বজন সমাদৃত হয় না, এই জন্যই হিন্দুরা সর্ব্বাকর্ষণহীন সর্ব্বত্র সমদর্শী ঋষিগণকে ব্যবস্থাপক সভার শিরোমণিরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

রাজা অন্যের প্রণীত ব্যবস্থা মানিয়া চলেন এ ব্যবস্থা পাশ্চাত্যগণের নিকট বড়ই অবৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতির শৈশব অবস্থার পরিচায়ক।

ব্রাহ্মণের এবং রাজার দণ্ড বিষয়ে মনু এই বলিতেছেন—

"কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতোজনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা॥
অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষং
ষোড়শৈব বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্যচ
ব্রাহ্মণস্য চতুঃ ষষ্টি পূর্ণং বাপি ভবেৎ॥"

মনু ৮ অঃ ৩৩৬।৩৩৭

যে অপরাধে অন্য প্রাকৃত জনের এক পণ দণ্ড হইবে রাজার সেই অপরাধে তাহার সহস্র পণ দণ্ড হইবে। চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র চুরি করিলে সে বিহিত দণ্ডের অষ্টগুণ, দণ্ডনীয় বৈশ্য ষোড়শ, ক্ষত্রিয় চৌষট্টি এবং ব্রাহ্মণ ১২৮ গুণ দণ্ডনীয় হইবে।"

ব্রাহ্মণ দণ্ডবিধির প্রণেতা ছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে আপনাকে অদণ্ড্য প্রকাশ করিয়াছেন এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। জাতিভেদে বা বিদ্যা গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির অবস্থাভেদে দণ্ডের তারতম্য শাস্ত্রে আছে, থাকিবারই

কথা আজকাল ও দণ্ডবিধিতে অপরাধীর শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অবস্থা বিচার করিয়া দণ্ডবিধান প্রচলিত আছে তবে এ ব্যবস্থা কার্য্যে তত পরিণত হয় না। বিধির তত দোষ নয়, দণ্ড দাতাদের শিক্ষার অভাবে বিভ্রাট ঘটে।

জাতি ও গুণভেদে দণ্ডের তারতম্য স্বীকার করায় হিন্দুর দণ্ডবিধি শাস্ত্র প্রণেতাদের বিপক্ষে একটা গুরুতর পক্ষপাতিত্বের দোষারোপ দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবস্থাবিদেরা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এ দোষারোপ কতদূর সঙ্গত একটু বিবেচনা করা যাউক। দণ্ড বা শাস্তি ব্যবস্থার মূল কি? অবশ্য শাসন অর্থাৎ অপরাধের পুনরাবির্ভাবের নিবারকরণ এবং যে প্রবৃত্তি হইতে অপরাধে আসক্তি হয় তাহার সঙ্কোচ করণ। প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইলেই অপরাধের সম্যক তিরোভাব হয়। দ্বিতীয়ত অপরাধের ভৌতিক করণের অভাব উৎপন্ন করিলে ও দেহে ক্লেশের উৎপাদন করিলে অপরাধ নিবারিত হয়। তৃতীয়ত আসক্তির কারণ স্বার্থ হইতে দূরে থাকিলে অপরাধ দূরিত হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপায় প্রায়সঃ শারীরিক দণ্ডে পরিণত হয়! হস্ত পদাদির কর্ত্তন অতি পূর্ব্বে বিলাতে এবং অন্যান্য দেশে ব্যবস্থাছিল। কারারোধ বা স্থানান্তর আজকাল প্রধানত অনুসৃত হয়। বেত্রাঘাত দ্বিতীয় উপায়ের অন্তর্গত। অর্থদণ্ড মানসিক শাস্তি তবে ইহার প্রচুরতা স্থল বিশেষে বিবিচ্য। ধনবানকে সামান্য অর্থদণ্ড কার্য্যকারী নহে।

প্রথম উপায়টি সর্ব্বোৎকৃষ্ট; দৈবদণ্ড ইহার সাধক। জপ হোম চান্দ্রায়ন প্রভৃতি কৃচ্ছ ইহার দণ্ড ইহাতে চিত্তমল দূর হয়! হিন্দু শাস্ত্রে এইরূপ দণ্ডেরও ব্যবস্থা প্রচুর পরিমানে ছিল। পরলোকে এবং পরজন্মে বিশ্বাস না থাকিলে এ দণ্ডের সাফল্য হয় না। তাই যাহাকে তাহাকে এ দণ্ড দেওয়াও হইত না। অধুনা এরূপ দণ্ড দণ্ডই নহে। কিন্তু

যাহারা জন্মান্তরবাদী তাঁহাদের নিকট দৈব দণ্ড অতি ভয়ানক। অনুতাপ এই দণ্ডের মূল।

প্রবৃত্তির বল সকল মনুষ্যে সমান হয় না, অনেক কারণে পৃথক হয় যথা বিদ্যায় বুদ্ধি ধর্ম্ম ও সংস্কারে। শাস্তি কখনই বিদ্বেষমূলক নহে যত টুকু শাসন হইলে প্রবৃত্তি মার্জিত হইতে পারে ততটুকুই আবশ্যক অধিক হইলে অন্যায় হয়।

ব্রাহ্মণ শমপর জাতি—তাহাব দ্বারা শান্তিভগের যে পরিমাণ সম্ভাবনা আর একজন ক্ষত্রিয়ের তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক। একজন কশাই বা ঠগের মনে যত চেষ্টা করিলে দয়ার উদ্রেক হওয়া সম্ভব একজন অন্য জাতির তাহার অপেক্ষ অল্প আয়াসেই হওয়া সম্ভব; সুতরাং কশাই এবং ঠগ এক হত্যায় যেরূপ দণ্ডার্হ একজন ব্রাহ্মণ সেই হত্যার জন্য সমভাবে দণ্ডনীয় হওয়া উচিৎ কি? দণ্ডার্হতা চিত্তের মলিনতার উপর নির্ভর করে, মনুর তথা হিন্দুদিগের দণ্ডবিধি নির্ণয় দেখিলেই সহজে অনুমিত হয়। আধুনিক দণ্ডবিধি সংহিতায় চিত্তের অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখা হয় না, একবারে হয় না একথা বলিনা তবে যতদূর হওয়া উচিৎ ততটা হয় না।

যে সময় হিন্দুদিগের দণ্ডবিধি প্রচলিত হইয়াছিল তখনকার সমাজ এবং তাহার গতানুসারে অতিশয় উপযোগী ছিল।

অপরাধে প্রবৃত্তি চিরদিন এক সমাজে একভাবে আসে না সমাজের অবস্থার সহিত তাহার পরিবর্ত্তন হয়। নূতন অপরাধ আবির্ভাব হয় আবার পুরাতন অপরাধ অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু যে মৌলিক তত্ত্বের উপর অবস্থান করিয়া দণ্ডবিধির সৃষ্টি সে তত্ত্ব যতদিন মনুষ্য থাকিবে ততদিন একভাবেই থাকিবে। মনুষ্যের চৈত্তিক অবস্থা চিরকাল এক থাকিবে। এই হিসাবে মনুর এবং শাস্ত্রকারগণের দৃষ্টি আধুনিক

বিধিজ্ঞগণ হইতে প্রখরতর এবং দূরগামিনী ছিল স্বীকার করিতে হইবে।

রাজধর্ম্ম বিষয়ে ভীষ্ম আর একটি অতিসুন্দর কথা বলিয়াছেন যথা "যে রাজা সকল বিষয় সন্দর্শন করিয়া কোন ব্যক্তির স্বীয় দুঃখ নিবেদনের পূর্ব্বেই "তুমি কি জন্য আসিয়াছ এরূপ জিজ্ঞাসা করেন এবং সহাস্য বদনে তাহার সহিত কথোপকথন করেন তাঁহার প্রতি সকল লোকেই প্রসন্ন হইয়া থাকে মধুর বচন বলিয়া প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও তাহাতে তাহার কষ্ট হয় না যেন না শান্ত দ্বারা সকল লোকেই বশীভূত হইয়া থাকে। অতএব দণ্ডধারী নৃপতি সর্ব্বদাই শান্ত বাক্য প্রয়োগ করিবেন।"

আজকাল এ নীতিও বড়ই অভাব। বর্ত্তমান সময়ে রাজপুরুষগণ বৃদ্ধ ভীষ্মের এই কথা কয়টির অনুসরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন কি?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজধর্ম্মের চর্চা আমাদিগের অনধিকার প্রবেশ সুতরাং এই স্থানেই এ বিষয়ের অবসান হওয়া উচিৎ।

এ পর্য্যন্ত ভীষ্ম বাক্যে কিছুই অগ্রহণীয় দেখিলাম না তাঁহার রাজধর্ম্ম বিষয়ক মত পর্য্যালোচনা করিলে তিনি যে একজন অতি উচ্চদরের রাজপুরুষ ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। একস্থলে বিদুর বলিতেছেন "সন্ধি বিগ্রহ ও অন্যান্য রাজগণের সহিত ব্যবহারের জন্য ভীষ্ম নিযুক্ত ছিলেন" তিনি একাধারে মিনিষ্টার এবং লর্ডচান্সেলার ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

বাস্তবিক ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় রাজা না হইয়াও বহুদিন রাজ্যভার বহন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজা ছিলেন না কিন্তু যাদবগণের তিনিই প্রতিপালক ছিলেন। শান্তনুর মৃত্যুর পর হইতে পাণ্ডুর রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত ভীষ্মই কৌরব রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন।

"সন্ধি বিগ্রহ সংযুক্তা রাজ্ঞাং সম্বাহনাক্রিয়া।
অবৈক্ষত মহাতেজা ভীষ্মপর পুরঞ্জয়ঃ ॥"

উ প—১৪৮ অ ১০।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আপদ্ধর্ম্ম সত্যাসত্য নিরূপণ।

আপদ্ধর্ম্ম প্রকরণে সত্য প্রশংসা ব্যতীত ভীষ্মোক্তির বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিষয় আর অধিক কিছুই নাই কতকগুলি সুন্দরনীতি কথাযুক্ত উপাখ্যান ইহাতে আছে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভীষ্মের সত্যাসত্য বিষয়ক মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

ভীষ্ম বলিতেছেন "সর্ব্ববর্ণের মধ্যে অবিকারিতম সত্যই শ্রেষ্ঠ। সাধু-গণের সন্নিধানে সত্যধর্ম্মই সতত আদরনীয়, সত্যই সনাতনধর্ম্ম সকলে সত্যকে সৎকার করিবে সত্যই পরমগতি। তপস্যা ও যোগসাধন সত্য-ধর্ম্ম, সত্যই সনাতনব্রহ্ম, সত্যই পরমোৎকৃষ্ট যজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন সমুদয় বস্তুই সত্যে প্রতিষ্ঠিত।" "রাজেন্দ্র সত্য সমতা দম অমাৎসর্য্য ক্ষমা লজ্জা তিতিক্ষা অনসূয়া ত্যাগ ধ্যান ধৃতি আর্য্যত্ব সর্ব্বভূতে দয়া ও অহিংসা এই ত্রয়োদশ প্রকার সত্যের আকার" এই ত্রয়োদশ প্রকার পৃথক পৃথক গুণ একত্রিত করিয়া সত্য হয়। সত্যের গুণ সমুদয়ের অন্ত বলিতে পারা যায় না। সত্য অপেক্ষা পরমধর্ম্ম আর কিছুই নাই, মিথ্যা হইতে পরমপাতক আর নাই। সত্যই ধর্ম্মের আশ্রয় অতএব সত্যলোপ করিবে না। সত্য হইতে দান সদক্ষিণ যজ্ঞ অগ্নিহোত্র বেদ সমুদয় ও ধর্ম্ম নিশ্চয়

প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও একমাত্র সত্য তুলাদণ্ডে ধৃত করিলে সহস্র অশ্বমেধ হইতে একমাত্র সত্য বিশিষ্ট হয়।"

শান্তি প—৬২ অঃ।

হিন্দুধর্ম্মে সত্যের আসন কত উচ্চ—তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে ইয়ুরোপীয়েরা হিন্দুধর্ম্মে সত্যের কখন আদর ছিল এ কথা দেখিতে পান না। সকলই অদৃষ্টের দোষ তবে ভারতীয়েরা যে চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পান না তার অধিক কষ্ট আর নাই।

উপরিউক্ত সত্য প্রশংসা হইতে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলা যাইতে পারে না এইরূপ ভীষ্মের মত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে মন্বাদি শাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থা অবশ্য গ্রাহ্য এবং পালনীয়। মনু বলিতেছেন—

"তদ্বদন্ ধর্ম্মতোঽর্থেষু জানন্নপ্যন্যথা নরঃ।
ন স্বর্গাচ্চ্যবতে লোকাদ্দৈবীং বাচং বদন্তিতাম॥
শূদ্রবিট ক্ষত্রিয়াণাং যত্রোক্তৌ ভবেদ্বধঃ।
তত্রবক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাদ্বিশিষ্যতে॥"

স্থান বিশেষে এক প্রকার জানিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে আর এক প্রকার কহিলে স্বর্গহানি হয় না। এরূপ বাক্যকে দৈববাক্য বলে। যে স্থলে সত্য কথা কহিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের প্রাণবধ হইবে এমত ক্ষেত্রে মিথ্যা-কথা কহিতে পারা যায় তখন মিথ্যাকথা সত্য হইতে প্রশস্ত হয়।" পুনশ্চ

"কামিনীষু বিবাহেষু গবাং ভক্ষ্যে তথেন্ধনে।
ব্রাহ্মণাভ্যুপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকং॥"

সুরত লাভার্থে কামিনী বিষয়ে বিবাহ বিষয়ে গরুর ভক্ষ্য সম্বন্ধে, হোম-কাষ্ঠ সম্বন্ধে এবং ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ মিথ্যা শপথে কোন পাতক নাই।

মনু ৮ম অ—১০৩।১০৪।১১২।

এখন বিবেচ্য এই মনুবাক্য যে স্থানবিশেষে মিথ্যা কথা বলা উচিৎ ভীষ্মানুমোদিত কিনা? ভীষ্ম প্রথমে বলিয়াছেন যে সর্ব্বদাই সত্য কথা বলা উচিৎ তাহা হইলে ভীষ্মের সহিত মনুর মহামতভেদ উপস্থিত হইল। অথচ তিনি মনুবাক্য অবশ্য প্রতিপালনীয় বলিতেছেন।

কোন ক্ষেত্রেই মিথ্যা বলা উচিত নয়। এ কথাটি পাশ্চাত্য মত সম্মত, কিন্তু হিন্দুর সত্য মিথ্যার জ্ঞান বিভিন্ন সেটি বুঝিতে হইলে একটু মনোযোগ আবশ্যক কারণ বিষয় গভীর তাহার উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তৎশিষ্যগণের মতের বিরুদ্ধে সুতরাং সহজে নিস্তার পাইবার আশা বৃথা।

যদি কেহ এই দেবব্রতের চরিত্র অধ্যয়নের কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের আর একটু ক্লেশ সহ্য করিয়া মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ৬৭ এবং ৬৮ অধ্যায় গবেষণা করিতে অনুরোধ করি।

তথায় শ্রীকৃষ্ণ সত্যাসত্যের নির্ণয় বিষয়ে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন এবং বলিতেছেন যে সেই উপদেশ ভীষ্মানুমোদিত সুতরাং ভীষ্ম চরিত্র লেখকের পক্ষে সে মত অবশ্য আলোচ্য।

পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ মুখনিসৃত বলিয়া সত্যাসত্যের আলোচনা করিয়াছেন, আমরাও প্রায় তাঁহারই পদানুসরণ করিতেছি।

ঘটনা এইরূপ। মহাবীর কর্ণ কৌরব সৈন্যের সেনাপতি হইয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রণকৌশলে পাণ্ডবচমূ ত্রস্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করিতে করিতে কর্ণের সমক্ষে উপস্থিত। অর্জ্জুন স্থানান্তরে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, দূর হইতে দেখিলেন অগ্রজ আজ কর্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান। কিয়ৎকালপরেই লক্ষ্য করিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রণক্ষেত্রে নাই। পার্থের মস্তক ঘুরিয়া গেল, তিনি ত্বরায় আসিয়া মধ্যম ভ্রাতা ভীমসেনকে

তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার কুশল জানিয়া আসিতে বলায় ভীমসেন উত্তর করিলেন, "আমি যাব না তুমি যাও, আমি একাকীই সমগ্র কৌরব সেনার সহিত যুদ্ধ করিব।" সুতরাং অর্জ্জুন শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। যাইয়া দেখিলেন যুধিষ্ঠির "শয়ানমেকং" শয্যায় শায়িত আছেন। কৃষ্ণার্জ্জুন রথ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকট যাইতে না যাইতেই আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি যথা "কর্ণহতস্ত্বয়া" সেরূপে কর্ণকে বধ করিয়াছ আমাকে বল। যুধিষ্ঠির ভাবিয়াছেন অর্জ্জুন বুঝি কর্ণকে নিহত করিয়া তাঁহাকে সুখবর দিবার জন্য শিবিরে আসিয়াছেন। আজ যুদ্ধে কর্ণ তাঁহাকে এমনভাবে পরাজিত করিয়াছেন যে যুধিষ্ঠির ভয়ে পলাইয়া একবারে শিবিরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন (বাঙ্গালীর মত) তাই তাঁহার কর্ণ বধ শ্রবণে এত আগ্রহ।

কিন্তু অর্জ্জুন বলিলেন কর্ণ সুস্থ আছেন, শুনিয়া যুধিষ্ঠির একবারে সপ্তমে উঠিয়া পার্থকে বলিলেন, তুমি কর্ণকে বিনাশ না করিয়া যুদ্ধ স্থল হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ — তবে "দেহন্যস্মৈ গাণ্ডীবমেতদন্ত" গাণ্ডীব ধনু অন্যকে দাও। "ধিকত্বাং" তোমাকে ধিক তোমাকে ইত্যাদি।

অমনি অর্জ্জুন "ক্রুদ্ধ সর্প ইব শ্বসন" সাপের মতন ফোঁস করিয়া বলিলেন, "আমাকে যে অন্যকে গণ্ডীব দাও একথা বলে——

"ছিন্দ্যামহং তস্যশিরঃ ইত্যুপাংশু ব্রতংমম।"

তাহার মাথা কাটিয়া ফেলি এই আমার গুপ্তব্রত। তরবারি লইয়া কথা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কাহাকে বধ করিবে এখানে ত যুদ্ধ করিবার কিছুই দেখি না। অর্জ্জুন বলিলেন, এই নরসত্তমকে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞাপালন করিব আমি যুধিষ্টিরের নিধন সাধন পূর্ব্বক সত্যের নিকট অঋণী হইয়া বিশোক ও বিজ্বর হইব।
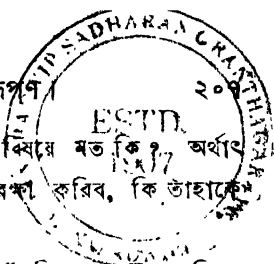
তিনি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার এ বিষয়ে মত কি ? অর্থাৎ আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মস্তকচ্ছেদ করিয়া সত্য রক্ষা করিব, কি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মিথ্যাবাদী হইব ?

গোবিন্দ অর্জ্জুনকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, "তুমি যে অকালে অতিশয় ক্রোধাসক্ত হইলে ইহাতে এখন জানিলাম যে তুমি কখন বিচক্ষণ লোকদিগের সেবা কর নাই! হে অর্জ্জুন "অদ্য তুমি ধর্ম্মভীরু ও বিমূঢ়, এস্থলে যেরূপ আচরণ তুমি করিলে ধর্ম্ম বিভাগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনই সেরূপ করিতে পারেন না। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা কোন ক্রমে অনায়াস সাধ্য নহে শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা তৎসমুদয় জানিতে হয় কিন্তু তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছ না। হে পার্থ তুমি, যে ধর্ম্মবেত্তা হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ তাহা অজ্ঞান প্রযুক্তই করিতেছ কেননা ধার্ম্মিক হইয়া প্রাণিগণের বধে কত অধর্ম্ম হয় তাহা বুঝিতেছ না।

হে তাত, আমার মতে প্রাণীবধ না করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বরং মিথ্যাকথা কহিবে তথাপি কোন প্রকারে কাহারও হিংসা করিবে না। পূর্ব্বে তুমি বালকের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে সেইজন্যই এক্ষণে মূঢ়তা প্রযুক্ত এই অধর্ম্ম যুক্ত কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছ।"

"প্রাণিনামবধ স্তাত সর্ব্ব জ্যায়ান মতো মম।
অনৃতাং বা বদেদ্বাচং নতু হিংস্যাৎ কথঞ্চন॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে ইহা কেবল আমার মত তাহা নহে ভীষ্ম যুধিষ্ঠির ক্ষত্তাবিদুর এবং যশস্বিনী কুন্তীরও এই মত। তিনি তাহা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, যে তুমি যুধিষ্ঠিরকে মারিতে পার না। কেন না প্রথম প্রাণিগণের অবধ (অহিংসা) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। দ্বিতীয়ত বরং মিথ্যা কথা বলিবে তথাপি হিংসা করিবে না।

এই উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ এবং ভীষ্মের চরিত্রে এক সমস্যা উপস্থিত হইল। অনেকে বলিবেন শ্রীকৃষ্ণ মুখে বলেন এক রকম কার্য্যে করেন অন্য রকম ; এই কুরুক্ষেত্র ব্যাপারের মূলই তিনি। কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড মনে করিলে লোমাঞ্চ হয়। অর্জ্জুনকে তিনিই ত যুদ্ধে উত্যক্ত করিয়াছেন। সেইরূপ ভীষ্মদেবের মত যদি অহিংসা তবে তাঁহার প্রত্যহ অযুত ব্যক্তির প্রাণ নাশের প্রতিজ্ঞাটা কি প্রকার? পৃথিবীকে অসংখ্য নরশোণিতে কর্দ্দমাক্ত করিতে করিতে অহিংসা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা বকধার্ম্মিকের মত হইল নাকি?

অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইতে এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, অহিংসা এবং সত্য রক্ষা ইহাদের মধ্যে বরনীয় কে? পূর্ব্বোক্ত ভীষ্মবাক্য হইতে সত্যই সকলের বড় ধর্ম্ম এইরূপ বোধ হয় অথচ মনু বলিতেছেন স্থান বিশেষে মিথ্যা কথা বলা যাইতে পারে। তাহার উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। আবার শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন অহিংসা সকলের বড়ধর্ম্ম বরং মিথ্যা কথা কহিবে তথাপি হিংসা করিবে না। শাস্ত্রগুরু মনু অহিংসা সম্বন্ধে বলিতেছেন——

"শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্ম্মো যত্রোপরুধ্যতে।
দ্বিজাতীনাঞ্চবর্ণানাং বিপ্লবে কালকারিতে॥
আত্মনশ্চ পরিত্রাণে দক্ষিণাঞ্চ সঙ্গরে।
স্ত্রীবিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ ধর্ম্মেণ ঘ্নন ন দুষ্যতি॥
গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতং।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচরয়ন॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতিকশ্চন।
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তন্মুন্যমৃচ্ছতি॥

মনু ৮ অ—৩৪৮।৩৪৯।৩৫০।৩৫১।

যখন বলদ্বারা দ্বিজাতিগণের ধর্ম্ম উপরুদ্ধ হয় যখন কালকৃত বর্ণবিপ্লব উপস্থিত হয় এমন সময় দ্বিজাতিগণ ধর্ম্ম রক্ষার্থ শস্ত্র ধারণ করিতে পারেন। আত্মরক্ষার্থ ন্যায়যুদ্ধে স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণের রক্ষা কারণ ধর্ম্মতে লোক হিংসা করিলে দোষভাগী হইতে হয় না। গুরু বালক বৃদ্ধ বা বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ কেন হউক না কেন বধ করিবার জন্য আগত হইলে এবং অন্য কোন আত্মরক্ষার উপায় না থাকিলে কোন বিচার না করিয়াই উহাদিগকে বধ করিতে পারা যায়। প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যেই হউক আততায়িবধে হন্তার কিছুই হয় না। মনুমন্যুতে গমন করে।"

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, "যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক আমার শয্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাঘ্র আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য লম্ফনোদ্যত আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার ধর্ম্মানুমত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারীকৃত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগ সম্মত হয় তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার করিতে ধর্ম্মত বাধ্য এবং যে রাজপুরুষের উপর বধার্হের বধভার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য।

সেকেন্দর বা গজনবি মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেশ তৈমুর বা নাদির দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বা নেপোলিয়ন পরস্বাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর হইয়া পররাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্ম্মত বধ্য, এখানে হিংসাই ধর্ম্ম।"

পক্ষান্তরে ইহাও শাস্ত্রসম্মত যে ঐ যে বিহগবর বিশ্বস্রষ্টার বিবিধবরণ বিম্বিত বিমোহন পক্ষ বৃক্ষান্তরালে বিস্তার করিয়া নিদাঘের অনলবর্ষী মধ্যাহ্নে আনন্দে কাকলি কুজনে কর্ণকুহরে শান্তিধারা ঢালিয়া দিতেছে, শিকার প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্যই হউক অথবা তাহার অস্থি চর্ব্বণ করিয়া রসনা তৃপ্তির জন্যই হউক তাহার নিপাত অধর্ম্ম। ঐ যে বিচিত্রিত চিক্কণ দেহ মৃগ বা ছাগশিশু নবোদ্গত শৃঙ্গ কণ্ডুতির প্রেরণায় উল্লাসে বহ্বাড়ম্বরে সহচরের সহিত মনোহর শৃঙ্গযুদ্ধ করিতেছে হিংসার তাড়-নায় তাহার বিনাশ মহা অধর্ম্ম। ঐ যে রক্তাভ রজতশঙ্কাস্তৃত লোহিত নয়ন মীনবর রোহিত পুষ্করণীর বিমল বারিরাশি ভেদ করিয়া কুতূহলে আহারান্বেষণ করিতেছে, তাহাকে আমিসের লোভ দেখাইয়া তীক্ষ্ণ-বড়িশের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া নির্ম্মম আকর্ষণে অসীম যাতনা দিয়া আয়ত্ত করা প্রায়শ্চিত্ত হীন অধর্ম্ম।

এতক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা পাইলাম কি? পাইলাম এই যে কৃষ্ণবাক্য এবং শাস্ত্র উভয়েই বলিতেছেন অহিংসা পরমধর্ম্ম বটে। কিন্তু স্থানবিশেষে হিংসা বৈধ। সত্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইলেও স্থানবিশেষ মিথ্যা বলা যাইতে পারে এতদুভয়ে পাপ নাই। যেস্থলে সত্য দ্বারা প্রাণিবধ হওয়া সম্ভব, সেখানে মিথ্যা কথা বলাই উচিৎ।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুন বাঁধায় পড়িয়াছিলেন, আমাদের ত কথাই নাই। তিনি অর্জ্জুন যাহাতে সহজে এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাই তাঁহাকে প্রথমে বলাকের ইতিহাস শুনাইলেন।

বলাক নামে কোন এক ব্যাধ ছিল। সে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার প্রতি-পালনের নিমিত্ত মৃগ হনন (হনন প্রবৃত্তির চরিতার্থের জন্য নহে) করিত সতত স্বধর্ম্মে নিরত সতবাদী অসূয়া শূন্য হইয়া সেই ব্যাধ বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ও অন্যান্য আশ্রিত জনগণকে প্রতিপালিত করিত। কোন

দিন সে মৃগয়া লাভে বাহির হইয়া বিস্তর যত্ন করিয়াও মৃগ পাইল না, পরিশেষে দেখিল একটা ঘ্রাণ চক্ষু অর্থাৎ অন্ধশ্বাপদ জলপান করিতেছে সে তাহাকে হত্যা করিল। তৎপরে আকাশ হইতে বলাকের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং তাহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য অপ্সরাগণের গীতবাদ্য নিনাদিত বিমান সমাগত হইল।

কৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন প্রসিদ্ধ আছে যে সেই জন্তু সর্ব্বপ্রাণীর বিনাশার্থে তপস্যা করিয়া বর পাইয়াছিল। অতএব বলাক সর্ব্বভূতের সংহারে কৃতসঙ্কল্প সেই হিংস্রজন্তুকে সংহার করিয়া স্বর্গে গিয়াছিল।

বলাক স্বর্গে গেল। কেন না, জীব মঙ্গলের সে সহায় হইয়াছিল। ঘ্রাণচক্ষুকে হত্যা করিয়া সে অন্য বহু প্রাণীর জীবন দানের ফল পাইয়াছিল; এ স্থলে হিংসা ধর্ম্ম।

পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কৌশিকের বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন।

"কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাস্ত্রে তাঁহার অধিক জ্ঞান ছিল না। কথিত আছে তিনি গ্রামের অদূরে নদী সকলের সঙ্গম স্থলে বাস করিতেন। সর্ব্বদা সত্য কথা কহিব, ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল সেহেতু তিনি সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। একদা কতিপয় ব্যক্তি দস্যুভয়ে ভীত হইয়া কৌশিকের আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং তথায় লুক্কায়িত রহিল। দস্যুগণ তাহাদের কোন ক্রমে সন্ধান করিতে পারিল না। অতঃপর তাহারা সত্যবাদী কৌশিকের নিকট আসিয়া বলিল, "ভগবন্ আমরা একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি সত্য বলুন কতকগুলি লোক কোন পথে গিয়াছে? যদি আপনি জানেন তবে আমাদিগকে বলিয়া দিন। কৌশিক সত্য কথা বলিলেন, দস্যুগণ সেই ব্যক্তিগণকে নিহত করিল। কৌশিক সূক্ষ্মধর্ম্ম নিরূপণে অনভিজ্ঞ হওয়ায় সেই দুরুক্ত সত্যবাক্য নিবন্ধন মহা অধর্ম্ম হেতু কষ্টকর, নরকে

গমন করিলেন। কৌশিকের সত্য কথার ফল হইল কতকগুলি নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণনাশ, তবে এ সত্যের মূল্য কি? এ সত্যে জীব মঙ্গল হয় নাই, অমঙ্গল হইয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অর্জ্জুন সেই ধর্ম্মতত্ত্ব না জানায় ভ্রান্তি বশতঃ এক গর্হিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন সত্য রক্ষণরূপ ধর্ম্মার্থে যুধিষ্ঠিরকে বধ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সত্য কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন না। তিনি স্থূল সত্য ধর্ম্মপালনে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন কিন্তু সেই সত্য ধর্ম্মে যে ব্যভিচার বা প্রতিপ্রসব আছে তাহা তাঁহার জানা নাই তিনি কৌশিকের মত শাস্ত্রজ্ঞান হীন।

তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "সত্যের কথনই সাধু সত্য হইতে আর কিছুই উৎকৃষ্ট নাই" এ অতি সহজ কথা ইহাতে কাহার সহিত বিবাদের সম্ভাবনা নাই, ভীষ্মও প্রথমে তাহাই বলিতেছেন কিন্তু অহিংসা তত্ত্বের ন্যায় এখানেও প্রতি প্রসব আছে তাহাই দেখাইতেছেন। "কেবল সত্যই যাহার অনুষ্ঠানের বিষয় হয় সত্যের যথার্থ তত্ত্ব সুদুর্জ্ঞেয় হইয়া থাকে। যেস্থলে মিথ্যা সত্য স্বরূপ হয়, এবং সত্য মিথ্যা স্বরূপ সেস্থলে সত্য বক্তব্য না হইয়া মিথ্যাই বক্তব্য হইবে।" উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন—বিবাহ কালে রতিক্রীড়া সময়ে প্রাণ বিনাশস্থলে সর্ব্বস্বাপহরণে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যাকথা কহিবে এই পঞ্চবিধ মিথ্যাকে পণ্ডিতেরা পাতক শূন্য কহিয়াছেন। যে নিরবচ্ছিন্ন সত্যের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হয় সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কেবল সত্যকেই সত্য মনে করে। স্থূলতঃ ধর্ম্মজ্ঞানী হওয়া সহজ নহে সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ যথার্থরূপে অবধারণ করিয়া পরে ধর্ম্মজ্ঞ হয়।"

কর্ণপর্ব্ব—৬৯ অধ্যায়।

উপরি উক্ত কৃষ্ণ বাক্য মনু বাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র তিনি প্রথমে সাধারণ নিয়ম বলিয়া পরে বর্জিত তত্ত্ব বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও কয়েকটি

নিষিদ্ধ সত্যস্থল ব্যক্ত করিয়াছেন পরে উল্লেখ করিতেছি।

এতাবতা স্থূল কথা এই দাঁড়াইল হিংসা অহিংসা সত্য ও অসত্য ধর্ম্মজ্ঞানে অনুসরনীয়। সুতরাং ধর্ম্ম কি তাহার লক্ষণ অবশ্য জ্ঞাতব্য নচেৎ হিংসা ও অসত্যের প্রয়োগ দুর্বোধ্য হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মনির্দ্দেশ করিতেছেন।

"ধর্ম্ম সকলের বিভাগে অনভিজ্ঞ অল্পদর্শী মূঢ় ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধ লোকদিগকে সন্দেহ জিজ্ঞাসা না করিয়া যেমন সংসার হইতে মহানরকে পতিত হইবার যোগ্য হয় ধর্ম্ম বিষয়ে তোমার (অর্জ্জুনের) লক্ষণ নির্দ্দেশ এইরূপ কিছু হইবে। অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাতে আমি দোষ দিইনা কিন্তু শ্রুতিতে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এই জন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে হয়।" "দেখ প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্যই ধর্ম্ম হইয়াছে যাহাতে প্রাণিগণের হিংসা না হয় তন্নিমিত্তই ধর্ম্মের লক্ষণ করা হইয়াছে অতএব সিদ্ধান্ত এই যাহা অহিংসা সংযুক্ত তাহাই ধর্ম্ম; প্রাণী বা প্রজা সকলকে ধারণ বা রক্ষা করে বলিয়া ধর্ম্ম নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অতএব সিদ্ধান্ত এই যাহা ধারণ সংযুক্ত তাহাই ধর্ম্ম।" অমূল্য ভারত বাক্য এই—

"প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতং।
যং স্যাদহিংসাসংযুক্তং সধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম্ম প্রবচনং কৃতং।
ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহর্দ্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ সংযুক্তং সধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

কৌশিক সত্য কথা বলিয়া প্রাণিগণের রক্ষা করেন নাই তাই তাঁহার সত্য অধর্ম্ম হইয়াছে। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত বা জীবহিতকর তাহাই সত্য যাহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে তাহা সত্য হইলেও মিথ্যা। যাহা লোক-

হিতকর তাহাই ধর্ম্ম এবং সত্য তদ্বিপরীত লোকত বা বাহ্যত সত্য হইলেও মিথ্যা এবং অধর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিতেছেন যদি কেহ কাহাকে ও তর্ক দ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মানাইতে চায় সে স্থলে কথা না কহাই কর্ত্তব্য। যদি এমত স্থল হয় যে কথা না কহিলে উপায় নাই বা কথা না কহিলে শঙ্কা করে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগই কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থলে মিথ্যা সত্য স্বরূপ হয়। খৃষ্টান দিগের ক্রুজেড় এবং মুসলমান দিগের অসিহস্তে ধর্ম্মপ্রচার যদি সত্য হয় তবে ধর্ম্ম জ্ঞানের অভাবে পৃথিবীতে কত দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

কুট তার্কিকেরা বোধহয় আপত্তি করিবেন যে যদি এই প্রকার ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম হয় তা হলে যে স্থলে নরহত্যার অভিযোগে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইবে সে স্থলে মিথ্যাবাক্য বা সাক্ষ্যদ্বারা অপরাধীর জীবনরক্ষা করা উচিৎ। ইহার উত্তরে আমরা বলি হত্যাকারীর দণ্ডই যে লোকহিতকর নচেৎ প্রজাস্থিতি হয়না অপরাধের দণ্ড না হইলে দুর্বৃত্তের দলপুষ্ট হইবে সমাজ থাকিবে না।

এইরূপ ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "শপথ দ্বারা তস্করদিগের সংসর্গ হইতে যে মুক্ত হওয়া যায় ইহাতে পণ্ডিতেরা অধর্ম্ম জ্ঞান করেন না, এ স্থলে মিথ্যা সত্য স্বরূপ। সাধ্যসত্বে তাহাদিগকে ধন দেওয়া উচিৎ নহে দিলে নরকার্হ হইতে হয়। তস্করের দল বৃদ্ধি সমাজ বিঘাতক।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়ে প্রতীচ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কৌশিকের মত অবস্থায় তাঁহারা কি উত্তর দিতেন। অনেকে বলিবেন মৌনাবলম্বন তাহাত শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন কিন্তু যেখানে "অবশ্য কুজিতব্য" অর্থাৎ না বলিলে উপায় নাই সেখানে কি করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা হয়ত বলিবেন কৌশিকের মৃত্যু স্বীকার করা উচিৎ ছিল তথাপ

তাঁহার প্রকাশ করা উচিৎ হয় নাই। তা হইলে ফল একই দাঁড়াইল নিরপ-রাধের বিনাশ। কিন্তু এইরূপ সত্যের অনুরোধ আত্মোৎসর্গ কি ধর্ম্ম হইবে যদি হয় তাহা হইলে কি সে ধর্ম্ম পৃথিবীতে আদরনীয় হইবে? নিশ্চয়ই নয়।

এই ভীষ্মানুমোদিত এবং কৃষ্ণ কথিত ধর্ম্মের বিপক্ষে অন্যপক্ষ হইতে একটা আপত্তি হইবে যে যদি ইহাই ধর্ম্ম হয় যে, সত্য যেখানে লোক হিতকর সেই স্থানে ধর্ম্ম এবং তদ্বিপরীতে অধর্ম্ম, তাহা হইলে সত্যাসত্যের এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার লইয়া প্রতিপদে একটা বিষম গোলমাল উপস্থিত হইবে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলার প্রচুর অবকাশ হইবে। প্রথমত অবস্থাভেদে সত্য পালনীয় কিনা তাহার মীমাংসা কে করিবে। যে সে ব্যক্তি ইহার অবধারণ করিতে পারেনা কারণ সাধারণ মনুষ্যের জ্ঞানও বিচার শক্তি অতি অল্প। দ্বিতীয়ত মনুষ্য স্নেহ মমতা লোভ মোহ ইত্যাদি প্রবৃত্তিগণের এত বশীভূত যে তাহার নিরপেক্ষ হওয়া বড়ই সুকঠিন অথচ সমাজের প্রায় ষোল আনা এই ভাবের লোক সুতরাং এরূপ ধর্ম্মবিধি একটা দারুণ উৎপাড়নের সুযোগ হইবে।

আর্য্য ঋষিগণ যে এ ছিদ্র দেখেন নাই তাহা নহে তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, এ দোষ দেখিয়াই নিজেরাই এরূপ বিবদমান বিষয়ের মীমাংসার ভার লইয়াছেন তাই তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিধি সকল নিহিত করিয়াছেন। অবিরোধী তর্কদ্বারা শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করিলে আর কোন গোলযোগ হইবার সম্ভবনা নাই। তাই ভীষ্মদেব প্রথমেই বলিয়াছেন শাস্ত্রবিধি অনুসারে দণ্ডাদি নিয়ম প্রয়োজ্য।

আমরা এক্ষণে এই ভীষ্মানুমোদিত সত্যতত্ত্ব হইতে যাহা পাইলাম তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—

১। যাহা ধর্ম্মসঙ্গত তাহাই সত্য যাহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তাহা বাহ্যত সত্য হইলেও অসত্য।

২। যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম্ম। সুতরাং লোকহিতই সত্য তদ্বিপরীত অসত্য।

৩। বরং মিথ্যা কথা বলা ভাল তথাপি প্রাণিহিংসা ভাল নয়। পুনশ্চ জীব মঙ্গলের জন্য হিংসা হিংসা নহে। তাহা ধর্ম্ম।

৪। সত্যাসত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যবস্থানুসারে নিরূপ্য।

কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মতত্ত্ব? জগতে আর কখন এরূপ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে কি? হিন্দু! এই সত্যতত্ত্ব তোমার ঋষিগণ কতযুগ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন একবার চিন্তা কর গৌরবে আনন্দাশ্রু বাহিবে।

আমরা আরম্ভেই বলিয়াছি এই ধর্ম্মতত্ত্ব বঙ্কিমবাবু তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন কারণ এই ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত, তাঁহার সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই থাকিতে ও পারেনা এ ব্যাখ্যা কাহার নিজের নহে, ঋষিগণের মত। তবে তাঁহার উপসংহারে কয়েকটি কথা আমরা গ্রহণ করিতে অক্ষম। তাঁহার উপসংহার ভাগ উদ্ধৃত করিতেছি।

"উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে যদ্দারা লোক রক্ষা লোকহিত সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্ম্মের মূল স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে যে উপধর্ম্মের ভস্মরাশির মধ্যে পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধর্ম্ম প্রোথিত হইয়াছে তাহা অনন্তকালে কোথায় যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া অনর্থক সামর্থ্য ব্যয়ও নিষ্ফল কালাতিপাত দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠানে হিন্দুসমাজ প্রভান্বিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামী জাতি মারামারি পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণ কথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া শূলপাণি

ও রঘুনন্দনের পদানত লোকহিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব ও মলমাস-তত্ত্ব প্রভৃতি আঠাইশ তত্ত্বের কচ কচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন জাতি অধঃপাতে যাইবে? যদি এখন আমাদের ভাগ্যোদয় হয় তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্র হইয়া "নমো ভাগবতে বাসুদেবায় বলিয়া কৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তদুপদিষ্ট এই লোক হিতকর ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।"

রচনা হিসাবে এ অংশ প্রথম শ্রেণীর।

তিনি যে বাঙ্গালি জাতির উন্নতিকল্পে শ্রীকৃষ্ণ প্রণীত অতুল্য ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে উপদেশ দিতেছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে গুরু বলিয়া "শিরসি" স্থান দিতে প্রস্তুত। তিনি যে হিন্দুজাতিকে "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" বলিতে আগ্রহে আহ্বান করিতেছেন আমরা তাঁহার কথায় বলি তথাস্তু এবং প্রার্থনা করি সমগ্র হিন্দুজাতি অবিলম্বে একবাক্যে বলুন "তথাস্তু।" কিন্তু তিনি যে বর্ত্তমান বাঙ্গালি জাতির অবনতির কারণের বোঝা, শূলপানি ও রঘুনন্দনের মুণ্ডিত মস্তকের উপর কেন চাপাইলেন তাহা আমাদের বিকৃত মস্তকে প্রবেশ করিল না।

রঘুনন্দন ও শূলপানি ইহাঁরা কপর্দ্দকহীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। দিনান্তে নিরূপকরণ আতপ তণ্ডুলের হবিষ্যান্ন অপক্ক কদলি সিদ্ধ ভিন্ন অন্য আহারের তাঁহারা প্রত্যাশী ছিলেন না, পরিধানে একখানি দেশজাত অতি মোটা কার্পাস বস্ত্র ব্যতীত বাসান্তর ছিল কি না সন্দেহ।

শতছিদ্র যুক্ত সংস্কারবিহীন তৃণাচ্ছাদিত কুটীর ব্যতীত যাঁহার দ্বিতীয় বাসস্থান আবশ্যক ছিল না আটকোটি বাঙ্গালীর জন্মভূমি এই বঙ্গদেশ এরূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদানত কেন তাহা মাসিক দেড় সহস্র রজতমুদ্রার উপার্জ্জক আপাদমস্তক বহুমূল্য বিদেশীয় বস্ত্রের দ্বারা দেহের

আচ্ছাদক এবং পোলাও কালিয়া চপ কটলেট প্রভৃতির নিত্য আস্বাদক বঙ্কিমচন্দ্র তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। এই যে অতলস্পর্শী বিলাস সাগরের মহোর্ম্মিতে বাঙ্গালি জাতি ক্ষিপ্তবিক্ষিপ্ত হইতেছে সে তরঙ্গের মূল কি আচার সার রঘুনন্দনের বাক্যবায়ু না পাশ্চাত্য আচার ভ্রষ্ট জাতি সমূহের প্রবল গরল ফুৎকার?

রঘুনন্দনের উপর বিরক্ত হইবার কারণ আজকাল অনেক বাঙ্গালীর আছে তিনি যে ব্রহ্মচর্য্যের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যদি রঘুনন্দন না জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে মহম্মদীয় ধর্ম্মের ভীমবেগে বাঙ্গালীজাতি যে সম্পূর্ণ অহিন্দু হইত তাহার খবর কেহ রাখেন কি?"

ভারতের এমন কি জগতের সর্ব্বস্থান বিচরণ করিয়া আসুন দেখিবেন আচার এবং ধর্ম্ম বুদ্ধিতে এখন বাঙ্গালি জাতি সকলের বড় রঘুন্দনের ন্যায় দেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালাদেশ একবারে অন্ধ মূর্খতায় নিমজ্জিত হয় নাই। ভারতের অন্য কোথও সমাজবন্ধন বাঙ্গালীদের ন্যায় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় নাই; বাঙ্গালী স্ত্রীর শৌচ এবং ভগবৎনির্ভরতা অতুলনীয় ইহাও রঘুনন্দের কৃপায়।

স্বকৃত অপরাধের কারণ অন্যের স্কন্ধে চাপাইয়া মহাপুরুষের অবমাননায় মহাপাতক হয়।

হিন্দুবঙ্গের পনর আনা ব্যক্তি এখন রঘুনন্দনের মতবর্ত্তী বাঙ্গালীর মজ্জায় এখন রঘুনন্দন বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ধর্ম্মে বিদেশীয় উত্তাপ এখনও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বড় বড় সভ্যতার ওস্তাদের মহা চেষ্টায় রঘূনন্দন বাঙ্গালীর স্কন্ধ হইতে কেন যাইতেছেন না তাহা একবার কেহ চিন্তা করেন কি?

যাহা হউক বিতণ্ডায় কোন ফল নাই আমরা মোক্ষধর্ম্ম কথনে প্রস্তুত হই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মোক্ষধর্ম্ম প্রকরণ।

ভারতে মোক্ষ ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ভারতের আর কিছুই নাই। বল বিক্রম সাহস যুদ্ধ রাজনীতি ব্যবসায় বাণিজ্য এবং অন্যান্য বহুবিধ বিদ্যা সমস্তই এখন অনুমানের বিষয় হইয়াছে। অতীত স্মৃতিপটে কালের স্রোতে অস্পষ্ট রেখা মাত্রে পর্য্যসিত। সামান্য দিন পূর্ব্বে যাহারা আমমাংস ভক্ষণ করিয়া পর্ব্বত কন্দরে বৃক্ষকোটরে বা গিরি গহ্বরে বাস করিত ভারত এখন তাহাদিগের নিকট শিক্ষার্থে দণ্ডায়মান কাল প্রভাব অনিবার্য্য। কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে।

যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে এই মোক্ষধর্ম্ম উল্লেখযোগ্য। বিবরে জল প্রবেশ করিলে যেমন পিপীলিকাগণ প্রাণভয়ে স্থানান্তর অন্বেষণ করে এবং সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল অণ্ডগুলি মুখে লইয়া জলস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোন বৃক্ষ বা উচ্চভূমি আশ্রয় করে তদ্রূপ এই বিপুল ভারতে কত কত প্রাণহর ব্যত্যা এবং বিধর্ম্মী দিগের প্লাবন হইলেও ঋষিগণ প্রাণ হতেও বড় এই মোক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই এবং একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইয়া ইহাকে জীবিত রাখিয়াছেন। অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বটে কিন্তু যাহা আছে জগতে আর কোথাও নাই এখনও ভারত তাঁহার ধবলগিরির ন্যায় উচ্চশিরে জগৎকে সগর্ব্বে বলিতে পারেন "যদি মোক্ষধর্ম্ম জানিতে চাহ যদি মিথ্যা প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া সত্যে আসিতে চাহ তবে আমার প্রিয় সন্তান ঋষিগণের সেবা কর।"

হয়ত পাশ্চাত্য জাতি সমূহ এ আহ্বান শুনিবে ভাব দেখিয়া বোধ হয় তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়াছে কিন্তু ভারতের মূঢ় সন্তান সকল কর্ণরন্ধ্রে অঙ্গুলি দিয়া প্রতীচ্য লগ্নদৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছে।

দেবব্রত কথিত মোক্ষধর্ম্ম যে কেবল তাঁহার মোক্ষ বিষয়ক স্বমতের প্রকাশ তাহা নয়। তাঁহার সময় মোক্ষধর্ম্মাধিকারের যত মত প্রচলিত ছিল তাহারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিয়া বোধ হয়।

অধ্যাত্ম রাজ্য অধিকার করিতে হইলে কোন পথ দিয়া যাইতে হয় কি উপায়ে যাওয়া যায় কোন সেনানী কতদূর গিয়াছেন কোথায় কোন বাধা আছে কোন দুর্গ কি ভাবে আক্রমণ করিলে তাহার ধ্বংস হয় এবং অগ্রসর হওয়া যায় এই প্রকরণে সেই সকল বিষয় লিখিত আছে। প্রথমে কবে এই রাজ্যের আবিষ্কার হয় এবং তাহার পর হইতে ইহার আয়ত্তের জন্য কত চেষ্টা হইয়াছে এবং যাহারা এই রাজ্যলাভের জন্য বদ্ধ করিকর হইবেন তাঁহাদের কত আয়োজন ও শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে তাহার বিবরণ ইহাতে আছে। বিষয় অতি গভীর এবং বিস্তীর্ণ, আমাদের সাধ্য কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করি। তবে মাদৃশগণের কুতুহল নিবারণের এবং কি ভাবেয় পদার্থ এই প্রকরণে আছে তাহার প্রচারের জন্য যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করি। যাঁহারা বিষয়ে প্রবেশ করিতে চাহেন তাঁহারা সৎগুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন।

পৃথিবী কতদিন সৃষ্ট হইয়াছে এবং উহাতে মনুষ্য জীব কতদিন হইতে বাস করিতেছে এ প্রশ্নের উত্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন প্রায় ছয় হাজার বৎসর হইল এই বিরাট ব্যাপার ভগবান কর্ত্তৃক ছয়দিনে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাবা আদম ও বিবি ইভা সমগ্র মানব জাতির জনক ও জননী। বিজ্ঞানবিৎ অনেকে এ মত স্বীকার করিতেছেন না

প্রাকৃতিক রচনা দেখিয়া তাঁহারা পৃথিবীর বয়স যে এত কম নয় এ কথা প্রকাশ করেন।

হিন্দুদিগের মত অবশ্য বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নয়। তাঁহারা বলেন পৃথিবীর সৃষ্টি বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে এবং মানবের ও সেই সময় সৃষ্টি হইয়াছে।

এমতদ্বয়ের মধ্যে কোনটি সমীচিন তাহা আমরা বলিতে অক্ষম এবং তাহার মীমাংসা লইয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। পৃথিবী এবং মনুষ্য যবেই হউক কোন সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে আর ভুল নাই।

জগতে সভ্যজাতি অনেক আছে এবং ছিল তাহাদের মধ্যে মোক্ষ ধর্ম্মের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা কে? চীন ভারতমিসর বাবিলন আসিরিয়া এবং পারশ্য প্রভৃতি কয়েকটি দেশ অতীত যুগের সভ্যতার নিকেতন বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম কে তাহা লইয়া একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে সভ্যজাতি হইলেই সে মোক্ষ ধর্ম্মের প্রকাশক হইবে এমন কোন নিয়ম নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক বহু গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বেদের অনেকাংশ বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত। অন্যান্য ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনিচ্ছা স্বত্তেও স্থির করিয়াছেন বেদের কোন কোন অংশ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।

সভ্যতার প্রতিযোগিতায় কে সর্ব্বপ্রথম হইবে তাহা লইয়া অপেক্ষা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু মোক্ষধর্ম্মের প্রথম আকর যে ভাগ্যহীনা ভারত এবং সেই ধর্ম্মের বক্তা যে আর্য্য ঋষিগণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

নির্গুণ আত্মজ্ঞান ভুবনমনোমোহিনী জননী ভারতের স্বোপার্জ্জিত

ধন। যথার্থই "প্রথম সামগান তব বন ভবনে।" তোমার সঙ্গীত, তোমার স্থাপত্য তোমার চিত্রবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা সমূহ বিদেশীয় গণের উচ্ছিষ্ট বলিয়া যে কলঙ্ক আছে থাকুক তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু তোমার আত্মবিদ্যা তোমারই মা।

জগতে তুমি অজেয়। যাহারা ধর্ম্মের জন্য অন্যের নিকট ঋণী তাহারাই প্রকৃত জিতও পরাধীন। তোমার কাছে জগৎ হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে তবে তোমার "কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ" মা।

সন্তাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে তোমারই সন্তানগণ শাস্ত্র ঋষিগণকে পরিহার করিয়া অন্য বেশাস্তগণের পশ্চাৎ ধাবিত।

পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম মত আছে তাহা দুইভাগে বিভক্ত যথা প্রবৃত্তি ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তি বা মোক্ষধর্ম্ম।

ক্রম বিকাশ নিয়মের বিবেচনায় প্রবৃত্তিধর্ম্ম বা মার্গ মোক্ষ ধর্ম্মের পূর্ব্বে ইহা সহজেই অনুমিত হয়। মানুষ প্রবৃত্তির সমষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং সেই প্রবৃত্তিগণের চরিতার্থ করার উপায় লইয়া প্রথমে ব্যস্ত থাকিবে ইহা স্বাভাবিক সুতরাং তাহার পুরুষার্থ বা চরম লক্ষ্য প্রবৃত্তিময়। এ জগতে সে দেখে তাহার ভোগের বিষয় সমূহ বড় ক্ষণস্থায়ী ও দুষ্প্রাপ্য যাহা দ্বারা সেই বিষয় উপভুক্ত হয় সেই ইন্দ্রিয়গণ অতি দুর্ব্বল এবং বহু অন্তরায়যুক্ত এই ইন্দ্রিয়গণের আধার যে শরীর তাহার কোন স্থায়িত্ব নাই বড় অল্পদিন থাকে উপরন্তু অতি শীঘ্র তাহার বিকার প্রাপ্ত হয়।

এই সকল বিঘ্ন হইতে নিস্তার পাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে একটি মার্গ বা পথ তাহার আয়ত্ত হইল। সে ক্রমশ দেখিতে পাইল যে কতকগুলি কার্য্য বা প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিলে তাহার ভোগ

বৰ্দ্ধিত হয়। বেদের কর্ম্মকাণ্ড বাইবেল কোরানের দান উপাসনা বলিদান প্রভৃতি কর্ম্ম সমূহ প্রবৃত্তি ধর্ম্মের মূল স্বরূপ। হিন্দুর স্বর্গও নরক তথা খৃষ্টান ও মুসলমানের "হেভন" "হেল্" এবং "বিহিস্ত" ও "জহান্নব" এবং অন্যান্য জাতির চরমস্থান সমস্তই প্রবৃত্তি কল্পিত।

জাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ব্রত নিয়মাদি তপশ্চরণ সকলই প্রবৃত্তি মার্গের অন্তর্গত এই সকল আচরণের উদ্দেশ্য অমানুষিক শক্তি সঞ্চয় এবং তৎফল হেতু স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট স্থান লাভ।

এতদূর পর্য্যন্ত প্রায় সকল ধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি।

কর্ম্মদ্বারা ভোগ বর্দ্ধনের প্রথম ইতিহাস হিন্দুর বেদ। কর্ম্মকান্ত এই সকল উপায়ের গ্রথিত গ্রন্থ। যাঁহারা এই সকল উপায়ের আবিস্কর্ত্তা তাঁহারা সেই উপায় বা বিধি বিশেষের ঋষি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন যেমন কোন বিজ্ঞানবিৎ কোন এক অজ্ঞাত প্রাকৃতিক শক্তির আবিষ্কার দ্বারা আপনাকে সেই আবিষ্কারের কর্ত্তা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহারা কোন আধ্যাত্মিক শক্তির আবিষ্কার করিয়া সেই আবিষ্কারের ঋষি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। পৃথক এই যে ঋষিগণ মানসিক ব্যাপারের আবিষ্কর্ত্তা এবং শেষোক্তেরা জড় তত্ত্বের ঋষি। উভয়েই মহাপ্রকৃতির উপাসক।

প্রকৃতি জড় এবং অজড়ে বিভক্ত। বিশ্বে যাহ কিছু জড় এবং অজড় আছে সমস্তই প্রকৃতির অন্তর্গত। মানসিক ভাব এবং অনুভবাদি সম্বন্ধবাচক জ্ঞান সবই প্রকৃতির কার্য্য। মাত্র চৈতন্য প্রকৃতির বাহিরে এই চৈতন্যবাচক পদার্থের নাম পুরুষ বা আত্মা ইহারা নির্গুণ প্রকৃতির সহিত কোন সম্পর্ক নাই। কেবল স্রষ্টা বা ভোক্তারূপে অবস্থিত হয়েন।

বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রধানত এই জড় এবং অজড় শক্তি লইয়া ব্যাপৃত।

এই ভাবে কতকাল কাটিয়া গিয়াছে তাহার নির্ণয় দুঃসাধ্য। তবে দুই একশত বৎসর নহে বহুশতাব্দী অতীত হইয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

প্রকৃতিতে শক্তি অনন্ত এক এক বেদমন্ত্র এক একটি প্রাকৃতিক শক্তির বাচক এবং জ্ঞাপক। এখনও বেদের আবিষ্কার হইবে, আবার অনেক আবিষ্কৃত বেদমন্ত্র ধ্বংস পাইয়াছে।

বেদমন্ত্র সকল যাহাতে রক্ষিত হয় সেইজন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাহার সংগ্রহ এবং বিভাগ করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুদিগের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে যে বেদ অপৌরুষেয় এবং ঈশ্বর প্রণীত। অবশ্য যখন বেদ প্রাকৃতিক শক্তির নির্দ্দেশক এবং শক্তি নিত্য ও অনাদি তখন সে হিসাবে বেদমন্ত্র সমূহ অপৌরুষেয় এবং ঈশ্বর প্রণীত। তবে মন্ত্র সমূহের আবিষ্কর্ত্তা মনুষ্য ঈশ্বর নহেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেদমন্ত্র এখনও অনেক প্রকাশিত হইবে।

পাশ্চাত্য প্রবৃত্তি ধর্ম্মে এবং ভারতীয় বৈদিক কর্ম্ম মার্গে একটু বিশেষ পার্থক্য আছে। তাঁহাদিগের মতে জন্মান্তর বাদ নাই উঁহাদের মতে জন্ম প্রবাহ নাই, একবার জন্ম এবং তজ্জনিত ফলভোগ হয় অনন্ত স্বর্গ না হয় অনন্ত নরক তবে জীবের নিত্যত্ব উঁহারাও স্বীকার করেন।

কালে তত্বদর্শী ঋষিগণের চক্ষে স্বর্গাদি স্থানের এবং পুণ্যাদি কর্ম্মের অনিত্যতা প্রতিভাত হইল। পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি স্থানলাভ হয় সত্য কিন্তু পুণ্যক্ষয় হইয়া যায় আবার কর্ম্ম ভূমিতে আসিতে হয় আবার যাইতে হয় গতায়াতের শেষ নাই। তৃষ্ণার বিরাম নাই। কোটি কোটি বৎসর স্বর্গবাসও অনন্তের নিকট কিছুই নয় যে আনন্দ তাঁহারা স্বর্গাদি স্থানে ভোগ করেন সে আনন্দে নিরানন্দের বীজ আছে, সে জীবনেও মৃত্যুর অধিকার রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন।

ক্রমে তাঁহারা কি করিলে জন্ম প্রবাহ বারিত হয় তৃষ্ণার বিরাম হয় কি উপায়ে মৃত্যুর হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায় কি হইলে আত্মার পরাধীনতা দূর হয় কি করিলে সর্ব্ববেদ জ্ঞানের উপরে যাওয়া যায় এবং কি করিলে আত্যন্তিক পবিত্রতার অধিকারী হওয়া যায় এই প্রশ্ন লইয়া ব্যস্ত হইলেন।

শুভক্ষণে এ মহাপ্রশ্ন ভারতে উত্থাপিত হইল জগতে আর কোন জাতিই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহস করে নাই, প্রশ্নের গুরুত্ব দেখিয়া সকলেই পরীক্ষাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে কিন্তু হিন্দু প্রতিজ্ঞা করিল এ প্রশ্নের উত্তর সে দিবে। সে বেদ হইতে বেদান্তে চলিল শ্রুতি হইতে দর্শনে উপস্থিত হইল।

ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসা সে তত্ত্বের অন্বেষণ করিতে লাগিল, অবশেষে ভগবদবতার সর্ব্বদর্শন পিতামহ মহর্ষি কপিল মেঘমন্দ্র কণ্ঠে জগৎকে প্রশ্নের উত্তর শুনাইলেন। চরাচর উৎকর্ণ হইল, প্রকৃতি দেবী লজ্জিতা হইয়া পুরুষকে পরিত্যাগ করিলেন। তৃষ্ণা অন্তর্হিত হইল জরাজন্ম আর জীবকে কষ্ট দিবেনা।

এইবার "ঘুচিল ভবের আনাগোনা" এতকাল পরে জীবের কর্ম্ম সূত্রের তানা বোনা ও মাকুভাবের শেষ হইল। জগতে মোক্ষ সোপান সাঙ্খ্য জ্ঞানের প্রচার হইল। কতকালে কত অন্বেষণে কত অধ্যবসায়ে এ অমর ভূমি জীবের আবিস্কৃত হইল তাহার ইতিহাস কেহ পড়ে কি?

এই নিগু́ণ আত্মজ্ঞান ঘোষণার পর হইতেই ভারতে উপনিষদ সমুহ আবির্ভূত বলিয়া বোধ হয়। যথার্থই এই সাংখ্যজ্ঞান সর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ক শাস্ত্রের জনক। পৃথিবীর আর কোন দেশে নিগু́ন আত্মজ্ঞান প্রচলিত হইয়াছিল এমন কথা ভারতদ্বেষী পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণও বলিতে সাহসী হন নাই। শ্রীভীষ্মদেব এই সাংখ্যজ্ঞানের বিষয় যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—

"জ্ঞানং মহদযদ্ধি মহৎসু রাজন।
বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে॥
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে
সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র॥
যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং
যচ্চার্থ শাস্ত্রে নৃপ শিষ্ট যুষ্টে।
জ্ঞানংচ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন্॥

শান্তি পর্ব্ব ৩০১ অ ১০৮।১০৯।

হে মহাত্মন অতি বিস্তৃত বেদ সাংখ্যযোগ ইতিহাস শিষ্টজন সেবিত অর্থশাস্ত্র এবং ইহলোকে যে সমস্ত নীচ বিবিধ জ্ঞান দৃষ্ট হয় সে সমস্তই এই স্যাংখ্য জ্ঞান হইতে আসিয়াছে।"

সাংখ্য জ্ঞানের সময় অর্থাৎ ভগবান কপিলের সময় হইতেই ভারতে ধর্ম্ম যুগের সৃষ্টি হয়। এযুগ কতদিন ছিল তাহা ঠিক বলাযায় না তবে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভগবান কপিল কবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার বিশ্বসনীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। কপিলের শিষ্য আসুরি এবং আসুরির শিষ্য মহামুনি পঞ্চশিখ এ কথা মহাভারতে এবং সাংখ্য কারিকায় রহিয়াছে।

মহর্ষি পঞ্চশিখ মিথিলাধিপতি জনকবংশীয় জনদেবকে সাংখ্যজ্ঞান উপদেশ প্রদান করেন; মহাভারতে আছে তিনি সহস্রবর্ষব্যাপী এক মানস যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তাহা হইলে তাঁহার স্থিতিকাল শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভগবান কপিল কর্ত্তৃক সগরবংশের ধ্বংস বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। সম্রাট সগর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র হইতে ১০ম পুরুষ অধস্তন।

সগর হইতে ৪র্থ পুরুষ ভগীরথ এবং ভগীরথ হইতে ২১ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীরামচন্দ্র হইতে রাজা বৃহদ্বল ৩০ পুরুষ অধস্তন এবং এই রাজা বৃহদ্বল অভিমন্যুর হস্তে কুরুক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে ৫৫জন সগরবংশীয় রাজা ছিলেন। যদি গড়ে ৩০ বৎসর প্রতিজনার রাজ্যকাল রাখা যায় তাহা হইলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে কপিল মত প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

পুরুষ গণনায় বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবত অনুসৃত হইয়াছে। গ্রীষের প্রাচীনত্ব দেখিয়া যাঁহাদের মনে বিস্ময়ভাব উপস্থিত একবার হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিবেন কি?

পৌর্বাপৌর্ব হিসাবে বিবেচনা করিলে প্রথম প্রবৃত্তি ধর্ম্ম পরে সগুন ঈশ্বর এবং অবশেষে নির্গুন আত্মজ্ঞান পাওয়া যায়। রোম গ্রীস, মিসর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পুরাতন জাতির মধ্যে সগুন ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায় না এমত নহে কিন্তু নির্গুন আত্মজ্ঞান সাধনার বিষয়ী ভূত ছিল এরূপ প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

সাঙ্খ্য জ্ঞানের সম সাময়িক এবং যমজ ভ্রাতার ন্যায় আর এক তত্ত্বজ্ঞান প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল তাহার নাম যোগ। যোগজ্ঞান মহর্ষি কপিলের পূর্ব্বেও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন যোগদ্বারা সগুন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কার হইত নির্গুন আত্মজ্ঞানের সহিত যোগেও পরিবর্ত্তন হইয়াছে স্পষ্ট বুঝাযায়।

এই যোগ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি কিন্তু মহর্ষি কপিলকেও প্রজাপতি বলিয়া লক্ষ্য করা হ য়াছে যথা:—

যথাহুঃ কপিলং সাংখ্যা পরমর্ষিং প্রজাপতিং।
সমন্থে তেন রূপেন বিস্ময়াপয়তি স্বয়ং॥

শাঃ—২২৮ অ—৯।

ভগবান কপিল যে সাংখ্য এবং যোগ শাস্ত্রের প্রণেতা এ মত বহুকাল হইতে বদ্ধমূল আছে। তাঁহার উভয় শাস্ত্রের বক্তা হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

আপত্তি হইতে পারে সাংখ্য এবং যোগ দুই অতি পৃথক শাস্ত্র এবং প্রাপ্য বিষয়ের সাধনোপায় ও দুই শাস্ত্রে বিভিন্ন সুতরাং এক ব্যক্তির হইতে পারে না।

উপরন্তু সাংখ্য সম্প্রদায়ে এবং যোগ সম্প্রদায়ে একটা বিতণ্ডা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল বলিয়া বোধ হয়। সে বিবাদের স্থল এই যে সাংখ্য উৎকৃষ্ট কি যোগ উৎকৃষ্টতর। ভগবান গীতায় এই মত বিরোধের নিরাকরণ করিয়াছেন এবং সুস্পষ্ট বলিয়াছেন—"সাংখ্য যোগৌ পৃথগ বালাা প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ" সাংখ্য এবং যোগ বিভিন্ন বালকেরা বলে পণ্ডিতেরা বলেন না। প্রাপ্য বিষয়ে বলিতেছেন—

"যৎ সাংখৈ প্রাপ্যতে স্থানং
তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাখ্যঞ্চ যোগঞ্চ
য পশ্যতি সপশ্যতি॥

সাংখ্যের দ্বারা যে স্থান পাওয়া যায় যোগের দ্বারাও সেইস্থানে যাওয়া যায় সাংখ্য এবং যোগকে যে এক দেখে সেই বাস্তবিক দেখে।

গীতা—৫ অধ্যায়।

অশেষ শাস্ত্রদর্শী ভীষ্মদেবেরও সেই মত তিনি বশিষ্ঠ মত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন,——

"যদেব শাস্ত্রং সাঙ্খ্যোক্তং যোগদর্শনমেবতৎ।

শান্তি—৩০৭।৫৪।

বাস্তবিক শাস্ত্রদ্বয় একই সাংখ্য জ্ঞানাঙ্গ যোগ কর্ম্মাঙ্গ। দুই এর নিত্য সম্বন্ধ।

এই মোক্ষ ধর্ম্ম প্রকরণে কতকগুলি মহাযোগীর নাম এবং মত সন্নিবিষ্ট হচ্ছে। ইঁহারা কেহ সাংখ্যাচার্য্য কেহ যোগাচার্য্য। আধুনিক নব্য সম্প্রদায় এ সকল নামের প্রতি হয়ত বিরক্ত হইবেন তাঁহাদের মতে প্রবর্ত্তি স্পেনসর এমাসন কারলাইল কান্ট ভিগেল ফিকৃটে প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের তুল্য পণ্ডিত ভারতে জন্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয় না হক্ কিন্তু হিন্দু মাত্রে এই নাম গুলি জগৎ গৌরব বলিয়া স্মরণ রাখিবেন।

আদি বিদ্বান ভগবান্ কপিলের শিষ্য মহামুনি আসুরি তাঁহার শিষ্য মহর্ষি পঞ্চশিখ, ভারতে ইনিই সাংখ্য শাস্ত্রের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন এবং লোকে তঁহাকে কপিলের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিত। বহুদিন পরে (মহাভারতের বহু পরে) আচার্য্য ঈশ্বর কৃষ্ণ কপিল মত তাঁহার সাংখ্য কারিকা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অতীত দার্শনিক চিন্তার তাজমহল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেমন সাজাহানের সেই ভুবন বিখ্যাত সৌধে মনুষ্যের বাস নাই কেবল কুতহলের কৌতূহল নিবারণ করিয়া তাহাকে বিস্ময় সাগরে নিক্ষেপ করে তদ্রূপ সাংখ্য জ্ঞানের অনুষ্ঠাতা কেহ নাই কেবল অতীত যুগের চিন্তা স্মৃতি স্বরূপ এই গ্রন্থ কেহ কেহ সুকের ন্যায় পাঠ করেন। তাঁহার পরে বিজ্ঞান ভিক্ষু "কালার্কভক্ষিত সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞান সুধাকরকে" পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন পণ্ডিতেরা বলেন তিনি কৃতকার্য্য হন নাই তাঁহার গ্রন্থের নাম সাংখ্য দর্শন বা সাংখ্য প্রবচন। বাচস্পতি মিশ্র কারিকার অপূর্ব্ব

পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা করিয়াছেন, মিশ্রের ন্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত অতি বিরল। তাঁহার টীকার নাম তত্ত্বকৌমুদী।

সাংখ্য দর্শন হইতে আর একটি শাখা নির্গত হইয়াছে বৌদ্ধদর্শন বা অনার্য্যদর্শন, অনার্য্য অবশ্য বিদ্বেষ হেতু হিন্দুগণের দত্ত নাম। সাংখ্য দর্শনের বিপক্ষে প্রধান অনুযোগ যে ইহা নিরীশ্বর সাধারণ লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপযোগী নহে। আচার হীন ভক্ষ্যাভক্ষ্য জ্ঞানশূন্যের অবশ্য সাংখ্যজ্ঞান আশ্রয় হইতে পারে না।

যোগের উপাসকদিগের মধ্যে মহর্ষি পতঞ্জলি এবং যাজ্ঞবল্ক্যের স্থান অতি উচ্চ যোগদর্শন বা পাতঞ্জলদর্শন অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। যোগের এক অতি উপাদেয় এবং প্রামাণিক ভাষ্য আছে তাহার নাম ব্যাস ভাষ্য। এ কোন ব্যাস তাহার নিশ্চয়তা নাই ইহাতে বৌদ্ধমতের ছায়া পাওয়া যায় তজ্জন্য অনেকে অনুমান করেন, অন্য কোন ব্যাস হইবেন কারণ ব্যাস অনেক ছিলেন। ব্যাস শব্দ উপাধিমাত্র। তবে এ কথা ও মনে রাখিতে হইবে যে বৌদ্ধ দর্শন অতি পুরাতন এবং বুদ্ধের বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত; আরও বিশজন বুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায় শাক্য সিংহ শেষ বুদ্ধ। এই যোগ দর্শনের ভোজরাজ কৃত এক প্রসিদ্ধ বৃত্তি বা ব্যখা ভোজবৃত্তি নামে প্রচলিত আছে।

সাংখ্যে এবং যোগে একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত নহেন শেষোক্তে স্বীকৃত। সাংখ্য প্রতিপাদন করেন যে জগতের নিমিত্তভূত উপাদানের মধ্যে ঈশ্বর বলিয়া কোন উপাদান নাই। কিন্তু জগৎ কারণে ঈশ্বর নাই বলিয়া যে ঈশ্বর একবারে ন স্যাৎ তাহা সাংখ্য বলেন না কেবল "ঈশ্বরাসিদ্ধে" ঈশ্বর প্রমাণ করা যায় না তাহাই বলেন। বাস্তবিক সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরের অনস্তিত্ব বাচক নহে।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কারও এই মত তাঁহার হিন্দু দর্শনে

প্রকাশ করিয়াছেন যদি ঈশ্বর না থাকিতেন তাহা হইলে সূত্র হইত "ঈশ্বরাভাবাৎ"।

যোগ দর্শনে ঈশ্বর বলিয়া পুরুষ বিশেষ আছেন সত্য কিন্তু জগৎ ব্যাপারে সাংখ্যের ন্যায় তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই যোগ বলেন ঈশ্বর প্রণিধান চিত্তস্থৈর্য্যের কারণ হয় তদ্ব্যতীত সৃষ্ট্যাদি প্রকৃতি পুরুষের দ্বারাই হইয়া থাকে এস্থলে সাংখ্য এবং যোগ দুইই এক।

সাংখ্য এবং যোগের মূল মত এই কয়টি।

১। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ—ত্রিবিধ দুঃখ যথা—আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এই অবস্থাই সাংখ্যের মোক্ষ।

২। বিশ্বের কারণ— প্রকৃতি এবং পুরুষ। পুরুষ অসংখ্য, প্রকৃতি এবং পুরুষ নিত্য ; সুতরাং অনাদি এবং অসৃষ্ট ও সত্য।

৩। ঈশ্বর অনাদিমুক্ত পুরুষ বিশেষ সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং প্রণব (ওঁ) তাহার বাচক।

৪। জন্য ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের সৃজক। অবশ্য তিনিও এক পুরুষ।

৫। যখন মোক্ষ হয় তখন পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎ হয়। এই তত্ত্ব সাক্ষাতের উপায় সমাধিজ প্রজ্ঞা ও বৈরাগ্য। যম নিয়ম ব্রহ্মচর্য্যাদি উপায় দ্বারা চিত্ত নিরোধ বা সমাধি হয়।

৬। মোক্ষ হইলে আর জন্ম হয় না জন্মের কারণ কর্ম্ম এবং তাহার ফল।

উপরিউক্ত মত কয়টি পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে সাংখ্য এবং যোগ মত সাধারণের ধর্ম্ম মত হইতে পারে না, ইহার সাধনা এতই কঠিন যে পূর্ণ নিবৃত্তি না হইলে এই ধর্ম্মের অধিকারী হওয়া যায় না। প্রবৃত্তির নিগ্রহ করা মুখে বলিতে এবং কাগজে লিখিতে কোন কষ্ট নাই অতি সহজ কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে হইলেই আর

তখন এ মতের উপর ভক্তি থাকে না, সাধনাকেও প্রবৃত্তিময় করিবার চেষ্টা আসিয়া উপস্থিত হয়। ফলেও তাহাই দেখা যায়।

এই মহান ধর্ম্ম ক্রমশঃ অনীশ্বরবাদে পরিণত হইয়া চার্ব্বাকাদি নানা প্রকার নাস্তিকবাদের ভারতে আবির্ভাব হইল। দেহাত্মবাদ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পাইল। এই দেহাত্মবাদকে পূর্ণরূপে চূর্ণ করিবার জন্যই ঋষিগণ কৃপা করিয়া উপনিষৎ বাক্য শুনাইতে লাগিলেন।

ঘাত হইলেই প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী অনীশ্বরবাদে ভারতীয় চিন্তায় এবং সমাজে বিষম বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হইলে। ধীরে ধীরে মেঘমুক্ত তপনের ন্যায় বেদান্তপদ উপনিষদাদিতে অন্ধকারে আলোক রশ্মির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। কালে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদবায়ণ পরিচয়ে তত্ত্বজ্ঞান মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড স্বরূপ ব্রহ্মসূত্র প্রচার করিলেন। সাংখ্য এবং যোগের পুরুষ তত্ত্ব সৃষ্টিরমূল উপাদানে পরিণত হইলেন। বিশ্বকারণ এক ব্রহ্ম জগৎ স্বীকার করিল। ভগবদ্গীতায় এই ব্রহ্মবাদ চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ, দেহাত্মবাদ ও মনাত্মবাদকে তিরোহিত করিয়া স্বপ্রকাশ হইল। জীব ব্রহ্মের অংশমাত্র প্রচারিত হইল প্রকৃতি মায়া মাত্রে পরিণত হয়েন নাই তিনিও ব্রহ্মের অংশ এবং অনাদি।

"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।"

গীতা—১৩।২০।

"মমযোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দদাম্যহং।"

ঐ—১৪।৩।

প্রায় দেড় সহস্র বৎসর পরে মানুষ ঈশ্বর বিমুখ হইয়া জ্ঞানহীন হইলে ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব অবতারে সাংখ্য জ্ঞানের পুনঃ সংস্কার করিলেন এবং ক্লিষ্টমান মানবকে শিখাইলেন।

"অবিদ্যায়ামসত্যাং সঙ্কারা ন ভবন্তি, অবিদ্যা নিরোধাৎ বিজ্ঞান নিরোধঃ। এবং যাবজ্জাতি নিরোধাৎ জরামরণশোক-পরিদেবন-দুঃখ দৌর্ম্মনস্যা পায়স্যা নিরুধ্যন্তে। এবমস্য মহতো দুঃখ স্কন্দস্য নিরোধোভবতি। অবিদ্যা অর্থাৎ অহং মম (আমি আমার) না থাকিলে সংস্কার হইবে না সংস্কার না হইলে বিজ্ঞান থাকিবে না এবং জন্ম না হইলে জরামরণ শোক ইত্যাদি কিছুই থাকিবে না। ইহা হইলেই জীবের দুঃখ সকলের চিরনিবারণ হইবে।

বৌদ্ধযুগ জগতের এক অপূর্ব্ব যুগান্তর। হিন্দু বৌদ্ধের সংঘর্ষে ভারতে বহু অমূল্য দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতীয় স্থাপত্য চৈত্যাদি নির্ম্মাণে চরম কৌশলে উপস্থিত হইয়াছিল এলোরা এলিফ্যান্টা কাশ্মীর ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিস্ময়কর কারুকার্য্য এই যুগেরই প্রসূত। কার্য্যের প্রকৃতি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়—ইঁহাদেরই বংশধরগণ কুতবমিনার পৃথ্বীরাজের মন্দির দেওয়ানখাস, মতিমসজিদ ও স্বপ্নসৌধ তাজমহলের নির্ম্মাণকর্ত্তা হইবেন।

কালস্রোত অনিবার্য্য। শ্রীবুদ্ধোপদিষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম ক্রমশঃ হীনযান মহাযান প্রভৃতি তর্কমাত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িল।

আবার সামাজিক বন্ধন শিথিল হইল। মানুষ স্বভাবের দোষে আত্মজ্ঞান ভুলিল।

অরুণোদয়ে তমোনাশের ন্যায় আচার্য্য শঙ্কর বিবর্ত্তবাদ জগতে প্রচার করিয়া বলিলেন।

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলং॥

কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে আমি তাহা আধা শ্লোক দ্বারা বলিব, তাহা এই ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা জীব এবং ব্রহ্ম একই। †

তিনি শিখাইলেন সমস্তই মিথ্যা প্রকৃতি ঈশ্বরের মায়া এই অবিদ্যাই জীবোৎপত্তির কারণ অবিদ্যার ধ্বংস হইলেই আত্মজ্ঞান হয়। অবিদ্যা অর্থে মিথ্যাজ্ঞান জ্ঞানহীনতা নহে যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান।

সাংখ্য যোগ এবং বেদান্ত ব্যতীত আর কয়েকটি মোক্ষদর্শন ভারতে প্রচলিত আছে। যথা ন্যায় বা আন্বীক্ষিকী বৈশেষিক এবং মীমাংসা দর্শন. কিন্তু ইহারা কখন মুমুক্ষুগণের আশ্রয় হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহার মধ্যে ন্যায় ষোড়শ পদার্থবাদী এবং বৈশেষিক ষটপদার্থবাদী। আত্মা ইহাদের মতে সগুণ মুক্তি যোগসাধ্য। ন্যায় দর্শন অধুনা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। নব্য ন্যায় এবং প্রাচীন ন্যায়। প্রাচীন ন্যায়ের মৌলিক গ্রন্থ গোতম সূত্র ইহার উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা বাৎসায়ন ভাষ্য। উদয়নাচার্য্যের নাম এই দর্শনে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। বাৎসায়ন ভাষ্য দুচারি জন ব্যতীত প্রায় নৈয়ায়িকেরা জানেন না। নব্য ন্যায়ের ঋষি নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি বা (কানা ভট্ট) ‡ ইনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। প্রবাদ আছে ইনি ১৯ বৎসর বয়সে নবদ্বীপ হইতে

---

† মহম্মদীয় ধর্ম্মে মনসুর তুরস্কে "অনলহক্" সোঽহং মত প্রথম প্রারম্ভ করেন এই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয় কিন্তু কথিত আছে তাঁহার শিরশ্ছেদ হইলে প্রতিরক্ত বিন্দু হইতে "অনলহক্" ধ্বনি অনবরত হইতে লাগিল।

‡ কথিত আছে পক্ষধর মিশ্র একলোচন বাঙ্গালী বালককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইন্দ্রের সহস্রলোচন মহাদেবের ত্রিলোচন অন্য সকলে দ্বিলোচন—তবে "কো ভবান একলোচনঃ।" রঘুনাথ উত্তর করেন।

মিথিলা গমন করিয়া তথাকার সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক পণ্ডিতপক্ষধর মিশ্রের সহিত শাস্ত্রবিচার করিয়া গৌড়দেশকে গৌরবে মণ্ডিত করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করেন। তদবধি মৈথিলগণ এবং অন্যান্য দেশবাসীরাও নবদ্বীপে আসিয়া অধ্যয়ন স্বীকার করেন।

এতক্ষণ আমরা মোক্ষের যে সকল উপায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম সে সমস্তই জ্ঞান সাধ্য অর্থাৎ চিত্তের যে বৃত্তি বিচারাত্মক তল্লভ্য। দুরুহত্ব হেতু জ্ঞানসাধ্য কৈবল্য সাধারণের গ্রহণীয় হইতে পারে না—পন্থা বড়ই দুর্গম। মুখে অনেক কথা বলা যায় বটে কিন্তু কাযে তাহার কোন অর্থবোধ নাই—যথা ঈশ্বর নিগুর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বব্যাপী; এই কথাগুলির ব্যবহার সকল সম্প্রদায়েই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু ঐ শব্দগুলি যে ভাবের বাচক তাহার ধারণা কয়জন ব্যক্তির সম্ভব? অথচ এই বাক্যগুলি লইয়া পৃথিবীতে কতকাল হইতে একটা বিরাট ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। যদি কেহ বলিলেন ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করিতে পারেন তাঁহাকে পিতা ভ্রাতা মাতার ন্যায় ভালবাসা যায়—অমনি তিনি বধার্হ হইলেন। আর একজন বলিলেন, ঈশ্বর প্রস্তরে ভূস্তরে এবং বৃক্ষান্তরেও থাকিতে পারেন—আর রক্ষা নাই তাঁহাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হউক হইতেছেও তাহাই। কি অপূর্ব্ব রঙ্গ যে দেখে সে দেখে।

"গৌড়দেশস্থ শিরোমণিঃ"—পক্ষধর উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন "অভাগ্যং গৌড়দেশস্য কাণভট্টঃ শিরোমণিঃ।" কিন্তু কিছু পরে সেই বাঙ্গালী বালকের বুদ্ধির বিমলতা দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন এবং শঙ্কিতচিত্তে বলিয়াছিলেন—মিথিলার প্রাধান্যের এই শেষ। ভগবৎ কৃপায় মিশ্রের শঙ্কা অচিরে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল তাঁহার অভাগ্য ইঙ্গিত সৌভাগ্যের কারণ হইল। রঘুনাথকে আমরা প্রণাম করি।

যাহা হউক অমিশ্র জ্ঞান পন্থা ক্রমশঃ বাক্যাড়ম্বরে পর্য্যসিত হইল, তখন শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তাবতার হইয়া দেখাইলেন ভগবানকে কি করিয়া ভাল বাসিতে হয় কৈবল্য চিত্তের যে বৃত্তি অনুভবাত্মক তদ্দারা প্রাপ্ত হওয়া যায়—তিনি শুষ্ক জ্ঞানে প্রেমের নিঃসন্দ প্রবেশ করাইলেন।

বৈষ্ণব দর্শনের সৃষ্টি হইল। শঙ্করের শুদ্ধ বা নিছক অদ্বৈতবাদে একটু বিশেষত্ব আসিল—বিশেষত্ব টুকু এই যে বৈষ্ণবেরা বলেন জীব ও ব্রহ্ম অনাদি তবে জীব কখন ব্রহ্ম হইতে পারে না—সে মুক্ত হয় কিন্তু তাহার মুক্তি ভগবৎ সামীপ্য, স্বারুপ্য নহে; সে "সোঽহং" বলিতে পারে না। প্রকৃতি মিথ্যা মায়া নহে নশ্বর মাত্র।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ৬ পরিচ্ছেদ।

"জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি ভাষা শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
"পরিণাম বাদ" ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যো ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর—তবু অবিকার॥
"ব্যাস ভ্রান্ত" বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
"বিবর্ত্তবাদ" স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ মিথ্যা নহে—নশ্বর মাত্র হয়॥"

এইরূপে দ্বৈতাদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতের সৃষ্টি হইয়াছে। এইমত সমুহের প্রধান কর্ত্তা পরম বৈষ্ণব দাক্ষিণাত্যের শ্রীরামানুজ মধ্ব্যাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য।

আর একটি কথা বলিয়া এই ইতিহাসের উপসংহার করি। ভারতে

মোক্ষধর্ম্মের ইতিহাস লিখিতে হইলে পুরাণের নাম না করিলে চলে না; হিন্দু ভারতের ত্রিভাগের ও অধিক এই পুরাণ ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। বৈদিক কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মই পুরাণের ভিত্তি। প্রবৃত্তি সাগরে নিমজ্জিত মানবের ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষাপুরণের পক্ষে পুরাণ চূড়ান্ত উপযোগী। কর্ম্মাবলম্বনে চিত্তশুদ্ধি সাধিত হইয়া উচ্চ ভূমিতে উঠাইবার জন্যই পুরাণ সকল কল্পিত।

আজকাল পুরাণ শব্দটির সহিত নাসিকা কুঞ্চনের ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস পুরাণ ইসপস্ ফেবলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তবে আমরা সাহস করিয়া এ কথা বলিতে পারি যে যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া এক আধখানি পুরান অধ্যয়ন করেন তবে তাঁহাদের সে বিশ্বাস থাকিবে না। যদি জন সাধারণকে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবার এবং জাগ্রত রাখিবার কোন সহজ উপায় থাকে তবে সে উপায় এই পুরাণ অধুনা পুরাণের অধ্যাপন প্রায় দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, আমাদের মতে নব্যন্যায়ের অধ্যাপক অপেক্ষা পুরানবিতের স্থান উচ্চতর এবং সমাজের শ্রেয়স্কর।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভীষ্মের ধর্ম্মমত।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ভীষ্মের সম-সাময়িক প্রধান ধর্ম্মমত সমূহ বিবৃত হইয়াছে কিন্তু ঐ মত সকলের মধ্যে ভীষ্মের অনুসৃত পন্থা কি তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এই পরিচ্ছেদে তাঁহার নিজের কি মত বুঝিবার চেষ্টা

করিব। ধর্ম্মই দেবব্রত জীবনের মুল উপাদান; তাঁহার চবিত্র বর্ণনা করিতে বসিয়া যদি তাঁহার ধর্ম্মমত লিপিবদ্ধ না করা যায় তবে একটি মানব চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার মস্তকটি চিত্রিত না করিলে যে রূপ হয় এও সেই মত হইবে। সুতরাং দেবব্রতের ধর্ম্মমত অনুসন্ধান করা আমাদেব অন্যায় হইবে না। যেরূপ গুরুতর কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছি তাহার পূর্ব্বেই আমরা ভূয় ভূয় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে পাঠকবর্গ (যদি কেহ থাকেন) একটি মনে রাখিবেন যে আমাদের পক্ষে দেবব্রতের ধর্ম্মপন্থা বিবরণের চেষ্টা একটা ক্ষুদ্রতম গুয়ানির পক্ষ সঞ্চালন দ্বারা অপার আকাশের পারে যাইবার চেষ্টার সদৃশ। মুক্ত পুরুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির ইয়ত্তা করিতে যাওয়া নরকের কীটের মহা ধৃষ্টতা সন্দেহ নাই। তবে মনে রাখিতে হইবে যে এই চেষ্টাই তাহার ভবিষ্যৎ উদ্ধারের একমাত্র পথ অতএব আমরা ক্ষমার্হ।

দেবব্রত তাঁহার ধর্ম্মমত কি তাহা কোন স্থানে আমরা যে ভাবে বলিয়া বেড়াই তাহা বলেন নাই। তাহা হইলে এত কথা বলিতে হইত না। তিনি কোন সম্প্রদায় ভূক্ত ছিলেন শাক্ত কি বৈষ্ণব কি গানপত্য কি ব্রাহ্ম কি যোগী সাংখ্য কি বৈদান্তিক তাহার কোন উল্লেখ নাই তবে তাঁহার ধ্যান ধারণা উপাসনা এবং চিত্তের অবস্থা দেখিয়া যাহা স্থূল বুদ্ধিতে ধরা যায় তাহাই বলা যাইতেছে।

দশদিন ভীষণ যুদ্ধের পর পুণ্য কুরুক্ষেত্রে প্রবাহবতী নদী তীরে শতায়ু ভীষ্ম শরশয্যায় অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে নিশ্চল দেহে শায়িত আছেন। একাদশ অক্ষৌহিনী সেনার পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহাকে আর বিরক্ত করিতেছেনা, কুরুপাণ্ডবের জয়াজয়ের চিন্তা ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য লিপির আশঙ্কা তাঁহার চিত্তকে আর বিক্ষিপ্ত করিতেছে না। তিনি

ইন্দ্রিয় মনের পূর্ণ নিগ্রহ সাধন করিয়া অবিক্ষিপ্ত নীল নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরবলম্বন চিত্তকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণপদে সমাহিত করিয়া তাঁহার ধ্যান করিতেছেন।

এই ধ্যান অপূর্ব্ব। বিষ্ণুপুরাণে সমুদ্র নিক্ষিপ্ত ভক্ত প্রহ্লাদের ধ্যান এই ধ্যানের সমকক্ষ। বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন যে স্তব করিয়াছেন তাহাও এই জাতীয়।

ভীষ্মের স্তব অনুধাবন করিলে তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। দীর্ঘত্বহেতু ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে ভীষ্মের স্তব সমগ্র উদ্ধৃত করিতে সাহস করিলাম না কিয়দংশ আবশ্যকমত প্রদত্ত হইল।

"যস্মিন সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং য সর্ব্বঃ সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়োনিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥ ১
যস্মিন বিশ্বানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশন্তি চ।
গুণ ভূতানি ভূতেশে সূত্রে মণিগণাইব॥ ২
যস্মিন্নিত্যে ততে তন্তৌ দৃঢ়ে স্রগিব তিষ্ঠতি।
সদসৎ গ্রথিতং বিশ্বং বিশ্বাঙ্গে বিশ্বকর্ম্মাণ॥ ৩
অপুণ্য পুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ।
শান্তা সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষত্মনে নমঃ॥ ৪
যুগেষ্বাবর্ত্ততে যোগৈর্ম্মাসর্ত্বয়নহায়নৈঃ।
সর্গপ্রলয়োঃকর্ত্তা তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ॥ ৫
ব্রহ্মবক্ত্রং ভূজৌক্ষত্রং কৃৎস্নমূরুদরং বিশঃ।
পাদৌ যস্যাশ্রিতা শূদ্রাস্তস্মৈ বর্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬

"এই বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থিত যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান যিনি স্বয়ং বিশ্বরূপ ও বিশ্বের আত্মাস্বরূপ সেই নিত্য সর্ব্বময় পুরুষকে নমস্কার। ১

যে ভূতেশ্বরে গুণাত্মক এই সমস্ত ভূতজাত (জগৎ) সূত্রস্থ মণিগণের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া প্রলয় সময়ে প্রবিষ্ট হয়, দৃঢ়তর বিস্তৃত তন্তু গ্রথিত মালার ন্যায় সদসৎ গ্রথিত এই যে বিশ্ব সে, বিশ্বাঙ্গ এবং বিশ্বকর্ম্মা নিত্য পুরুষে অবস্থিত রহিয়াছে।২।৩ পাপ ও পুণ্য ক্ষয় হইলে শান্ত সন্ন্যাসীগণ পুনরাবৃত্তি বিষয়ে নির্ভয় হইয়া যাঁহাকে প্রাপ্ত হন সেই মোক্ষাত্মকে নমস্কার। ৪। যিনি যোগ প্রভাবে যুগে যুগে মৎস্যকূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করত অবতীর্ণ হন এবং মাস ঋতু অয়ন ও বৎসরাদি রূপে সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন করেন সেই কালরূপ পুরুষকে নমস্কার। ৫। ব্রাহ্মণ যাঁহার মুখ ক্ষত্রিয় যাঁহার বাহুদ্বয় বৈশ্য যাঁহার উরুদ্বয় এবং শূদ্র যাঁহার পাদদ্বয় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে সেই বর্ণাত্মকে নমস্কার। ৬

উপরি উক্ত সকল কথাই গীতার প্রতিধ্বনি মাত্র। আমরা দেখিব গীতোক্ত পন্থাই ভীষ্মের ধর্ম্মমত এক কথায় বলিতে গেলে ভীষ্ম জীবন্ত গীতা।

প্রথম তিন শ্লোক হইতে জানা গেল এই বিশ্বের কারণ অবস্থান ও লয়, সৎ অসৎ এবং যাহা কিছু ভাব আছে, ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান চেতন অচেতন আদি অন্ত মধ্য সমস্তই এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বোৎপাদক ও সর্ব্বভূক পুরুষ হইতে আগত। সমস্তই তিনি তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই। তিনি কর্ত্তা তিনি কর্ম্ম তিনি সমগ্র এবং তিনি অংশ। তিনি জাগ্রত তিনি নিদ্রিত। তিনি প্রসব করিতেছেন তিনিই আহার করিতেছেন। তিনি অতি ক্ষুদ্র এবং অতি বড়। এ বাক্য হইতে বুঝা যায় সাংখীয় দ্রষ্টা পুরুষ এবং যোগের ভোক্তা ও গৌণ পুরুষ ভীষ্মের অভিমত নহে। পুরুষের বহুত্ব তিনি স্বীকার করেন না। প্রকৃতি এবং পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নাই, সকলেই এক হইতে আগত। ইহাই বেদান্তবাদ, গীতার মহাবাক্য।

ভীষ্ম বাক্য হইতে আরও একটি কথা সুন্দর প্রতিপন্ন হয়। এ কথাটি উপাসনার প্রথা বা পন্থা বিষয়ক। উপাসনা দুই প্রকারের হয়, সাকার বা মূর্ত্ত ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা, এবং নিরাকার বা অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা। অমূর্ত্তের উপাসনা কি প্রকারে হয় বা হইতে পারে তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত তবে পুস্তকে দেখিতে পাই নিরাকারের উপাসনা হয়।

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার কি উভয়াকার ইহা লইয়া পৃথিবীতে একটা মারামারি কাটাকাটি যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। খৃষ্টান মুসলমান ব্রাহ্ম প্রভৃতিরা বলিবেন ঈশ্বর নিরাকার তাঁহাকে সাকার বলিলে তাঁহার অবমাননা হয়। তিনি একটা পুতুল রূপ বা প্রস্তররূপ কখনই হইতে পারে না। পৌত্তলিকতা অসহ্য অতএব লগুড় প্রহার দ্বারা পুতুল এবং পৌত্তলিকের ধ্বংস সাধন করাই মহাধর্ম্ম।

ইহাদিগের মতে ভীষ্মও লগুড়াঘাতের উপযুক্ত কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা ও স্তব করিতেছেন। মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি ভগবদবতার এ কথা তিনি লজ্জাহীনতার সহিত মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছেন।

এখন স্বভাবত প্রশ্ন উঠিতেছে—সাকার উপাসনা ভাল কি নিরাকার উপাসনা ভাল? প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদিগকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না ইহার উত্তর স্বয়ং ভগবান গীতার ১২শ অধ্যায়ে প্রদান করিয়াছেন।

প্রথমে স্থির করিতে হইবে ভগবান সাকার কি নিরাকার? তিনি ব্যক্ত কি অব্যক্ত? অর্জ্জুন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঠাকুর—

"কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোসি ভগন্ময়া"।

আমি তোমাকে কি কি ভাবে ধ্যান করিব। তিনি সংক্ষেপে তাঁহার অনন্ত বিভূতির নির্দ্দেশ করিয়া এই বুঝাইলেন যে দেখ আমি সাকার আমি নিরাকার আমি সর্ব্বাকার। আমি কি তাহা দেবতারাও জানেন না। তৎপরে অর্জ্জুনকে বলিলেন—

"অথবা বহু নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন"।

তোমার এত বিভূতি জানিবার কি প্রয়োজন আমি যাহা তাহা আমি তুমি আমাকে সমগ্র বিশ্বের ধারক জানিও তাহা হইলেই তোমার কার্য হইবে।

উপরি উক্ত বাক্য হইতে এই বুঝা যায় যে ভগবান সাকার কি নিরাকার কি অন্য কোন আকার তাহা লইয়া মারামারি করিবার কোন আবশ্যক নাই। তিনি যাহাই কেন হউন না তুমি তাঁহাকে কি ভাবে দেখিবে এইটিই বড় আবশ্যক। তুমি তাঁহাকে যে ভাবে ভাবিবে তিনি সেই ভাবের এবং সেই আকারের। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"।

সার কথা দাঁড়াইল তিনি সাকার এবং নিরাকার। তাঁহার কোন আকারই নাই আবার তাঁহার সকল আকারই আছে। যেমন জলের কোন আকার নাই—পাত্র ভেদে জলের আকার হয় সেইরূপ ঈশ্বরের কোন আকার নাই অধিকারী ভেদে তাঁহার আকার হয়। এই অধিকারী শব্দটার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলেই সাকার নিরাকারের ঝগড়া শেষ হয়।

অর্জ্জুনের সন্দেহ হইয়াছে যে তিনি সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন কি অব্যক্তের উপাসনা করিবেন সন্দেহের কারণ পূর্ব্বাধ্যায়ে ভগবান নিজেই বলিয়াছেন তিনি নিরাকার এবং "আমি সাকার" তিনি প্রশ্ন করিতেছেন—

"এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্তাং পর্য্যুপাসতে"

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥

যাহারা তোমার সাকার স্বরূপের ভক্তি সহকারে শরণ লয়েন আর যাহারা তোমায় অক্ষর অব্যক্ত নিগুর্ণ রূপের ধ্যান করেন ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ভগবান উত্তর করিলেন—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরযোপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ" ॥

"যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত ও সাত্বিক শ্রদ্ধাসক্ত হইয়া আমার সগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন আমার মতে তিনিই যোগবিত্তম।"

পুনরায় তৎক্ষণাৎ বলিতেছেন—যাঁহারা ইন্দ্রিয় গ্রাম নিরোধ করিয়া সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি যুক্ত ও সর্ব্বভূতহিত রত হইয়া অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত সর্ব্বত্র বিদ্যমান অচিন্ত কূটস্থ অচল ধ্রুব নিগুর্ণ অক্ষরের ধ্যান করেন তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন"—তবে পার্থক্য কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—

"ক্লেশোধিকতর স্তেষামব্যক্তা সক্তচেতসাম।

অব্যক্তা হি গতির্দুখং দেহবদ্ভিববাপ্যতে ॥"

নিগুর্ণ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে কেননা নিগুর্ণ ব্রহ্ম সাধনা দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে নিতান্ত ক্লেশ সাধ্য; অহং মমেতি বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিগুর্ণ সাধন একেবারে অসম্ভব। কারণ নিজে গুণযুক্ত হইলে নিগুর্ণের উপাসনা কিরূপে হইবে। দর্পণ মলযুক্ত হইলে প্রতিবিম্ব পরিস্ফুট হইবে না। নিগুর্ণ উপাসনা অমিশ্র জ্ঞান পন্থা এ পন্থা, বড়ই দুর্গম বহুকালে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে ॥"

বহু জন্মের পর আমাকে জ্ঞানবান প্রাপ্ত হয়েন। জ্ঞানবান হইতে অনেককাল লাগে।

সংসার—কম্বলি তোমাকে ছাড়িবে কি ? তুমি ছাড়িলেও সে ছাড়িবে না। তবে কি উপায় তাই ভগবান তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছেন—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং॥"

যাঁহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক মৎপর হইয়া অনন্য সমাধি দ্বারা আমারই উপাসনা করেন সেই সকল সংযতচিত্তগণকে আমি (ন চিরাৎ) অল্পকালেই মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। নির্গুণ উপাসনায় জ্ঞানের প্রাধান্য সগুণ উপাসনায় ভক্তির প্রাধান্য; সংসারীর পক্ষে ভক্তি পন্থাই প্রকৃষ্ট। মুক্তি অনায়াস লভ্য এবং অল্পকালেই হয়। ভীষ্মদেব তাই জ্ঞানী হইয়াও সগুণ ঈশ্বরের স্তব করিতেছেন। আর আমাদের মত নারকীগণকে বলিতেছেন তোমরাও তাই কর।

উদ্ধৃত ৪র্থ শ্লোক হইতে ভীষ্মের মোক্ষ বিষয়ক মত অনুভব করা যায়। মোক্ষ পাইতে হইলে তাঁহার মতে অপুণ্য (পাপ) এবং পুণ্য দুই হইতেই উপরত হইতে হইবে। পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি লোক ভোগ হয় কিন্তু মুক্তি হয় না। পুণ্য ক্ষয়ে আবার কর্ম্মভূমিতে আসিতে হয়, যাতায়াতের বিরাম হয় না, সুতরাং মুক্তি নাই। পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করিতে হইলে অহং মম ত্যাগ করিতে হইবে, অহং মম ত্যাগ করিতে হইলে সেই সত্ত্ব রজ তমের আকর্ষণের বাহিরে থাকিতে হইবে। প্রকৃতির সহিত চিরবিচ্ছেদ সাধন করিতে

হইবে। প্রকৃতির সহিত মিত্রতা দূর হইলেই আর কামনা থাকিবে না। কামনা না থাকিলেই কর্ম্মাশয় থাকিবে না। কর্ম্মাশয় না থাকিলে আর জন্ম হইবে না। জন্ম না হইলে আর সুখ দুঃখ প্রভৃতি থাকিবে না। এত দূর হইলে তখন শান্ত হইবে শান্ত হইলেই জীব প্রকৃত সন্ন্যাসী হয়। সন্ন্যাসী হইলেই সেই পদ পাওয়া যায় ইহাই জীবের নিজ ধাম, ইহারই নাম বুড়ী ছোঁয়া ইহাই মোক্ষ।

ভীষ্ম নির্দ্দিষ্ট মোক্ষ গীতার মোক্ষের প্রতিধ্বনি মাত্র ভগবান বলিতেছেন—

"নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গ দোষা।
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্ত কামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখ দুঃখ সংজ্ঞৈ।
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥"
"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"।

যাহাদের মান ও মোহ তিরোহিত হইয়াছে যাঁহারা অনাসক্ত আত্মবিচার তৎপর নিষ্কাম এবং দ্বন্দ্বাতীত তাঁহারা সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়েন।

যেখানে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না তাহাই আমার পরম ধাম।

ভীষ্ম বলিতেছেন শান্ত সন্ন্যাসীরা "খং যান্তি" তাহাই মোক্ষ। খং কে? তাঁহার কথা হইতে জীবের অতিরিক্ত এক ব্যাপক সত্তার আভাস পাওয়া যায় কেবল শান্ত সন্ন্যাসী হইলেই মোক্ষ হয় না "খং" প্রাপ্তি হওয়া চাই। ভগবান গীতায় "খং" এর কথা বলিয়াছেন—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

সংসারে জীব আমার অংশ। ইহা হইতে বুঝা যায় জীবের ভদ্রাসন সংসার নহে সংসার পান্থ নিবাস মাত্র। প্রকৃতির টানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে বাড়ী পৌঁছায়।

আরও বুঝা যায় জীব ব্রহ্মের অংশ সুতরাং জীবে এবং ব্রহ্মে বাস্তবিক পার্থক্য নাই। যথা জল সূর্য্যক (সূর্য্যবিম্ব) সূর্য্যের অংশ জল না থাকিলে আর সে থাকে না সূর্য্যে চলিয়া যায় সেইরূপ জীব এবং ব্রহ্ম, অথবা যেমন ঘটের আকাশ এবং বাহিরের আকাশ ঘট ভাঙ্গিলেই আর কোন প্রভেদ থাকে না সেইরূপ।

অথবা নদী সকল যেমন দেশদেশান্তর হইতে আসিয়া নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে জীব তদ্রূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করে।

ইহা অবশ্য পূর্ণ অদ্বৈতবাদ।

জীব ব্রহ্মের অংশ এ কথা বলিয়াই পুনরায় ভগবান বলিতেছেন—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষর শ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্কানিভূতানি কূটস্থোক্ষর উচ্যতে॥"

"ক্ষরও অক্ষর নামে দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। কার্য্যরূপ ভূতগণ ক্ষর এবং কূটস্থ অক্ষর বলিয়া কথিত হয়েন।

কূটস্থ কি? শঙ্কর বলেন—

"অনেক মায়াদি প্রকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ"

কূট শব্দের অর্থ মায়া বঞ্চনা। ভগবানের যে মায়া শক্তি যাহার দ্বারা ক্ষর ভূতাদি প্রকাশিত হয়। স্বামী এ মায়ার ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই তিনি কূটস্থ শ্চেতনো ভোক্তা এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা পূর্ণাদ্বৈতবাদের অনুরূপ শ্রীধরের ব্যাখ্যা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুমত। যদি কূটস্থ শব্দ জীবের অনুবাচক হয় তাহা হইলে অদ্বৈতবাদ ক্ষুন্ন হয়। কারণ পরের শ্লোকেই ভগবান বলিতেছেন—

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥"

"আর এক অন্য পুরুষ আছেন যাঁহার নাম পরমাত্মা বলা হয়। যিনি লোকত্রয়কে ধারণ করিয়া আছেন তিনি ঈশ্বর।

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

"যে হেতু ক্ষর এবং অক্ষয় হইতে আমি উত্তম সেই জন্য বেদেও লোকে আমাকে পুরুষোত্তম বলে।

এতক্ষণে আমরা ভীষ্মের ইঙ্গিত কৃত "যং" বুঝিতে পারিলাম এই পুরুষোত্তমই তাঁহার "যং" বা মোক্ষপদ।

মর্কটপনা প্রকাশ করিয়া আমাদের বলিতে হইল ভীষ্মের মোক্ষ স্বারূপ্য বা সোহংভাব নহে বলিয়া বোধহয়। গীতায় যে ভাবে অদ্বৈত বাদ আছে ভীষ্মের সেই ভাবের অদ্বৈতবাদ ছিল তিনি বলিতেছেন—"আমি তোমার শরণাগত ভক্ত" ইহা হইতে তাঁহার মতে জীব এবং ব্রহ্মের বিশেষত্ব আছে বলিয়া সন্দেহ হয়।

যাহা বলা উচিত নহে আমরা তাহাই বলিয়া ফেলিলাম অনধিকার চর্চ্চার এই রূপই ফল দাঁড়ায়। ভগবান এই পাপের জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করুন।

পঞ্চম শ্লোক হইতে ভীষ্মের অবতারবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীবানুগ্রহহেতু ভগবদবতরণ তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব তিনিই ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞে প্রথম প্রস্তাব করেন।

অনেকে আপত্তি করিবেন এই অবতারবাদ দর্শনশাস্ত্র সম্মত নহে। বিশেষ সাংখ্য এবং পাতঞ্জল মতে ত নহেই। কারণ সাংখ্যে ঈশ্বর অসিদ্ধ এবং পাতঞ্জলের ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেও গৌণ তাঁহার কর্ত্তৃত্বভাব নাই—এরূপ অবস্থায় উক্ত দর্শনদ্বয়ের মতে পুরুষ মুক্ত হইলে কিরূপে

পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। যেহেতু জন্মের কারণ কর্ম্মফল— যাঁহারা মুক্ত তাঁহারা কিরূপে কর্ম্মফলে অনুবিদ্ধ হইবেন? অতএব এই অবতারবাদ সর্ব্ববাদী সম্মত নহে সুতরাং সাম্প্রদায়িক এবং দোষ যুক্ত।

প্রশ্নটি অবজ্ঞা করিয়া উড়াইবার নহে। ইহার একটা সদুত্তর না দিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে দাগ লাগিয়া যায়, ভীষ্মের একটা বিষম ভ্রান্তি প্রকাশ পায়।

পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর বিষয়ক সূত্র এই "ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈ রপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।" সমাধিপাদ ২৪।

ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট যে পুরুষ তিনিই ঈশ্বর। ক্লেশ-অবিদ্যাদি, কুশল অকুশলাদি পাপ পুণ্য কর্ম্ম। কর্ম্মের ফলই বিপাক এবং বিপাকজনিত যে চিত্তের অনুরূপ বাসনা তাহাই আশয়। ইহারা মনে উপস্থিত হইয়া পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয়, তাহাতে পুরুষ সেই কর্ম্মফলের ভোক্তা হন। মুক্ত পুরুষের বা ঈশ্বরের এরূপ কর্ম্মফল নাই। ঈশ্বর অনাদিমুক্ত অর্থাৎ তাঁহাতে কোনকালেই কর্ম্মফল স্পর্শ হয় নাই সুতরাং তাঁহার জন্ম প্রয়োজন কিরূপে সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যকার ব্যাস প্রামাণিক ব্যক্তি। তিনি এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য পরের সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

"তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহ প্রয়োজনং জ্ঞান ধর্ম্মোপদেশেন কল্প প্রলয় মহাপ্রলয়েষু সংসারিণ পুরুষান উদ্ধারয়িষ্যামিতি। তথাচোক্তং আদিবিদ্বান নির্ম্মাণচিত্ত মধিষ্ঠায় কারুণ্যাৎ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ।" তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কল্পপ্রলয়ে মহাপ্রলয়ে জ্ঞান ধর্ম্ম উপদেশ দ্বারা জীবানুগ্রহ তাঁহার প্রবৃত্তির প্রয়োজন। ভাষ্যকার সাংখ্যযোগী পঞ্চশিখাচার্য্যের বচন

উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতেছেন যে আদি বিদ্বান ভগবান কপিল (মুক্ত পুরুষ হইলেও) কারুণ্যবশত জন্মগ্রহণ করিয়া তৎশিষ্য মুনি আসুরিকে সাংখ্য শাস্ত্র বলিয়াছিলেন।

প্রমাণ হইল ঈশ্বর এবং পুরুষের জীব মঙ্গলের জন্য দেহ ধারণ সাংখ্য এবং পাতঞ্জল মতে সম্পূর্ণ ন্যায্য।

শ্রীভগবানও বিশ্ববিমোহন কণ্ঠে বলিয়াছেন, যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই আমি জন্মগ্রহণ করি, সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। প্রমাণ হইল ভীষ্মের অবতার বিশ্বাস সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত। অবতার দশটি নহে, উপরি উক্ত ভগবৎ বাক্য বিবেচনা করিলে ভগবদবতরণ দেশকাল বা সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে অবতার "বহব", বলিয়া উল্লিখিত। প্রয়োজনের তারতম্য অনুসারে পূর্ণ বা কলা হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব একটু চিন্তা করিলেই বিনা তর্কেই প্রতিভাত হইবে। যখন ভগবদবতরণ স্বীকৃত তখন প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকুল রূপ ধারণ অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য; সুতরাং মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদিরূপে অবতরণ হাস্য করিয়া উড়াইবার কারণ নাই।

এতদূর পর্য্যন্ত দেবব্রতের সহিত আধুনিকগণের একটা বিশেষ রকম মতভেদ উপস্থিত হয় নাই—তাহার প্রধান কারণ নব্যগণের মোক্ষবিষয়ক কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা নাই; পূর্ব্বে ভীষ্মের নিয়োগ এবং বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় মত প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে তাঁহার নব্যমতে চিত্তের অবনতি ব্যক্ত হইলেও সভ্যসমাজ হইতে একবারে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা ছিল না কারণ নিয়োগ প্রথাটি কলিকালে প্রচলিত হইলেও এই যৌবন বিবাহের প্রখরতর স্রোতের দিনে অনেক

পরিবারের কলঙ্ক প্রক্ষালনের উপায়টা সহজ হইত। বহুবিবাহও তত দোষের হইত না। যদি মহিলাগণেরও সাম্যবাদ অনুসারে ঐ অধিকার স্বীকার করা যাইত। ফল কথা যোষিৎগণের এ দাওয়া সময়ও আন্দোলন সাপেক্ষ এবং কোন কোন স্থলে তাঁহারা এ অধিকার প্রায় আয়ত্ত করিয়াছেন।

যাহা হউক এবার যে মতটা ভীষ্মের অনুসৃত বলিয়া লিখিতেছি সেটি সত্য হইলে ভীষ্ম আর সভ্যসমাজে আসন বা কণিকা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না। এক হতভাগ্য হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত জাতিই দেবব্রতের বিপক্ষে রোষ কষায়িত লোচনে দণ্ডায়মান হইবেন ও তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা কর্ম্ম জ্ঞান ত্যাগ অভ্যাস সমস্তই পাথুরে কয়লার ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিবেচিত হইবে।

ভীষ্ম স্তব করিতেছেন, "ব্রাহ্মণ যাঁহার মুখ ক্ষত্রিয় যাঁহার বাহুদ্বয় বৈশ্য যাঁহার উরুদ্বয় এবং শূদ্র যাঁহার পাদদ্বয় আশ্রয় করিয়া আছে সেই বর্ণাত্মকে নমস্কার"।

কি সর্ব্বনাশ! এ যে সেই অভিশপ্ত জাতিভেদের কথা। সেই হিন্দুজাতির সর্ব্বোচ্চ বিন্দু হইতে সর্ব্ব নিম্ন বিন্দুতে পতনের নিশান, এ যে সেই স্বার্থান্ধ বুভুক্ষিত ব্রাহ্মণগণের বিনা আয়াসে বংশ পরম্পরায় অন্ন সংস্থানের প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ অঙ্গে এঁটুলির ন্যায় লিপ্ত থাকিয়া ধর্ম্ম ব্যপদেশে জাত্যান্তরের শ্রম লব্ধ প্রাণরক্তের শোষণ করিবার নালীক যন্ত্র এই বর্ণবিচার।

পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় দেবব্রত চরিত্রে ইহা তুষপনের কালিমা।

দেবব্রত কেবল স্বয়ং জাতিভেদ মানিয়াই ক্ষান্ত নহেন তিনি ধৃষ্টতার সহিত ব্যক্ত করিতেছেন যে ভগবান বর্ণাত্মক অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি বর্ণচতুষ্টয় তাঁহারই সৃষ্ট; কি প্রাগল্‌ভ্য! ভীষ্ম এবার

বাস্তবিকই অসহ্য হইয়াছেন, জাতিভেদ মানিতে হয় মানুন কিন্তু ভগবানের দোহাই দিয়া মানুষকে ঠকাইয়া নরকের রাস্তাকে প্রশস্ত করিবার প্রয়োজন কি?

অনেকে হয়ত বলিবেন এ গ্রন্থে জাতিতত্ত্বের বিতণ্ডা উপস্থিত না করাই ছিল ভাল বিশেষত জাতিভেদ সামাজিক ব্যাপার ভীষ্মের মোক্ষ বিষয়ক প্রবন্ধে একটা দুরুহ এবং বহুজনের মত বিরুদ্ধ প্রসঙ্গ একেবারে অবান্তর ও অরুচিকর। তাহা হইতে পারে তবে এ স্থলে বক্তব্য এই যে যদি জাতিভেদ নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক ব্যবহার বা লৌকিকতা মাত্র বিবেচিত হইত তাহা হইলে এ বিষয়টির আলোচনা এ পুস্তকে না করিলে চলিত, বরং না করাই ছিল ভাল, কিন্তু ভীষ্মত এই বর্ণবিচারকে ইয়ুরোপীয়দিগের ন্যায় ব্যবসায় সম্ভূত সম্প্রদায় বলিতেছেন না; তাঁহার উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় জাতিবিচার ঐশ্বরিক সুতরাং নিত্যপদার্থ মুমুক্ষুর অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং অনুসর্ত্তব্য ধর্ম্ম। আজ আছে কাল নাই থাকিলেও চলে না থাকিলেও চলে এরূপভাবের বস্তুত জাতিভেদ নহে। ভীষ্মের কথায় বোধ হয় জাতিভেদ সৃষ্টিচক্রের একটি প্রধান ধুর ইহার অব্যভিচারী সত্ত্বা। ভীষ্ম ইহাকে প্রাকৃতিক পরিণতির এবং জীবত্বের চরম স্ফূর্ত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন সুতরাং জাতিতত্ত্ব যে পরিমাণে মোক্ষধর্ম্মের অন্তর্গত ততটা আমাদের বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য নচেৎ দেবব্রতকে সাম্প্রতিকগণের নাসিকাকুঞ্চন এবং দারুণ অশ্রদ্ধা হইতে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে।

জাতিতত্ত্ব।

এই জাতিভেদ ভারতের নিজস্ব, পৃথিবীর আর কোথাও এ প্রকার সৃষ্টি নাই। ভারতবর্ষের যে সকল বিষয় পাশ্চাত্য বুদ্ধিকে প্রবেশাধিকার দেয় নাই তন্মধ্যে এই জাতি প্রথা একটি প্রধান।

এ প্রথার বীজ কোথায় এবং কেন ইহা এতকাল ধরিয়া সমাজ অঙ্গে লিপ্ত রহিয়াছে, এ বিষয় লইয়া চর্চ্চা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর কেহই দিতে পারেন নাই। না পারিবার কারণ তাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষায় নিহিত আছে। তাঁহারা যে ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাহাতে জন্মান্তরবাদ নাই, পরজন্ম না স্বীকার করিলে জাতি বিচার বৃথা কারণ জাতি এক জন্মের ফল নহে।

পাশ্চাত্যেরা বলেন সমাজের উন্নতির সহিত বহুপ্রকার অভাবের আবির্ভাব হয় এবং সেই অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি ব্যক্তি প্রবর্ত্তিত হয় ক্রমে সেই অভাব পূরক বিষয়ক কর্ম্ম অভ্যাস এবং সুবিধা হেতু বংশগত লইয়া পাড়ে এবং সেই কর্ম্মে নিযুক্ত যত লোক কালে এক জাতিতে পরিণত হয়।

এ ব্যাখ্যায় হিন্দুর জাতিভেদ বিবৃত হইল না, ইয়ুরোপীয় সমিতি সমূহের এক প্রকার কারণ বলা হইল। ইহা ব্যবহারিক জাতি ব্যবসায়াত্মক ইহার নিত্যত্ব নাই মোক্ষ বিষয়ে তাহার কোন সংস্রব নাই। এ কথা বলা বাহুল্য যে যে প্রয়োজনের জন্য এইরূপ জাতির উৎপত্তি সে প্রয়োজনের অভাব হইলেই এ সকল জাতির তিরোভাব হয়।

হিন্দুর জাতি জন্মরূপ যিনি যে কর্ম্মই করুন না কেন—তাঁহার জাতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে আংশিকভাবে জাতির উৎপত্তির কথা বলিয়াছি, তথায় সামান্যত জাতি বিচার অবান্তর হইবে বলিয়া ক্ষাত্র ধর্ম্মের উৎপত্তি মাত্র বিচার করিয়াছি অধুনা জাতির সাধারণভাবে বিবেচিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

ঋষিগণ এই দুরবগম্য প্রশ্নের কি মীমাংসা করিয়াছেন তাহাই

আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। কেবল যুক্তি দ্বারা এ তত্ত্বের উদ্ঘাটন হয় না সমাধি প্রজ্ঞা ব্যতীত এ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার অসম্ভব তবে যুক্তি দ্বারা যতদূর যাওয়া যায় ততদূর অগ্রসর হওয়া যাউক।

জগতে দেব মানব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি অসংখ্য জাতি আছে। ইহাদের সামান্য ধর্ম্ম জীবত্ব; জাতি বিশেষে অবশ্য জীবত্বের তারতম্য আছে যথা মনুষ্যের জীবত্ব এবং কীটের জীবত্ব বিকাশ হিসাবে সমান নহে মানুষের জীবত্ব উচ্চ অঙ্গের।

সকল কার্য্যেরই কারণ আছে জীবত্ব একটা কার্য্য অবশ্য তাহার কারণ আছে এবং জীবত্বের যে পার্থক্য তাহারও নিশ্চয় কোন কারণ আছে।

আমরা মনুষ্য জাতীয় জীব মনুষ্যত্বের কারণ অনুসন্ধানই আমাদের প্রশস্ততর। যদিও যে কারণে জীবের মনুষ্যত্ব হয় সেই কারণেই তাহার ভিন্ন যোনিত্ব হয়। তবে মানুষ তাহার দলভুক্তকে শীঘ্র বুঝাইতে পারে এ জন্য আমরা মানুষের কথাই বিশেষরূপে আলোচনা করিব।

মনুষ্য যে যোনি তাহার রচনা কি লইয়া; প্রথমত তাহার কতকগুলি করণ বা যন্ত্র দেখা যায় এই করণ গুলিকে শাস্ত্রে ইন্দ্রিয় বলে।

এই ইন্দ্রিয় সমূহ তিন ভাগে বিভক্ত যথা জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণেন্দ্রিয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ—কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও নাসা।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পঞ্চ—বাক পানি পাদ পায়ু ও উপস্থ।

প্রাণেন্দ্রিয়ও পঞ্চ—প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান।

ইহাদের নাম সাধারণ বাহ্যকরণ। বাহ্যকরণ ব্যতীত আর একটি করণ মনুষ্যে লক্ষিত হয় সে করণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বাহ্যকরণের

সহিত নাই বটে কিন্তু সে বাহ্যকরণগণের দ্বারা আনীত বিষয় ব্যবহার করে তাহার নাম চিত্ত বা অন্তঃকরণ।

সামান্য অনুধাবন করিলেই দেখা যায় এই চিত্ত তিন প্রকার অবস্থাপন্ন। চিত্তের বিশেষ ধর্ম্ম বা প্রকৃতি এই যে ইহা নিরন্তর পরিণামশীল, প্রতিক্ষণেই ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। বাহ্যবিষয়ের সহিত ইহার অনবরত সম্বন্ধ ঘটিতেছে এক এক সম্বন্ধই এক এক পরিণাম। এক একটি সম্বন্ধের নাম বৃত্তি। বৃত্তিহীন হইলে আর চিত্ত থাকে না তাহার লয় হয়।

বোধ, ক্রিয়া এবং ধারণা বা স্থিতি সকল বৃত্তিরই প্রকৃতি বা অবস্থা সুতরাং চিত্তেরও ঐ তিন অবস্থা। চিত্ত যেমন কোন বাহ্যবিষয়ের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইবে অমনি তাহাতে এক ক্রিয়া উপস্থিত হয়—তৎ সঙ্গেই বোধ বা জ্ঞানের উদয় হয় পুনরায় ঐ বোধের এক অবরুদ্ধাবস্থা হয়।

বোধশক্তি প্রকাশশীল বোধের অব্যবহিত যে কারণ তাহা ক্রিয়াশীল এবং বোধের যে তিরোভাব বা অবরুদ্ধাবস্থা তাহা স্থিতিশীল এই ত্রিবিধ শীলের নাম সত্ত্ব রজ ও তম। সত্ত্ব রজ ও তম ইহারা গুণ বা ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয় বা করণ সমূহ এই তিন গুণের দ্বারা অনুপ্রাণিত বা পরিচালিত। তাহারা ত্রিগুণাত্মিক সকল করণই এক গুণবিশিষ্ট নহে, কোন করণে সত্ত্বের প্রাবল্য কোন মতে রজের আধিক্য এবং কোন করণে তমের প্রাধান্য আছে—যথা।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সত্ত্বের প্রাধান্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ে রজের এবং প্রাণেন্দ্রিয়েতে তমের প্রবলতা বর্ত্তমান।

স্থূল কথায় আমরা বুঝিলাম যে বাহ্যবিষয় করণসমূহ দ্বারা আনীত হইয়া চিত্তে আরোপিত হয়, চিত্ত বিদ্ধ হওয়ায় বৃত্তির উৎপত্তি হয় বৃত্তির

উৎপত্তির কারণ হইল বিষয়ের চিত্তের সহিত সংযোগরূপ ক্রিয়া। তৎপরে বোধরূপ প্রকাশ পরে এই প্রকাশভাবের অপ্রকাশে পরিণাম।

সকল বৃত্তিরই এক সাধারণ আবরণ আছে সে আবরণ আমিত্ব, আমিত্ব ব্যতীত জ্ঞান বা বোধ হয় না। সকল জ্ঞানেই জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা থাকিবে একের অভাব হইলে অন্যের তিরোভাব হইবে। উভয়ের সংযোগ হইলে তবে জ্ঞান হইবে। এই জ্ঞাতৃভাবই আমিত্ব। আমিত্বের বৃত্তি সংযোগ অব্যভিচারী অর্থাৎ সকল বৃত্তিতেই আমিত্ব থাকিবেই। যাইতেছি খাইতেছি করিতেছি ইত্যাদি আমিত্বের অভিমান সর্ব্বদাই বর্ত্তমান ইহারই নাম অহংকার!

আমিত্বের এক জড় বা স্থিতিশীল ভাব আছে এই স্থিতিশীল ভাব দুই অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ম যখন আমিত্ব বাহ্য বিষয়ের দ্বারা অনুবিদ্ধ নহে (এইটি বোধের পূর্ব্বাবস্থা) ২য় যখন আমিত্ব বাহ্য বিষয়ের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার পরে বোধের উদয় হইলে পুনরায় যে অবুদ্ধ বা অপ্রকাশাবস্থা। এই আমিত্ব মিশ্রিত জড়তা বা স্থিতি ভাবের নাম মন।

সুতরাং মনের প্রধান গুণ ধারণা যথা কোন একটি বৃত্তি যখন বুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় অবুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় সে বৃত্তি তখন একবারে ধ্বংস হয়না মনে সূক্ষ্মভাবে আহিত বা লিপ্ত থাকে। চেষ্টা বা আন্তরিক অন্বেষণ দ্বারা এই অবুদ্ধবৃত্তিকে পুনরায় বুদ্ধ করা যায়। তাহা যদি না যাইত তাহা হইলে স্মৃতি থাকিত না; পূর্ব্ব অনুভূত বিষয়ের পুনরনুভবই স্মৃতি। যদি পূর্ব্ব অনুভব সম্যক ধ্বংস হইত তাহা হইলে আর পুরাতন বৃত্তি জাগ্রত হইত না।

পাঠককে মনের এই ধৃতি শক্তিকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে অনুরোধ করি। আমরা এখনই দেখিব মনের এই আহিত অবস্থাই জাতি বা জন্মের কারণ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সমস্ত করণই ত্রিগুণাত্মক। গুণত্রয়ে চলৎ ভাব থাকায় করণ সকলে নিয়ত চেষ্টা হইতেছে। চেষ্টা থাকিলেই পরিণতি বা কর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী। এমন এক মূহুর্ত্তও নাই যখন এই কর্ম বন্ধ থাকিবে প্রবাহরূপে নিরন্তর কর্ম্মস্রোত চলিয়াছে।

কর্ম্মের এই অপ্রতিহত গতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"নহিকশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বৈঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ

গীতা—৩।৫

"কখন কেহ ক্ষণমাত্র ও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেনা যে হেতু প্রকৃতি জাত গুণ কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া সকলে কর্ম্ম করে।"

কর্ম্ম দুই প্রকারে সম্পন্ন হয় দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম জীবের স্বতঃ চেষ্টা বা ইচ্ছাদ্বারা হয়, ২য় অনিচ্ছাপূর্ব্বক (অবশঃ) বা আত্মচেষ্টা ব্যতীত হয় শ্বাসাদি ক্রিয়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ইত্যাদি বাহ্য করণের অবশক্রিয়া।

অন্তকরণের অবশক্রিয়া বোধহয় প্রায় ব্যক্তির জীবনে কখন না কখন ঘটিয়া থাকে। যেমন অনেক মাতা বিদেশস্থ সন্তানের বিপদ পূর্ব্বেই জানিতে পারেন। দূরস্থ আত্মীয়ের মৃত্যু অনেক সময়ে কোন কোন ব্যক্তির স্বতঃজ্ঞান হয়। ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়া পূর্ব্বাহ্ণে অনেকেই দেখিতে পান অধিক বলিবার আবশ্যক নাই স্বপ্ন অন্তঃকরণের চেষ্টাহীন ক্রিয়া। মরণ ভয় চেষ্টাহীন ক্রিয়ার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

প্রথমোক্ত কর্ম্মের নাম পুরুষকার শেষোক্তের নাম অদৃষ্ট বা অজ্ঞাতফল কর্ম্ম।

প্রত্যেক কর্ম্মই অন্তঃকরণের ধারিনী শক্তির দ্বারা চিত্তফলকে অঙ্কিত থাকে চিন্তাও একটা কর্ম্মের মধ্যে একথা বলা বাহুল্য। চিত্তে অনুভূত

কর্ম্মের যে অঙ্কিত বা আহিত ভাব তাহার নাম সংস্কার। জীব অনাদি-কাল হইতে আছে প্রলয়ে তাহার ধ্বংস নাই। প্রলয়কালে সে সুসুপ্তা-বস্থায় থাকে কল্পারম্ভে পুনরায় জীবত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রলয়ে অব্যক্তে ডুবিয়া যায়। তথাহি গীতায়।

"ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে
রাত্র্যাগমে অবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥

প্রাণী সকল উত্তর কল্পে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহারাই পুনর্ব্বার ব্রহ্মার দিবাগমে স্বস্ব কর্ম্মের বশীভূত হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়।

যখন জীব অনাদিকাল হইতে আছে তাহার চিত্তও অবশ্য অনাদিকাল হইতে আছে সুতরাং সংস্কারও অনাদি। ফল কথা দাঁড়াইল এই চিত্ত বা মন একখানি অনাদি দীর্ঘ পুস্তক বা আলবম তাহাতে জীবের যাবতীয় অনুভব বা বৃত্তিই লিখিত বা ফটোগ্রাফ করা হইয়াছে। এই গুপ্ত চিত্রই চিত্র গুপ্তের খাতা ইহা দেখিয়াই জীবের সদসৎ কর্ম্মের বিবেচনা হয়। মনের অতি নিভৃত চিন্তাও এই খাতাখানিতে অঙ্কিত থাকে কি সম্পূর্ণ যন্ত্র। অতি সামান্য এবং ক্ষণিক সুখ দুঃখের অনুভব ও ইহাতে ছাপ প্রাপ্ত হয়।

আপত্তি হইতে পারে যদি সমস্ত অনুভবই অক্ষয়ভাবে মনে লিপ্ত থাকে তবে বিস্মৃতি কেন হয়। জন্মান্তরের কর্ম্মসমূহ আমার অনবরত মনে পড়েনা কেন?

অনেক কারণে অনুভূত বিষয়ের পুনরনুভবের ব্যাঘাত উপস্থিত করে যথা—

১। অনুভবের অতীব্রতা ২। অনুভূত কালের দীর্ঘতা। ৩। অবস্থান্তর পরিণাম। ৪। বোধের অনির্ম্মলতা। ৫। অনুকূল ক্রিয়ার অভাব বা উপলক্ষণাভাব।

কর্ম্মভেদে সংস্কার দুই প্রকার ১। ক্লিষ্ট সংস্কার অর্থাৎ অবিদ্যাদি অজ্ঞান মুলক এবং অক্লিষ্ট বা প্রজ্ঞা সংস্কার।

অজ্ঞান মূলক সংস্কারের নাম কর্ম্মাশয়; কর্ম্মাশয় হইতে তদনুরূপ বাসনার উৎপত্তি হয়। এই বাসনার বিপাক বা ফল জাতি আয়ু এবং ভোগ।

ভগবান পতঞ্জলি যোগসূত্রে জাতির বিষয় সাধন পাদের ১২।১৩ সূত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন সূত্র দুইটি এই—

১। ক্লেশমূলে কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট জন্মবেদনীয়ঃ।

২। সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।

ব্যাস সূত্রের যে অপূর্ব্ব ভাষ্য করিয়াছেন তদবলম্বনে এই জাতি বিষয় লিখিত। একটু বিশদভাবে এই বিচার অনুধাবণ করা যাক তাহা হইলে বিষয় সুগম হইবে স্থূলত ব্যাপার এই—

গুণ হইতে কর্ম্ম হয়, যে কর্ম্মের মুলে অজ্ঞানতা যথা কাম ক্রোধ লোভাদি আছে সেই কর্ম্মগুলি বিপাকী অর্থাৎ ফলপ্রদ হয় (এই ফলই বন্ধন বা শৃঙ্খল) আর যে কর্ম্মের মূলে কামাদি নাই সে কর্ম্মের বন্ধন নাই সে কর্ম্মের আশয় বা বাকি হিসাব নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কর্ম্ম সৎ বা অসৎ দুইই বন্ধনের মূল; এই বন্ধন হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্যই নিষ্কাম কর্ম্মের এত উপদেশ।

মনে করুন এক ব্যক্তি জীবনে হিংসাবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বহু জীব-হিংসা করিল। হিংসার এক প্রকাণ্ড সংস্কার তাহার চিত্তে লিপ্ত রহিল সুতরাং তাহার বাসনাও হিংসাময় হইবে একথা বলাই বৃথা। মরণের পর এই বাসনা চরিতার্থের জন্য তদনুকুল করণ সকল প্রাপ্ত হইবে সহজেই বুঝা যায়।

কর্ম্মই জাতির মূল আমার জাতির কর্ত্তা আমি যে গুণবিশিষ্ট কর্ম্ম

করিব সেই গুণবিশিষ্ট জাতি পাইব। ইহাতে ব্রাহ্মণের কি দোষ ভাই। এই প্রাকৃতিক নিয়ম অসীম জ্ঞান বলে ব্রাহ্মণ জগতে প্রচার করিয়াছেন তোমার অশেষ মঙ্গলের জন্যই করিয়াছেন। নিষ্কাম কর্ম্ম না করিলে তোমার মুক্তি নাই তাই ভগবান্ বলিতেছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

কর্ম্মে অধিকার রাখ ফলের দিকে তাকাইও না। তাহা হইলে আর রক্ষা নাই আটা কাটিতে জড়াইয়া যাইবে।

যেমন জল হইতে বাষ্প বাষ্প হইতে জল বৃক্ষ হইতে বীজ বীজ হইতে বৃক্ষ সেইরূপ গুণ হইতে কর্ম্ম কর্ম্ম হইতে জাতি জাতি হইতে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতে গুণ হয়। গুণ এবং কর্ম্মের উপরেই আমার বর্ণ নিহিত আছে। তাই ভগবান বলিতেছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগসঃ।"

গুণ এবং কর্ম্মানুসারে আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।

এখন বুঝা গেল হিন্দু কেন বর্ণ বিভাগ স্বীকার করেন। জাতি অপরিহার্য্য।

জীবের গুণের সহিত যে সঙ্গ তাতেই তাহার দেব মানব পশু পক্ষী প্রভৃতি যোনির সৃষ্টি হয়। সুস্পষ্টাক্ষরে বাসুদেব তাহাই উপদেশ করিতেছেন—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থ হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান গুণান।
কারণং গুণ সঙ্গোস্য সদসৎ যোনি জন্মসু॥"

গীতা—১৩।২২

জীব প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতি জাত (সত্ত্ব রজ তম) সুখ দুঃখাদি গুণ সকলকে ভোগ করেন। প্রকৃতির সহিত সংসর্গই তাঁহার সদসৎ যোনিতে জন্মের কারণ।"

সাংখ্যমতে পুরুষ দ্রষ্টা যোগ মতে তিনি ভোক্তা ভাবগত পার্থক্য কিছু নাই।

ভাষ্যকার ব্যাস কর্ম্মাশয় হইতে কি প্রণালীতে জাতি উৎপন্ন হয় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন পাঠকের অবগতির জন্য সে ব্যাখ্যায় কিয়দংশ বক্তব্য মনে করি। বিষয় অতি চমৎকার।

জীব ত জীবনে অনেক প্রকার কর্ম্ম করে—কত ভাল কর্ম্ম করিয়াছে, কত মন্দ কর্ম্ম করিয়াছে অনন্ত তাহার কর্ম্মাশয়। প্রশ্ন হইতেছে তাহার এক একটি কর্ম্ম হইতে তাহার এক একটি জন্ম হইবে অথবা অনেক গুলি কর্ম্ম মিলিয়া তাহার একটি জন্ম হইবে অথবা একটি কর্ম্ম হইতে তাহার বহু জন্মের সৃষ্টি হইবে।

ভাষ্যকার বলিতেছেন, একটি কর্ম্মাশয় অনেক জন্মের কারণ হইতে পারে না তাহা হইলে কর্ম্মফলের আর ভোগের সময় থাকিবে না ফল দাঁড়াইবে যে বহু মন্দ কর্ম্ম করিয়াছে তাহার আর সৎ কর্ম্ম করিবার অবসর হইবে না এবং করিলেও তাহার ভোগ সে পাইবে না। তাহা হইল কর্ম্ম জগতে কোন এক ব্যক্তিকে কেবল মন্দ কর্ম্ম না হয় কেবল সৎকর্ম্ম করিতে এবং তাহার ফল ভোগ করিতে দেখিব। কিন্তু তাহা ত দেখা যায় না। অমিশ্র সৎ এবং অমিশ্র অসৎ জগতে নাই।

পুনরায় এক কর্ম্মাশয় অনেক জন্মের কারণ হইতে পারে না তাহাতে কর্ম্মফলের ভোগের কালাভাব হয়। তাহাদের ফলের কাল উপস্থিত হইবে না। সেইরূপ এককর্ম্ম হইতে একজন্ম হইলেও পূর্ব্বোক্ত দোষ আসিয়া পড়ে।

সুতরাং অনেক কর্ম্মাশয় হইতে একটি জন্ম উৎপন্ন করে। এই নিয়মটিই যথার্থ।

অনুভবের তীব্রতা অনুসারে কর্ম্মাশয় বিপাকী অর্থাৎ ফলপ্রদানোন্মুখ হয়। এরূপ স্বতন্ত্রভাবে ফলদায়ী কর্ম্মাশয়কে **প্রধান কর্ম্মাশয়** বলা যায়।

প্রধান কর্ম্মাশয় হইতে জাতি হয় আর অপ্রধান বা সহকারী কর্ম্মাশয় সমূহ ভোগে পরিণত হয়। যেমন একটি জীবনের প্রধান কর্ম্মাশয় হিংসা কিন্তু তাহার সহিত কতকগুলি সৎকর্ম্মাশয়ও আছে ইহাতে ভবিষ্যৎ জন্ম হিংসাত্মক হইবে তবে মাঝে মাঝে এক আধটা সৎকর্ম্মও দেখা যাবে। সচরাচর অধিক মনুষ্যই এই প্রকারের; প্রবৃত্তিময় জীবনের মাঝে ঘন মেঘের উপর বিজলি চমকের ন্যায় কখন কখন নিবৃত্তিকর কর্ম্ম দেখা যায়।

পুনশ্চ প্রবল কর্ম্মাশয় ক্ষীণকর্ম্মাশয়কে বন্ধ্যা করিতে পারে অথবা তাহার ফলবান হইবার সময়কে পিছাইয়া দিতে পারে।

এই নিয়মটিতে পুরুষকারের স্থান যে অতি উচ্চ তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। অতি মন্দ কর্ম্মাশয়কেও ভীম পুরুষকার বিনষ্ট করিতে পারে তাহা যদি না পারিত তাহা হইলে অনন্তকাল আমরা বাসনার দাস থাকিতাম, উদ্ধারের কোন পথ থাকিত না; চিরব্যাধিতে ডুবিয়া থাকিতাম আরোগ্য কাহাকে বলে তাহার জ্ঞান হইত না।

মহামুনি বিশ্বামিত্র এবং বাল্মীকি এই নিয়মের সুন্দর দৃষ্টান্ত। বিশ্বামিত্র জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কেবল টিকি রাখিয়া গলায় পৈতা দিয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ প্রচার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। যে কর্ম্মাশয় তাঁহাকে ক্ষত্রিয় জাতিতে নিক্ষেপ করিয়াছে সেই কর্ম্মাশয়কে বন্ধ্যা করিবার জন্য ভীষণ তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন পরিণামে সে সিদ্ধি তাঁহার অর্জন হইল তাঁহার রজ গুণময় কর্ম্মাশয় সত্ত্ব গুণে পরিণত হইল তিনি শম প্রধান ব্রাহ্মণ হইলেন। জগৎকে বলিলেন পুরুষকার কাহাকে বলে একবার দেখ।

বাল্মীকি নরঘাতক ছিলেন অমানুষ তপস্যায় তাঁহার হিংসা প্রসূত

কর্ম্মাশয় বন্ধ্যা হইয়া গেল তিনি ব্রহ্মর্ষি হইলেন। ইহাদের কর্ম্ম দেখিয়া আমরা কেন কর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হই না? পুরুষকারে যে জলাঞ্জলি দিয়াছি।

মরণকালে ব্যাধিবশতঃ যখন প্রাণবৃত্তি নিস্তেজ তখন তাহার জ্ঞান-বৃত্তির উন্মেষ হয় সে সময় জীব তাহার কৃত এবং সঞ্চিত কর্ম্মাশয়কে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং তাহার মধ্যে যে সংস্কারটি প্রবল সেইটিকে পছন্দ করে। মৃত্যুর পরে তাহার পছন্দ করা সংস্কারের অনুরূপ দেহ হয়।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আর তাঁহার ব্যপদেশে জগৎকে এই তত্ব বলিতেছেন,——

"অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্তা কলেবরং।
য প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্রসংশয়ঃ॥"
"যং যং বাপি স্মরণভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥"
"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধচ।"

"যে ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে চিন্তা করিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করেন সে ব্যক্তি আমারই ভাব প্রাপ্ত হয়েন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন এমন হয় তদুত্তরে বলিতেছেন, "হে কৌন্তেয় (চিরজীবনে) সর্ব্বদা চিন্তা জন্য মরণকালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই-ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

পাছে কেহ মনে করেন যে জীবনে যতই কেন পাপকর্ম্ম করি, শেষ-কালে একবার কোন রকমে তাঁহাকে চিন্তা করিলেই ত মুক্তি তাই সাবধান করিয়া দিতেছেন জানিও আমার কথার অর্থ তাহা নহে যে আমাকে সর্ব্বেষু কালেষু স্মরণ করে নাই সে আর তখন পূর্ব্ব কর্ম্মাশয়

পরিত্যাগ করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে পারে না। এইজন্য সর্ব্বকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অনুস্মরণ করিবে। তবে পারিবে।

এককথায় বলিতে গেলে এ বিশ্বে এককর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই সমস্তই কর্ম্মময় কেবল কর্ম্মের দোলায় উঠা নামা মাত্র ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত জীবের অনন্ত কর্ম্মপট। স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্মময় অহরহ কর্ম্মরত তাই কর্ম্মের এত প্রশংসা। তাই তিনি বলিতেছেন,——

"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং॥"

"আমি যদি কর্ম্ম না করি তাহা হইলে সকল লোকই উৎসন্ন হইয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত কর্ম্মহীন হইয়া আমরা উৎসন্নের তলে গিয়াছি। বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্রে কর্ম্ম তাই বিশ্বকর্ম্মা কর্ম্মচক্রের গতি গীতায় এই ভাবে বলিতেছেন।"

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞেপ্রতিষ্ঠিতম্॥

"ভূত (শরীরাদি) সকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন বৃষ্টি হইতে হয়, বৃষ্টি যজ্ঞ ধূম হইতে হয় এবং যজ্ঞ (ত্যাগাত্মক) কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কর্ম্ম সকল বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং সর্ব্বগত ব্রহ্ম সদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বাঙ্গালি এখন এস কর্ম্মশক্তি অনুভব করিবার চেষ্টা করি নহিলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

হিন্দুত্ব কোথায়?

জাতির কথা আলোচনা করিতে করিতে আর একটি কথা মনে পড়িল। হিন্দু কে? কি করিলে হিন্দু হয়? সহজে কথাটার উত্তর দিতে

অনেক হিন্দুই পারিবেন না। আমরাও অবশ্য পারিবনাদের মধ্যে তবে দেখা যাক একটী শিকড় ধরা যায় কিনা।

হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে বিশেষ বৈলক্ষণ্যময় ইহার রচনা কি ভাবের বুঝা যায় না বড়ই দুর্জ্ঞেয়।

খৃষ্টান হইতে হইলে খৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র স্বীকার করিতেই হইবে, এবং তাঁহার উপদেশ এবং জীবন কর্ম্মাদি লইয়া খৃষ্টধর্ম্ম। মুসলমান হইতে হইলে একেশ্বরবাদ এবং পগম্বর সাহেব মহম্মদকে ঈশ্বরের মুখপাত্র স্বীকার করিতে হইবে।

যদি ঐ ধর্ম্মদ্বয় হইতে খৃষ্ট এবং মহম্মদকে সরাইয়া অথবা বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে কি থাকে? এ দুই ধর্ম্মমতের অস্তিত্ব থাকে কি? সুতরাং বেশ বুঝা যায় খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম একপ্রকার ব্যক্তিগত ধর্ম্ম। ব্যক্তি বিশেষের রচিত বা প্রকাশিত ধর্ম্ম।

হিন্দুধর্ম্ম অন্য ভাবে রচিত ব্যক্তিগত প্রাধান্য ইহাতে নাই। শ্রীকৃষ্ণ একজন প্রধান ধর্ম্মের বক্তা কিন্তু তাঁহাকে মানিতেই হইবে এমন কিন্তু ব্যবস্থা নাই। অর্থাৎ তাঁহাকে না মানিলে হিন্দুত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে এমত নহে। কালী, দুর্গা, গণেশ, কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবতা এমন কি তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কাহাকেও মানিতে হইবে তাহা নহে। তাঁহা-দিগকে বিদায় করিয়া দিন তথাপি আপনি হিন্দু হইতে পারিবেন।

সাংখ্যবক্তা কপিল ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই তথাপি তিনি হিন্দুর হিন্দু! চার্ব্বকগণ নাস্তিক তাহারা ও হিন্দু।

সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্ম নিষ্ঠ সর্ব্বভূতাদিতে রত যোগীও হিন্দু আবার বটের ডাল ও জঙ্গলের পাথর পূজক সেও হিন্দু! বেদোক্ত কর্ম্মকারী স্বর্গার্থীও হিন্দু আবার বেদান্তবাদী স্বর্গে অরুচিযুক্ত জ্ঞান পথের পথিকও হিন্দু। তবে হিন্দু নহে কে কোন ভিত্তির উপর হিন্দুত্ব দাঁড়াইয়া আছে?

কত কত অশনি সম্পাত ও বিধর্ম্মীগণের ভীম আক্রমণ সহ্য করিয়া এত কাল যে গ্রীবা উচ্চ করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে চিন্তা করিলে আমাদের হেঁট মাথাও খাড়া হইয়া উঠে। স্তব্ধ হৃৎপিণ্ড গতিশীল হয়।

কর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের অক্ষয় ভিত্তি। যতকাল কর্ম্ম থাকিবে ততকাল হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে। কর্ম্ম থাকিলেই কর্ম্মফল থাকিবে কর্ম্মফল থাকিলেই জাতি যোনি থাকিবে। যিনি এই কর্ম্মফল হেতু জাতি স্বীকার করেন এবং বর্ণাশ্রম অনুসরণ করিয়া কর্ম্মফলকে বন্ধ্যা করিবার চেষ্টা করেন তিনিই হিন্দু।

কর্ম্ম স্বীকার করিলেই বেদ স্বীকার করিতে হইবে, কারণ বেদ কর্ম্মমূলক।

কর্ম্ম হইতে জাতি হয় জাতি থাকিলেই ধর্ম্ম বা গুণ থাকিবে। যিনি যে গুণ বা ধর্ম্মবিশিষ্ট তাঁহার সেই গুণের সেবাই প্রকৃষ্ট নচেৎ বিকাশ হয় না। এই জন্যই স্বধর্ম্ম অনুসরণ এত উপদিষ্ট। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ং" পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

জাতি মানি না বলিলেই জাতি পলায় না। জাতি তত্ত্ব অবগত হইলে ব্রাহ্মণ শূদ্র লইয়া যে আজকাল এক মনোমালিন্য চলিতেছে তাহা আর থাকে না। শূদ্র জানিবেন তাঁহার কর্ম্ম তাঁহাকে শূদ্রত্ব দিয়াছে ব্রাহ্মণ জানিবেন তাঁহার কর্ম্ম তাঁহাকে পুনরায় শূদ্রত্ব দিতে পারে। শূদ্র উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করিলেই তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব আয়ত্তাধীন।

ব্রাহ্মণও স্থির জানিবেন তাঁহার কর্ম্ম তাঁহাকে পশুত্বে নিক্ষেপ করিবে। কর্ম্ম নির্ম্মম সে ব্রাহ্মণ শূদ্রের খাতির করে না। অদ্যকার ব্রাহ্মণ কল্য কার চণ্ডাল এবং আজি যে শূদ্র কাল সে যোগী।

কর্ম্মের বিষয়ে আমাদের দেশে একটা ভুল বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; অনেক স্থলে আমরা শিক্ষা পাই যে পাপ কার্য্য করিলে তাহার বদলে পুণ্য কর্ম্ম করিলে পাপজনিত ফল ক্ষয় হইয়া যায়। অর্থাৎ পাপ

পুণ্যে কাটাকাটি হয়। খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদিগের এইরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের স্বর্গ এবং নরক পাপ পুণ্যের হিসাব নিকাশের উপর নির্ভর করে। যদি পাপের বাকী পড়ে তবে অনন্ত নরক আর যদি পুণ্যের খাতায় ফাজিল হয় তবে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে অনেকেই মনে করেন যে আপাততঃ একটা অসৎ কর্ম্মদ্বারা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা যাক ইহার পরে দান তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি কোন এক পুণ্যকর্ম্ম করিলেই হইবে। নিদানে গঙ্গাস্নান করিলেই হইবে। বাস্তবিক হইতেছে পাপস্রোত বৃদ্ধি দানাদি কর্ম্ম আর কে করে, পরিণামে সামর্থ্যও থাকে না বিশেষতঃ পাপস্রোতে ডুবিলে আর উঠিতে প্রবৃত্তি হয় না।

পূর্ব্বে কর্ম্ম আলোচনা করিয়া যতযূর দৃষ্টি হয় তাহাতে পাপ পুণ্যে কাটাকাটি হয় না বলিয়াই বোধ হয় কারণ পুণ্যের ছাপ পাপের ছাপকে মুছিয়া দিতে পারে না। উভয়ই ফল দায়ক পদার্থ জমাখরচের শক্তি তাহাদের নাই। উভয়েরই ফলভোগ হইবে। যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা কথা হেতু নরক দর্শনের যে বিবরণ আছে তাহা পাপ পুণ্যের কাটাকাটি না হওয়ার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এ বিষয়ে ঋষিবাক্য এবং নির্দ্দেশ নিম্নলিখিত প্রকার।

ধৃতরাষ্ট্র ঋষি সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন দেখুন এই সংসারে অনেক লোক ধর্ম্মানুষ্ঠান আবার অধর্ম্মানুষ্ঠানও করে তাহাদের ধর্ম্ম পাপ দ্বারা বিনষ্ট হয় কি অথবা তাহাদের পাপ ধর্ম্মের দ্বারা নিহত হয়। অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম সমবল হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করে কি ?

"ধর্ম্মঃপাপেন প্রতিহন্যতে বা
উতাহো ধর্ম্ম প্রতি হন্তি পাপং॥"

সনৎসুজাত এই ভাবে উত্তর করিলেন।

"তস্মিন স্থিতোবাপ্যভয়ং হি নিত্যং
জ্ঞানেন বিদ্বান প্রতিহন্তি সিদ্ধং।"
যথান্যথা পুণ্যমুপৈতি দেহী
তথাগতং পাপমুপৈতি সিদ্ধং॥

"পাপ পুণ্য কেবল জ্ঞানদ্বারা নিহত হইতে পারে অন্যথা নহে। ইহাই সেই পূর্ব্বে কথিত পুরুষকার।

শ্রীমচ্ছঙ্কর ব্যাখায় বলিতেছেন—

"ক্ষণমাত্মানু সন্ধানং পাপং দহতি কোটীশঃ
অন্যথা পাপবিদ্ধংশো ন ভবেৎ কোটি পুণ্যতঃ॥

ক্ষণকাল ব্যাপী আত্মানুসন্ধান কোটি কোটি পাপকে দগ্ধ করে আর জ্ঞান না হইলে "কোটি পুণ্যেও পাপের বিনাশ হয় না। উভয়েরই ফল ভোগ হইবে।" সনৎসুজাত—১ম অ—২২।২৩।২৪

উপরি উক্ত কথার পুনরুত্থাপন করিয়া সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে ব্রাহ্মণ পাপ কর্ম্ম করিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করিলে পাপী নিষ্পাপ হয় কি না? অর্থাৎ গরু মারিয়া জুতা দান করিলে গোবধের পাপ দূর হয় কি না?

ঋষি উত্তর করিলেন—তাহা করে না।

"নছন্দাংসি বৃজিনং তারয়ন্তি
মায়াবিনং মায়য়া বর্ত্তমানং।"
"ছন্দাংস্তেনং প্রজহত্যন্তকালে
নীড়ং শকুন্তাইব জাত পক্ষাঃ॥" ঐ ২য়—অ—৩।

যেমন পক্ষীশাবক পাখা উঠিলে নীড় পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বেদ সকল পাপচারীকে পরিত্যাগ করে—অর্থাৎ কোনও উপকারেই আসে না।

অতএব পাপকে ধ্বংস করিবার ক্ষমতা পুণ্যের নাই। পাপ না করাই একমাত্র উপায়।

এতক্ষণে আমরা বুঝিলাম জাতি নিত্য জীবের একমাত্র মুক্তির উপায় এবং সোপান। আসুন আমরা গললগ্ন কৃতবাস হইয়া সাষ্টাঙ্গে দেবব্রতের সহিত কর্ম্মাত্মক ও বর্ণাত্মক ভগবানকে প্রণাম করি। আর জাতি পরিত্যাগের নিমিত্ত তাঁহার সেই বিমোহন বাশরীর তানটি অভ্যাস করিবার চেষ্টা করি।

"ময়ি সর্ব্বানি কর্ম্মাণি সংন্যাস্য অধ্যাত্মচেতসা
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভীষ্ম ও যোগ।

আমরা বার বার বলিয়াছি মোক্ষই হিন্দুদিগের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যই পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে ও প্রাচ্যগণকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। পাশ্চাত্যেরা যে প্রাচ্যগণকে চিনিতে পারেন না, তাহার কারণ উভয়ের চরম লক্ষ্যের গুরুতর পার্থক্য।

প্রাচ্য শিখিয়াছে আত্মবিসর্জ্জন ব্যতীত তাহার চরম স্থানে পৌঁছিবার উপায়ান্তর নাই পাশ্চাত্য প্রচার করিতেছেন আত্ম সংস্থাপন; প্রাচ্যের আচার ব্যবহার ক্রিয়াকলাপ বিবাহ আহার বিহার সমস্তই সেই চরম লক্ষ্যের সুরে বাঁধা আছে; সে সুর এত সূক্ষ্ম যে পাশ্চাত্যের স্থূল কর্ণে তাহা আঘাত করে না। কাজেই পাশ্চাত্য দেখে প্রাচ্যের সবই বেসুর এবং বেতালা।

যতদিন এই ভাব থাকিবে ততদিন প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সঙ্গত হওয়া অসম্ভব। বক্তৃতায় বিশ্বব্যোম ভরিয়া গেলেও মিলের দিকে এক পদও অগ্রসর হইবে না। প্রাচ্য যাহাকে বিষ বলে পাশ্চাত্য তাহাকে অমৃত বলে প্রাচ্য যাহাকে নিম্ব মনে করে পাশ্চাত্য তাহাকে শর্করা জ্ঞান করে। একদিক গুণহীন পুরুষের জন্য ব্যস্ত অন্যদিক গুণময়ী প্রকৃতির জন্য বদ্ধ পরিকর এ অবস্থায় বৃথা টানাটানিতে ছিড়িয়া যাইবে। যাদের যাহা আছে তাহাদের তাই ভাল। যদি কখন উভয়ের লক্ষ্যের সামঞ্জস্য হয় তবে তখন মিলের কথা উত্থাপন হইতে পারে। যদি প্রাচ্য তাহার অমর ঋষিগণের উপদেশ একবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে তাহার কপিল, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, ব্যাস নারদ প্রভৃতিকে চির বিদায় দিতে পারে এবং জাতি-ভেদ আচার ব্যবহার ও সংস্কারকে বাতুলের প্রলাপ বাক্য বলিয়া মনে করিতে পারে তবে কস্মিন কালে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে স্বার্থ নিবন্ধন কর মর্দ্দন হইলেও হইতে পারে। আর না হয় যদি পাশ্চাত্য তাহার বিরাট অহঙ্কার "কো অস্তি সদৃশ ময়া" ভাবকে ত্যাগ করিয়া আর্য্য ঋষিগণের পাদ-মূলে বসিয়া নির্গুণ আত্মজ্ঞানের সাধনা করিতে শিখে এবং সেইভাবে তাহার আচার ব্যবহারকে নমিত করে তাহা হইলে একদিন আলিঙ্গন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এ ঘটনা মানবের দৃষ্টির বহির্ভূত।

যুধিষ্ঠির পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পুরুষ কিরূপ চরিত্র কি প্রকার আচার কোন বিদ্যা এবং কীদৃশ পরাক্রম সমন্বিত হইলে প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হয়?" ভীষ্ম উত্তর করিলেন—"যিনি মোক্ষধর্ম্মে নিরত লঘ্বাহার ও জিতেন্দ্রিয় তিনিই ঐ ধাম প্রাপ্ত হয়েন।"

যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে মুক্তি পথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহাই মোক্ষধর্ম্ম যোগাভ্যাস ব্যতিরেকে মোক্ষমার্গে অধিক দূর যাওয়া অসম্ভব ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে তাই যোগাঙ্গ উপদেশ করিতেছেন। ভীষ্ম

কথিত এই সাধনা এবং যোগশাস্ত্রে উক্ত সাধনা সর্ব্বতোভাবে এক। গীতাতে শু ঐ সাধন প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে।

আমাদের দেশে যোগ বলিলে যেন একটা অমানুষিক অসাধ্য প্রহেলিকাময় বিষয় বলিয়া বোধ হয়। বিলাসিতায় উপযুক্ত গুরুর অভাবে এবং শিক্ষার দোষে যোগ বিষয়ে ভারতবাসীর আর কোন আস্থা নাই। গুরু শিষ্যের অভাবে এই অমূল্য জ্ঞান রত্ন বিস্মৃতির অতল জলে এখন নিমজ্জিত যোগাঙ্গ অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে যাহা অবশিষ্ট আছে যদি তাহার চর্চ্চার উপায় হয় তাহলেও প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

যোগ শাস্ত্রে অনাস্থার কারণ কতকগুলি অসত্য বিশ্বাসে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। সাধারণ বিশ্বাস এই যে যোগাভ্যাস করিতে হইলে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজনের স্নেহপাশ কুচিকুচি ভাবে ছিন্ন করিয়া এবং চিরদিনের মত সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া হিমালয়ের অন্ধ গহ্বরে হরিতকী এবং আমলকী ভক্ষণ করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে।

দ্বিতীয়ত যোগাভ্যাসকারীকে যাবতীয় সাংসারিক ব্যবহার যথা অর্থোপার্জ্জন জ্ঞানোপার্জ্জন বিবাহ সমাজশাসন প্রভৃতি সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া শিরসি আগুল্‌ফ জটাভার ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর, ভাংধুতুরা পানে আরক্ত নয়ন, পরিহিত কৌপীন, ও সার্দ্ধ হস্ত পরিমিত লৌহ চিমটা-পানি হইয়া উন্মত্তের ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া জীবনতিবাহিত করিতে হইবে।

তৃতীয়ত যোগাভ্যাসে শরীরে নানাপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয় এবং প্রায়ই কিছুদিন অভ্যাসের পর অল্প বয়সেই বাপমাকে কাঁদাইয়া চির-নিদ্রায় শয়ন করিতে হয়। উপরি উক্ত কোন আশঙ্কার মূলেই সত্য নাই সমস্তই বৃথানিন্দাপূর্ণ প্রবাদ মাত্র। যোগ শাস্ত্রের কোন গ্রন্থেই

গৃহ পরিত্যাগের ব্যবস্থা নাই। আত্মীয় স্বজন কাঁদাইয়া পলায়নের কথাও দেখা যায় না। বিশেষ উপদেশের জন্য গুরুর নিকট আশ্রমবাসের ব্যবস্থা আছে। সেত অতি উত্তম ব্যবস্থা নচেৎ শিক্ষা কি করিয়া হইবে। আজকাল ত বিদ্যালয়ই ছাত্রাবাসের পূর্ণ উদ্যোগ চলিতেছে তবে আশ্রম বাসের উপর খড়্গহস্ত কেন। অভ্যাসের সময় যাহাতে সারা মনটি উপদেশের দিকে ধাবিত থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয় নচেৎ সিদ্ধি হয় না।

আজ নাচ কাল যাত্রা পরশু থিয়েটার তৎপরদিন বায়োস্কোপ তারপর ফুটবল ঘোরদৌড় ইত্যাদি কার্য্যে কাঁচা মনটিকে লাগাইলে কি শিক্ষা হয়? সুতরাং প্রলোভন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকাই ভাল নহে কি?

আশ্রম বলিলেই অনেকে চমকাইয়া উঠেন যেন যমদ্বার। দেশের কোন অজ্ঞাত কোনে জঙ্গল পূর্ণ স্থান সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি শ্বাপদ সঙ্কুল, দিনমানে ও টানিয়া লইয়া যায় রজনীতে বহুবিধ বিষধর সর্পগণের ফোঁস ফোঁস রব পূর্ণ শতছিদ্র যুক্ত বর্ষার জল আট কায়না গ্রীষ্মে রৌদ্র বাধা পায়না এরূপ ভাবের মার্জ্জনাহীন ক্ষুদ্র মৃন্ময় কুটীর মাত্র। যদি এই আশ্রমের সংজ্ঞা হয় তবে যথার্থই বিভীষিকার কারণ বটে কিন্তু বাস্তবিক কি তাই। হরিদ্বারে কেদারনাথে অমর নাথে কুরুক্ষেত্রে ঝুসিতে এবং অন্যান্য বহুস্থানে এখনও বহু আশ্রম বিদ্যমান আছে একবার দেখিলেই ত চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়। তথায় কোন পদার্থের অভাব নাই। কি শান্তিপূর্ণ স্থান সমূহ একবার দেখিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে কি? অনন্তের দিকে যেন প্রাণকে আপনিই টানিয়া লয়।

বাহ্যত কি রমনীয় কি পরিষ্কার লাট ভবনও লজ্জা পায়। ভক্ষ্য ভোজ্যের ও কোন অভাব নাই অধিক স্থলেই বদান্য ভক্তগণের মুক্ত

হস্ততায় আশ্রমবাসী দিগকে সঞ্চয়ের জন্য বিব্রত হইতে হয় না। তবে চা কফি সোডা লেমনেড্ আয়না ক্রুস আতর এসেন্স টেবিল চেয়ার এ সকল দ্বন্দ্ব তথায় নাই।

আহারাদির ব্যবস্থা যোগ শাস্ত্রে যথেষ্ট আছে হরিতকীর ভয় নাই তবে যা তা আহারটা বারণ আছে আহার তত্ত্বে এ বিষয়ের বিচার করা যাইবে।

মোটা কথায় বুঝিলেইত হয় সংসার কি ত্যাগ হয় বাড়ী হইতে বনে যাংলেই কি গৃহ ত্যাগ হয়। বনেও ত একটা কুটীর চাই সুখ দুঃখ ভোগ আছেই উদরের চেষ্টা কোথায় যাইবে? তবে গৃহত্যাগ কই হইল।

যোগী বলিলেই সাধারণের ধারণা একবারে শ্রীবুদ্ধ না হয় শ্রীচৈতন্য নারদ না হয় শুকদেব। ইহাঁরা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং তোমাকে আমাকে ও তাই করিতে হইবে তাঁহারা যে জগদ্গুরু তাঁহার সঙ্গে কি তোমায় আমায় তুলনা হবে। তাঁহারা ঘরে থাকিলেন কি জঙ্গলে থাকিলেন কি কোথায় থাকিলেন তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। যখন তাঁহাদের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তখন গৃহই তোমাকে ত্যাগ করিয়া পলাইবে।

অভ্যাসে ব্যাধি হয়না বরং অত্যুৎকট ব্যাধিও আরোগ্য হয়। আমরা ক্রমশ তাহার বিবরণ দিতেছি।

যোগ বলিলেই কাষ্ঠাপ্রায় হইবার কোন কারণ নাই। শারীর বিদ্যা চিকিৎসা বিদ্যা রাসায়নিক বিদ্যা যেমন বিজ্ঞানের উপর নিহিত যোগ বিদ্যাও তদ্রূপ। যোগে কিছুমাত্র অবৈজ্ঞানিক নাহি, তবে সকলেই ইহার একভাবে অধিকারী নহেন। সাধারণ বিদ্যাতে ও ত তাহাই একবারে এম এ পরীক্ষার অধিকারী কেহ হয় কি?

যোগবিদ্যা এতই গভীর এতই বিস্তৃত যে কত কত যুগ অতীত হইবে তবে অভ্যাস হইবে। এখানে যথার্থই বিশ্ববিদ্যা কেবল নামে বিশ্ববিদ্যা নহে বিশ্ববিদ্যা কত বিস্তৃত তাহার একবার চিন্তা করুণ।

আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি মনুষ্যকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় প্রথম এই জড় শরীর যাহাতে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ অবস্থিত। দ্বিতীয় মন বা চিত্ত অন্তঃকরণ সমূহ যাহাতে লিপ্ত। এই দুইটি সম্বল লইয়া আমাদের সেই পূর্ব্ব কথিত পরমধামে যাইতে হইবে। সে কোথায় এবং কেমন স্থান একবার ভাবুন, সেখানে পিতামাতা পুত্র ভাই বন্ধু কেহই সহায়তা করিবার নাই বিষয় বৈভব ধনজন কাহারও তথায় প্রবেশাধিকার নাই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারার আলোক সেখানে পৌঁছায় না বড়ই কঠিন ঠাঁই।

এই শরীর এবং মনকে যে ভাবে শিক্ষা দিলে সেই স্থানে যাওয়ার পথ সুগম হয় সেই শিক্ষার নামই যোগ। যোগ লক্ষ্য নহে উপায় মাত্র।

পৃথিবীতে কোন দুইটি ব্যক্তির এক প্রকারের মন এবং শরীরের অবস্থা পাওয়া যায় না ইহা প্রত্যক্ষ। শ্রীযুক্ত রামমূর্ত্তিকে দেখিয়াছেন ত তাঁহার বক্ষের উপর একটা হাতী অবলীলাক্রমে দাঁড়াইয়া থাকে—সেটা শোলার হাতী নয় রক্তমাংস অস্থিযুক্ত জীবন্ত ঐরাবত বংশধর; বিলাতী বীর স্যাণ্ডোকে দেখিয়াছেন ত তিনিও রামমূর্ত্তির দাদা। শরীর ত আমাদের ও আছে তবে সন্ধ্যার সময় ভুক্ত সাগুদানা প্রাতঃকালে ও অবিকৃত ভাবে কণ্ঠে আসিয়া পরিচয় দেয় কেন?

পাঞ্জাবে মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমকালীন হরিদাস সাধুর বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন ত। তিনি শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া ছয় মাস কাল ভূগর্ভে থাকিতে পারিতেন কাশীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কথা শুনিয়াছেন ত অল্পদিনের কথা তিনি সমস্তদিন জলে ডুবিয়া থাকিতেন। শ্বাস প্রশ্বাস ত

আমরাও গ্রহণ এবং ত্যাগ করি তবে এক মিনিটের উপর দেড় মিনিট হইলেই চক্ষু স্থির হয় কেন?

এ সকল ঘটনা বিবেচনা করিলে প্রমাণ হয় না কি যে শরীর উন্নতিসাধ্য এবং সে উন্নতি অসীম। শরীর এবং মানসিক শক্তি যাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার একটি সামান্য পর্ব্বতোত্তলন কি অনৈসর্গিক?

মনের এই প্রকার আকাশ পাতাল পার্থক্য মানবগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের ইতিহাসে বিশেষ হিন্দুর ইতিবৃত্তে মানসিক উৎকর্ষ এবং অপকর্ষের বৃত্তান্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণ মানবের মনের অবস্থা প্রায় এইরূপ যদি আমার প্রতিবেশীর বৃক্ষের ছায়া আমার গোশালার উপরে পতিত হয় মন তৎক্ষণাৎ অগ্নিসংযুক্ত পেট্রলিয়ম তৈলের ন্যায় ক্ষিপ্তবিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল প্রতিবেশীর মুণ্ডপাত না হইলে আর দারুণ মানসিক সন্তাপের নিবৃত্তি নাই।

খবরের কাগজে দেখিলাম পালিতসাহেব ঘোষ মহাশয় এবং অনেকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন; "আমাকে কেন কিছু অংশ দিলেন না" এই অকারণে চিত্তের ক্ষোভের আর সীমা নাই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইল। এত টাকা জলের ন্যায় বাহির হইয়া গেল অথচ এক কপর্দ্দকও হাত লাগিল না হা হতোস্মি দগ্ধোস্মি ইত্যাদি। সচরাচর মানবচিত্ত এই ভাবের।

উপাখ্যানটি অনেকদিনের পুরাতন বটে; কিন্তু তাহা হইলেও তাহার ভাস্বরতা হীনপ্রভ হয় নাই, যতই শুনা যায় ততই তাহাতে নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সময়ে কুরুপাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট অশেষ শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন সেইকালে দ্রোণের অস্ত্রপাণ্ডিত্যে মুগ্ধ

হইয়া একলব্য নামে এক নিষাদ বালক শিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। একলব্য জাতিতে নিষাদত্ব হেতু দ্রোণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখাত হইলেন। বালক একলব্য গুরুর "শিরসা পাদৌগৃহ্য" বনে গমন করিলেন এবং এক "মহীময়" দ্রোণ মূর্ত্তি স্থাপিয়া তাহাতে গুরুবুদ্ধি নিহিত করিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত যোগযুক্ত চিত্তে অস্ত্রাভ্যাস আরম্ভ করিলেন।

কিছুকাল পরে একদা সেই বনে কুরুগণ মৃগয়া করিতে উপস্থিত তাঁহাদের মধ্যে একটা কুকুর ছিল, সে জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে "কৃষ্ণমল দিগ্ধাঙ্গ কৃষ্ণাজিন জটাধর" একলব্যকে দেখিয়া ভেক ভেক আরম্ভ করিল। একলব্য তৎক্ষণাৎ অমানুষ হস্তলাঘবের সহিত সপ্তশর কুকুরের ব্যাদিত মুখে মোচন করিলেন। কুকুর আহত হইল না অথচ তাহার খেউ খেউ করিবার শক্তি রহিল না। এরূপ সন্ধান জানা থাকিলে অনেকে বাঙ্গালীদের মুখে শরক্ষেপ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা ও বিরক্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

সেইভাবে সারমেয় প্রভুদের নিকট উপস্থিত কুরুপাণ্ডবেরা অজ্ঞাত ধনুর্দ্ধরের লঘুহস্ততা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অন্বেষণ তৎপর হইয়া একলব্যকে তদবস্থ পাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন "দ্রোণশিষ্যং চ মাং বিত্ত" আমি দ্রোণের শিষ্য।

অর্জ্জুন শিবিরে আসিয়া দ্রোণকে বলিলেন আপনি যে বলেন আমার অপেক্ষা বিশিষ্ট শিষ্য আপনার নাই, একলব্য আপনার শিষ্য এবং আমার অপেক্ষা সে বিদ্যায় অনেক উন্নত।

অর্জ্জুনকে সঙ্গে করিয়া দ্রোণ একলব্যের উদ্দেশ্যে চলিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া একলব্য অভিগমন পূর্ব্বক "জগাম শিরসা মহীং" ভূলগ্ন মস্তক হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দ্রোণ একলব্যের কাছে তৎ-শিষ্য শুনিয়া বলিলেন "যদি আমার শিষ্য তুমি তবে গুরু দক্ষিণা দাও।"

একলব্যের আর আনন্দ ধরে না। গুরু স্বয়ং আসিয়া দক্ষিণা চাহিতেছেন, হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন আজ্ঞা করুণ কি দক্ষিণা দিব; গুরু যাচ্ঞা করিলেন "অঙ্গুষ্ঠো দক্ষিণো দীয়তাং" দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দাও। কি হৃদয়বিদারক প্রার্থনা, ধনুর্দ্ধরের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেওয়া আর গগনবিহারী পক্ষীর পক্ষচ্ছেদ করা একই ভাবের। যে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য একলব্য এত সাধনা করিয়াছেন তাঁহার সেই বহু শ্রমার্জ্জিত সিদ্ধি আজ চিরজীবনের মত তাঁহা হইতে অপসৃত হইতেছে। এ কি সহ্য করা যায়?

কিন্তু বীর একলব্য কি করিলেন, দেবগণও আসিয়া দেখুন——

"তথৈব হৃষ্টবদন স্তথৈবাদীন মনসঃ;
ছিত্ত্বাবিচার্য্য তং প্রাদদৎ দ্রোণায় অঙ্গুষ্ঠমাত্মনঃ॥"

সেই প্রফুল্লবদনে, সেই হাসিমুখে, অদীনমনষ হইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে (ভীষ্মের ন্যায়) অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

ধন্য একলব্য, ধন্য তোমার গুরুপ্রীতি, ধন্য তোমার একাগ্রতা! তোমার পদধূলি বঙ্গে পতিত হউক।

এই উপখ্যানের পরেই অর্জ্জুনের একাগ্রতার একটি ঘটনা মহাভারতে বিবৃত আছে।

কুরুপাণ্ডবেরা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, কাহার কি রকম শিক্ষা হইল তাহার পরীক্ষা হইবে। দ্রোণ এক উচ্চ বৃক্ষের উপরে একটি কৃত্রিম ভাষপক্ষী (ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেষ) লক্ষ্য স্বরূপ স্থাপন করাইলেন। এই ভাষপক্ষীর ক্ষুদ্র মস্তকটি শর দ্বারা কাটিয়া পাড়িতে হইবে।

বহুদর্শকবৃন্দ সমাগত। দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে জ্যেষ্ঠত্বহেতু আজ্ঞা করিলেন তুমিই প্রথমে চেষ্টা কর। যুধিষ্ঠির ধনুষ্পানি হইয়া দাঁড়াইলেন দ্রোণ জিজ্ঞাসা করিলেন কি দেখিতেছ তিনি উত্তর করিলেন সভাস্থ সকলকে

দেখিতেছি, ভাই সকলকে দেখিতেছি, আপনাকে দেখিতেছি, পক্ষীটাও পর্য্যায় ক্রমে দেখিতেছি, গুরু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ধনুক বাখ এ কর্ম্ম তোমার নয়।"

এইভাবে অন্য সকলকেও পরীক্ষা করিলেন এবং সকলেই অসন্তোষ-কর উত্তর দিলেন। শেষে অর্জ্জুনের পালা পড়িল। পার্থ চক্রীকৃত চাপ হইয়া পক্ষীতে আবদ্ধদৃষ্টি সন্ গুরুর আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

গুরু পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ, অর্জ্জুন বলিলেন পক্ষী দেখিতেছি,—পুনরায় গুরু বলিলেন পক্ষীকে কিরূপ দেখিতেছ, সব্যসাচী বলিলেন "শিরঃ পশ্যামি ভাষস্য ন গাত্রং" কেবল মস্তকটি দেখিতেছি, পক্ষীর গাত্র দেখিতেছি না। হৃষ্টচিত্তে আজ্ঞা হইল "মুঞ্চস্ব" শর সন্ধান কর, অবিলম্বে পক্ষীমস্তক ভূপতিত হইল। এত একাগ্রতা না থাকিলে কি গীতা শুনিবার উপযুক্ত হওয়া যায়।

অতি মন্দ চিত্তও সাধনায় কি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় তাহার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মহর্ষি বাল্মীকি।

সকলেই জানেন বাল্মীকির প্রথম বয়সের ব্যবসায় ছিল নরহত্যা চিত্তের কি অবনত অবস্থা হইলে নরহত্যা জীবিকারূপে স্বীকৃত হয়, একবার চিন্তা করুন।

নরঘ্ন রত্নাকরের একদিন ভাগ্যক্রমে দেবর্ষি নারদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। নারদকে হত্যা করিতে সে উদ্যত হওয়ায় ঋষিবর বলিলেন, তুমি যে এই মহাপাতক আচরণ করিতেছ, ইহার ফলভাগী আর কেহ আছে কি? গৃহে যাইয়া তোমার পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তোমার পাপের ভাগ তাহারা কেহ লইবে কিনা।

রত্নাকর নারদকে লতাগুল্মে বন্ধন করিয়া গৃহে দৌড়াইল এবং তথায় প্রশ্ন করায় উত্তর পাইল কেহই তাহার পাপের ভাগ লইবে না। সে

দেখিল বাহবা যাহাদের জন্য এত পাপ করিতেছি, তাহারা আমার কেহ নয়। কেবল "খাবার গুরু" বলা বাহুল্য, আমাদেরও এই দশা। তখন সে নারদের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া উৎকট তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইল। এত উগ্রতপ যে অচিরে তাহার দেহ বল্মীকে আবৃত হইয়া গেল তাহাতেও তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই। তাহার সমাধিকালে সিদ্ধি আনিল তিনি ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি হইলেন।

কথিত আছে একদিন তমসাতীরে আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন এমত সময় এক ব্যাধ তথায় একটা কামমোহিত ক্রৌঞ্চ পাখীকে বিনাশ করিল, ঋষির কোমল প্রাণে তাহা সহ্য হইল না তিনি ব্যথিত হইয়া ব্যাধকে ভৎসনা করিলেন।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথনাদেক মবধীঃ কামমোহিতং॥

এই শ্লোকের প্রতি অক্ষরে এখন সেই অনুভূত বেদনা অনুভব হয়।
আদিকাণ্ড—২য় স্বর্গ—১৫।

কি অপূর্ব্ব চিত্ত পরিণাম। যার পূর্ব্বে মুমূর্ষু নরের আর্ত্তনাদে কিছু মাত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই, আজ একটা সামান্য পাখী হত্যা দেখিয়া হৃদয় কি উদ্বেলিত। জগতে সবই সম্ভব। রত্নাকরের অবস্থা দেখিয়া আমাদেরও আশা হয়, একদিন উদ্ধার হইলেও হইতে পারে।

যে কাঁদিতে জানে না, সে কখন কাঁদাইতে পারে না। বাল্মীকি কাঁদিয়াছিলেন তিনি যেমন অমৃতময়ী লিপিতে ভারতকে কাঁদাইয়াছেন এমন আর কেহ পারেন নাই। কৃত্তিবাস তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া বঙ্গে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

উপর্য্যুক্ত ঘটনাবলি বিবেচনা করিলে শরীর এবং মন যে পরিণামশীল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। চিত্তের উন্নতি বলিলে কি জ্ঞান হয়

অগ্রে তাহার স্থির করা যাক্, পরে তাহার সাধনোপায় বিবেচিত হইবে।

চিত্তের স্বভাব চাঞ্চল্য কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সে অধিকক্ষণ লিপ্ত থাকিতে পারে না। সে নিরন্তর বহির্ম্মুখ, বিষয়ের প্রতি অনুক্ষণ ধাবিত। বিষয় অর্থে আত্মা ভিন্ন সমুদয় পদার্থ বা ভাব। যখন চিত্ত সকল বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া নিস্তরঙ্গ হইবে তখনি তাহার চরম উন্নতি। সে অবস্থায় চিত্তের যে কারণ, দ্রষ্টা বা পুরুষ বা আত্মার স্বরূপ অবস্থান হয়। আত্মা বিষয়ব্যাধি গ্রস্ত হইলেই তাহাতে মিথ্যা জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়, এই মিথ্যাজ্ঞান বা চিত্তমল পরিষ্কার করিতে পারিলেই পুনরায় যে পুরুষ সেই পুরুষ হয়।

সাধারণতঃ আবর্জ্জনার গাঢ়তা অনুসারে চিত্ত পাঁচ প্রকারের হয়। যথা—

ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। ইহাদের মধ্যে ক্ষিপ্ত এবং মূঢ় চিত্ত অতি নিম্নদরের। ক্ষিপ্ত চিত্তে অস্থৈর্য্য এত অধিক তাহাতে আপাততঃ বাহ্য বিষয় ব্যতীত চিন্তার শক্তি থাকে না।

মূঢ় ভূমিক চিত্ত কোন এক ইন্দ্রিয় বিষয় লইয়া এত ব্যস্ত যে চিন্তার প্রবৃত্তিই হয় না। ক্ষিপ্ত অপেক্ষা কিছু ভাল।

বিক্ষিপ্ত অর্থে বিগত ক্ষিপ্তভাব। যে চিত্ত সময়ে সময়ে চঞ্চল এবং সময়ে সময়ে স্থির হয় তাহাই বিক্ষিপ্তচিত্ত। বিক্ষিপ্ত চিত্ত সমাধির অনুকূল তবে তাহাতে সমাধি বহুকাল স্থায়ী হয় না।

একাগ্র চিত্তে স্থৈর্য্যের প্রাবল্য থাকে এক বিষয়ে বহুক্ষণ লিপ্ত থাকা যায় সুতরাং অবান্তর প্রত্যয় বা বৃত্তিসমূহ সেই সময়ের নিমিত্ত তিরোহিত থাকে; সাধনাতে একাগ্রভূমি ফলপ্রদ।

নিরুদ্ধ চিত্তের কথা বলিবার আবশ্যক নাই যখন সকল চিত্তমল দূরীভূত হয় তখন এই অবস্থা হয়।

চিত্তকে নিরোধ করিতে পারিলেই যোগ হয় যখন চিত্তে অন্য কোন বৃত্তি থাকিবে না তখনই নিরোধ অবস্থা হয়।

"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"। সমাধি পাদ ১।২

কিন্তু কি উপায়ে চিত্তের নিরোধ হয়?

"অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।"

ঐ ১।১২

অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত নিরোধ হয়।

চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনের যে চেষ্টা যত্ন বা অনুষ্ঠান তাহার নাম **অভ্যাস**। এই অভ্যাস দীর্ঘকাল এবং নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত আসেবিত হইল দৃঢ় ভূমি হয় অর্থাৎ পাকা হয়।

স্ত্রীঅন্ন পান ইত্যাদি দৃষ্ট বিষয়ে এবং স্বর্গাদি অনুশ্রবিক বিষয়ে অনিত্য-বোধে যে অবহেলা তাহাই **বৈরাগ্য**।

এই কথারই সমর্থন ভগবান গীতায় করিতেছেন এবং অর্জ্জুন মনের দুর্নিগ্রহাত্ব বিষয়ে জ্ঞাপন করাইলে তিনি বলিতেছেন—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।"

চঞ্চল মনকে নিগৃহীত করা বড়ই কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই তবে অভ্যাসে এবং বৈরাগ্যে সে নিগৃহীত (বশবর্ত্তী) হয়।

চিত্তকে স্থির করিতে হইলে তাহার প্রতিযোগী বা অন্তরায় সকলকে ধ্বংস করিতে হয়। স্থৈর্য্যের কতকগুলি অন্তরায় বা ব্যাঘাতক আছে। যথা—"ব্যাধিস্ত্যান সংশয় প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনা
লব্ধাভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তে অন্তরায়াঃ॥" ঐ ১।৩০।

ব্যাধি=ধাতুরসের বাতপিত্তকফাদির বৈষম্য; আমাদের যথেষ্ট জানা আছে।

স্ত্যান=চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা যেমন কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলেও সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠানে অনিচ্ছা।

সংশয়=স্যাদিদং এবং নৈবং স্যাদিদং এই কিনা ইহা মনের দুর্ব্বলতার লক্ষণ সংশয়যুক্ত ব্যক্তিদ্বারা কোন কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয় না।

প্রমাদ=সমাধির সাধন সকলের ভাবনা না করা। সমাধির অনুকুল চিন্তাকে পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিপরীত বিষায়ানুবন্ধি চিন্তাতে আদর করা।

আলস্য=শরীরের এবং মনের গুরুত্ববশতঃ কর্ম্মের অপ্রবৃত্তি।

অবিরতি=বিষয় ভোগের তৃষ্ণা।

ভ্রান্তি দর্শন=মিথ্যাতে সত্যজ্ঞান।

অলব্ধভূমিকত্ব=ইপ্সিত ফললাভে বিলম্বহেতু চিত্তের পশ্চাৎপদতা।

অনবস্থিতত্ব= প্রাপ্ত হইয়া রক্ষা করিবার যে না চেষ্টা বা অপ্রতিষ্ঠা।

এই গুলির নাম যোগ প্রতিপক্ষ যোগমল বা যোগান্তরায়। এ সকল থাকিতে স্থৈর্য্যের সম্ভবনা নাই। এই অন্তরায় সমূহ যে কেবল সমাধির প্রতিষেধক তাহা নহে সকল কর্ম্মের প্রতিযোগী। বর্ত্তমান বাঙ্গালিজাতিতে ইহাদের পূর্ণপ্রভাব দৃষ্ট হয়।

এই অন্তরায় গুলির উৎপাঠনের উপায় কি?

"তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ"। ঐ ১।৩২। উহাদের প্রতিষেধের উপায় একতত্ত্বাভ্যাস। একতত্ত্ব অর্থে কি? বাচস্পতি মিশ্র বলেন ঈশ্বর বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন কোন একতত্ত্ব ভোজরাজ বলেন অভিমততত্ত্ব।

আমরা বলি ঈশ্বর তত্ত্বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শাস্ত্রে অর্থাৎ যোগ শাস্ত্রে কতকগুল চিত্তের পরিষ্কার-প্রণালী কথিত আছে। সে গুলিকে হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম বা দুরূহ ব্যাপার পৃথক ভাবে শাস্ত্রাধ্যয়ন না থাকিলে বুঝা যায় না—তা অতিসংক্ষেপে কয়েকটি প্রণালীর উল্লেখ করিতেছি।

চিত্তস্থৈর্য্য অনেক অভ্যাসের ফল। প্রথমে চিত্তপ্রসাদ অভ্যাস করিতে হয়। সর্ব্বদাই প্রসন্ন মনে থাকিব ইহা অভ্যাস করিতে হয়।

"মৈত্রী করুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনং॥ ঐ ১।৩৩।

সুখী দুঃখী পুণ্যবান ও অপুণ্যবান প্রাণীতে যথাক্রমে মৈত্রী করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিলে চিত্তপ্রসন্ন হয়।

প্রতিবেশীর সুখ দেখিলে সাধারণ লোকের ঈর্ষা হয় মুখে হয়ত প্রতিবেশীকে অনেক অভিনন্দন করিলাম কিন্তু ভিতরটা জ্বলিয়া যাইতেছে। শত্রুর সুখের ত কথাই নাই সে ত মৃত্যুবৎ। শত্রুর দুঃখ দেখিলে পৈশাচিক হর্ষ বা আনন্দ উপস্থিত হয়। যাহারা শত্রু নয় তাহাদের দুঃখ দেখিলে একবার আহা বলা ব্যতীত আর বিশেষ কিছু হয় না' এ সকল অবস্থায় চিত্তপ্রসাদ হয় না তাই মৈত্রী এবং করুণা ভাব অভ্যাস করিলে চিত্তপ্রসন্ন হয়। বিপক্ষদলে পুণ্যকর্ম্মকারী ব্যক্তিতে অসূয়া আসিয়া উপস্থিত হয় সেস্থলে মুদিত বা আনন্দ প্রকাশ করা শিখিতে হয়। পরের দোষে উপেক্ষাবান হওয়া উচিৎ, যে দোষ আমি বা আমার কেহ করিলে গ্রাহ্য করি না সে দোষ অন্যে করিলে তাহার উপর খড়্গহস্ত হই। উপরি উক্ত চারিটি ভাব অভ্যাস করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় নাকি ?

"প্রচ্ছর্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।" ঐ ১।৩৪।

প্রাণবায়ুর যত্নবিশেষের সহিত পূরণে ও রেচনে চিত্তস্থৈর্য্য হয়। ইহা প্রাণায়াম পরে ইহার বিষয় কিছু বলা যাইবে।

"বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতি নিবন্ধনী।" ঐ ১

বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও মনসঃ স্থিতি হয়।

বিষয়বতী প্রবৃত্তি অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি সূক্ষ্মবৃত্তি। প্রবৃত্তি অর্থে প্রকৃষ্ট-

বৃত্তি বা জ্ঞান। শাস্ত্রে এবং গুরুমুখে অনেক উপদেশ পাওয়া যায় কিন্তু সে উপদেশ সকল অনুভূত হইতে কত বিলম্ব হইবে তাহার স্থির নাই এরূপ অবস্থায় উপদেশ বাক্যে সংশয় বা অনাস্থা উপস্থিত হয়। কিন্তু উপদেশ মত কোন এক বিষয় নিজের ইন্দ্রিয় গোচর হইলে তখন উপদেশ বাক্যে আস্থা উপস্থিত হয়। যেমন প্রথম রসায়ণ বা পদার্থ বিদ্যা অভ্যাসের সময় পরিভাষা মুখস্থ করিতে প্রাণান্ত হয় এবং ক্রমশঃ রসাসন বিদ্যাতেই এক বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু যখন দুটি একটি পদার্থসংযোগ প্রত্যক্ষ হয় তখন বিদ্যার উপর শ্রদ্ধা জন্মায়।

গান বাজনা শিক্ষায় বেশ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সরগম সাধিতে এবং হস্তপাঠ অভ্যাস করিতে শিক্ষার্থীকে পাড়ার সকলেই ঝাঁটাহস্ত হয়েন। অতঃপর কিছু অভ্যাসের পর যখন একটি গৎ কি একটি রাগিনী আয়ত্ত হয় তখন অগ্রসর হইবার ইচ্ছা এবং নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া চিত্তের পূর্ব্ব বিরক্তিভাব তিরোহিত হয়। ইহাই বিষয়বতী প্রবৃত্তি।

"বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।" ঐ ১।৩৬

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিও চিত্তের স্থিতি সাধক হয়।

সাত্ত্বিকভাবের প্রবলতাহেতু চিত্তে এক প্রকাশশীলতা উপস্থিত হয়। ইহা হ্লাদকর এবং জ্ঞানালোকের আধিক্য হেতু জ্যোতিষ্মতী। ইহা হইতে অস্মিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা উচ্চ অঙ্গের ধ্যান।

"বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তং।" ঐ ১।৩৭

বীতরাগ চিত্ত ধারণা করিলেও চিত্তস্থৈর্য্য হয়। যে সকল মহাপুরুষ বীতরাগ বিষয়াসক্তি শূন্য তাঁহাদের স্থির চিত্তকে ধ্যান করিলে ধ্যান-কর্ত্তার চিত্ত স্থির হয়। এ ভাব সহজেই বুঝা যায়। শ্রীবুদ্ধ বা শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস মূর্ত্তির চিন্তা করিলে চিত্ত শান্ত হয়। অনবরত তাঁহাদের ত্যাগময়

বিগ্রহ চিত্তে ধারণা করিতে করিতে আমাদের চিত্তেও শান্তির ধারা আসিয়া উপস্থিত হয় ইহা প্রত্যক্ষ।

"স্বপ্ননিদ্রা জ্ঞানালম্বনং।" ঐ ১৩৮

স্বপ্নজ্ঞান বা নিদ্রাজ্ঞানকে আলম্বন করিলে চাঞ্চল্য দূর হয়।

স্বপ্নে এবং নিদ্রাবস্থায় বাহ্যক্রিয়া অপসৃত হয় এক জাড্যভাব আসিয়া উপস্থিত হয় চিত্তে সেই পরিমাণে মানসিক ভাব সমস্ত প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয় এই অবস্থায় ধ্যান প্রয়োগ করিলে চিত্ত চাঞ্চল্য বিরলতা প্রাপ্ত হয়। যখন নিদ্রা হইতেছে না তখন নিদ্রিত ব্যক্তির চিন্তায় নিদ্রা আসে। ফলকথা স্থিরত্বযুক্ত পদার্থের ধ্যান স্থৈর্য্য উপস্থিত করে। যথা নীল আকাশের বা প্রশান্ত সমুদ্রের চিন্তায় চিত্ত অনেক স্থির হয়। অতিমহৎ বা অতি ক্ষুদ্রের ধ্যানে চিত্ত চাঞ্চল্য দূর হয়।

শয়নগৃহে দেবমূর্ত্তি রাখা অতি প্রশস্ত, মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তির প্রকৃতি চিত্তে প্রবেশ করে। আজকাল অনেক সাহেবে একথা স্বীকার করেন। অতএব সাহেব শিষ্যেরা এ বিষয়ে আস্থাবান হইয়া দেওয়ালে পুনরায় কালী দুর্গার অবস্থান সহ্য করিলেও করিতে পারেন।

কিছুকালের জন্য কোন এক পদার্থে ধ্যান অভ্যাস হইলে তখন চিত্ত অন্য পদার্থের ধ্যানের উপযুক্ত হয়।

যোগশাস্ত্র বলেন চিত্ত স্থিতি প্রাপ্ত হইলে "ক্ষীণবৃত্তিক চিত্তের নির্ম্মল মণির ন্যায় তদঞ্জনতা হয়।" অর্থাৎ চিত্ত স্থির হইলে তাহাতে যে বিষয় চিন্তিত হইবে সেই বিষয়ের দ্বারা চিত্ত তদাকার প্রাপ্ত হইবে। দৃষ্টান্ত যেমন নির্ম্মল কাচের নিকট যদি একটা লাল কাপড় ধরা যায় তা হলে সেই কাচ সমগ্র লাল বোধ হইবে। এই অবস্থার নাম তন্ময়ভাব. এক বৃত্তি ব্যতীত অন্য বৃত্তির স্থান থাকিবে না। ইহার দার্শনিক নাম সমাপত্তি, স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্তের যে সমাধি (কোন বিষয়ের ধ্যান)

তাহারই ফল সমাপত্তি। স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্ত যে অভ্যাসমূলক এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

সমাপত্তি চারি প্রকার :————

১। সবিতর্ক ২। সবিচার ৩। নির্ব্বিতর্ক ৪। নির্ব্বিচার

যে সমাধিতে তর্ক থাকে অর্থাৎ শব্দময় চিন্তা থাকে তাহার নাম সবিতর্ক। তর্ক অর্থে শব্দময় চিন্তা। যথা গো ইহা এক শব্দ, ইহার অর্থ এক প্রকার জন্তু এবং ইহা এক প্রকার জ্ঞান। কিন্তু বাস্তবিক গো জ্ঞান এই তিন শব্দ অর্থ এবং জ্ঞান হইতে পৃথক। সুতরাং শব্দময় সাঙ্কেতিক জ্ঞান পদার্থের যথার্থ জ্ঞান নহে, হয় কিছু কম না হয় কিছু বেশী জ্ঞান না হয় এক অস্ফুট জ্ঞান।

অনেক বাক্য আমরা ব্যবহার করি, যাহার পূর্ণ জ্ঞান আমাদের হয় না যেমন "অনন্ত" "সর্ব্বজ্ঞ" সর্ব্বশক্তিমান এই কথাগুলি যে অর্থের বাচক তাহাব এক অস্ফুট জ্ঞানাভাষ মাত্র হয় সুতরাং এ জ্ঞান বাস্তবিক জ্ঞান নহে। ইহা স্থূল জ্ঞান।

শব্দের সহায়তা না লইয়া যে জ্ঞান তাহার নাম নির্ব্বিতর্ক জ্ঞান। যেমন গো শব্দ না জানিয়া বা ভুলিয়া গিয়া যে গোর জ্ঞান তাহাই গো বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান। ইহাও অবশ্য রূপের জ্ঞান। রূপের কারণের জ্ঞান নহে।

নির্ব্বিতর্ক সমাধি দ্বারা চিত্ত স্থিরতম করিয়া কালাদি গুণ সকলের সূক্ষ্ম কাবণে যাওয়ার নাম সবিচার সমাপত্তি। ইহাই তন্মাত্র সাক্ষাকার এ অবস্থায় বিষয় সকল শব্দ স্পর্শ রূপরস গন্ধের মিশ্রণমাত্র বলিয়া বোধ হয়। এ অবস্থায় ভেদজ্ঞান যথেষ্ট থাকে সেইজন্যই ইহা বিচারাত্মক।

যখন সবিচার সমাপত্তির কুশলতা অত্যধিক হয় তখন সূক্ষ্মবিষয় মাত্রের নির্ভাষক যে সমাধি হয় তাহা নিবিচার সমাধি। এ অবস্থায় জ্ঞানের পরা-

কাষ্ঠা হয় সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান চরমে উপস্থিত হয়। ইহাই নির্বিচার সমাধি। বস্তু সত্তা স্বতই দৃষ্টমান হয়। কিন্তু ইহাও যখন জ্ঞান তখন ইহাতেও জ্ঞাতার গন্ধ রহিয়াছে সুতরাং ইহা অবলম্বন স্পৃষ্ট। অতএব ইহা সবীজ।

যখন ধ্যানের আরও গাঢ়াবস্থা হইয়া এই অবলম্বন বা বীজভাব চলিয়া যাইবে, যখন জ্ঞানে আর জ্ঞাতৃভাব পরিস্ফুট থাকিবে না তখনই নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। আত্মা তখন স্বরূপ প্রতিষ্ঠ হন। ইহাই মুক্তি বা কৈবল্য। তখন কেবল তিনি।

সমাপত্তি সকলের জ্ঞান হওয়া বড় দুরূহ যতটুকু বলা গিয়াছে তাহাতে যে কাহারও সমাপত্তি বিষয়ক জ্ঞান পরিষ্কার হইবে তাহা হইবে না; অথচ অধিক বলিতে গেলে বিষয়ের গম্ভীরত্ব এবং নীরসত্ব হেতু সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্য থাকিবে না দার্শনিক তত্ত্বের বিচার উদ্দেশ্য নহে, চিত্ত পরিণাম কত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে তাহাই বলা উদ্দেশ্য।

নির্বীজ সমাধি চিত্ত পরিণতির আদর্শ তাহা স্থির হইল কিন্তু কি উপায়ে এই আদর্শে যাওয়া যায় তাহার কথাই অধিক আবশ্যক। আমরা এখন পাঠকের অনুমতি লইয়া সেহ সাধনোপায়ের কিয়দংশ বিবৃত করি।

পূর্ব্বে প্রমাণ হইয়াছে যে চিত্তের সংস্কারেই জীবের বন্ধনের কারণ। অবশ্য ক্লিষ্ট সংস্কার সে সংস্কার কিরূপে ধ্বংস হয় তাহাই এখন বলা হইতেছে।

চিত্তে স্থিরতা আসিলেই সংস্কারের বিরলতা হয়। ক্রিয়াযোগ দ্বারাতে চিত্তে স্থৈর্য্য আসে; অতএব এই ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠিতব্য।

ক্রিয়াযোগ কি? ভগবান পতঞ্জলি বলিতেছেন——

"তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।"

তপ স্বাধ্যায়ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই তিন প্রকার ক্রিয়াযোগ।

তপ অর্থে আপাততঃ সুখস্পৃহা নিবারক এক চেষ্টা, চিত্তপ্রসাদক*

নির্ব্বিঘ্ন তপস্যাই যোগীদের সেব্য। উৎকট তপস্যা যথা তীক্ষ্ণ পদার্থ ভক্ষণ অত্যন্ত অগ্নিসেবা বহুপর্য্যটন, নিদ্রাত্যাগ শরীরযন্ত্রের কার্য্যোপকারিতার বিনাশ যথা উদ্ধবাহুত্ব কর্ণচ্ছেদন নাসাচ্ছেদ ইত্যাদি এ সকল শাস্ত্রে অতিনিন্দিত। ইহাতে কোন ক্ষুদ্রসিদ্ধি লাভ হয় বটে; কিন্তু ইহারা সমাধির অনুকূল নহে।

স্বাধ্যায়—প্রণবাদি পবিত্রমন্ত্র জপ অথবা মোক্ষশাস্ত্রাধ্যায়ন।

ঈশ্বরপ্রণিধান—পরমগুরু ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ অথবা কর্ম্মফলকামনা ত্যাগ।

সাধারণত এই তিন প্রকার অভ্যাসকে যোগাভ্যাস বলে। উপায় ভেদে ভারতে যোগ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা—রাজ-মন্ত্র হঠ লয়;

প্রণবাদি মন্ত্র বা অভীষ্ট দেবতার ধ্যান করিতে করিতে যে চিত্ত স্থির হয় ইহাই মন্ত্রযোগ। ভৃগু কশ্যপ দধিচি জমদগ্নি ইঁহারা মন্ত্রযোগের সাধক শ্রীচৈতন্য এই মন্ত্রযোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় তাঁহার সমাধি উপস্থিত হইত। কীর্ত্তন সেই চিন্তার উদ্রেককারিণী শক্তি। মহামুনি বাল্মীকিও এই যোগে সিদ্ধ হয়েন।

ব্যাসাদি কয়েক মহাপুরুষ লয় যোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন। এই যোগে শরীরস্থ শক্তি বিশেষের উদ্বোধন দ্বারা চিত্তসমাহিত হয়।

প্রাণায়ামাদি দ্বারা বায়ুস্থির করতঃ যে চিত্তের স্থৈর্য্য তাহাই রাজ-যোগ। হঠযোগ রাজযোগের পূর্ব্বাভ্যাস মাত্র। আসন মুদ্রা প্রভৃতি শারীরিক কর্ম্মদ্বারা বায়ুকে বশীভূত করার উপায়ই হঠযোগ।

দত্তাত্রেয় প্রহ্লাদ ভীষ্ম ইঁহারা রাজযোগী রাজযোগে জ্ঞানের প্রাধান্য। জ্ঞেয় ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানই রাজযোগের চরম অবস্থা এই যোগের কথা গীতার নবম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ক্লেশ হইতে উৎপন্ন যে সংস্কার তাহাই ক্লিষ্ট সংস্কার।

ক্লেশ দার্শনিক অর্থে পঞ্চপ্রকার,অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ।

অবিদ্যা=মিথ্যাজ্ঞান যেমন অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মবিষয়ে যথাক্রমে তদ্বিপরীত জ্ঞান।

অস্মিতা=দৃষ্টশক্তির ও দর্শনশক্তির একাত্মতাই অস্মিতা। আমি কর্ত্তা, আমার চক্ষু, আমার হস্ত এই জ্ঞানই অস্মিতা।

রাগ=ক্রোধ নহে, তদ্বিপরীত অনুরাগ, ভগবানে নহে, বিষয়ে সুখের পিপাসা।

দ্বেষ=রাগের বিপরীত দুঃখাভিজ্ঞ প্রাণীর দুঃখে যে প্রতিঘ মন্যু জিজ্ঞাসা ও ক্রোধ ইহাও এক প্রকার বিপর্য্যয় জ্ঞান।

অভিনিবেশ=সমস্ত প্রাণীর এই নিত্য আত্ম প্রার্থনা হয় কি "আমার যেন অভাব না হয়" "আমি যেন জীবিত থাকি"—মরণের ভয় অভিনিবেশ ক্লেশের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বে যে মরণ ত্রাস অনুভব করে নাই তাহার মরণ ভয় আসিতে পারে না, ইহার দ্বারা পুনর্জন্ম অনুভব প্রতিপন্ন হয়; এই মরণত্রাস প্রত্যক্ষ অনুমানও আগমের দ্বারা সম্পাদিত নহে তবে কোথা হইতে আসে; সুতরাং জন্মান্তর অনুভব বলিতে হইবে। মনে থাকে যেন অনুভব ব্যতীত কোন সংস্কারই হয় না।

পাঃ দ—২।৩।৫।৭।৮।

উপরি উক্ত ক্লেশ বীজ সকল ধ্যান হেয় ধ্যানের দ্বারা তাহারা নষ্ট হয়। ২।২১

ধ্যান শিক্ষা করিতে হইলে যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যোগ চরম লক্ষ্য নহে চরম লক্ষ্য সাধনের উপায় মাত্র। যেমন ব্যায়াম উদ্দেশ্য নহে শারীরিক স্বাস্থ্য উদ্দেশ্য তদ্রূপ যোগ যদি

চিত্তমল অপনোদনের কারণ না হয় অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা কৈবল্য প্রাপ্তির উপায়ে পরিণত না হয় তাহা হইলে যোগাভ্যাস একেবারেই পরিত্যজ্য।

যোগ অতিশয় শক্তি "নাস্তি যোগ সমং বলং" ইহার অভ্যাসে অমানুষিক শক্তি বা সিদ্ধির আবির্ভাব হয়। পূর্ণ অভ্যাস হইলে মানুষ আকাশ মার্গে পক্ষী অপেক্ষাও উৎকৃষ্টভাবে উড়িয়া বেড়াইতে পারে, পর্ব্বতের ন্যায় বিরাট দেহ ধারণ করিতে পারে, পুনরায় চক্ষুর অগোচর হইতে পারে; কতপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে। মারণ, উচাটন, বশীকরণ এত সামান্য সিদ্ধি।

যোগে এত কাণ্ড করা যায় শুনিলেই মনটা লম্ফ দিয়া উঠে এবং ভাবে কিসে এ যোগাভ্যাস অতি শীঘ্র আয়ত্ত হয়। যিনি অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছেন তিনি ভাবেন যদি অদৃশ্য হইবার অভ্যাসটা আসিয়া যায় তবে কালই বেঙ্গল ব্যাঙ্কের যত টাকা নোট কাগজ যাহা কিছু আছে সবই শ্রীমানের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পর মনোহর বাগানবাটী অতি বেগবতী মোটরগাড়ী ক্রমশঃ অন্যান্য। ফল কথা, যিনি যে ভাবে মগ্ন আছেন সেই ভাবের এক কল্পিত মূর্ত্তি সৃজিয়া যোগ সিদ্ধি তৎসাধনোপায় করিয়া লয়েন। যোগ প্রবৃত্তি রথের বেগবান অশ্বে পরিণত হয়।

যথার্থ তাহাই হয় কাম বিবর্জ্জিত না হইলে যোগসিদ্ধি সংসারে প্রভূত দুঃখের উৎপাদক হয়। দৃষ্টান্ত লঙ্কেশ্বর রাবণ।

রাবণের সাধনা অপূর্ব্ব কিন্তু সেই সাধনার ফল কি মনে আছে ত! ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ তাহার বশীভূত ঐহিক সুখের মনুষ্য যত কল্পনা করিতে পারে তাহা তাহার সমস্তই হইয়াছে, কিন্তু কামমোহিত চিত্ত হওয়ায় অতি জুগুপ্সিত কর্ম্ম সে করিয়া বসিল। যদি তাহার যোগ সংসিদ্ধি না থাকিত তাহা হইলে সে মা জানকীকে অবমাননা করিতে পারিত না।

শ্রীভগবান গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে প্রথমে যোগাঙ্গ এবং তাহার সাধনোপায় উপদেশ করিলেন তাহার পর অধিকারীর কথা বলিলেন—"অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।" অসংযত চিত্ত যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। তাহার পর বলিতেছেন তপস্বী কর্ম্মী জ্ঞানী সকলের অপেক্ষা যোগী 'বড়' অতএব তুমি "যোগীভব" কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবিলেন যোগাভ্যাসে পাছে অর্জ্জুন রাবণ হইয়া যান সেই আশঙ্কা নিবারণ করিয়া পরেই বলিতেছেন যোগীগণের মধ্যে যে আমাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনা করেন সেই প্রকৃত যোগী। ঈশ্বর বিমুখ হইয়া যোগাভ্যাসে রাবণের ন্যায় অধোগতির কারণ হয়। তাঁহাতে অচলা ভক্তি থাকা চাই।

এই কারণেই শাস্ত্র যাহাকে তাহাকে যোগোপদেশ দেওয়া নিষেধ করিয়াছেন। উপযুক্ত অধিকারী না হইলে কোন ক্রমেই যোগ বীজ দিতে নাই।

যোগাঙ্গ।

"যম নিয়মাসন প্রণায়াম প্রত্যাহার ধারণাধ্যান সমাধয়োষ্টাবঙ্গানি"

সা—পা—২৯।

যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি যোগের এই অষ্টাঙ্গ।

ষড়ঙ্গ যোগের কথাও শাস্ত্রে আছে কার্য্যত উভয়ই এক কোন ভিন্নতা নাই। ভীষ্মদেব অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ করিয়াছেন—

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যম।

অহিংসা—সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অনভিদ্রোহ।

সত্য—যথাভূত অর্থযুক্ত বাক্য ও মন।

যেমনভাবে দৃষ্ট, অনুমিত বা শ্রুত হইয়াছে সেইরূপ কথন এবং চিন্তন। কিন্তু সেই বাক্য সর্ব্বভূতের উপঘাতক না হইয়া উপকারার্থে প্রযুক্ত হওয়া

আবশ্যক। যদি ভূতোপঘাতক হয় তাহা হইলে তাহা সত্য হয় না, পাপ হয়।

অস্তেয়—অশাস্ত্রীয় পূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য স্বীকরণ বা গ্রহণ তাহার নাম স্তেয় তদ্বিপরীত অস্তেয় অস্পৃহারূপ স্তেয় প্রতিষেধ।

ব্রহ্মচর্য্য—"গুপ্তেন্দ্রিয়স্যোপস্থস্য সংযমঃ।"

ব্যাসভাষ্য—

গুপ্তেন্দ্রিয় হইয়া উপস্থ সংযমই ব্রহ্মচর্য্য। শুদ্ধ উপস্থ সংযমই ব্রহ্মচর্য্য নহে। সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযম না হইলে ব্রহ্মচর্য্য হয় না। ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে ভীষ্মদেবের কথা সকল বাঙ্গালীর জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিলে বাঙ্গালী অচিরে জগতের মধ্যে এক প্রধান জাতিতে পরিণত হইবে। তাহার ইহকাল পরকাল উভয় কালই বশীভূত এবং সমস্ত পৃথিবী নতশিরে তাহার মুখ নিঃসৃত বাক্য শিরোধার্য্য করিবে।

দেবব্রত বলিতেছেন—

"আমি শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা যথাক্রমে ইন্দ্রিয় জয় বিষয়ে উপায় বলিব, তাহা জানিয়া মনুষ্য দমাদির অনুষ্ঠান করিলে পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে।" ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মের রূপ বলিয়া যে স্মৃত হইয়াছে তাহাই সমস্ত ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ যেহেতু মনুষ্য তদ্দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হয়।"

যিনি সম্যকরূপে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে পারেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মচর্য্য অতি দুষ্কর ব্রত, অতএব তদ্বিষয়ে যে উপায় আছে তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ব্রহ্মচারী দ্বিজগণ সমুৎপন্ন ও সংবর্দ্ধিত কাম ক্রোধ প্রভৃতির নিগ্রহ করিবেন; যোষিৎ সম্বন্ধীয় কথায় কর্ণপাত করিবেন না, নিরম্বরা রমণীগণকে নিরীক্ষণ করিবেন না। রমণীগণ কথঞ্চিৎ দৃষ্টিপথের অতিথি হইলে অজিতেন্দ্রিয় মানবগণের অন্তঃকরণে

রাগোদ্রেক হইয়া থাকে। রমণীগণের প্রতি রাগোৎপন্ন হইলে কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবেন অর্থাৎ তিন দিন প্রাতঃকালে তিন দিন সায়ংকালে এবং তিন দিন অযাচিত ভোজন করিবেন, পরে তিন দিবস অনাহারে থাকিবেন তিন দিন জল মধ্যে প্রবেশ করিবেন। স্বপ্নকালে যদি রেত স্খলন হয় তবে জল মধ্যে মগ্ন হইয়া মনে মনে তিন বার অঘমর্ণ জপ করিবেন।" ঋগ্বেদে অঘমর্ণ মন্ত্র আছে যথা "ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাপি" সন্ধ্যা বিধিতেও আছে।

শরীরান্তর্গত মল বহানাড়ী যেমন দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছে, তদ্রূপ দেহগত আত্মাকে দেহ বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ জানিবে। রস সমুদয় শিরা সমূহ দ্বারা মানবদিগের বাত পিত্ত কফ রক্ত ত্বক মাংস স্নায়ু অস্থি ও মজ্জা সমন্বিত দেহের তৃপ্তি সাধন করে। এই শরীরে ইন্দ্রিয়গণের বিষয় গ্রহণ করণের উপযুক্ত দশটী নাড়ী আছে।" "হৃদয়ের মধ্যভাগে এক মনোবহা নাড়ী আছে সেই শিরা মানবগণের সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্প জন্য শুক্রকে সঞ্চারণ করতঃ উপস্থাভিমুখে আনয়ন করে। সর্ব্বগাত্র ব্যাপিনী শিরা সকল সেই মনোবহা নাড়ীর অনুগত হইয়া তৈজস গুণ বহন করিয়া নয়ন দ্বারের সন্নিহিত হয়।" "দুগ্ধ মধ্যে নিহিত নবনীত মন্থন দণ্ড দ্বারা মথিত হয় তদ্রূপ দেহস্থ সংকল্পও ইন্দ্রিয় জন্য রমণী দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা শুক্র মথিত হইয়া থাকে। স্বপ্ন সময়ে যোষিৎ সঙ্গ না থাকিলেও মন যখন রমণীবিষয়ক সংকল্প জন্য অনুরাগ লাভ করে তখন মনোবহা নাড়ী সংকল্প জন্য শুক্রক্ষরণ করে। অন্নরস সংকল্প ও মনোবহা নাড়ী এই তিনটি শুক্রের বীজ।" যাহারা জীবগণের শুক্রের উদ্রেক বশতঃ (স্বদেহেই) বর্ণসঙ্করের সংস্কার বিষয়ের গতির আলোচনা করেন তাহারা কামনাহীন হইয়া পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না।" শান্তিপর্ব্ব, ২১৩।১ অ।

শুক্রের উত্তেজনায় দেহে রজোগুণের প্রবলতা হয়, রজের প্রবলতা হইলে পিত্তাধিক্য হয়, তাহা হইতে বায়ু চঞ্চল হয়, বায়ু চঞ্চল হইলে

চিত্তস্থৈর্য্য হয় না। তাই ভীষ্ম বলিতেছেন এই সংকল্পাত্মক মনের বিনাশ জন্য নিবৃত্তি লক্ষণযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এই কর্ম্ম অনুষ্ঠানের নাম ব্রহ্মচর্য্য।

শাস্ত্রেও আছে মৈথুন অষ্ট প্রকার "স্মরণং কীর্ত্তণং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং সংকল্পে ধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেব চ।" সপ্তাহে তিন দিন থিয়েটার চারি দিন নাচ করিলে কি ব্রহ্মচর্য্য হয়!!!

ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান সহায় আহার ব্যবস্থা, সে কথা আমরা আহারতত্ত্বে বলিব। মনের সম্পূর্ণ নিগ্রহ না হইলে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হয় না।

"ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ" ২।৩৮

ভাষ্যকার বলিতেছেন, যাহার লাভে অপ্রতিম গুণসকল অর্থাৎ অনিমাদি উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। আর ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ পুরুষ শিষ্যহৃদয়ে জ্ঞান আহিত করিতে সমর্থ হয়েন। এই নিমিত্ত ভীষ্ম কুরুপাণ্ডবের জন্য এবম্বিধ গুরু অন্বেষণ করিতেছেন।

অনেকে হয়ত আশঙ্কা করিবেন যে, ভীষ্মের কথামত ব্রহ্মচর্য্য সকলেই যদি আরম্ভ করে তাহা হইলে জননক্রিয়ার অভাবে প্রজা সৃষ্টি ব্যাহত হইবে সুতরাং এমন সময় উপস্থিত হইবে যখন জাতি ধ্বংসপ্রায় হইবে।

আমরা তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিতেছি তাহা কখন হইবে না।

ব্রহ্মচর্য্যের আধিক্য হইলেই সুসন্তান অধিক পরিমাণে জন্মগ্রহণ করিবে—দীর্ঘায়ু কর্ম্মঠ উদারহৃদয় সন্তান উৎপন্ন হইবে। ব্রহ্মচারী হইলে জননক্রিয়া ব্যাহত হয় না—ব্রহ্মচারী অমোঘ বীর্য্য হয়েন, তাঁহারা ইচ্ছামত বীজ প্রদান করিতে পারেন। এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যই ভীষ্মই বলিতেছেন—

"ভার্য্যাং গচ্ছণ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতিবৈদ্বিজঃ।" শান্তি পঃ ২২১।১৯।

ঋতুকালে ভার্য্যাগমনে দ্বিজ ব্রহ্মচারী হয়। এই অভ্যাস ত সকলের হউক।

অপরিগ্রহ—বিষয়ের অর্জ্জনে রক্ষণে ক্ষয়ে দুঃখ এবং বিষয় গ্রহণে অবশ্যম্ভাবী হিংসা এই সকল দোষ দেখিয়া বিষয় গ্রহণ না করা। প্রাণ ধারণের উপযুক্ত বিষয় গ্রহণ করিয়া তদতিরিক্ত অগ্রহণ হইল অপরিগ্রহ।

২। "শৌচ সন্তোষ তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মঃ।" ২।৩২
শৌচ সন্তোষ তপ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান ইহাদের নাম নিয়ম।

শৌচ—মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা এবং মেধ্য আহারের দ্বারা যে শৌচ তাহা বাহ্য শৌচ। আভ্যন্তর শৌচ চিত্তমল স্খালন; পচা, দুর্গন্ধযুক্ত মাদক দ্রব্য অমেধ্য অতএব—পরিত্যজ্য।

আজকাল অমেধ্যের দিকেই রুচি অধিক দেখা যায়।

সন্তোষ—আবশ্যকের বহির্ভূত গ্রহণের অনিচ্ছা তপাদি পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

যম এবং নিয়ম বলা হইল ইহাদের সাধনায় অনেক সিদ্ধি অর্জ্জন হয়। যথা—

অহিংসা প্রতিষ্ঠা হইলে বৈরত্যাগ হয়—সকল জীবই তখন সাধুকে মিত্র মনে করে। সর্প ব্যাঘ্রাদি ঋষিগণের আশ্রমে বৈরভাব ত্যাগ করিয়া বাস করে এরূপ বর্ণনা প্রায়ই দেখা যায় তাহার কারণ যোগীর অহিংসা প্রতিষ্ঠা। ২।৩৫—

সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে বাক্য অমোঘ হয়—যোগী যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। আমাদের দেশে সত্য নাই এরূপ গঞ্জনা আছে। ২।৩৬

অস্তেয় প্রতিষ্ঠা হইলে সর্ব্বরত্ন উপস্থিত হয়। ২।৩৭

অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইলে অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান হয়। ২।৩৮।

নিয়মের সিদ্ধি সকল বলা যাইতেছে—

শৌচ হইতে নিজ শরীরে জুগুপ্সা বা ঘৃণা এবং পরের সহিত অসংসর্গ বৃত্তি হয়।

আভ্যন্তর শৌচ প্রতিষ্ঠা হইলে অন্তকরণের নির্ম্মলতা হয়—তাহা হইতে সৌমনস্য জন্য মানসিক প্রীতি বা আনন্দলাভ হয়। আনন্দ হইতে একাগ্রতা হয়, একাগ্রতা হইতে ইন্দ্রিয় জয় হয়।

তপ হইতে কায় সিদ্ধি হয় যথা—দূব শ্রবণ ও দর্শনের ক্ষমতা।

স্বাধ্যায় হইতে ইষ্টদেবগণের দর্শন হয়। দেব ঋষি এবং স্বাধ্যায়শীলগণ দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয়েন।

ঈশ্বর প্রণিধান হইতে সমাধি হয়। সমাধি সিদ্ধি হইলে আর কোন সিদ্ধির অভাব থাকে না। ২।৪৫—

এতক্ষণ যম নিয়মের কথা বলা হইল; অনেকে মনে করিবেন যমনিয়ম আসনাদি পর্য্যায় ক্রমে সাধন করিতে হয় তাহা নহে, সকল অঙ্গই যুগপৎ সাধিত হয়। উপদেশ এইরূপ ভাবে গ্রথিত যে অনুষ্ঠানে অষ্টাঙ্গই কিয়ৎ পরিমাণে অভ্যস্ত হয়।

আসন।

যোগাভ্যাস করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই আসন অভ্যাস করিতে হয়। যোগের অনুকূল উপবেশনের নামই আসন।

শারীরিক স্থৈর্য্য না হইলে চিত্ত স্থৈর্য্য অসম্ভব। শরীরকে অনেক প্রকারে ন্যস্ত করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে কতকগুলি পদ্ধতি আছে সে গুলি শরীরের ব্যাধিনাশক এবং ধৃতিবর্দ্ধক হয়। ঋষিগণ সেই শারীরিক অবস্থান সমূহকে অভ্যাসার্থ আসন স্থির করিয়াছেন। ইহাতে অবৈজ্ঞানিক ত কিছুই নাই; ব্যায়ামে শরীরের কোন অঙ্গবিশেষকে

বলিষ্ঠ করিবার জন্য শারীরিক অবস্থানকে বাছিয়া লওয়া হয়। জাপানীরা এইভাবে তাহাদের জিউজিৎসু এবং ভারতবাসীরা কুস্তীর পেঁচ আবিষ্কার করিয়াছেন।

আসন বহু প্রকার—৮৪ প্রকার যথা, পদ্মাসন, বীরাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন, গোমুখাসন, কূর্ম্মাসন, কুক্কুটাসন, ধনুরাসন, মৎস্যাসন, ময়ূরাসন, যাবাসন, ভদ্রাসন, ক্রৌঞ্চাসন ইত্যাদি। ইহার মধ্যে, সিদ্ধ, পদ্ম, সিংহ এবং ভদ্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া হঠদীপিকায় উক্ত। সকল আসনের প্রকার লিপিবদ্ধ করা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের সাধ্য নয়, তবে কয়েকটি প্রধান আসনের পদ্ধতি বলা যাইতেছে।

সিদ্ধাসন।

"যোনিস্থানকমঙ্ঘ্রি মূলঘটিতংকৃত্বা দৃঢ়ং বিন্যসে
ন্মেঢ়ে পাদমথৈকমেব হৃদয়েঘটিতংকৃত্বা হনুংসুস্থিরং
স্থাণুঃ সংযমেন্দ্রিয়োচলদৃশা পশ্যেদ্ ভ্রুবোবন্তরং।
হ্যেতন্মোক্ষকপাটভেদজনকং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে॥"

অণ্ডকোষের নিম্ন হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত যোনিদেশ এবং নাভির নিম্ন হইতে উপস্থ পর্য্যন্ত মেঢ়্‌ দেশ। এই যোনিস্থানে বামপদের গুল্ফ দৃঢ়সংলগ্ন করিয়া মেঢ়দেশে দক্ষিণপদের গুল্ফ সংলগ্ন করিবে। তদনন্তর চিবুক হৃদয়ের উপর আনয়ন করিবে কিন্তু চিবুক হৃদয়ে সংলগ্ন হইবে না (মেরুদণ্ড এবং গ্রীবাদেশ ঋজু হইলেই এই হয়) তৎপর ইন্দ্রিয় সকলকে নিজ নিজ বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া ভ্রূমধ্যে (ভিতর দিয়া) অবলোকন করিবে। ইহাই সিদ্ধাসন এই আসন অভ্যস্ত হইলে মোক্ষের দ্বার মুক্ত হয়।

পদ্মাসন।

"বামোরূপরি দক্ষিণং চ চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা।
দক্ষিণোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনাধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং॥
অঙ্গুষ্ঠৌ হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়ে।
দেতদ্‌ব্যাধিবিনাশকারি যমিনাং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে॥

বাম উরুর উপর দক্ষিণপদ এবং দক্ষিণ উরুর উপর বামপদ উত্তান-ভাবে (চিৎ করিয়া) রাখিবে তৎপরে দক্ষিণহস্ত দ্বারা পৃষ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে, বামহস্তের দ্বারাও তদ্রূপ বামপদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে। পরে চিবুক বক্ষোপরিসিদ্ধাসনের ন্যায় আনয়ন করিবে এবং ভ্রূ মধ্যে অবলোকন করিবে। পদ্মাসনের প্রকার ভেদও আছে, অঙ্গুষ্ঠ না ধরিয়া হস্তদ্বয় উত্তানভাবে ক্রোড়ে রাখিলেও হয়। শ্রীবুদ্ধের এই আসন স্বভাবসিদ্ধ ছিল। পদ্মাসনেই বুদ্ধমূর্ত্তি সকল প্রায় দেখা যায়।

সিংহাসন।

গুল্‌ফৌ চ বৃষণ্যস্যাধঃ সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োঃক্ষিপেৎ।
দক্ষিণ সব্যগুল্‌ফং তু দক্ষগুল্‌ফং ত সব্যকে॥

অণ্ডকোষের নিম্নে যে সেলাই করার ন্যায় দাগ অণ্ডদ্বয়কে পৃথক করে তাহার নাম সীবনী, দুই পায়ের গুল্‌ফ সীবনীর অধোভাগে যোড়া করিয়া রাখিলেই সিংহাসন হয়।

ভদ্রাসন।

পার্শ্বপাদৌ চ পাণিভ্যাং দৃঢ় বদ্ধ সুনিশ্চলং
ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং॥

সিংহাসনে উক্ত সীবনীর নিম্নে পাদদ্বয় রাখিয়া হস্তের অঙ্গুলি সমুদায়

দ্বারা পাদদ্বয় দৃঢ় আকর্ষণ করিয়া উদর সংলগ্ন করিবে তাহা হইলেই ভদ্রাসন হইবে।

আসন সমূহের অভ্যাসে শারীরিক ব্যাধি অনেক নষ্ট হয় ইহাতে এক প্রকার কঠিন ব্যায়াম এবং শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মিত গতিতে স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

আসন সকল অবস্থাতে অভ্যাস করা যাইতে পারে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

"যুবাবৃদ্ধোঽতিবৃদ্ধোবা ব্যাধিতো দুর্ব্বলেপিবা।
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি সর্ব্বযোগেষ্যতন্দ্রিতঃ॥

যুবা বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত বা দুর্ব্বল সকলের পক্ষেই প্রশস্ত।

সাধনা করিলেই সিদ্ধি হইবে। তবে গুরু উপদেশ মত হওয়া চাই গুরু ভিন্ন হইবার উপায় নাই।

কেবল শাস্ত্র পাঠ করিলে কিছুই হয় না।

"ন শাস্ত্র পাঠমাত্রেন যোগসিদ্ধিপ্রজায়তে।"

"স্থিরসুখমাসনং।"—

যেরূপ আসনই হউক, নিশ্চল ও সুখাবহ হওয়া উচিৎ নচেৎ স্থৈর্য্যের ব্যাঘাত হয়।

প্রায় আসনেই মেরুদণ্ড ঋজু রাখিতে হইবে।

"প্রযত্নশৈথিল্যানন্ত সমাপত্তিভ্যাং।" ২।৪৭

"প্রযত্নশৈথিল্য বা অনন্তে চিত্ত সমাহিত হইলে আসন সিদ্ধ হয়।"

প্রযত্ন শৈথিল্য অর্থাৎ স্নায়ু সকলের একান্ত বিশ্রাম ভাব এবং চিত্তকে সর্ব্বব্যাপী আকাশবৎ ভাবনায় আসন জয় হয়। ইহা হইলে অঙ্গ মেজয় অর্থাৎ অঙ্গ সকলের কম্পন দূর হয়। যতদিন আসন স্বাভাবিক না হয় ততদিন সুখাবহ হয় না এবং স্নায়ু সকলে চেষ্টা ভাব থাকে,

তাহাতে চিত্তস্থৈর্য্যের ব্যাঘাত হয়। মনকে শরীর চেষ্টা হইতে একবারে অপসৃত না করিতে পারিলে সারা মনটি ধ্যানে লাগান যায় না।

আসন সিদ্ধ হইলে সাধক শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের দ্বারা অভিভূত হন না।

"ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ।" ২।৩

অধুনা আমরা যে ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছি তাহাতে আসন স্থিরের ত কথাই নাই ক্রমশঃ উপবেশন ক্রিয়ারই অভাব হইবে। পৈতৃক বিছানায় বসা এখন অসভ্যতাব নিদর্শন চেয়ার এবং বেঞ্চের অবাধ আবির্ভাবে এবং বুট পাদুকার কল্যাণে পাদদ্বয় কুঞ্চিতভাবে স্বদেহ স্পর্শ বিস্মৃত হইয়া সবলভাবে অন্যের বক্ষ এবং পৃষ্ঠ নিপীড়নে যত্নবান। আহারের সময়ও উপবেশন কদাচিৎক, দাঁড়াভোগ শনৈঃ অধিকার বিস্তার করিতেছে। শ্বেতাঙ্গদিগের ন্যায় সপাদুকা শয়ন গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিতেছে।

স্নায়বীয় শৈথিল্যের পরিবর্ত্তে সঙ্কোচক কোট পণ্টালুন সমাদৃত হইতেছে। এ অবস্থায় আমরা আসন অভ্যাসের কোন সুযোগ দেখি না।

আজকাল শিক্ষিতগণের ধারণা এই যে সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বকালীন দৃঢ় আবরণ স্বাস্থ্যের বড় সহায় তাই অতি গ্রীষ্মের সময়ও আঙ্গুল পরিমিত মোটা কাপড়ের পাজামা এবং কোট ও মোজা তাঁহারা ব্যবহার করেন। *

* গ্রন্থকার এক সময়ে গ্রীষ্মকালে এক খাস বিলাতি সিবিলিয়ান সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব গৃহে দিব্য পাতলা কাপড়ের পাজামা পরিয়া এবং নগ্নপদে বসিয়া আছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা এত গরমে মোজা কেন ব্যবহার করেন। উত্তরে গ্রন্থকার বলেন, না ব্যবহার করিলে আপনারা যে আমাদের অসভ্য মনে করিবেন। সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন। মোজা পায় দিলেই আমরা "Respectable" মনে করি না। "Is it not constant Standing on wet ground ?" আমাদের চক্ষু খুলিবে কি ?

ফল হইয়াছে সমান্য শীতাতপেই তাপমান যন্ত্রের ন্যায় দেহ যন্ত্র ধাতু-বিকৃতি নির্দ্দেশ করে। চিকিৎসকের আনন্দবর্দ্ধক ব্যবস্থা বটে; কিন্তু জাতির প্রাণ হিসাবে বড়ই নিরানন্দের কথা।

প্রাণায়াম।

যোগচার্য্যেরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন অভ্যাসার্থীর বাহ্য স্থির না হইলে কখনই অন্তর স্থির হয় না, কার্য্যত আমরাও তাহাই দেখিতে পাই, যদি অক্ষিগোলক এক মিনিটে এক লক্ষ পদার্থের প্রতি ধাবিত হয় তাহা হইলে স্থৈর্য্য হয় কখন।

শারীরিক চাঞ্চল্যের কারণ দুই প্রকার।

১। স্বকৃত বা ইচ্ছাপূর্ব্বক।

২। স্বতঃ বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক।

স্বকৃত চাঞ্চল্যের কথা অধিক বলিবার আবশ্যক নাই কেন না ইচ্ছা করিলেই সে চাঞ্চল্যের দূর করা সম্ভব।

স্বতঃ বা স্বাভাবিক চাঞ্চল্যের পরিহার বড় দুরুহ ব্যাপার। আপত্তি হইতে পারে যাহা স্বাভাবিক তাহার আবার পরিবর্ত্তন কি পরিত্যজন কি ভাবে হওয়া সম্ভব? হঠাৎ অসম্ভব বলিয়াই ত জ্ঞান হয় কিন্তু বাস্তবিক তাহা অসম্ভব নয়। এখানে স্বভাবের পরিবর্ত্তন বা পরিত্যাগ নাই বরং যাহা পূর্ণ স্বাভাবিক তাহার দিকে অগ্রসর হওয়াই আছে। স্বভাবের অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্যই যোগাভ্যাসে নাই। আমরা ক্রমশঃ দেখিব অভ্যাসে যাহা স্বাভাবিক বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত তাহার পরিবর্ত্তন করা যায়। প্রকৃতির সেবায় নিযুক্ত হইলে তাহার অসীম ক্ষমতার পরিচয় মানব পাইয়া থাকে।

স্বত বা স্বাভাবিক চাঞ্চল্যের কারণ প্রধানতঃ ১। শ্বাস প্রশ্বাস

২। হৃৎপিণ্ডের অনবরত আঘাত ৩। পাকস্থলীর ক্রিয়া ৪। রক্তের চলাচল ৫। স্নায়বিক ক্রিয়া ৬। শীতাতপাদি ৭। মানসিক চাঞ্চল্য যথা হর্ষ ক্রোধাদি বৃত্তিসমূহ। এই শেষোক্ত কারণটি শারীরিক অস্থিরতা উৎপন্ন করিলেও শরীরের উপর সামান্য ত নির্ভর করে না।

অপর ষষ্ঠ কারণই এক প্রধান কারণের কার্য্যভেদ মাত্র, যথা শ্বাস প্রশ্বাস। এই শ্বসন ক্রিয়া না থাকিলে উপরোক্ত কোন ক্রিয়াই থাকে না। শরীরে যত কাল শ্বাস থাকে তত কাল জীবন থাকে, বাস্তবিক শ্বাসই জীবন। শ্বাস প্রশ্বাস বায়ুর অন্তরাকর্ষণ এবং নিষ্কাশন মাত্র। বায়ুই সুতরাং জীবের জীবন!

"যাবৎ বায়ুস্থিতো দেহে তাবজ্জীবনমুচ্যতে।"

ফল কথা শ্বাস প্রশ্বাস বায়ুই শারীরিক অস্থৈর্য্যের প্রধান কারণ।

সাধারণতঃ আমারও লক্ষ্য করি যখন কোন বিশেষ চিন্তা বা শক্তির কার্য্য করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হই তখন ক্ষণকালের জন্যও শ্বাস বায়ুকে ধারণ করি এবং অতি ধীরে বায়ু গ্রহণও ত্যাগ করি। দূরের ক্ষীণ শব্দ শ্রবণ করিতে হইলেও আমরা স্বতই শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করি। অতএব এই বায়ুর চলৎভাব স্থগিত করিতে পারিলে চিত্তের চলভাবও বহু পরিমাণে প্রশমিত হয়। ইহাতে অবৈজ্ঞানিক কিছু নাই।

"চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।
যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ॥"

বায়ু চলিতে থাকিলে চিত্তও চঞ্চল থাকে না চলিলে চিত্ত নিশ্চল হয় অতএব প্রাণ বায়ুকে নিরোধ করিবে। হঠদীপিকা।

প্রাণ অপান উদান সমান ও ব্যান নাগ কৃকর কূর্ম্ম দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশটি বায়ু শরীরে অনবরত আছে, তন্মধ্যে প্রথম পঞ্চবায়ু প্রাণবায়ু বলিয়া অভিহিত হয়। একই বায়ু স্থান এবং কার্য্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম পাইয়াছে।

প্রাণায়াম পদ্ধতি বা প্রকার ভেদ ও সাধারণ বিবরণ বলিবার পূর্ব্বে মানবদেহ সম্বন্ধীয় কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় কথা বলা প্রয়োজন নচেৎ প্রাণায়ামের বৈজ্ঞানিক অস্তিত্বে সন্দেহ নিরাকৃত হইবে না।

হস্ত পদাদি ব্যতীত মনুষ্যের মস্তকের নিম্নভাগ হইতে গুহ্যের কিছু উপর পর্য্যন্ত যে অস্থিময় দণ্ড বিশেষ লম্বমান আছে তাহার নাম মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ড একখানি অস্থি নহে অনেকগুলি অস্থিখণ্ড মালার ন্যায় গ্রথিত আছে। ঐ অস্থিগুলির নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত এক সূত্র বা নাড়ী আছে। শবচ্ছেদে ইহা পাওয়া যায়। এই মেরু মধ্যস্থিত নাড়ীর নাম সুষুম্না।

মানব দেহে বহু নাড়ী উদ্ধমূল অশ্বত্থের ন্যায় বিস্তৃত আছে সেই নাড়ী সকলের ভিতর দিয়া বায়ুর চলাচল হেতু দেহ বৃত্তি সম্পন্ন হয়।

যোগশাস্ত্রে এই অগণ্য নাড়ী সমূহের মধ্যে ৩টি প্রধান নাড়ীর বিশেষ উল্লেখ আছে, তাহাদের নাম ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না।

যোগ গ্রন্থে এই নারী ত্রয়ের অপর নামও দৃষ্ট হয় যথা—ইড়ার নাম চন্দ্র এবং পিঙ্গলার নাম সূর্য্যনাড়ী। সুষুম্নার অনেক নাম যথা—

"সুষুম্না-শূন্যপদবী ব্রহ্মরন্ধ্রং মহাপথঃ।
শ্মশানং শাম্ভবী মধ্যমার্গ শ্চেত্যেববাচকাঃ॥

জ্ঞানবৃত্তি ইচ্ছাবৃত্তি ও ক্রিয়াবৃত্তি এই নাড়ীগণ দ্বারা সাধিত হয়। তন্মধ্যে সুষুম্না জ্ঞানবাহিনী নাড়ী; সুতরাং এই নাড়ীর চরমোন্মেষ ব্যতীত চরম জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে।

সুষুম্নার মধ্যে চিত্রাণি নামে এক অতি সূক্ষ্ম নাড়ী আছে ইহার অপর নাম দিব্য পথ। চিত্রাণির মধ্যে সূক্ষ্মতম বিদ্যুল্লতা সম ব্রহ্মনাড়ী নামে এক নাড়ী আছে। ইহা মূলাধার হইতে মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্ম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার শেষে এক রন্ধ্র বা ছিদ্র আছে তাহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে। ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর শিখা রাখিতে হয়।

ব্রহ্মনাড়ীর সম্যক উদ্বোধনই যোগের চরম লক্ষ্য ইহার মার্জ্জনাতেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

সাধারণ মনুষ্যের নাড়ী সমূহ "মলাকুল" কি উপায়ে সেই নাড়ীর মল ধৌত করা যায় সেখানে ত সাবান এবং ফিনাইল পৌঁছিতে পারে না।

শরীরে বায়ুই এক পদার্থ আছে যে সর্ব্বস্থানে যাইতে সক্ষম তাহার অব্যাহত গতি অতএব সেই বায়ু ভিন্ন আর কোন শুদ্ধির উপায় নাই। তাই যোগশাস্ত্র বলিতেছেন "মলাকুলেষু নাড়ীষু নৈব মধ্যগঃ!" মলাকুল নাড়ী থাকিলে বায়ু সুষুম্নায় প্রবেশ করে না তজ্জন্য—

"প্রাণায়ামং তত কুর্য্যান্নিত্যং সাত্বিকয়া ধিয়া।
যথা সুষুম্না নাড়ীস্থা মলাঃ শুদ্ধিং প্রযাতীব॥"

সাত্বিক বুদ্ধি দ্বারা নিত্য প্রাণায়াম করিবে যাহাতে সুষুম্না নাড়ীর মল শুদ্ধি হয়।

মানব দেহে ছয়টী স্নায়ুকেন্দ্র বা চক্র আছে। সুষুম্নানাড়ী সর্ব্বপ্রথম চক্র হইতে উদ্ভূত হইয়া অন্যান্য চক্রগণকে ভেদ কর ত সহস্রদল পদ্মে শেষ হইয়াছে। অগত্যা সুষুম্নার মার্জ্জনা করিতে হইলে এ চক্রগণেরও মার্জ্জনা করিতে হইবে।

ষটচক্র।

জীব দেহ ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ উপাদানে প্রস্তুত। এই পঞ্চ উপাদানকে শাস্ত্র পঞ্চভূত বলেন। রজনীতে যে ভূতের ভয়ে গাছের দিকে তাকান যায় না এ সে ভূত নহে।

গন্ধ রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারা স্থূল উপাদান বা ভূত।

আমাদের শরীর অগণ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। পরমাণু কি আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অবসরহীন শক্তিপুঞ্জ মাত্র ইহাদের জাতি আছে।

শরীরের "ক্ষিতি" ধাতুর বা ভূতের প্রয়োজন ক্ষিতিগুণযুক্ত পরমাণুব দ্বারা সাধিত হয় অন্যান্য উপাদানের প্রয়োজনও ঐ ভাবে তদ্‌গুণযুক্ত পরমাণুর দ্বারা সাধিত হয়।

মনে করুন রেলের এঞ্জিন তাহাতে উত্তাপের ও জলের আবশ্যক আছে বাষ্পের প্রয়োজন আছে কয়লার দরকার আছে। তৎপরে বহুবিধ প্রণালীর দ্বারা ঐ বাষ্পকে চালিত করিয়া চাকার উপরে শক্তি প্রয়োগ করিলে তবে গমন ক্রিয়া সমাধা হয়।

শরীরেও অবিকল ঐ ভাব হয়। একটি যন্ত্র আছে যদ্দ্বারা দেহের জলময় বা রসাত্মক ক্রিয়া সাধিত হইতেছে অপর এক যন্ত্র আছে যদ্দ্বারা তেজোময় বা উত্তাপ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে।

মানুষ যখন কাঁদে তখন তাহার চক্ষে কত জল আসে কোথা হইতে আসে অবশ্য কোনও জলাধার আছে।

এই উপাদান সঞ্চয়ের যন্ত্রগুলিকে যোগ শাস্ত্রে চক্র বা পদ্ম বলা হয়। চক্রগুলির স্থূল এবং সূক্ষ্ম ভাব আছে।

যন্ত্রের বিকৃতি বা তাহার ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলেই ব্যাধির উৎপত্তি হয় আর এই যন্ত্র সমূহকে বশীকৃত ও তাহাদের রচনা জ্ঞাত হইলেই শরীর ব্যাধিহীন ও বহুকাল স্থায়ী করা যাইতে পারে ; যদি উপাদান হস্তগত হয় তবে যেরূপ ভাবে ইচ্ছা দেহকে চালিত এবং গঠিত করিতে পারা যাইবে ইহাতে অবিশ্বাসের কারণ কেন থাকিবে।

চক্র সকলকে দৃঢ় করা মার্জ্জিত অবস্থায় রাখা যোগের কর্ম্ম।

মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে চক্র ছয়টি অবস্থিত। ইহাদের স্থূল রূপ যন্ত্র সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় সূক্ষ্ম রূপ কেবল যন্ত্রের দ্বারা গৃহীত হয়।

শাস্ত্রে উহাদের নাম যথাক্রমে মূলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র, মণিপূরক বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্র।*

মূলাধার চক্র (Pelvic Plexus.)

গুহ্যের দুই অঙ্গুলি উপরে যথায় মেরুদণ্ডের শেষ হইয়াছে সেই স্থানে এই প্রথম চক্র বা পদ্ম অবস্থিত। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যন্ত্রসমূহ পদ্মাকৃতি। যাঁহারা এই পদ্ম সকলকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন তাঁহারাই ইঁহাদের রূপ এবং আকার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্য ছাড়া অন্য প্রমাণ দিবার উপায় নাই।

এই পদ্মের চতুর্দ্দল, দলের বর্ণ লোহিত, কর্ণিকায় স্বয়ম্ভূ লিঙ্গোপরি অতুলনীয়া রূপবতী মহাপ্রকৃতি অধিষ্ঠিতা, তিনি নিদ্রিতা আছেন। কর্ণিকাকে তিনবার বেষ্টন করিয়া সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধমুখে সুষুম্না নাড়ীকে ধারণ করিয়া সুসুপ্তা আছেন।

"ল" এই চক্রের বীজ, ব্রহ্মা ইহার অধিষ্ঠাতা দেবতা। ঐ কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিতে পারিলেই ষটচক্র ভেদ হয়।

সর্ব্বশক্তির আধার এই কুণ্ডলিনী; ইহার প্রবোধ ব্যতীত যোগসিদ্ধির উপায় নাই।

"সুপ্তা গুরু প্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী
তদা সর্ব্বানি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থ যোনি চ॥"

শ্রীগুরুর প্রসাদে সুপ্তা কুণ্ডলী জাগ্রত হইলেই ষটচক্র ভেদ ব্রহ্মা গ্রন্থি বিষ্ণু গ্রন্থি ও রুদ্র গ্রন্থি ভেদ হইয়া যায়।

এই চক্র ক্ষিতি পরমাণুর তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রকৃতি সংযোগ হেতু মূলাধার। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তির অব্যক্তাবস্থা তাই তিনি নিদ্রিতা।

কুণ্ডলিনী সেই অপ্রকাশিত শক্তির গ্রন্থি। এই গ্রন্থি উন্মোচিত হইলে তবে প্রকৃতি পুরুষের যথার্থ জ্ঞান হয়।

"ল" ইহার নির্দ্দেশক বীজ অর্থাৎ অনবরত এই চক্রে ললল ধ্বনি হইতেছে; কুণ্ডলী জাগ্রত হইলে সাধকের ঐ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। বীজ দুই প্রকার রূপাত্মক এবং শব্দাত্মক।

আমাদের দেশে যে শিবপূজা প্রচলিত আছে, তাহা এই আধার পদ্ম হইতে হইয়াছে। লিঙ্গাকৃতি শিব পুরুষ এবং গৌরীপট্ট প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ অবস্থিতি ইহাই শিবপূজা "বিশ্বাদ্যং" "বিশ্ববীজং।"

প্রকৃতি এবং পুরুষের ধ্যান করিতে করিতে প্রকৃতি জাগ্রত হয়েন তাহা হইলেই সৃষ্টিক্রম জ্ঞান হয়। অতএব শিবপূজা বড় সাধারণ পূজা নহে। রূপক জ্ঞানে কেহ যেন সম্মিত না হয়েন এ সকল সিদ্ধগণের দৃষ্ট পদার্থ। সাধনা হইলে সকলেরই দর্শন হইতে পারে।

স্বাধিষ্ঠান চক্র (Hypogastric plexus)

এটি ষড়দল পদ্ম; দলের বর্ণ পাটল। বিষ্ণু অধিষ্ঠাতা দেবতা। শরীরের জলময় বা রসাত্মক ক্রিয়া এই চক্রদ্বারা সাধিত হয়।

"ব" ইহার বীজ এই স্থানে অনবরত "ব" ধ্বনি হইতেছে। উপস্থমূলের অপরদিকে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইহার অধিষ্ঠান।

মণিপূরক চক্র (Epigastric plexus)

মণিপূরক চক্র বা মণিপদ্ম—ইহা দশ দল, পদ্মদলের বর্ণ নীল। কর্ণিকা গাঢ় রক্তবর্ণ। রুদ্র ইহার অধিষ্ঠাতা দেবতা "র" ইহার শব্দাত্মক বীজ. নাভিদেশের অপরদিকে মেরু মধ্যে ইহার অবস্থান। শরীরে তাপক্রিয়া এই যন্ত্র হইতে হয়।

অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ এই চক্রের ধ্যানে দূর হয়। যাঁহাদের পেটের

...যথা অম্ল, গ্রহণী, পেট ফাঁপা কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু প্রভৃতি ব্যাধি আছে ...ই চক্রের ধ্যানে তাঁহারা শীঘ্র সুফল লাভ করিবেন।

নিরামিষ ভোজন এবং মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ অত্যাবশ্যক। ধ্যান ... কিছুদিন ধরিয়া করিতে হইবে, ব্যস্ত হইলে চলিবে না।

"নাভিচক্রে কায়ব্যূহ জ্ঞানং" ৩।২০ যোসূ।

...ভিচক্র ধ্যান করিলে কায়ব্যূহ জ্ঞান হয় অর্থাৎ শরীরের ধাতু সমস্ত ...হয়। বাত পিত্ত কফ ত্বক রক্ত মাংস অস্থিমজ্জা ও শুক্র ...রাই ধাতু।

অনাহত চক্র (Cardiac plexus)

...টি দ্বাদশদল পদ্ম; দলের রং গাঢ় রক্তবর্ণ হৃদপিণ্ডের অপরদিকে ...মধ্যে ইহার কেন্দ্র "হং" ইহার স্বরাত্মক বীজ। হৃদপিণ্ড ইহার ...ক্ষেত্র ধ্যানে হৃদপিণ্ড সবল হয় এবং চিত্ত সংবিৎ হয়।

"হৃদয়ে চিত্ত সংবিৎ" ৩।৩৪ যোগসূ।

ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে হইলে তাঁহাকে হৃদয়স্থ চিন্তা করিতে হয়। এই চিন্তার ফল হ্লাদজ্ঞান বা তাঁহাতে প্রেম ভালবাসা। গীতা বলিতেছেন—

"ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।"

হৃদয় অস্মিতা বা আমিত্বভাবের কেন্দ্র অনুভব এই স্থলে হয়।

মস্তিষ্ক চৈত্তিক ক্রিয়ার স্থান অর্থাৎ জ্ঞানের স্থান সন্দেহ নাই, কিন্তু ...বিজ্ঞানের স্থান। অনুভবযুক্ত যে জ্ঞান তাহারই নাম বিজ্ঞান।

"জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং—" গীতা ৯।১।

বিজ্ঞান সহিতং অনুভবযুক্তং"—শাঙ্কর ভাষ্য।

...গ্রন্থকার ভুক্তভোগী তাঁহার কথা গ্রহণ করিলে কোন দোষ নাই। প্রাতে এবং সন্ধ্যায় ...অর্দ্ধঘণ্টাকাল এক মনে চক্র চিন্তায় অতি শুভ ফল পাওয়া যায়।

ভাষ্যকার ব্যাসও বিজ্ঞান শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ৩।৩৮ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—

"যদি দমস্মিন ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম
তত্র বিজ্ঞানং তস্মিন সংযমাৎ চিত্ত সংবিৎ।

অর্থাৎ এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) যে দহর (গর্ভযুক্ত) পুণ্ডরীকাকার বিজ্ঞানের গৃহ আছে তাহাতে সংযম করিলে চিত্ত সংবিৎ হয়।

একটা দৃষ্টান্তে জ্ঞান ও বিজ্ঞান বুঝা যাক। সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ৭ মিনিট সময় লাগে, সূর্য্য কয়েক কোটি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই যে অকল্পনীয় আলোকের বেগ বা গতি তুমি অঙ্কশাস্ত্র দ্বারা নিশ্চয় করিলে বটে কিন্তু ইহার অনুভব তোমার নাই ইহা জ্ঞান। আর হাওয়া গাড়ীতে চাপিয়া ঘণ্টায় ২৫ ক্রোশ যাইতে তাহার একটা অনুভব হইতেছে ইহা বিজ্ঞান।

জ্ঞান এবং বিজ্ঞান লইয়া দুই প্রকার উপাসনার পন্থা বর্ত্তমান। যাহারা অনাদি অনন্ত নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহাদের বিজ্ঞান নাই কারণ এরূপ সত্বাধারণার বাহিরে। ব্যাসাদি ঋষিগণের হইত কিনা জানিনা তবে সাধারণ মনুষ্যের যে ঐরূপ ঈশ্বরের বিজ্ঞান হয়না তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

ভগবান বলিয়াছেন—"নিগুর্ণ ব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে কেননা নিগুর্ণ ব্রহ্মলাভ করা দেহাভিমানীর পক্ষে নিতান্ত ক্লেশ সাধ্য" এ উপাসনা কেবল জ্ঞানময়।

আর তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া ভক্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামচন্দ্র শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি রূপে উপাসনা করিলে তিনি সহজে লভ্য হয়েন।

গৃহস্থের নির্গুণ উপাসনা ছলনা মাত্র। কর্ম্ম হইতে অবসর পাইবার উপায় বিশেষ। যাহারা জ্ঞানমার্গের পথিক তাঁহাদের বাহ্যকর্ম্ম

দৃশ দেখা যায় না। আর ভক্তের কর্ম্মই প্রধান উপাসনা। মূর্ত্ত ঈশ্বরই মানবের উপাস্য হওয়া উচিৎ। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও তাহাই।

বিশুদ্ধ চক্র (Trachea)

এটি ষোড়শদল পদ্ম দলের বর্ণ ধূসর। কণ্ঠকূপের অপরদিকে মেরু মধ্যে অধিষ্ঠিত "হং" বীজ। শরীরের আকাশাত্মক ক্রিয়া এই চক্র হইতে হয়। শব্দ আকাশের গুণ, আমরা যে শব্দ করি বা কথা বলি ইত্যাদি এই চক্র দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। কণ্ঠকূপ ইহার বাহ্য অবয়ব।

"কণ্ঠকূপে ক্ষুৎ পিপাসা নিবৃত্তিঃ"—৩।৩০ যো সূ। জিহ্বার অধোদেশে তন্তু তাহার নিম্নে কণ্ঠ তাহার অধোভাগে কূপ ইহাতে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা লাগে না।

আজ্ঞাচক্র (medulla oblongata)

এইটি দ্বিদল পদ্ম দলের বর্ণ শ্বেত। সুষুম্নানাড়ী যথায় মস্তিস্কের সহিত মিলিয়াছে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের শেষভাগ ইহার অবস্থান। ওঁ ইহার শব্দাত্মক বীজ ইহাই চিত্ত বা জ্ঞান স্থান। এতদূর্দ্ধে সহস্রদল পদ্ম বা মস্তিষ্ক। শরীর বিজ্ঞান জানিলে এই চক্রগণের যথার্থতা অনুভব হয় এবং ইহাদিগের স্থূল বৈজ্ঞানিক উৎপত্তি অবগত হওয়া যায়।

স্নায়ুচক্রের ধ্যানে তাহাদের দৃঢ়তা উপস্থিত হয়, দৃঢ়তা হইলে শরীর ব্যাধিহীন এবং ক্রমশঃ যোগাভ্যাসের কঠোরতা সহ্য করিবার উপযুক্ত হয়।

সমগ্র শরীরের প্রাণ ক্রিয়াকে রুদ্ধ করিয়া সুষুম্নানাড়ী দ্বারা তাহাকে মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলেই যোগসিদ্ধি হয়। যোগী প্রাণ বায়ুকে যতই আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবেন, ততই তাঁহাতে স্থিরতার আবির্ভাব হইবে অবশেষে যখন সমস্ত প্রাণ বায়ু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে অপসৃত করিয়া জ্ঞানাধিষ্ঠান মস্তকে স্থায়ীভাবে রাখিতে নিপুণ হইবেন,

তখনই সমাধি উপস্থিত হইবে। সমাধি বলিলে কেহ যেন অজ্ঞানতা না মনে করেন বরং সমগ্র বিকীর্ণ জ্ঞানের পুঞ্জীভূত বা পিণ্ডিত অবস্থাই সমাধি, এ অবস্থায় জ্ঞান অব্যাহত হয়। যে কোন বিষয়ই হউক না কেন সমাধিতে তাহার চরম জ্ঞান উপলব্ধি অবশ্যম্ভাবী!

পঞ্চপ্রাণ।

হিন্দু শাস্ত্রে প্রাণ শব্দটির প্রয়োগ অনেক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এক মহাভারতেই ইহার বিভিন্নার্থে প্রয়োগ বহু। কখন বায়ু অর্থে কখন চেষ্টা অর্থে কোথাও ধারণা শক্তির অর্থে কোথাও বা করণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মত অজ্ঞলোকের জ্ঞান হয়। বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত ঐ সকল আপাততঃ বিরোধোক্তির সমন্বয় করা চেষ্টা গভীর মূর্খতার পরিচয়। প্রাণ শব্দটি প্রাণাত্মক বহুক্রিয়ার বাচকরূপে ব্যবহৃত অনুমান হয়। ভাব অনেক ভাষা অল্প সুতরাং ভাষা দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া বাচকত্বে বিভিন্নতা উপস্থিত হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাব ও ভাষার মিত্রতা রাখিবার জন্যই পরিভাষার প্রয়োজন। সকলক্ষেত্রে পরিভাষা না থাকায় ভাব লইয় গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে।

তাহা হইলেও এইরূপ ভিন্নার্থবাচক প্রয়োগে কেহ যেন অজ্ঞানতার ছিদ্র না দেখেন। ঋষিগণ অভ্রান্তদৃষ্টি ছিলেন, অবিরোধী তর্কের দ্বারা তাঁহাদের বাক্যার্থ নিরূপণ করিতে হইবে নচেৎ সমস্তই অন্ধকারবৎ জ্ঞান হইবে।

গীতাতে ও প্রাণ শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—

"প্রাণো বায়ুরাধ্যাত্মিকং" প্রাণ আধ্যাত্মিক বায়ু।

৪।২৭—শাঙ্কর ভাষ্য

"প্রাণঃ প্রাণবৃত্তিং" ৪।২৯ ঐ

"ইত্যেতে বায়বঃ পঞ্চ চেষ্টযন্তীহ দেহিনাং"

এই পঞ্চবিধ বায়ু এইরূপ প্রাণিগণের অঙ্গ চালনাদি চেষ্টা সমাধান করে।

শান্তি—১৮৪।২৫।

"রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যতি।

এই রয়ি (অর্থাৎ আদিভূত) এবং প্রাণ (চৈতন্য) এই মিথুন প্রজা উৎপাদন করিবেন। প্র উ।

"সা মোহমাপদ্য অাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং।

প্রবিভজ্যৈতদ্ বাণনবাষ্টভ্য বিধারয়ামিতি॥

তে শ্রদ্দধানা বভূবুঃ।"

আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া এই দেহকে ব্যাপিয়া রক্ষা করিতেছি। প্র উ।

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং"

যেমন রথ চক্রের নাভিতে অর সমস্ত সংলগ্ন থাকে তেমনি সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। প্র উ।

প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুবৎ সঞ্চারাৎ বায়বোতে প্রসিদ্ধাঃ।

প্রাণেরা বায়ুর ন্যায় সঞ্চরণ করে বলিয়া তাহারা বায়ু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

প্রবচন ভাষ্য—২।৩১।

"তৈরেব চ বিজানাতি প্রাণান আহার সম্ভবান"

অশ্বমেধ—১৭।২৫।

আহার দ্বারা ইন্দ্রিয় স্রোত হয় তদ্বারা প্রাণ সকলকে জ্ঞাত হয়।

"ভুক্তং ভুক্তমিদং কোষ্ঠে কথমন্নং বিপচ্যতে
তথা মাসঞ্চ মেদঞ্চ স্নায়ুবস্থীনি চ পোষতি"
কথং রসত্বং ব্রজতি শোণিতত্বং কথং পুনঃ"
নিরোজসাঃ নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক পৃথক"

অনুগীতা—১৯।৪০।৪১।

ভুক্ত অন্ন কি রূপে রসত্ব শোণিতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কিরূপে মাংস অস্থিমেদ পোষণ করে, শরীরই বা কিরূপে নির্ম্মিত হয়? তাহার উত্তর হইয়াছে প্রাণের দ্বারা।

উপরি উক্ত বাক্যগুলি বিবেচনা করিলে প্রাণ যে শরীর ধারিণী শক্তি এই কথাই প্রমাণ হয়। চৈতন্যবাচক যে প্রয়োগ উপনিষদে পাওয়া গেল উহা বিশেষার্থ।

এই ধৃতিশক্তি পঞ্চ প্রধান ভাগে বিভক্ত প্রাণ অপান উদান সমান-ব্যান। বায়ু বলিয়াই ইহাদের প্রসিদ্ধি বাস্তবিক এখন দেখা গেল ইহারা পঞ্চমূল ধৃতি শক্তি।

শরীরে সর্ব্বস্থানেই সর্ব্বক্ষণ ইহারা বর্ত্তমান আছে। তবে ইহাদের কার্য্য এবং স্থূল অবস্থান-ভেদ শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

ভীষ্ম কথিত এই বায়ু পঞ্চের সাধারণ আলয় এবং কার্য্য এই ভাবে লিখিত আছে,—

"প্রাণাৎ প্রণীয়তে প্রাণী
ব্যানাদচেষ্টতে তথা
গচ্ছত্যপান অধশ্চর
সমানো হৃদিস্থিত
উদানাদুচ্ছসতি চ
প্রতিভেদাচর ভাষতে

ইতোতে বায়ব পঞ্চ
চেষ্টয়ন্তীহ দেহীনাম্
শান্তিপর্ব্ব ১৮৪।২৪।২৫

প্রাণিগণ প্রাণ বায়ু আশ্রয় করিয়া গমনাগমন কার্য্য করে, ব্যান বায়ু অবলম্বন দ্বারা বল সাধ্য কার্য্যে উদ্যত হয়, অপান বায়ু অধোগমন করে সমান বায়ু হৃদয়ে অবস্থিত এবং উদান বায়ু দ্বারা উচ্ছ্বাস ও শব্দ উচ্চারণ হয়।

"প্রাণো মূর্দ্ধনি তথা চাগ্নৌ বর্ত্তমানো বিচেষ্টতে ॥
সজন্তুঃ সর্ব্বভূতাত্মা পুরুষ স সনাতনঃ।
মনোবুদ্ধি অহংকারো ভূতানি বিষয়াশ্চ স
এবং ত্বিহ স সর্ব্বত্র প্রাণেন পরিশ্চাল্যাত
পৃষ্ঠতস্তু সমানেন স্বাং স্বাং গতিমুপাশ্রিতঃ ॥
বস্তিমূলং গুদং চৈব পাচকং সমুতাপাশ্রিতঃ
বহন্মূত্রং পুরীষং চাপ্যপানঃ পরিবর্ত্ততে ॥
প্রযত্নে কর্ম্মণি বলে য একস্ত্রিষু বর্ত্ততে।
উদান ইতি তং প্রাহুরধ্যাত্মবিদুষো জনাঃ ॥
সন্ধিষ্বপি চ সর্ব্বেষু সন্নিবিষ্ট স্তথানিলঃ
শরীরেষু মনুষ্যাণাং ব্যান ইত্যুপদিশ্যতে ॥
ধাতুষ্বগ্নিস্তু বিতত সমানেন সমীরিতঃ।
রসান ধাতুং দোষাংশ্চ বর্ত্তয়ন্নবতিষ্ঠতে ॥
অপান প্রাণয়োর্মধ্যে প্রাণাপান সমাহিতঃ
সমন্বিত স্বধিষ্ঠানং সম্যক পচতি পাবকঃ ॥

অগ্নিমস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক শরীর পালন করতঃ শারীরিক চেষ্টা সকল সমাধান করে, আর প্রাণ বায়ু মস্তকে ও অগ্নিতে (নাভির নিকট)

বর্ত্তমান থাকিয়া শারীরিক গমনাদি কার্য্য সমাধান করিয়া থাকে—সেই প্রাণই সর্ব্বভূতময় সনাতন পুরুষ; মন বুদ্ধি অহংকার জীব সমুদয় ও শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় স্বরূপ। প্রাণ দ্বারা আন্তরিক বিজ্ঞান এবং বাহ্য দেহ ক্রিয়াদি পরিচালিত হয়।

সমান বায়ু দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি নিজ নিজ গতি অবলম্বন করে।

অপান বায়ু জঠরাগ্নিকে অবলম্বন পূর্ব্বক মূত্রাশয় ও পুরীষাশয়স্থিত ভুক্ত ও পীত পদার্থকে পরিপাক করতঃ মূত্র ও পুরীষে পরিণত করে।

গমনাদি কার্য্য তদনুরূপ চেষ্টা এবং ভার বহনাদি সামর্থ্য এই তিন বিষয়ে যে বায়ু বর্ত্তমান রহে অধ্যাত্মবিৎগণ তাহাকে উদান বায়ু বলেন।

মানবগণের শরীরের সন্ধিস্থানে যে বায়ু আছে তাহার নাম ব্যান।

ত্বকাদিতে বিস্তীর্ণ জাঠর অগ্নি সমান বায়ু দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া রস, রক্ত ধাতু ও পিত্ত প্রভৃতিতে পরিণত করিয়া থাকে।

শান্তিপর্ব্ব ২৮৫।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯

উপরি উক্ত ভারত বাক্য শ্রুতি বাক্যের দ্বারা দৃঢ় সমর্থিত। যথা—

"পায়ূপস্থে অপানং, চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে. মধ্যে তু সমানঃ। এষহ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতা সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি। হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং, দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি। অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যাং এব মনুষ্যলোকং।

"মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ে অপানকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন প্রাণ স্বয়ং মুখ ও নাসিকাদ্বারা নির্গত হইয়া চক্ষু ও কর্ণে বাস করেন। মধ্যে সমান স্থিত। ইনিই জঠরাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত (ভুক্ত) অন্ন সমান করেন অর্থাৎ যেখানে যে রূপ আবশ্যক তাহা পৌঁছান। ইহা হইতেই অর্থাৎ জঠরাগ্নি

সপ্ত দীপ্তি হয়—চক্ষু কর্ণ নাসিকা এবং আস্য আপন আপন কার্য্য করে।

হৃদয়েই এই আত্মা আছেন, হৃদয়ে একাত্তর শত নাড়ী আছে তাহাদের প্রত্যেকের একশত করিয়া শাখা নাড়ী আছে—এই সকল নাড়ীতে ব্যান ব্যাপ্ত আছেন। তন্মধ্যে একটি নাড়ী (সুষুম্না) দ্বারা উদান ঊর্দ্ধগত হইয়া পুণ্যলোকে পাপলোকে ও মনুষ্যলোকে লইয়া যায়। প্রঃ উঃ

"মুখ নাসিকাভ্যাং বায়োর্নির্গমনং প্রাণস্য গতিঃ!"

গীতা ৪।২৯ শঙ্কর ভাষ্য।

ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য— গীতা

এই সকল বাক্য হইতে প্রাণ বায়ুর স্থান ও কার্য্য নিরূপণ করা যায়। শ্বাসাদি কার্য্য প্রাণের কর্ম্ম।

উদান জয়াজ্জল—পঙ্ক—কণ্টকাদি সঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ।

যোগ দর্শন ৩।৩৯

প্রাণাদি লক্ষণ সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই জীবন। তাহার ক্রিয়া পঞ্চবিধ—প্রাণ মুখনাসিক গতি (অর্থাৎ তাহারা গমনাগমন করে) হৃদয় পর্য্যন্ত তাহার বৃত্তি (অবস্থান)। সমনয়ন হেতু সমান তাহার নাভি পর্য্যন্ত বৃত্তি। উন্নয়ন হেতু উদান তাহা আশিরোবৃত্তি। ব্যান ব্যাপী (সর্ব্ব-শরীরে) ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান প্রাণ।

উদান জয় হইতে জলপঙ্ক কণ্টকাদিতে অসঙ্গ হয় এবং প্রয়াণকালে উৎক্রান্তি হয়। উদান বশীকৃত হইলে ইচ্ছামত উৎক্রান্তি বা মৃত্যু হয়।

(ব্যাসভাষ্য।)

উদান অপসৃত হইলেই মৃত্যু হয়। শরীরের তাপ বা উষ্মা এই উদান বায়ুদ্বারা নাভিমূল হইতে উদ্ধ চালিত হইয়া মস্তকে নীত হয়। উদান দেহ ধারণের এক প্রধান শক্তি। বোধ বহনের জন্যও উদান বিশেষ

উদ্যুক্ত কারণ বোধ বহা নাড়ীর গতি উৰ্দ্ধদিকে নচেৎ চিত্ত বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না।

ব্যান সর্ব্ব শরীর ব্যাপী বলের কার্য্যে ব্যানের প্রকাশ সুতরাং ব্যান চালিকা শক্তি।

বলা হইয়াছে, পায়ু এবং উপস্থে অপান অবস্থিত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পাকযন্ত্রের সহিত উপস্থঘটিত বাজিকরণাধিকারে প্রায়ই একই ঔষধের ব্যবস্থা দেখা যায়। পায়ু এবং উপস্থের ক্রিয়ায় ঐক্য অস্বীকার করিবার যো নাই। যে শক্তির দ্বারা শরীর মল নির্গত হয় তাহাই অপান।

শরীরস্থ সর্ব্বধাতুকে যথোপযুক্ত উপাদান পৌঁছান সমানের কার্য্য। যেমন শরীরে ক্ষত হইলে তাহা পূরণ সমানের বৃত্তি।

"সমান জয়াজ্জ্বলনং"। ৩।৩০ যো সু

সমানজিত যোগী তেজের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়েন।

সমান বায়ু বশীকৃত হইলে শরীরে জ্যোতির আবির্ভাব হয়। থিয়জফিষ্টগণ এই জ্যোতিকে "অরা" বলেন। দেবদেবীর এবং মহাপুরুষগণের চিত্রে চিত্রকরেরা মহত্বসূচক এই জ্যোতি প্রদর্শন করে।

আহারের পূর্ব্বে পঞ্চবায়ুকে চিন্তা করিলে ভুক্তান্ন সহজে পরিপাক হয় এবং উপযুক্ত রসাদিতে পরিণত হইয়া শরীর ধাতু সমূহ পুষ্ট করে। লুব্ধ হইয়া শ্বাপদগণের ন্যায় আহার করিলেই বায়ুর বিকৃতি হয়।

এখন আমরা প্রাণায়ামে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

প্রাণায়াম পদ্ধতি।

"প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণভ্যাং বা প্রাণস্য।" যোগ ১।৩৪

প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন এবং বিধারণের দ্বারাও চিত্ত স্থিতিলাভ করে।

অভ্যান্তরের বায়ুকে নাসিকাপুট দ্বারা প্রযত্ন বিশেষের সহিত বমন করা প্রচ্ছর্দ্দন। বিধারণ প্রাণ বায়ুকে সংযত করা "তস্মিন সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।" ৩।৪৯—

(আসন জয় হইলে) শ্বাস প্রশ্বাসের--বিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম।—

মানব দেহে নক্তন্দিব অবিরাম শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। কিন্তু এই শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, আপনিই হইতেছে বন্ধ হইলেই সর্ব্বনাশ। অভ্যাসে কিন্তু এই সর্ব্বনাশকারী শ্বাস প্রশ্বাসকে ইচ্ছাধীন করা যাইতে পারে। যে উপায়ে যে অভ্যাসে এই শ্বাস প্রশ্বাস আয়ত্ত হন তাহারই নাম প্রাণায়াম।

মানব স্মৃতির অতীতকাল হইতে ভারতে প্রাণায়াম প্রচারিত আছে এবং সম্যক অনুষ্ঠিত ও হইতেছে। ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই পদ্ধতি আবিস্কৃত কিন্তু এমনিই দুর্ভাগ্য অধুনা প্রাণায়াম শিখিবার নিমিত্ত অনেকে বৈদেশিক এবং বিধর্ম্মী গুরুর আশ্রয় লইতেছেন। তাঁহাদের এ জ্ঞান হয় না যে যে পদার্থ যে দেশে উৎপন্ন হাজার অধঃপতন হইলেও সেই দেশে তাহার চর্চ্চা এবং কৌশল বাস্তবিক ভাবে থাকিবে।

প্রাণায়ামের বহু প্রকার বা অভ্যাস প্রণালী আবিস্কৃত হইয়াছে এক একজন যোগাচার্য্য এক এক ভাবের পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিয়াছেন। অবশ্য শারীরিক সামাজিক এবং গার্হস্থাদি অবস্থাভেদে প্রাণায়ামের প্রকার ভেদ হইয়াছে।

যে প্রকারের প্রাণায়ামই হউক না কেন তাহাদের সাধারণ বৃত্তি তিনটি যথা পূরক রেচক এবং কুম্ভক।

নাসিকা দ্বারা বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করান পূরক। শরীরভ্যন্তরে আকৃষ্ট বায়ুকে ধারণ করার নাম কুম্ভক—কুম্ভকে আকর্ষণ এবং নিঃসরণ থাকিবে না। কুম্ভিত বায়ুর ক্রমশ বহিষ্করণ রেচন।

উপযুক্ত গুরু এবং শ্রদ্ধার অভাবে আমাদের দেশে সাধারণ বিশ্বাস এই দাঁড়াইয়াছে যে প্রাণায়াম অতি বিপদ সঙ্কুল অভ্যাস—শিক্ষা না করাই ভাল।

যাহারা গুরু বলিয়া পরিচিত হয়েন ভাগ্যদোষে তাহারা এতাদৃশ অধঃপতিত যে অভ্যাসের গুণাগুণ বিচার করিবার তাঁহাদের শক্তি নাই। বার্ষিক বিদায় হইলেই শিষ্যের সহিত আর কোন সম্পর্কই থাকে না। শিষ্যেরাও গুরুকে দেখিলে আপাদ মস্তক প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন।

প্রাণায়াম বিপদ জনক নহে একথা আমরা বার বার বলিয়াছি এবং বলিতেছি আচারবান্ ব্যক্তির পক্ষে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া কর্ম্ম (মুক্তির কথা দূরে থাকুক) সাংসারিক উন্নতিরও বলবান সহায়।

আমাদের দেশে কর্ম্ম হীনতার স্রোত খরতর হইয়া বহিবার একটি প্রধান কারণ—শ্রীচৈতন্যের পবিত্র ভক্তি ধর্ম্মের অধিকার ভেদ না থাকায় অধঃপতন। ধর্ম্ম যখনই কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় তখনই আর তাহার ধরিবার শক্তি থাকে না গলিত রজ্জুতে পরিণত হয়; অনায়াসেই বিলাসিতা সে ধর্ম্মকে বিধ্বস্ত করিয়া তৎপদে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হয়। চিরকালই এই ভাব চলিয়া আসিতেছে এবং চলিবে। কর্ম্ম ভুলিয়া যাও ধর্ম্ম উড়িয়া যাইবে জগতে তোমার অস্তিত্বও মুছিয়া যাইবে।

কর্ম এই কথাটির ভিতর জীবতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ব্যবহার তত্ত্ব অর্থনীতি রাজনীতি—আর যে কোন নীতি জগতে আছে সকলই প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে; চক্ষুষ্মান হইলেই দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ দেখিতে পাইতেন তাই ঋষিপ্রণীত আর্য্যধর্ম্মে কর্ম্মের এত প্রাধান্য।

শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কর্ম্মবীর ছিলেন কিন্তু তাঁহার পরে তৎপ্রণীত পবিত্র ধর্ম্মের ভস্মস্তূপ হইতে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম উত্থিত হইয়াছে তাহার মেরুদণ্ড পিণ্ডিত অলসতা মাত্র সুতরাং সাধারণ লোকের দ্বারা অধিকতর আদৃত।

যোগাভ্যাস কর্ম্মের অন্তর্গত। সন্ধ্যা বন্দনা দান পূজা কূপ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা সমস্তই চিত্তশুদ্ধির কারণ সুতরাং যোগাঙ্গের অধীন। তাই আদেশ হইয়াছে—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ!"

প্রথমে আমরা যোগসূত্রোক্ত প্রাণায়াম কি তাহাই বলিতেছিলাম। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম বলা হইয়াছে। পুনরায় রেচক, পূরক এবং কুম্ভককে প্রাণায়াম বলিয়াছি। যোগ দর্শনে রেচক পূরক কুম্ভক শব্দ পাওয়া যায় না এবং ব্যাসভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে যোগসূত্রের প্রাণায়াম এবং পরবর্ত্তী হঠযোগীদিগের রেচক পূরণাত্মক প্রাণায়াম কিছু পৃথক বলিয়া বোধ হয়।

শ্বাস প্রশ্বাসের গতি কি ভাবে রোধ করিলে প্রাণায়াম হয় তাহা সূত্রকার বলিতেছেন।

বাহ্যাভ্যন্তর স্তম্ভবৃত্তি দেশকাল সংখ্যাভিঃ
পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ। ২।৫০

প্রাণায়াম বাহ্যবৃত্তি আভ্যন্তর বৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি। তাহারা দেশকাল এবং সংখ্যা দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়।

যাহাতে প্রশ্বাস পূর্ব্বক গত্যভাব হয় তাহাই বাহ্য বৃত্তিক প্রাণায়াম যাহা শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক হয় তাহা আভ্যন্তর বৃত্তিক আর শ্বাস ব্যতীত যাহাতে গত্যভাব হয় তাহাই স্তম্ভবৃত্তি অতএব আধুনিক পদ্ধতি হইতে এই প্রাণায়াম কিছু পৃথক।

উপরি উক্ত প্রথার রেচক এবং পূরক উভয়ের অন্তেই কুম্ভক রহিয়াছে পুনরায় শ্বাস এবং প্রশ্বাসকে প্রযত্ন না করিয়াই ধারণ করিলেই স্তম্ভবৃত্তি অর্থাৎ সহজ অবস্থায় শ্বাস বন্ধ করিলেই স্তম্ভবৃত্তি হয়। ইহাই প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ ; কক্ষের বায়ু যত্নসহকারে নাসিকা দ্বারা বমন করাকে প্রচ্ছর্দ্দন বলে তৎপরে শ্বাস না লওয়াই বিধারণ; এই প্রাণায়াম দেশ এবং কালের দ্বারা সীমাকৃত যথা নাসিকা হইতে যতদূর বায়ু যাইবে ততদূর বাহ্যদেশ এবং শরীর অভ্যন্তরে যতদূর বায়ু গমন করিবে ততদূর আধ্যাত্মিক দেশ বাহ্যদেশ যত অল্প হইবে তত প্রাণায়াম উৎকৃষ্ট এবং সূক্ষ্ম হইবে। আধ্যাত্মিক দেশ, যত বিস্তৃত হইবে তত ফলপ্রদ। ইহার অর্থ এই যত কুম্ভক কালব্যাপী হইবে এবং রেচক ধীর হইবে ততই প্রাণায়াম উপকারী হইবে।

অতঃপর যতক্ষণ প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ করা উচিৎ তাহারও ব্যবস্থা আছে। সকল সময়েই শ্বাস প্রশ্বাসকে নিগ্রহ করা অনুচিত তাহাতে অনর্থের উৎপত্তি হয়।

উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম ব্যতীত যোগ দর্শনে এক চতুর্থ প্রাণায়ামের সূত্র রহিয়াছে। "বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।" ৩।৫১।

ইহা এক প্রকার স্তম্ভবৃত্তি। বাহ্য এবং আভ্যন্তর বৃত্তি অভ্যস্ত হইলেও শ্বাস প্রশ্বাস অতি সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইলে এই চতুর্থ প্রাণায়াম অভ্যস্ত।

হঠযোগীদের অনুসৃত পদ্ধতি নিম্নে বিবৃত হইতেছে। ইহাই প্রায় আধুনিক পদ্ধতি।

তবে সংসারী এবং ব্রহ্মচারীর পক্ষে কিছু প্রভেদ করিয়া গুরুরা উপদেশ দিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীর কঠোরতা গৃহী সহ্য করিতে পারেন না।

অভ্যাসের পূর্বে যোগশাস্ত্র বলিতেছেন,—"গুরূপদিষ্ট মার্গেন প্রাণায়ামেন অভ্যসেৎ" গুরুপদিষ্ট পথ ভিন্ন অভ্যাস করিতে নাই। অনেকে হয়ত বলিবেন প্রাণায়াম করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু গুরু কোথায় পাওয়া যায়। যখন গুরুর জন্ত চিত্ত ব্যাকুল হইবে তখন আপনিই গুরুর সন্ধান পাওয়া যাইবে কথাটা গোড়ামীর মত বটে কিন্তু ঘটনা এইরূপেই হয় তবে ব্যাকুলতা চাই। আরামে আরাম কেদারায় আকাশ পানে পা করিয়া সুরধ্যান করিতে করিতে গুরুর অন্বেষণ করিলে কি আর গুরু পাওয়া যায়। আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিতে শিখিতে হয় অতল অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া আছি, উপলব্ধি করিতে হয় তবে গুরুর দর্শন হয়।

গুরু ভিন্ন উপায় নাই; যাহারা জগদ্গুরু তাঁহাদেরও গুরুর আবশ্যক হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ গর্গের নিকট শ্রীবুদ্ধ গৃহত্যাগ করিয়া আবাঢ়ের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন, শ্রীচৈতন্য কেশব ভারতীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলেন। উপদেশ প্রাপ্তির কামনা বলবতী হইলেই গুরুর সাক্ষাৎ নিশ্চয়। অতঃপর—

"বদ্ধ পদ্মাসনো যোগী প্রাণং চন্দ্রেন পূরয়েৎ
ধারয়িত্বা যথাশক্তি ভূয়ঃ সূর্যেন রেচয়েৎ॥"

হঠ যোগ।

যোগী পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা প্রাণবায়ু শরীরে পূরণ করিবেন এবং যথাশক্তি তাহাকে ধারণ করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা রেচন করিবেন।

পদ্মাসনের কথা বলা হইয়াছে তবে সিদ্ধাসনাদিতেও হয় যে আসনে মেরুদণ্ড ঋজু থাকে সেই আসনেই হয়।

পূরণ অতি ধীরে করিতে হইবে যুগপৎ গ্রহণ বা ত্যাগ ফলপ্রদ নহে। কুম্ভক বা ধারণ অল্প অল্প করিয়া অভ্যস্থ অভ্যাস করিতে করিতে ক্ষণ ক্রমশঃ দীর্ঘ হইবে।

অত্যধিক আশাই যোগানুষ্ঠানের প্রধান অন্তরায়। অনেকের প্রথমে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায় কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তাঁহার অভীপ্সিত অবস্থা উপস্থিত না হয়—তখন বীতশ্রদ্ধ হইয়া অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। এইটি সম্পূর্ণ ভ্রম। সিদ্ধি কাহার কতদিনে হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। জন্মান্তরের কর্ম্ম থাকিলে এ কর্ম্মে শীঘ্র সুফল হয়। অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে নাই।

"প্রাণং সূর্য্যেন আকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ
বিধিবৎ কুম্ভকং কৃত্বা পুনশ্চন্দ্রেন রেচয়েৎ॥"

পূর্ব্ব কথিত প্রকারে প্রাণায়াম করিয়া পুনরায় সূর্য্যনাড়ী বা দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ক্রমে ক্রমে পূরণ করিয়া উদর পূর্ণ করিবে, পরে যথাবিধি কুম্ভক করিয়া চন্দ্র বা বামনাড়ী দ্বারা রেচন করিবে।

"যেন ত্যজে ত্তেন পীত্বা ধারয়েদতি রোধতঃ
রেচয়েচ্চ ততো অন্যেন শনৈরেব ন বেগতঃ॥"

যখন যে নাসিকা দ্বারা রেচন করিবে সেই নাসিকা দ্বারা পূরক করিয়া কুম্ভক করিবে। একবারে সমস্ত বায়ু পরিত্যাগ উচিৎ নয় তাহাতে বল হানি হয়—মন্দ মন্দ করা উচিৎ। যতক্ষণ শরীরে কম্প বা ঘর্ম্ম উপস্থিত না হয় ততক্ষণ কুম্ভক করিবে।

"সূর্য্যচন্দ্রমসোরনেন বিধিনা ভ্যাসং সদা তন্বতাং
শুদ্ধ নাড়ীগণা ভবন্তি যমিনাং মাসত্রয়া দূর্দ্ধতঃ।"

এইরূপে বাম দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে সংযমী ব্রহ্মচারী গণের তিনমাস অভ্যাসের পর নাড়ী শুদ্ধ হয়।

"প্রাতর্মধ্যন্দিনে সায়মর্দ্ধরাত্রে চ কুম্ভকান
শনৈরশীতি পর্য্যন্তং চতুর্ব্বারং সমভ্যসেৎ।"

প্রাণায়ামের সময় ও সংখ্যা নির্ণয় করিতেছেন। প্রাতঃকালে অর্থাৎ অরুণোদয় হইতে তিন ঘণ্টা মধ্যাহ্নে অর্থাৎ পঞ্চভাগে বিভক্ত দিনমানের মধ্যভাগের তিন ঘণ্টা এবং অর্দ্ধরাত্রকালে তিন ঘণ্টা প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক বারে অশীতিবার করিয়া প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য —মতান্তরে চারিবার প্রাণায়ামের ব্যবস্থা বলিতেছেন অর্থাৎ হয় তিন না হয় চারিবার প্রাণায়াম করিবে। তাহাতে ক্রমশঃ চল্লিশ বা ৩২০ বার প্রাণায়াম দিবারাত্রিতে হইবে।

"কনীয়সি ভবেৎ স্বেদঃ কম্পো ভবতি মধ্যমঃ
উত্তমে স্থানমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ॥

প্রাণায়ামের প্রকার বলিতেছেন—কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম প্রাণায়াম তিন প্রকার। প্রাণায়াম অবস্থায় ঘর্ম্ম হইলে তাহাকে কনিষ্ঠ কম্প হইলে মধ্যম এবং ব্রহ্মরন্ধ্র প্রাপ্ত হইলে তাহাকে উত্তম প্রাণায়াম বলে।

লিঙ্গপুরাণে তিন প্রকার প্রাণায়ামের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। যথা দ্বাদশ মাত্রাত্মক প্রাণায়াম কনিষ্ঠ তাহার দ্বিগুণ বা চব্বিশ মাত্রাত্মক মধ্যম এবং বত্রিশ মাত্রাত্মক মুখ্য বা প্রধান। দ্বাদশ মাত্রায় একবার উদ্ঘাত হয়। প্রাণবায়ু উৎসার্য্যমান হইয়া অপান বায়ুকে পীড়ন করে এবং উর্দ্ধে গমন করিয়া নিবৃত্ত হয় তাহাই উদ্ঘাত। কুম্ভক করিলে বায়ু উচ্চগামী হইয়া মস্তকে আঘাত করে ইহাই উদ্ঘাত।

মাত্রা কাহাকে বলে? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির মোচন নয় বারজানু পরিমার্জন এবং তাল ত্রয়কে মাত্রা বলে।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই মাত্রা বোধ সুগম নহে মাত্রা বিষয়ে মতভেদ আছে যোগ চিন্তামণিতে আছে নিদ্রিত পুরুষের শ্বাস প্রশ্বাসে যে সময় লাগে তাহাই প্রাণায়ামের একমাত্রা।

প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে প্রত্যাহারাদি স্বতই সিদ্ধ হইয়া থাকে যখন প্রাণ পাঁচদণ্ড ব্রহ্মরন্ধ্রে থাকিতে পারে তখন ধারণা হয় এবং ৬০ দণ্ড থাকিতে পারে তখন ধ্যান হয় এবং যখন দ্বাদশ দিন অবস্থান করিতে পারে তখন সমাধি হয়। ফল কথা প্রাণায়ামই ক্রমশ অভ্যাস হইয়া প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধিতে পরিণত হয়।—হঠ দীপিকা

যোগ দর্শনও বলিতেছেন প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে—"ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণং।" ৩।৫২

"মহামোহময় ইন্দ্রজাল প্রকাশশীল সত্ত্বকে আবরণ করিয়া তাহাকে অকর্ম্মে নিযুক্ত করে।"

সেই সংস্কার নিবন্ধন কর্ম্ম প্রাণায়াম অভ্যাসে দুর্ব্বল হয় এবং প্রতিক্ষণ ক্ষয় হয়।

শ্রুতি বলেন—প্রাণায়াম অপেক্ষা বড় তপ আর নাই—তাহা হইতে মন বিশুদ্ধ এবং জ্ঞানের দীপ্তি হয়।"— ব্যাঃ ভা--

প্রাণায়াম অভ্যাস কালে কিরূপ আহার প্রশস্ত তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—

অভ্যাসকালে প্রথমে শস্তং ক্ষীরাজ্য ভোজনং
ততোভ্যাসে দৃঢ়ীভূতেনতাদৃক্ নিয়মঃ॥"

প্রথম অভ্যাসের সময় দুগ্ধ এবং ঘৃতমিশ্রিত ভক্ষ্য (চরু ইত্যাদি) প্রশস্ত। কুম্ভক সিদ্ধ হইলে নিয়মের শিথিলতা হইতে পারে।

প্রাণায়াম ফল বলিতেছেন।

"প্রাণায়ামাদি যুক্তেন সর্ব্বরোগ ক্ষয়োভবেৎ।
অযুক্তাভ্যাস যোগেন সর্ব্বরোগ সমুদ্ভবঃ ॥"

আহারাদির নিয়ম পূর্ব্বক জালন্ধরবন্ধ হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয় কিন্তু অবিধি পূর্ব্বক অভ্যাস করিলে সকল প্রকার রোগ উৎপত্তি হইতে পারে।

শ্রীভগবান গীতাতেও এই কথা বলিয়াছেন কি করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয়—তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—

যোগীযুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসিস্থিত।
একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশী রপরিগ্রহঃ ॥"

ধ্যানার্থী (গিরিগুহাদি) একাকী নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া শরীর এবং মনকে সংযত করিয়া বিতৃষ্ণ (নিরাশ) এবং পরিগ্রহ বিরত হইয়া সমাধিস্থ হইবেন।

কিরূপ স্থানে এবং আসনে কি ভাবে বসিবেন তাহা বলিতেছেন—

শুচৌ প্রদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসন মাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিন কুশোত্তরং ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়ঃ
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাৎ যোগমাত্ম বিশুদ্ধয়ে ॥

পবিত্র স্থানে নিশ্চল আসন রাখিবে। আসন অতিউচ্চ বা অতি নত হইবে না। প্রথম কুশ তদুপর মৃগচর্ম্ম তদুপর বস্ত্র বিস্তৃত করিবে। সেই আসনে উপবেশন করিয়া চিত্ত এবং ইন্দ্রিয় ক্রিয়াকে সংযত করিয়া অন্তঃকরণের বিশুদ্ধার্থ যোগ সেবা করিবে।—

দেহ কি অবস্থার থাকিবে ?—তাহা প্রকাশ করিতেছেন—

সমং কায় শিরোগ্রীবং ধারযন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন॥
প্রশান্তাত্মা বিগত ভীর্ব্রহ্মচারি ব্রতেস্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীতমৎপরঃ॥

যোগাভ্যাসী ব্যক্তি কায় শির ও গ্রীবা সমান ও অচল ভাবে রাখিয়া নাসাগ্র দর্শন করিবেন—কোন দিকে তাকাইবেন না।

অতঃপর প্রশান্তাত্মা ভয়বর্জ্জিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত শীল সংযত মন মদগতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া সমাধিস্থ হইবেন।—

তৎপরে কোন পুরুষের যোগাভ্যাস হয় না তাহা বলিতেছেন—যথা—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্ন শীলস্য জাগ্রতোর্নৈব চার্জুন—"

যিনি অতি ভোজন করেন বা একবারে ভোজন করেন না, এবং যে ব্যাক্তি অত্যন্ত নিদ্রালু বা অত্যন্ত অনিদ্রাভ্যাসা তাহাদের যোগ সমাধি হয় না।—তবে কাহার হয় ?

"যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

যিনি নিয়মিত আহার ও নিয়মিত বিহার করেন এবং নিয়মিত অভ্যাস করেন—উপযুক্ত ভাবে নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন তাঁহার যোগ দুঃখ বারক হয়।

এই সকল প্রমাণের পর বোধ হয় আর কেহ বলিবেন না যে যোগাভ্যাস অতি কষ্টকর অভ্যাস। আরও কত প্রকারের ব্যবস্থা আছে দেখুন—

যোগীদিগের পথ্য ব্যবস্থা।

"গোধূম শালি যব ষষ্টীক শোভনান্নং
ক্ষীরাজ্য খণ্ড নবনীত সিতা মধূন॥
শুন্ঠী পটোল ফলাদিক পঞ্চশাকং
মুদ্গাদি দিব্যমুদকং চ যমীন্দ্রপথ্যং॥

গোধূম—(তাহা হইতে উৎপন্ন—রুটি, লুচি, পুরী, পরাটা, মোহনভোগ অবশ্য পাউরুটি বিস্কুট লোফ নহে।)

শালি ধান্যের অন্ন—ঘৃত এবং দুগ্ধ সংক্ষেপে পরমান্ন ও ভাত (মুড়ি বা চাউলভাজা নহে)

যব—তদুৎপন্ন শক্তু অতি উপাদেয় গ্রীষ্মকালে অবশ্য ব্যবহার্য্য অতি স্নিগ্ধ পদার্থ।

ষষ্টি ধান্য—ইহাকে যাটিধান বলে।

এক প্রকার আশু ধান্য বঙ্গদেশে বিরল ইহার ভাত অতি মধুর তবে মোটা বাঙ্গালী বাবুর উপযুক্ত নহে।

শ্যামাক নীবরাদি—ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাউল বিশেষ—অতি উৎকৃষ্ট পরমান্ন প্রস্তুত হয়।

দুগ্ধ ঘৃত শর্করা নবনীত, খণ্ড শর্করা (খাঁড়) মধু শুন্ঠী পটোল পঞ্চশাক যথা—

"জীবন্তী বাস্তমূলাক্ষী মেঘনাদ পুনর্ণবা।"

জেঁইতীশাক, বেতোশাক, হিঞ্চাশাক, নটেশাক (রাঙা), পুনর্ণবা (গাধা পূর্ণিমে।)

মুদ্গাদি ডাইল এবং পবিত্র জল।

এ খাদ্যবর্গ অতি মনোহর নয় কি?

যোগীদিগের অপথ্য।

"কটুম্ল তীক্ষ্ণ লবনোষ্ণ হরীত শাক
সৌবীর তৈল তিল সর্ষপা মদ্যমৎস্যান
আজাদি মাংস দধিতক্র কুলথ কোল
পিণ্যাক হিঙ্গুল শুনাদ্য মপথ্যমাহুঃ।

করেলা আদি কটুদ্রব্য অম্ল, লবণ, উষ্ণপদার্থ যথা গুড়াদি পত্রশাক অর্থাৎ কেবল পাতাযুক্ত যে শাক কাঞ্জি তৈল, সরিষা মদ্যমাংস ছাগাদির মাংস দধি ঘোল অর্থাৎ মথিত দুগ্ধের দধি হইতে উৎপন্ন তক্র, কুলথাদি (কুরতী ও কড়াই ইত্যাদি দ্বিদল) কুল, খৈল হিং লশুনাদি (লশুন পেঁয়াজ গাজর) সাধন কালে পরিত্যজ্য।

বাঙ্গালী নিশ্চয়ই বলিবেন কাজ নাই আমাদের যোগাভ্যাসে মাংস গেল,—পেঁয়াজ গেল,—রশুনও গেল—এ ত এক প্রকার উপবাসই হইল।

আরও কিছু পরিত্যজ্য আছে যথা—

বর্জয়েদ্দুর্জন প্রান্তং বহ্নি স্ত্রীপথি-সেবনং
প্রাতঃ স্নানোপবাসাদি কায়ক্লেশবিধিং তথা—

দুর্জন সন্নিধানে বাস দুর্জনের সহিত প্রণয় বহ্নিসেবা স্ত্রীসংসর্গ—পথ পর্য্যটন প্রাতঃস্নান উপবাস ফলাহার দণ্ডবৎ নমস্কার ও অত্যন্ত গুরুভার দ্রব্য বহন প্রভৃতি কষ্টকর কর্ম্ম সাধনকালে অবশ্য পরিত্যজ্য।

সৎগুরুর নিকট যোগের উপদেশ লইয়া প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিতে হয়,—ভয় পাইবার কোন কারণ নাই যে ব্যক্তি যেরূপ শক্তিসম্পন্ন গুরু তাহাকে সেই ভাবের উপদেশ করেন;—যিনি ভূমিতে উপবেশন করিতে পারেন না বা মদ্য মাংস ভিন্ন আহার করিতে পারেন না তাহার উপদেশও সেই ভাবে হইবে—তিনি কি আর কুম্ভকের উপদেশ পাইবেন? তাহা নহে।

প্রত্যাহার।

প্রাণায়াম হইতে—

"ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ"——যো সূ ২।৫৩।

অনবরত অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তের কোন একবিষয়ে আবদ্ধ থাকিবার ক্ষমতা জন্মে। যিনি কোন একবিষয়ে চিত্তকে যতক্ষণ আবদ্ধ রাখিতে পারেন—যোগমার্গ তাঁহার কাছে তত সুগম। কোন এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে লিপ্ত রাখিতে হইলে, বিষয়ান্তরের নিমন্ত্রণ বা আহ্বান মনকে অবশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। বাহ্য বিষয় সমূহ হইতে মনকে টানিয়া আনিয়া নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে যুক্তকরাকে প্রত্যাহার বলে।

ভাষ্যকার ব্যাস একটি সুন্দর উদাহরণ দ্বারা এই প্রত্যাহার বুঝাইয়াছেন।

"যথা মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতন্তং অনুৎপতন্তি।"

মধুমক্ষিকারা যখন এক চক্র পরিত্যাগ করিয়া আর এক নূতন চক্রের জন্য উড়িয়া যায় তখন তাহাদের মধ্যে দুটি বা চারিটি বড় মক্ষিকা থাকে তাহাদের কর্ম্ম কেবল সন্তানোৎপাদন এবং মধু ভক্ষণ কিন্তু অন্যান্য মক্ষিকারা তাহাদিগকে সম্রাট বলিয়া মানে যে স্থানে তাহারা বসে উহারাও তথায় বসে। সেইরূপ যখন ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া মনের ভৃত্য হয় তখন প্রত্যাহার উপস্থিত হয়।

যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার এই পঞ্চাঙ্গ সাধনকে যোগ শাস্ত্রে বহিরঙ্গ সাধন বলে আর ধারণা ধ্যান এবং সমাধি ইহারা আধ্যাত্মিক বা অন্তরঙ্গ সাধন। বহিরঙ্গ বলিয়া যে তাহাদের আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ নাই তাহা নহে স্থূল শরীরের নিগ্রহাদি বিষয়ের প্রাধান্য

থাকায় বহিরঙ্গ বলা হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক এই পঞ্চাঙ্গেও যথেষ্ট মানসিক সাধনা আছে।

ধারণা কি? "দেশ বন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।" ৩।১

ধারণা শব্দটি আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি, কোন এক বিষয়ের জ্ঞানের নামই ধারণা এই ভাবে প্রায় ইহার ব্যবহার হয় কিন্তু যৌগিক ধারণা কিছু পৃথক।

নাভিচক্রে হৃদয় পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধ জ্যোতিতে নাসিকাগ্রে ইত্যাদি দেশেতে, অথবা বাহ্য বিষয়ে চিত্তের যে বৃত্তি মাত্রের ধারণবন্ধ তাহা ধারণা।

যখন চিত্তকে কোন এক আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক বিষয়ে নিবদ্ধ করা যায় এবং সেই চিত্তবন্ধে যখন সেই বিষয় ব্যতীত বিষয়ান্তরের জ্ঞান হয় না তখন তাহাকে তদ্বিষয়ক ধারণা বলে।

প্রত্যাহার সম্যক সাধিত না হইলে ধারণা উপস্থিত হয় না কারণ চিত্ত বিক্ষেপ থাকিলে সম্যক ধারণার অভাব হয়।

ভাবনা বা চিন্তা ধারণা নহে এক বিষয়ে ভাবনা অত্যন্ত গাঢ় হইলে ধারণা হয়।

ধারণার যখন একতান তা সিদ্ধ হয় তখন তাহাকে ধ্যান বলে

"তত্র প্রত্যৈক তানতা ধ্যানং" ৩।২

ধ্যেয় বিষয়ের জ্ঞানের যে একতানতা অর্থাৎ অন্য জ্ঞানের দ্বারা অপরামৃষ্ট যে একরূপ প্রবাহ তাহাই ধ্যান। ধারণাতে এক বিষয়ক বৃত্তি খণ্ড খণ্ড ভাবে উত্থিত হয় ধ্যানে বৃত্তি সমূহ ভাবের ন্যায় নিরন্তর প্রকাশ পায়।

ধ্যানের চরম উৎকর্ষ হইলেই সমাধি হয়। সমাধি চিত্তের স্থিরতম অবস্থা; সকল বৃত্তিতেই একটা অহং জ্ঞান কিছু পরিমাণে থাকে

ধ্যান যখন এতগাঢ় হয় যে ধ্যেয় বিষয়মাত্র চিত্তে ভাসমান হয় এবং আমি ধ্যান করিতেছি, এ রূপজ্ঞান থাকে না তখনই সমাধি হয়।

আত্মহারা হওয়া এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ আমিত্বের আর কিছুই বাকি থাকিবে না—গোটা আমি ডুবিয়া যাইবে—তখন সমাধি হবে।

সাধক রাম প্রসাদ তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ গানে এই সমাধি লক্ষণ অতি সহজে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এমন দিন কি হবে তারা :
যবে তারা তারা তারা বলে
তারা বয়ে পড়বে ধারা ॥
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে
মনের আঁধার যাবে ছুটে—
আমি ধরাতলে পড়িব লুটে
তারা বলে হয়ে সারা ॥

এই গানটিতে, ধারণা ধ্যান এবং সমাধি তিনটি অবস্থাই চমৎকার বিবৃত।

প্রথম তিনছত্রে ধারণা ব্যক্ত তৎপরে দুইছত্রে ধ্যান বিবৃত, আঁধার শব্দের অর্থ ধ্যেয় বিষয় হইতে অন্যবৃত্তি। শেষ দুইছত্রে সমাধির অবস্থা লক্ষিত। "সারা"—না হইলে অর্থাৎ অস্মিতা বা আমিত্ব হানতা না হইলে সমাধি হয় না। ভক্ত সাধক বিনা এ গান রচনা অসম্ভব।

যোগশাস্ত্রে ধারণা ধ্যান এবং সমাধি এই তিন অবস্থার পারিভাষিক নাম সংযম।

সমাধি অবস্থায় উপস্থিত হইলেও আমরা দেখিতেছি চিত্তের

নিরোধ হয় না চিত্তস্থির হইয়া এক-বৃত্তিক হয়, কিন্তু তা হইলেও বৃত্তি থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যোগ চিত্তবৃত্তির সম্যক নিরোধ। সুতরাং সমাধি হইলেই চিত্তের নিরোধ হয় না।

ইহার পরেও এক অবস্থা আছে যাহার নাম নির্বীজ সমাধি পূর্ব্বোক্ত সমাধি সবীজ কারণ তাহার বৃত্তিরূপ অবলম্বন রহিয়াছে। যখন চিত্তের এই শেষ অবলম্বনও তিরোহিত হয় তখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা চিত্ত নিরোধ হয়।

ধারণা ধ্যান ও সমাধি অন্তরঙ্গ হইলেও নির্বীজসমাধির পক্ষে বহিরঙ্গ মাত্র—নির্বীজ সমাধিতে উপনীত হইতে পারিলেই চিত্ত নিরোধ হয়।

একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে চিত্ত একবার নিরোধ প্রাপ্ত হইলেই কি অনন্তকাল নিরুদ্ধ থাকে কি তাহার ব্যুত্থান সম্ভব।

এ কথার উত্তর আমরা পূর্ব্বে অবতারবাদ সম্বন্ধে একবার বিচার করিয়াছি।

নিরুদ্ধ চিত্ত যোগী জীবানুগ্রহের নিমিত্ত ব্যুত্থিত চিত্ত হইতে পারেন তবে যদি কোন যোগী এরূপ ইচ্ছা করেন যে আমি আর কোন কালেই ব্যুত্থিত হইব না তাহা হইলে তাঁহার আর পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে আগমনের সম্ভাবনা নাই। যোগীরা যতদিন ইচ্ছা নিরুদ্ধ থাকিতে পারেন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আমরা যোগ বিষয়ক প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে পারিতাম কিন্তু শ্রীভীষ্মদেবে আমরা কতকগুলি অমানুষিক সিদ্ধি দেখিতে পাই; যথা তাঁহার ত্রিকাল জ্ঞান অতিবৃদ্ধ বয়সেও যুবার ন্যায় কার্য্য তৎপরতা—শরীরে সম্যক ব্যথা হীনতা; ৫৮ রাত্রি শর শয্যায় শয়ন করিয়া ক্ষুৎপিপাসা হীন হইয়া অতি বিস্তৃত শান্তি পর্ব্বের

উপদেশ দেওয়া আমাদের চক্ষে—আরব দেশের একাধিক সহস্র রজনী হইতেও বিচিত্র, সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ত দূরের কথা কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি জগতে অসম্ভব কিছুই নাই এবং যোগসিদ্ধ ব্যক্তির নিকট অসম্ভবও সম্ভব। যোগ সাধনায় কিকি সিদ্ধি হইতে পারে তাহার দু চারিটির বলা আবশ্যক মনে করি।

"পরিনামত্রয় সংযমাদা তীতানাগত জ্ঞানং"

যোসূ ৩।১৬

"পরিনামত্রয়ে সংযম করিলে ভূত এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান হয়।" ধর্ম্ম লক্ষণ ও অবস্থা এই তিনটিকে পরিণাম বলে—এই তিন অবস্থাতে চিত্ত সংযম করিলেই বিষয় কি ছিল এবং কি হইবে তাহার জ্ঞান হয়। ভবিষ্যৎ জ্ঞান কখন কখন আপনিই হয়। আমাদের মত সাধারণ লোকেরও হয় বোধ হয় অনেকেরই এইরূপ ভবিষ্যৎ জ্ঞান কখন না কখন জীবনে উপস্থিত হইয়াছে। স্বপ্নাদিতে প্রায়ই দেখা যায় বিশেষতঃ স্ত্রীলোক গণের এ জ্ঞান অনেক সময়ে লক্ষকরা যায় এরূপ ভবিষ্যৎ জ্ঞান কেন হয়?

যাঁহারা Hypnotism প্রভৃতি কার্য্য দেখিয়াছেন তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান বাস্তব পদার্থ এবং মনের এমন শক্তি আছে যদ্দ্বারা অতীত অনাগতের জ্ঞান আয়ত্ত হওয়া অবৈজ্ঞানিক নহে।

পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থা সাক্ষাৎ করিতে পারিলেই তাহার পরিণাম জ্ঞাত হওয়া যায় সমস্ত পদার্থই কতকগুলি সূক্ষ্মাবস্থার সমষ্টি মাত্র। পদার্থ সমূহ জ্ঞাতভাবে বা অজ্ঞাতভাবে অনবরত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। ক্রিয়া দ্বারা এই অবস্থান্তর হয় সুতরাং ক্রিয়াই বাস্তবিক বস্তুর ধর্ম্ম। এক প্রকার ক্রিয়ার পর অন্য রকম ক্রিয়া হইতেছে, প্রতিক্ষণে পদার্থ

অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। এখন যদি মনের দ্বারা এই সূক্ষ্মক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় তাহা হইলে কোন পদার্থের পরিণাম বা পরিবর্তন কারিনী ক্রিয়া সমষ্টি জানা অসম্ভব নহে। ভবিষ্যৎ অনবরত বর্ত্তমানে পরিণত হইতেছে। সমাধি নির্ম্মল চিত্ত সূক্ষ্মাবস্থা সাক্ষাৎ করিবার শক্তি ধারণ করে কাজেই অতীত এবং ভবিষ্যৎ তাহার নিকট কোন ব্যবধান উপস্থিত করে না। প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞেয় অতীত এবং অভেদ্য ভবিষ্যৎ বলিয়া কোন অবস্থা নাই সমস্তই বর্ত্তমান, পরিণতির ক্রমভেদে ভূত ভবিষ্যৎ ব্যবহার হয়। এক পরিণাম হইতে অন্য পরিণাম হইলেই পূর্ব্ব পরিণাম অতীত হয় এবং অনুদিত পরিণাম ভবিষ্যৎ হয়।

অব্যাহত জ্ঞান হইলেই ভূত ভবিষ্যৎ থাকে না। এক অনন্ত বর্ত্তমান চিত্তের নিকট উপস্থিত হয়।

"সংস্কার সাক্ষাৎ করনাৎ পূর্ব্ব জাতি জ্ঞানং।" ৩।১৮

সংস্কার সাক্ষাৎ করিলে পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান হয় সংস্কার কাহাকে বলে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পূর্ব্ব জন্মেই সংস্কার সঞ্চিত হয় সুতরাং সেই সংস্কার কোথায় কেন, কি ভাবে কবে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার জ্ঞান হয়।

"প্রত্যয়স্য পরচিত্ত জ্ঞানং।" ৩।১৯

প্রত্যয়ে অর্থাৎ চিত্ত বৃত্তিতে সংযম করিলে পরচিত্তের জ্ঞান হয়। অনেক পরচিত্তজ্ঞ দেখা যায়। তবে তাহারা যোগ অভ্যাসে এ সিদ্ধি হস্তগত করে নাই জন্ম হইতেই এ ক্ষমতা পাইয়াছে।

"সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎ
সংযমাৎ অপারান্ত জ্ঞানং অরিষ্টেভ্যোবা।"

কর্ম্ম সোপক্রম বা নিরুপক্রম, তাহাতে সংযম করিলে অথবা অরিষ্ট সকল হইতে মৃত্যুর জ্ঞান হয়।

শিশু পালের আসন্ন মৃত্যু ভীষ্মদেব অরিষ্ট লক্ষণ হইতে জানিয়াছিলেন।

"বলেষু হস্তি বলাদীনি" ৩।২৪

হস্তি-বলে সংযম করিলে হস্তীসদৃশ বল হয়। জাতিকে বলবান করিতে হইলে শৈশব হইতে বলবানের চিত্র ও কাহিনী দেখাইতে ও শুনাইতে হয়। আমার বল বাড়িতেছে এইরূপ চিন্তা শিখাইতে হয়। বলসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করাইতে হয়। মরণ ত্রাস (জুজুর ভয়) হ্রাস করাইতে হয়। কেবল কাব্য এবং কাব্য বাড়াইলে কি হবে।

"ভুবন জ্ঞানং সূর্য্যেসং যমাৎ" ৩।২৬

সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবন জ্ঞান হয়। সূর্য্য এখানে দিবাকর সূর্য্য অর্থে ব্যবহৃত নহে সূর্য্য অর্থে সূর্য্যদ্বার সুষুম্নায় অবস্থিত। ব্রহ্মলোকে যাইতে হইলে এই সূর্য্যদ্বার দিয়া যাইতে হয় সূর্য্যের সহিত এই আভ্যন্তরীন সূর্য্যদ্বারের সম্বন্ধ থাকায় ইহাকে সূর্য্যদ্বার বলে। ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্থানে অনেকানেক লোক আছে যথা ভূর্লোক, স্বর্লোক, মাহেন্দ্রলোক জনর্লোক পুনরায় জ্যোতিহীন তমিস্রলোক সকল ও আছে কর্ম্মানুসারে এই সকল লোক ভোগ করিতে হয়। লোক বলিলে যে একটি পৃথক অণ্ডাকৃতি গ্রহ তারা বিশেষ তাহা নহে—সূক্ষ্মলোক সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নহে। লোক সকলের অবস্থান একই স্থান কেবল সূক্ষ্মতার ভেদ মাত্র। এই স্থূল পৃথিবী ভেদ করিয়া সমস্ত লোকই আছে কিন্তু সূক্ষ্মতর উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া পার্থিব পদার্থের দ্বারা অব্যাহত।

"চন্দ্রে তারা ব্যূহজ্ঞানং।" ৩।২৭

চন্দ্র দ্বারে সংযম করিলে তারাগণের ব্যূহ জ্ঞান হয়। চন্দ্রদ্বার কোথায় সুষুম্নাব্যতীত অপর দ্বারই বোধহয় চন্দ্রদ্বার—চন্দ্রদ্বার দিয়া উৎক্রমণ হইলে পুনরাবৃত্তি হয়।

"নাভিচক্রে কায়ব্যূহ জ্ঞানং" ৩।২৯

নাভি চক্রে সংযম করিলে শরীরের সমগ্র উপাদান জানা যায়। বায়ু পিত্ত কফ ত্রিদোষ এবং সপ্তধাতু ত্বক রক্ত মাংস স্নায়ু অস্থি মজ্জা ও শুক্র।

"কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিঃ"। ৩।৩০

জিহ্বার নিম্নে তন্তু তাহার অধোদেশে কণ্ঠ তাহার অধোভাগে কূপ তাহাতে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা লাগে না।

"কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যং।" ৩।৩১

কণ্ঠ কূপের অধোদেশে কূর্ম্মাকার নাড়ী আছে তাহাতে সংযম করিলে স্থির পদলাভ হয়। যেমন সর্প বা গোধা করিয়া থাকে। এরূপ স্থৈর্য্য শিকারী জন্তুতে প্রায় দেখা যায় যথা টিকটিকি বক সাপ গোসাপ বিড়াল প্রভৃতি ইহারা শিকারের পূর্ব্বে শরীরকে কাষ্ঠবৎ নিশ্চল করিতে পারে তাহাতে অভীষ্ট একাগ্রতা হয়।

"কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধ সংযমাৎ লঘুতুল
সমাপত্তে শ্চাকাশ গমনং" ৩।৪২

শরীর এবং আকাশের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ দেহের উপাদানের যে অবকাশ বা অন্তর, যে সম্বন্ধের কারণে শরীরের কাঠিন্যাদি উৎপন্ন হয় তাহাতে সংযম করিলে আকাশ গমন সিদ্ধ হয়। শরীরের অণু সকল গুরুত্ব ত্যাগ করিয়া লঘুত্ব স্বীকার করিলে জলের উপর বিচরণ করা যায়। অণু সকলকে বিস্তৃত করিতে পারিলেই বায়ুর স্থান অধিক হয় সুতরাং উড়িতে পারা যায়। পক্ষী জীবিত অবস্থায় পক্ষপুটদ্বারা এত বায়ু আকর্ষণ করে যে তাহার দেহ ভার লঘু হইয়া যায়। অভ্যাস হইলে মনুষ্যও শরীরাভ্যন্তরে অত্যধিক বায়ু আকর্ষণ এবং সঞ্চয় করিতে পারে। কিছুকাল প্রাণায়ামের পর শরীরে একটা লঘুতা উপস্থিত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ।

"স্থূল স্বরূপ সূক্ষ্মন্বয়ার্থ বত্ত্ব সংযমাৎ ভূতজয়ঃ ॥ ৩।৪৪

স্থূল স্বরূপ সূক্ষ্ম অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই পঞ্চবিধ ভূতরূপে সংযম করিলে ভূত জয় হয়। ক্ষিত্যপ তেজ মরুৎব্যোম এই পঞ্চভূত ইহাদের বিবিধ সংযোগে ঘট পটাদি সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের অবশ্য স্থূল সূক্ষ্ম সামান্য অন্বয়াদি ভাব আছে। ভূতের সূক্ষ্মাবস্থা তন্মাত্র। ইহা পরমাণু অর্থাৎ যাহার পর যাওয়া যায় না সেই অবস্থা। আর এক অবস্থা ইহার প্রকাশ, ক্রিয়া বা স্থিতি এ বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইহার নাম অন্বয়ত্ব। ভূতের গ্রহণে সুখ দুঃখের ভোগ হয় এবং ভোগায়তন শরীর হয় ইহাতে বৈরাগ্য হইলে অপবর্গ হয়। এইটি অর্থবত্ত্ব।

এই উপাদানের উপর কর্তৃত্ব হইলে যোগী যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন যেমন কুম্ভকার এক মৃত্তিকা হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করে।

ভূতজয়ী যোগী সেইরূপ ইচ্ছামত স্ত্রীকে পুরুষ বিকলাঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যকে পশু, পশুকে মনুষ্য করিতে পারেন। ইচ্ছা মাত্রেই ব্যাধিতকে নির্ব্যাধি করিতে পারেন। স্থূনাকর্ণ শিখণ্ডীকে এই বিদ্যাদ্বারা পুরুষত্ব দিয়াছিলেন বোধ হয়।

শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ করা স্পর্শে কুব্জাকে সুন্দরী করন ভক্তের অনুরোধে কালিকারূপ গ্রহণ স্বশরীরে বিশ্বরূপ প্রদর্শন কিছুই অবিশ্বাস্য নহে এমন অনেক যোগী আছেন যাঁহারা ইচ্ছামাত্রেই রোগ মুক্ত করিতে পারেন। যীশুখৃষ্টের ব্যাধি নিবারণ এই কারণের অন্তর্গত। ভূতশুদ্ধ হইলে শরীর এবং মন উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ভূত শুদ্ধির উদ্দেশ্যেই হিন্দুদিগের বিবাহাদি সংস্কার প্রতিষ্ঠিত।

ততোণিমাদি প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ
তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ।" ৩।৪৬

ভূত জয় হইলে অণিমাদি সিদ্ধির আবির্ভাব হয় এবং কায়সম্পৎ ও কায়ধর্ম্মের অনভিঘাত সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধি অষ্টপ্রকার যথা অণিমা যদ্বারা অতি ক্ষুদ্র হওয়া যায় এমন কি প্রস্তরের ভিতরেও প্রবেশ করা যায় এবং অদৃশ্য হওয়া যায়।

লঘিমা—যাহাতে অতি লঘু হওয়া যায়।

মহিমা। যাহাতে অতি প্রকাণ্ড হইতে পারা যায়।

প্রাপ্তি। যদ্দারা চন্দ্রকে বা দূরস্থ পদার্থকে স্পর্শ করিতে পারা যায়।

প্রাকাম্য। ইচ্ছার অনভিঘাত যথা দেওয়ালের মধ্য দিয়া চলিয়া যাওয়া ইত্যাকার শক্তি।

বশিত্ব। ভৌতিক পদার্থের উপর কর্তৃত্ব গ্রহণ—এবং অন্যের অবশ্য হওয়া।

ঈশিতৃত্বং। সংকল্প করিলে ভৌতিক পদার্থের উৎপত্তি ও তিরোভাব হইতে পারে।

যত্র কামাবসায়িত্ব। যাহা ইচ্ছা করিব তাহাই সম্পন্ন হইবে।

এই শেষ সিদ্ধি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। মনে রাখিতে হবে যে সিদ্ধি আবির্ভূত হইলেই ভক্ত যোগী তাহার ব্যবহার করিবেন—একথা সত্য নয়—কারণ সিদ্ধির ব্যবহারে পতন সম্ভব। যেমন রাবণ সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিয়া মা জানকীকে হরণ করিয়াছিল। রাক্ষসগণও অনেক সময়ে অনেক ক্ষুদ্র সিদ্ধির অধিকারী হয়।

কেহ যেন মনে না করেন যে উপরোক্ত সিদ্ধি সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইলেই যোগী কৈবল্যের অধিকারী হন, কৈবল্য আরও উপরের অবস্থা। সিদ্ধির পরে ইন্দ্রিয় জয় করিতে হয়। ইন্দ্রিয় জয় হইলে তাহার সকলের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য হয়। ইন্দ্রিয় জয় হইলে প্রকৃতি জয় হয়, তৎপরে আত্মদর্শন হয়, ইহার পরে কি হয় তাহা আর বলিবার উপায় নাই। ও স্থানে উপস্থিত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। এই অবস্থাকেই সম্প্রদায় বিশেষে এক এক নাম দিয়া থাকেন।

কেহ ব্রহ্মলোক, কেহ বিষ্ণুলোক, কেহ গোলকধাম, কেহ বৃন্দাবন বলিয়া থাকেন।

আমাদের সাধারণ লোকের মধ্যে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ লইয়া একটা বিতণ্ডা প্রায়ই শুনা যায়। যাঁহারা এই বিতণ্ডার অবতারক তাঁহারা যে সাধনার দ্বারা দ্বৈত অদ্বৈতবাদের তীরে উপস্থিত হইয়াছেন তাহা নহে। মৌখিক একটা সময় কাটান এবং জনসমাজে প্রসিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য কোলাহল করিয়া থাকেন—তাহাদিগকে নিবেদন যে মূলে এক কি বহু এ তর্ক লইয়া বৃথা সাম্প্রদায়িক বৈরিতার প্রশ্রয় না দিয়া যাহাতে "মূলে এক কি বহু" এ তত্ত্ব জানিবার উপযুক্ত হইতে পারা যায় সেই উপদেশ প্রদান করিলে সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য যোগ পন্থা এবং অভ্যাস এ সকল বিষয়ে সকল মতই এক ... প্রথমে এ সকল আয়ত্ত হউক তখন বৈকুণ্ঠ কোথায় শিবলোক কোথায় পুনরাবর্ত্তন হইবে কিনা এইরূপ প্রশ্নের উত্তর করিবার অবকাশ অন্বেষণ করা যাইবে। "কিমাদ্র বানজ্যে র্বহিত্র চিন্তয়া" আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি আবশ্যক ?

ভগবান অর্জ্জুনকে ঠিক এই রকম ভাবে উত্তর করিয়াছিলেন——

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন"

আমার কত বিভূতি আছে তাহা তোমার পৃথক পৃথক জানিবার আবশ্যক নাই। তুমি সাধক আমাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া জান তাহা হইলেই হইবে।

আমরাও বৃথা বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া গুরুদৃষ্ট পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করি তবে ফললাভ করিব। অন্যের বাক্যের শরণ লইলে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় সে যে দূর হইতে দূরান্তরে যাইবে। কখনই তাহাকে ধরা যাইবে না।

আমরা এখন যোগীগণের উৎক্রান্তি বিষয়ক একটা কথা বলি। শ্রীভীষ্মদেব কথিত দুস্তর এবং অতল মোক্ষধর্ম্ম সাগরের পারে উপস্থিত হই। মোক্ষধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পুস্তক অধ্যয়নে হয় না— গুরূপদেশ লইয়া সাধনা করিতে হয়। তবে ভীষ্মচরিত্রের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করিতে যতটুকু বলা আবশ্যক এবং সাধারণের বিরক্তি হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে যে সীমার মধ্যে থাকা উপযুক্ত মনে করিয়াছি ততটুকু এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "যোগীরা পাদ দ্বারা প্রাণ বায়ু পরিত্যাগ করিলে বসুলোক জানুদ্বারা ত্যাগ করিলে সাধ্যলোক পায়ুদ্বারা ত্যাগ করিলে মৈত্রলোক, জঘন দ্বারা পরিত্যাগে পৃথিবী লোক, উরুদ্বারা ত্যাগ করিলে প্রজাপতিলোক পার্শ্বদ্বারা পরিত্যাগ করিলে বায়ুলোক, নাসা দ্বারা ত্যাগ করিলে চন্দ্রলোক, বাহুদ্বারা বিসর্জ্জন করিলে ইন্দ্রলোক বক্ষদ্বারা করিলে রুদ্রলোক গ্রীবাদ্বারা নরলোক মুখদ্বারা বিশ্বদেবলোক, শ্রোত্রদ্বারা দশদিকপাললোক, ঘ্রাণ দ্বারা ত্যাগ করিলে গন্ধ বহ বায়ুলোক, নেত্রদ্বারা অগ্নিলোক, ভ্রূদ্বারা অশ্বিনী লোক ললাটদ্বারা পিতৃলোক এবং মস্তকদ্বারা ত্যাগ করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন।" শাঃ প—৩১৮।৩।৪।৫।

মস্তক অর্থে পূর্ব্ব কথিত সুষুম্না নাড়ী এবং তদন্তর্গত সূর্য্যদ্বার— ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বারা প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মলোকে গমন হয়।

গীতায় ভগবান এই উৎক্রমণের কথা বলিয়াছেন,——

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদিনিরুধ্য চ
মূর্দ্ধ্যধয়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম॥
ওঁমিত্যে কাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ মামুনস্মরণ
যঃ প্রয়াতি ত্যজন দেহং সযাতি পরমাং গতিং॥ ৮।১২।১৩

যে উপাসক সমস্ত ইন্দ্রিয় অবরুদ্ধ এবং মনকে হৃদয় পুণ্ডরীকে নিরুদ্ধ করিয়া এবং প্রাণ বায়ুকে (সর্ব্বশরীর হইতে আকর্ষণ) করিয়া মূর্দ্ধদেশে (ব্রহ্মরন্ধ্রে) স্থাপন করিয়া আত্মসমাধি সাধন করেন এবং ওঁ এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে চিন্তা করেন তিনি দেহান্তকালে পরম গতিপ্রাপ্ত হয়েন।

যোগীগণের উৎক্রান্তির শুভাশুভ সময়ও আছে যে সে ক্ষণে তাঁহারা প্রাণ ত্যাগ করেন না তাহাতে গতির তারতম্য হয় যোগেশ্বর হরি গীতায় এই সময় বলিতেছেন,——

"যত্রকালে ত্বনাবৃত্তি মবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥
অগ্নি জ্যোতিরহঃ শুক্ল ষন্মাসা উত্তরায়ণং
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ ॥
ধূমো রাত্র স্তথা কৃষ্ণ ষন্মাসা দক্ষিণায়নং
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্যনিবর্ত্ততে ॥

৮।২৩।২৪।২৫।

যে কালে গমন করিলে যোগিগণ অনাবৃত্তি বা আবৃত্তি (পুনরাগমন) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সেই কালের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি।

যে স্থানে জ্যোতিস্বরূপ অগ্নি দিন শুক্লপক্ষ ছয় মাস উত্তরায়ণ স্থিতি করিতেছে, সেই দেবযান পথে গমন করিলে যোগীব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।

যে স্থানে ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষও ছয় মাস দক্ষিণায়ন অবস্থিতি করিতেছে সেইস্থানে গমন করিলে যোগী চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন এবং কর্ম্মফলান্তে সংসারে পুনাবৃত্ত হয়েন।

ইহারই নাম শুক্ল কৃষ্ণ গতি।

শ্রীভীষ্মদেব কেন উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিতেছেন তাহা আর বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিতে হবে না।

যোগ সম্বন্ধে আর অধিক অগ্রসর হইলে মোক্ষধর্ম্ম প্রকরণ নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে ভয়ে এইস্থানেই ক্ষান্ত হওয়া সুপরামর্শ।

সপ্তম অধ্যায়।

অনুশাসন পর্ব্ব।

—∞—
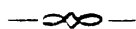
প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুশাসন পর্ব্বের মৌলিকতা বিষয়ে আমরা ইতঃপূর্ব্বে বিচার করিয়াছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে এই পর্ব্ব মূল মহাভারতে এক স্বতন্ত্র পর্ব্ব বলিয়া অভিহিত ছিল না।

এই পর্ব্বের যে অংশ মৌলিক তাহা শান্তিপর্ব্বেরই অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভীষ্মদেব অতি গম্ভীর মোক্ষধর্ম্মে উপদেশ করিয়া পুনর্ব্বার কতকগুলি সামাজিক আচার শ্রাদ্ধাদি প্রচলিত প্রথা এবং বর্ণাশ্রমের কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিবেন একথা অনেকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না।

ধ্রুবপদের গুরু গম্ভীর স্বরবিন্যাস এবং তালমান সম্পন্ন সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরে বৃক্ষতলে ঝুমরগান শুনিতে বসার ন্যায় শান্তিপর্ব্বের পর অনুশাসন পর্ব্বের কথা সকল বোধ হয়। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়াই বঙ্কিমবাবু অনুশাসন পর্ব্বকে কেবল "বাজে" কথায় পূর্ণ এবং অমৌলিক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা কিন্তু একেবারে বাজে কথা বলিয়া শ্রদ্ধাহীন হইতে পারিতেছি না। তবে একথা স্বীকার করি যে যে সকল পর্ব্ব কেবল নীতি-কথায় পূর্ণ সে সকল অধ্যায়ে প্রক্ষেপের অবসর অনেক। এই অনুশাসন পর্ব্বটি ঐরূপ অবসর যুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই এবং কিয়দংশ যে পরে

সংযুক্ত এরূপ বিবেচনার কারণ একবারে ভিত্তিহীন নহে। যে যে অংশ অমৌলিকতা দোষে দুষ্ট এ পর্ব্বে তাহাদের পরিবর্জ্জন সহজ।

শান্তিপর্ব্বের পরেও অনুশাসন পর্ব্বের অথবা বাক্যের আপেক্ষিক ভাব অতি স্পষ্ট। আমরা মোক্ষধর্ম্মের ইতিহাসে দেখাইয়াছি যে মানবগণ ধর্ম্ম বিষয়ে দুইটি মার্গ অনুসরণ করিয়াছে একটি প্রবৃত্তি ও দ্বিতীয়টি নিবৃত্তিমার্গ। জগতে সহস্র জনের মধ্যে একজন হয়ত নিবৃত্তিমার্গের পথিক আর ৯৯৯ জন প্রবৃত্তির পথে ধাবমান।

ভীষ্মদেব শান্তিপর্ব্বে প্রথম রাজধর্ম্ম পরে আপদ্ধর্ম্ম এবং অবশেষে মোক্ষধর্ম্ম বলিয়াছেন কিন্তু ঐ ৯৯৯ জনের যে ধর্ম্ম তাহার বিশেষ কিছু উপদেশ দেন নাই। প্রবৃত্তি ধর্ম্মে উন্নতি করিতে হইলে অর্থাৎ মানবের সংসারে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরিণামে দেহান্তে কি উপায়ে শুভ লোক সমূহে যাওয়া যায় এবং পরজন্মে উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার উপায় বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই; আর এক কথা মোক্ষধর্ম্ম উপদেশ লাভ করিতে হইলে যে পরিমাণে শরীর এবং মনের পরিশুদ্ধির আবশ্যক এবং সেই পরিশুদ্ধি কি কি উপায়ে হইতে পারে তাহার উপদেশ বিশেষভাবে বলা হয় নাই। তাই বিবাহাদি সংস্কার সমূহ ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার তীর্থাদি দর্শনের ফল বর্ণাশ্রমের প্রতিপালন ইত্যাদি কথা তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে। কথাগুলি মোক্ষধর্ম্মের ন্যায় অত্যুচ্চ দর্শনের না হইলেও সাধারণ মানবের অনুসর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই—তাই যুধিষ্ঠির পিতামহকে শাসন বাক্য সমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন; আর এই অনুশাসন বাক্য গুলি না বলিলে ভীষ্মের উপদেশ সর্ব্বাঙ্গীন হয় না। প্রবৃত্তিধর্ম্ম বলিবার জন্যও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এখন বোধ হয় অনুশাসন পর্ব্বের সর্ব্বাংশই অমৌলিক নহে বলিতে সাহস করা যায়।

অনুশাসন পর্ব্বের সকল কথার আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে স্থানাভাব ত বটেই তবে কিঞ্চিৎ বিশেষ কথা এই অধ্যায়ে আছে এবং সেই বিশিষ্ট কথাগুলি আধুনিক সমাজের সহিত বড় ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট। তন্মধ্যে একটি কথা উপাদেয় কেন না আহার সম্বন্ধীয় তবে সকলের পক্ষে যে রোচক হইবে বলা যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেক।

পৃথিবীর চক্ষের সম্মুখে হিন্দুধর্ম্ম কতকগুলি সামাজিক নৈতিক এবং ধর্ম্ম বিষয়ক সমস্যা দাঁড় করাইয়াছে। ধর্ম্মান্তরবাদীগণের নিকট হিন্দু সেই জন্য এখনও আদিবর্ব্বতার অন্ধতমিস্রা হইতে সভ্যতার চক চক কিরণময় জ্ঞানের দিকে পতঙ্গের ন্যায় সমৃদ্ধবেগে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় কি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি তাহাকে হিন্দুত্ব কেন্দ্রে আকৃষ্ট রাখিয়াছে। বহু গবেষনার পর এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে সে শক্তি অসভ্যজাতির চিরন্তন প্রথার স্থিতিশীলত্বে মমতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে কোথায় তাহার চিন্তায় আহারে বিহারে এক বিরাট উদারভাবের আবির্ভাব হইবে না, বসন্তে কুসুম কোড়কে তুষারপাতের ন্যায়—প্রাকৃতিক বৃত্তিতে বিকাশহীন সংকীর্ণতার সৃষ্টি করিয়া পশুত্বের আবরণ গাঢ় করিতেছে।

স্মৃত্যতীত যুগে মনু প্রণীত ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেকের প্রবাহরূপে বিংশতি শতাব্দীতে আগমন এবং বহুল প্রচার হিন্দুজাতির নিত্যত্ব প্রিয়তার

সুন্দর নিদর্শন স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। অন্য জাতিরা হিন্দুকে পরিণামভীত বলিয়া উপহাস করে এবং নূতন পথ আবিষ্কারের অনুপযুক্ত বলিয়া সে চিরলাঞ্ছিত, যে সকল কারণে তাহার এই লাঞ্ছনা, সেচ্ছা আহারে অপ্রবৃত্তি এবং তদ্বিষয়ক নিয়মের বংশ পরম্পরায় পালন তাহাদের মধ্যে অন্যতম কারণ।

জীবের পক্ষে আহার একটা অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার—অনাহারে জীবন থাকিতে পারে না ইহাই সাধারণ নিয়ম। কোন কোন জীব আছে যাহারা বহুদিন আহার না করিয়া জীবিত থাকে—যেমন ভেকসর্প এবং অন্যান্য কয়েক প্রকার সরিসৃপ। হয়ত এমন জন্তু আছে যাহাদের আহারের কোন আবশ্যক নাই। অভ্যাস করিলে মনুষ্যও বহুদিন আহার না করিয়া থাকিতে পারে একথা আমরা পূর্ব্ব বলিয়াছি।

আমরা মনুষ্যের আহার বিচার করিতেছি মনুষ্যেতর জীবের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে মনুষ্যেতর জাতির অঙ্গের অবস্থাদির সাদৃশ্য লইয়া মনুষ্যের আহার্য্য নিরূপণ অনেক পণ্ডিতে করিয়া থাকেন এই জন্য কিছু বলিবার আবশ্যক হইবে।

আহার মূলতঃ দুইপ্রকার আমিষ এবং নিরামিষ। হিংসার সহিত যে আহারের নিকট সম্পর্ক তাহাই আমিষাহার। অণ্ডাদিতে সূক্ষ্মভাবে জীবত্ব আছে সুতরাং ভিন্নভাবে প্রাণিহিংসা আছে অতএব ইহাও আমিষ। জীবহিংসা না করিলে আমিষভক্ষণ সুচারু হয় না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন মৃত জীবের দেহ ভক্ষণ করিলে হিংসা না করিয়া আমিষ ভক্ষণ চলিতে পারে। ব্যাধিতে বা অন্য উপায়ে মৃত জীবের দেহ ভক্ষণ মনুষ্যে না করে তাহা নহে, শুনিয়াছি বৌদ্ধেরা হিংসা করে না কিন্তু উপরিউক্তভাবে মৃতদেহ ভক্ষণ করে। ভারতে অনেক অন্ত্যজজাতিতেও করে। এরূপভাবে আমিষ সংগ্রহ যে সমাজের মহানর্থের মূল তাহা আর

কষ্ট করিয়া বলিতে হইবে না! বহুতর দুঃসাধ্য ব্যাধি এরূপ আহার হইতে সমাজ অঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে।

যাহাহউক এরূপভাবে মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া মাংসাহারে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয় বলিয়া বোধ হন না। প্রথমত এ রকম মৃতদেহ বৎসরে কয়টা পাওয়া যায় তৎপরে অভিমত জীব কবে প্রাণত্যাগ করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদিই করে হয় তা হলে চটকস্থ ভাগ শতং লইয়া একটা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে।

গারো জাতির ন্যায় বৃদ্ধ স্বজাতি ভক্ষণ করিলে কতক সুবিধা হইতে পারে কিন্তু তাহাতে বর্ব্বরতার গন্ধ আছে।

গব্য পদার্থ (অর্থাৎ ছাগমহিষের এবং গবির ও উষ্ট্রের দুগ্ধ) ও ক্ষেত্রোৎপন্ন উদ্ভিজ্জের আহার নিরামিষ আহার। উদ্ভিদের মধ্যে ফল, মূল পত্রাদি প্রধানতঃ ব্যবহার্য্য।

পরিশ্রমে এবং শ্বাস প্রশ্বাসাদি স্নায়বিক ক্রিয়াতে শরীর ধাতুর অনবরত অপচয় হইতেছে, অপচয় বোধ না হইলে শরীর স্থায়ী হয় না এবং দুর্ব্বলতা বশতঃ ব্যাধি মন্দির হয়। সুতরাং অকালমৃত্যু এবং অকর্ম্মন্যতা আপন অধিকার বিস্তার করে।

পূর্ব্বোক্ত অপচয়কে রোধ করিবার উপায় আহার। যে উপাদানে মনুষ্যদেহ গঠিত বহিঃস্থিত দ্রব্যেও সেই সমুদায় উপাদান বর্ত্তমান, কাজেই আহারে উপাদানের অপচয় পূর্ণ হইয়া ধাতুর উপচয় হয়। ক্ষুৎপিপাসাদি শরীর ধাতুর অপচয় জ্ঞাপক এবং তৎপূরণের স্বাভাবিক উত্তেজনা।

এতদূর পর্য্যন্ত হিন্দুর সহিত কাহার এতদ্বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু হিন্দু মনে করেন দেশকাল পাত্র এবং অবস্থাভেদে আহারের তারতম্য ভক্ষ্য ও অভক্ষ্যের নির্দ্দেশ হওয়া উচিৎ নচেৎ সমাজে মঙ্গল হয় না।

যদি আহার শরীর ধাতু মাত্র পোষণ করিয়া ক্ষান্ত হইত প্রবৃত্তি এবং

কামনার উত্তেজনার কারণ না হইত তা হইলে বোধহয় আহারের বিচার লইয়া হিন্দুকে এত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত না এবং মনুষ্য-মাত্রেই একরূপ আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত।

পশু সমাজ ব্যতীত কেবল দেহমাত্র এবং তস্য উৎকর্ষ অপকর্ষ লইয়া ব্যতিব্যস্ত মানবসমাজ জগতে অতি বিরল। দেহের উপরে মন নামে একটা পদার্থ মানবসমাজে বহুদিন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং দেহের উপর তাহার আন্তরিক কর্তৃত্ব আছে তাহা সর্ব্বলোক স্বীকৃত। সুতরাং কেবল দেহের পুষ্টি হইলেই হইল না মনেরও পুষ্টি চাই; মানব সাহিত দেহ এবং মনের সমবায় মাত্র।

কামক্রোধ লোভাদি স্বার্থময় শক্তি সমূহ এবং দয়া দাক্ষিণ্য ত্যাগ প্রভৃতি পরার্থময় প্রবৃত্তি সকল সামাজিক যাবতীয় কর্ম্মের প্রেরণা; তাহাদের আহার দ্বারা জীবিত রাখা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

সমাজে সকল মনুষ্যই একপ্রকার কর্ম্মে রত নহে। একই সময়ে বিজলিচালিত সুশীতল অনিল সেবী রাজপুরুষ এবং মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডতাপিত অনল সেবী শকট বাহক প্রয়োজন বশে কর্ম্ম করিতেছে। এতদুভয়ের দেহধাতুর অপচয় কি এক? যদি তাহা না হয় তবে অপচয় নিবারণের উপায় যে আহার তাহা কখন এক হইতে পারে না। এতত্ত্ব হিন্দু অতি প্রাচীন কালেই উপলব্ধি করিয়াছে এবং তদনুসারে আহারের ব্যবস্থাও প্রচলিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতি সমূহ এ তত্ত্ব অদ্যাবধি সম্যক অনুভব করেন নাই। ক্লোণ্ডাইকে স্বর্ণরেণু আহর্ত্তার যে আহার কলিকাতা মহানগরীর প্রধান ধর্ম্মযাজক পাদরী সাহেবেরও সেই আহার। ধর্ম্মতলার পশু মাংস বিক্রেতার যে আহার মসজিদে "ইলম এলাহি" বক্তা নাভিস্পর্শী শ্মশ্রুযুক্ত মৌলভিসাহেবের ও সেই আহার।

আইসলণ্ড দ্বীপে এস্কুইমো জাতি বরফের গৃহে রাত্রিতে নিদ্রাযায় মদ মাংস বিনা অগ্নিতে পাক করিয়া আহার করে তাহাতে শারীরিক অবস্থা আইসলণ্ডের অতি শীতের উপযুক্ত হয় কিন্তু ঐ ভাবের আহার যে দেশে তাপমান যন্ত্র বায়ুর উত্তাপ ১১৫° দেখায় তথায় ব্যবহৃত হইতে পারে কি? উৎকট শীতকালের ভক্ষ্য গ্রীষ্মকালে ব্যবহৃত হইলে শরীর সুস্থ থাকে কি? অসুস্থাবস্থায় সুস্থাবস্থার আহার কখন পথ্য হইতে পারে না। এই পথ্যা পথ্যের ব্যবস্থা যেমন শরীর ধাতুর সাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজ্য তেমনি মানসিক প্রকৃতির সমতারক্ষার জন্যও ব্যবহার্য্য।

ঐ শেষোক্ত কথাটা পাশ্চাত্য দেশে এখন বিশেষ ভাবে গৃহীত হয় নাই। ভারতে বহু প্রাচীনকালে ঋষিগণ আহারের এবং মনের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দিব্য চক্ষে দেখিয়াছেন এবং শরীর ও মনের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পথ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যে আহারে শারীরিক কল্যাণলাভ হয় তাহা আয়ুর্ব্বেদ বা চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত আর যাহাতে মানসিক স্থিরতা এবং চিন্তাশক্তির আতিশয্য সাধন হয় তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যগত।

যে জাতি শারীরিক স্বচ্ছন্দতাকে পুরুষার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহার আহারের ব্যবস্থা এই ভোগায়তন দেহের জন্যই হইবে তদ্রূপ যে জাতি মানসিক উন্নতিকে চরমলক্ষ্য করিয়াছে তাঁহার আহার ব্যবস্থাও উদ্দেশ্যের সাধকরূপে নির্ণীত হইবে এ কথা স্থির।

হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ও মুসলমান জগতের এই প্রধান ধর্ম্ম চতুষ্টয়ের চরম লক্ষ্যগত পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি করিলে তত্তৎ মতাবলম্বী গণের আহারগত পার্থক্যের ও কারণ বুঝা সুগম হইবে।

সকল মনুষ্যেরই জীবনে একটা লক্ষ্য আছে এবং সেই লক্ষ্যের

দিকে অগ্রসর হইবার জন্য সে তাহার সমগ্র উদ্যম সেই দিকে উৎসর্গ করে। সেইরূপ সকল জাতিরই একটা চরমলক্ষ্য বা পুরুষার্থ আছে যাহা প্রাপ্তির জন্য সে সমগ্র জাতীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার উদ্যম চেষ্টা সেই লক্ষ্যের প্রতি নিয়োজিত করে এবং করাই উচিৎ। যদি তাহা না করে তবে তাহার জাতীয় উদ্যমের কিয়দংশ বৃথা হইয়া যায়। যখন লক্ষ্যে এবং তৎসাধন উপায় সমূহে বিবাদ উপস্থিত হয় তখনই লক্ষ্য ভ্রষ্ট জাতি বা মানবের যে গতি তাহাই আসিয়া দাড়ায়।

মনে করুন একব্যক্তি জীবনে উৎকৃষ্ট গায়ক হইবে লক্ষ্য করিল সে ব্যক্তি যতটুকু উদ্যম ও সাধনা করিবার শক্তি রাখে তাহার সমস্তই সঙ্গীতের দিকে উৎসৃজিত না হইলে সঙ্গীতের সাধনাও হইবেনা এবং বহু উদ্যমও লক্ষ্যহীনতা দোষে বৃথা নষ্ট হইবে।

কোন জাতির আচার ব্যবহার নীতি রীতি ও শিক্ষা উদ্যম বুঝিতে হইলে তাহার চরমলক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হয় নচেৎ সহস্র বৎসর অধ্যয়ন করিলেও তাহার আচার ব্যবহারাদির কারণ অনুভূত হইবে না।

প্রায়ই শুনা যায় যে প্রাচ্যজাতি সমূহের কর্ম্ম প্রেরণার কারণ চিরদিনই পাশ্চাত্য জাতিদের নিকট অজ্ঞাত থাকিবে প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকিবে প্রতীচ্যের সহিত কখন মিলিবে না। বাস্তবিক তাই যতদিন পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্যের চরমলক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিবেন ততদিন সেই লক্ষ্যের উপযোগী আচার ব্যবহার ক্রিয়া কর্ম্ম তাহার কাছে অজ্ঞেয় থাকিবে। সমষ্টি হইতে বিশ্লিষ্টভাবে কোন একটা আচার বা পদ্ধতি যতই কেন অনুধাবন করুন না তাহার মর্ম্ম গ্রহণ হইবেই না।

মৃতের উদ্দেশে তর্পণ বা পিণ্ডাদি দান হিন্দুদিগের একটি নিয়ম আছে। একজন ইংরেজ এ ব্যবস্থা যতই কেন চিন্তা করুন না কিছুতেই ইহা

বুঝিতে পারিবেন না, অথচ একজন কৃত-বিদ্য সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচার পতিকে এই আপাতত কুসংস্কার পূর্ণ কার্য্যটা করিতে তিনি দেখিলেন। মৃত এবং জীবিতের সম্বন্ধ যে অতি নিকট এবং মৃতকে আমার জন্ত কত ব্যস্ত আমার উন্নতিতে তিনি যে কত উৎফুল্ল জীবিতকে যে কত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন ইংরেজ তাহা বুঝেন না তবে কি করিয়া তিনি এই আচার অনুভব করিবেন।

আজকাল আমাদের দেশে একদল উঠিয়াছেন যাঁহারা মনে করেন ইংরেজের খাদ্য ইংরেজের পোষাক এবং কিছু তাহার ভাষা অধিকার করিতে পারিলেই তিনি ইংরেজের সহিত মিলিয়া গেলেন। নিজেও ঐরূপ করেন এবং পরকেও ঐরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। কি ভ্রান্তি ইংরেজের বাহ্যিক ব্যবহার মক্স করিলেই কি ইংরেজ হওয়া যায় বা তাহার সহিত মিলিত হওয়া যায় তাহলে আর ভাবনা কি ছিল। জাতীয়তা একটা স্বতন্ত্র পদার্থ অনুকরণে তাহা আসে না। ইংরেজের জাতীয় লক্ষ্য যদি তুমি নিজের লক্ষ্য করিতে পার তবে একদিন ইংরেজ হইতেও হইতে পারিবে। তাহার আহারে এবং বিহারে ভর করিলে পক্ষাঘাত ব্যতীত অধিকলাভ নাই।

হিন্দু এবং বৌদ্ধের জাতিগত চরমলক্ষ্য এক খৃষ্টান এবং মুসলমানের এক। হিন্দু এবং বৌদ্ধ কৈবল্য চরম পুরুষার্থ মনে করেন খৃষ্টান এবং মুসলমান স্বর্গ heaven বা বিহিস্ত চরমস্থান মনে করেন। হিন্দু বৌদ্ধের কৈবল্য নির্ব্বাণ সেখানে ভোগ নাই সুখ নাই দুঃখ নাই। খৃষ্টান এবং মুসলমানের স্বর্গে ভোগ আছে সুখ আছে আনন্দের প্রস্রবণ অনবরত চলিয়াছে হুর (পরি) আছে তহুর (মদ) মাংস অত্যুৎকৃষ্ট, আছে ভোগের পরাকাষ্ঠা, আর ভোগ করিবার জন্য চিরযৌবন আছে। এখানেও যাহা আছে সেখানে ও তাই আছে পৃথক কেবল প্রাচুর্য্যে

এবং সকলের সমভাবে প্রাপ্তিতে সুতরাং মুসলমান এখানে আহারের নিষেধ বা সঙ্কোচ কেন করিবেন তাঁহার চরমলক্ষ্যে যাইতে হইলে ত্যাগের কোন আবশ্যক নাই। হিন্দুর অণুরূপ অত্যল্প ভোগ বাসনা থাকিলেও তথায় প্রবেশের অধিকার নাই কাযেই তাঁহাকে জন্মে জন্মে আহারের সঙ্কোচ বা নিষেধ অভ্যাস করিতে হইবে নচেৎ প্রবৃত্তি নিগৃহীত হয় না। খৃষ্টান মুসলমানের মানসিক উন্নতির জন্য কোন স্বতন্ত্র আহার শাস্ত্র নাই হিন্দুর বৃহৎ ভক্ষ্যাভক্ষ্য শাস্ত্র বর্ত্তমান!

যে দ্রব্য আহার করিব সেই পদার্থ যে ধর্ম্ম বা গুণ বিশিষ্ট সেই ধর্ম্ম বা গুণ ভোক্তার দেহে বিসর্পিত হইবে এবং দেহ হইতে মনকে আক্রমণ করিবে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

এরূপাবস্থায় যদিচ্ছা আহার চলিতে পারেনা খাদ্যবর্গের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্রিয়া বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক নচেৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। কেহ চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য চেষ্টা করিতেছেন অথচ তাঁহার আহার হইতেছে মাংস, পলাণ্ডু রসুন এবং পরিপাকার্থ কিছু বিলাতী সুরা।

এ অবস্থায় চিত্তস্থৈর্য্যের ত কথাই নাই পদের স্থৈর্য্য থাকাই দুষ্কর যে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বিশ্বের সমস্ত বিষয়ই ত্রিগুণাত্মক অতএব আহার্য্য বস্তুও তদ্গুণাত্মক। পৃথিবীতে সকল ব্যক্তিই সত্ত্বরজঃ তম তিন গুণের মধ্যে কোন একটির প্রাধান্য অর্জ্জনে যত্নবান। জাতিভেদ বিচারে এ বিষয়ে আমরা বিশদভাবে বলিয়াছি। যাঁহারা সত্ত্বগুণের বিশিষ্টতা লাভে প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহাদের আহারে বিহারে উদ্যমে সকল বিষয়েই সত্ত্বগুণের উদ্দীপক বস্তুর অন্বেষণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

কোন পদার্থ কোন্ গুণ বিশিষ্ট তাহা পদার্থের ব্যবহারে জ্ঞান হয়। বহুকাল হইতে উহাদের ব্যবহার এবং পরিণাম লক্ষ্য করিয়া তবে পূর্ব্ব

পুরুষগণ ভবিষ্যৎ সন্ততির মঙ্গলের জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে জাতি সভ্যতার সোপানে যত অগ্রে আরোহণ করিয়াছে তাহার বহুদর্শিতা ও অবশ্য তত অধিক কারণ বস্তুবিশেষের ক্রিয়া অনুধাবন করিবার অবসর তাহার অধিক ছিল।

গৌরব এবং মহত্ত্ব আহরণ সকল মানব ও জাতিরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং এ উদ্দেশ্য প্রায়ই দেখা যায়। কোন জাতির মহত্ব বা গৌরব তাহার আবয়রিক অবস্থার উপর তত নির্ভর করে না, যত তাহার মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অবনতির উপর নির্ভর করে। কত কত জাতি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের হীনতায় বিস্মৃতির অতলজলে ডুবিয়া গিয়াছে এবং যাইবে; কিন্তু যে জাতির মস্তিষ্ক এবং হৃদয় সম্যক মার্জিত হইয়াছে তাহার দেহে প্রাণ না থাকিলেও তাহার বাহুতে বলের অভাব হইলেও কাল সমুদ্রে অক্ষয় আলোক স্তম্ভরূপে সে অতীত গৌরবের জ্বলন্ত ইতিবৃত্ত শিরে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবে। জাতীয় ভাবে হিন্দু নাই তাহার কঙ্কালসার দেহে প্রাণ নাই। শীর্ণ বাহুতে শক্তি নাই কিন্তু তাহার বেদ বেদান্ত স্মৃতি শ্রুতি যোগ দর্শন সর্ব্বধ্বংশী কালকে উপেক্ষা করিয়া ভবার্ণবে ভেলার মতন সংসার শ্রান্ত জীবকে শান্তির ক্রোড়ে পৌঁছাইবার জন্য জননীর ন্যায় এখনও আহ্বান করিতেছে।

চৈত্তিক উন্নতি সাত্ত্বিক ভাব সাপেক্ষ। সত্ত্ব কে বাড়াইতে হইলে সত্ত্ব গুণযুক্ত আহার করা উচিৎ।

গুণভেদে আহার্য্যও তিন প্রকার। সাত্তিক রাজসিক ও তামসিক।

যোগেশ্বর কৃষ্ণ আহারের গুরুত্ব অনুভব করিয়াই গীতায় আহারের কথা বলিতেছেন,——————

আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখ প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ
রস্যাঃ স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিক প্রিয়াঃ।

কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ যৎ
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং।

আয়ুসত্ব বল আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বিবর্দ্ধন, রসযুক্ত স্নিগ্ধ স্থির (যাহার ফল বহুদিন থাকে) এবং হৃদ্য আহার সাত্ত্বিক দিগের প্রিয়।

অতি কটু অম্ল লবণ অত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদগ্ধ পাকা (প্রদাহকারী) এবং দুঃখ শোকে ও রোগ জনক আহার রাজসিকদিগের প্রিয় যাহা যাতযাম (বাসী) যাহার রস শুকাইয়া গিয়াছে, যাহাতে দুর্গন্ধ হইয়াছে, পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র তামসগণের প্রিয়।

ভগবান সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তবে কি কি বস্তু এই লক্ষণার অন্তর্গত তাহার অবগতির জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হইবে।

বহু প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য ওপেয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে তৎসমুদায়ের বিবরণ দেওয়া এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে—যাহারা সমস্ত নিষিদ্ধ আহারের তালিকা জানিতে চাহেন, স্মৃতি শাস্ত্র দেখিবেন অথবা কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের শরণ লইবেন।

যে কয়টা নিষিদ্ধ খাদ্যের নিমিত্ত বহু হিন্দুসন্তান পৈতৃক ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আহারের সুবিধার জন্য ধর্ম্মান্তর বা জাত্যন্তর গ্রহণ করিতেছেন সে কয়টি আহার্য্যের বিষয়ে দেবব্রত ভীষ্মের কি মত তাহা বলা উচিৎ এবং সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিব।

আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই একথাটা দেশের অনেক কৃতবিদ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও গণ্যমান্য ব্যক্তির মুখে শুনা যায় এবং তাঁহারা যেখানে সেখানে এবং যাহা তাহা ভোজন করিয়া কর্ম্মতঃ দেখান যে

তাঁহাদের আহার ধর্ম্মে কোনরূপ আঘাত করেন নাই। সুস্থ সবল এবং উপার্জ্জনোক্ষম আছেন বরং যাহারা নিসিদ্ধ আহারের পক্ষপাতী তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বলবান ও কার্য্যক্ষম। সুকুমারমতি বালক এবং যুবাগণ যুক্তির অকাট্যতা দেখিয়া গৃহে অন্যবিধ শিক্ষা পাইলেও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কবিবারই কথা "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরাজনাঃ—একে নবযৌবন—তাহাতে কুশিক্ষায় প্রবৃত্তিগণের বিশেষ আকর্ষণ গত্যান্তর নাই।

যে কয়টী পদার্থের অবৈধতা লইয়া বড় গণ্ডগোল তাঁহারা এই; নিবা-মিষের মধ্যে পক্ষীবর তাম্রচুড় ও তাহার অণ্ড। পেয়র মধ্যে সুরা এতদ্ব্যতীত আরও বহুবিধ দ্রব্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে তবে সে সব দ্রব্যের উপর বাঙ্গালীর তত দৃষ্টি নাই। সুরাপান অতি ভীষণ দোষ, ইহার বিষময় ফল সকলের চক্ষের উপরে বর্ত্তমান। মানুষকে পশুর অধম করিতে যদি কেহ পারে তবে এই সুরা পূর্ব্বে সুরাপানে যত দোষ মনে হইত ইদানী ন্তন আর তত দোষ বলিয়া গ্রাহ্য হয় বলিয়া বোধ হয় না। ধনবানের এ দোষ দোষই নহে অন্যের পক্ষে দোষ হইলেও সামাজিক পাতিত্য নাই। সকল ঘরেই একজন না একজন সুরাপায়ী বিরাজ করেন কাযেই পাতিত্যের কথা তুলিলে চলে কই।

উক্ত নিষিদ্ধ পদার্থের শাস্ত্র এই।

"লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডু কবকানি চ।
অভক্ষ্যানি দ্বিজাতীনামমেধ্য প্রভবানি চ॥

মনু ৫।৫

লশুন (রসোন) গৃঞ্জন (গাজর ঘোড়ার খাদ্য) ও পেঁয়াজ কবক ছাতা ও বিষ্ঠাদি হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদ দ্বিজাতিগণের অভক্ষ্য।

শূদ্রের পক্ষে এ ব্যবস্থা নহে। যাহারা শূদ্রত্ব ত্যাগ করিয়া দ্বিজত্বের

প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহাদের ত এ ব্যবস্থা মানিতে হইবে। বৈষ্ণব হইবার সাধ আছে কিন্তু মহোৎসব দিতে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে কেন।

যে বিহঙ্গটি লইয়া এত মনোবাদ তদ্বিষয়ে এইভাবে উক্তি আছে—

"কলবিঙ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রামকুক্কুটং।
সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যূহং শুকসারিকে॥
প্রতুদান জালপাদাংশ্চ কোষষ্ঠি নখ বিষ্কিরান।

চড়ুই জলকাকহংস চক্রবাক গ্রাম্যকুক্কুট সারস রজ্জুবাল ডাক ও টেয়া সালিক পক্ষী খাইবে না—অন্যান্য মাংস ও আছে যাহা খাদ্য নহে।

ছত্রাকং বিড় বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম্যকুক্কুটং
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ॥ মনু— ৫।১৯

ছত্রাক গ্রাম্যশুকর লশুন গ্রাম্যকুক্কুট পলাণ্ডু এবং গৃঞ্জন ইচ্ছা করিয়া খাইলে দ্বিজাতিরা পতিত হন।

অতঃপর বৈধমাংসের কথা আছে। তাহার তালিকা সুদীর্ঘ এমন কি গণ্ডার এবং উট ও তাহার ভিতর রহিয়াছে—কিন্তু মনুষ্যের কেমন স্বভাব নিষিদ্ধ পদার্থের দিকেই চিত্তটা অগ্রে ধাবমান হয়।

মাংসের বৈধতা এবং অবৈধতা প্রবৃত্তি পন্থার ব্যবস্থা, যাঁহারা নিবৃত্তির অনুগামী তাহাদের এ ব্যবস্থাই নয়—তাঁহাদের নিষিদ্ধ আহার একেবারে পরিহর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন—

ন মাংস ভক্ষণে দোষে ন মদ্যে নচ মৈথুনে
প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা

বৈধ মাংস ভক্ষণে বৈধ পানে বৈধ ইন্দ্রিয় সেবায় দোষ নাই কারণ প্রবৃত্তিই এইরূপ কিন্তু এ সকল হইতে নিবৃত্তিই মহাফলপ্রদ (পুণ্যাত্মক।)

এখন শ্রীভীষ্মদেব আমিষাহারের বিষয় কি বলিতেছেন শ্রবন কর।

যাউক। তাঁহার প্রাণিহিংসা বিষয়ক মত সুবিস্তারে আমরা ইহার পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি এখন মাংস আহারের বিষয় বলিতেছেন।

রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহকে প্রশ্ন করিলেন "মাংসভক্ষকের কি দোষ হয়?" "স্বয়ং হনন করিয়া ভক্ষণ না করিলে বা অন্যের দ্বারা হত জীবের মাংস ভক্ষণ করিলে কি দোষ হয়? যে পরের জন্য পশু হনন করে এবং যে ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করে তাহার কি দোষ হয়?

উত্তরে ভীষ্ম বলিতেছেন—'যাঁহারা সৌন্দর্য্য অধ্যবসায় আয়ু, বুদ্ধি সত্ত্ব বল স্মৃতি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন সেই সমুদয় মহানুভব জনগণ কর্ত্তৃক হিংসা পরিত্যক্ত হইবে। হিংসার বিপক্ষে বহু ঋষিগণের মত আছে তাঁহারা অহিংসাকেই সাধু বলিয়া থাকেন। "মধুপান (সুরা) ও মাংস ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হওয়া দান যজ্ঞ ও তপস্যার তুল্য এ কথা বৃহস্পতি বলেন। যিনি শত সংবৎসর প্রতি মাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন আর যিনি মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত হয়েন, আমার মতে তাঁহারা উভয়ে সমান। মধু মাংস বিবর্জ্জনবশতঃ পুরুষ সতত সত্র দ্বারা যজ্ঞ করেন, সদা দানের ফলভাগী হয়েন এবং সতত তপস্বী হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় তাহাতে যে ফল হয় বেদ সকল তাদৃশ ফল প্রদান করিতে সমর্থ নহে এবং যজ্ঞ সমুদায় তদ্বিধ ফল প্রদানে যোগ্য হয় না। রস জ্ঞান হইলে মাংস পরিত্যাগ অতি দুষ্কর, সর্ব্বপ্রাণীব অভয় প্রদ এ ব্রত অতি উৎকৃষ্ট যিনি মাংস ভক্ষণ করেন না তিনি লোক মধ্যে প্রাণদাতা এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মাংসবিবর্জ্জনকে ধর্ম্ম স্বর্গ ও সুখের আয়তন জ্ঞাত করিবে, অহিংসা পরমধর্ম্ম অহিংসা পরম তপস্যা অহিংসাহি পরম সত্য— যাহা হইতে সত্য প্রবৃত্ত হয়।

"জীবিতার্থী হইয়া হত বা মৃত জীবগণের মাংস ভক্ষণ যে করে, তাহাতে হন্তাও যেমন সে ভক্ষণও তেমন।

কেহ অর্থ দ্বারা মাংস ক্রয় করে কেহ উপভোগার্থ ভক্ষণ করে কেহ বা বধ বন্ধন দ্বারা জীব হনন করে—মাংস ক্রয় ভক্ষণ ও হনন এই ত্রিবিধ বধ।

যে ব্যক্তি স্বয়ং মাংস ভক্ষণ না করিয়াও অভিপ্রায় দোষে ভক্ষকের অনুমোদন করে অথবা হননকারীকে অনুমোদন করিতে প্রবৃত্ত হয় সেও দোষে লিপ্ত হয়।

অতঃপর যজ্ঞাদিতে পশু হনন বিষয়ে বলিতেছেন—"প্রচার্থিগণ যে প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা মোক্ষাভিলাষী মানবগণের ধর্ম্ম নহে।" ভগবান মনুও তাহাই বলিয়াছেন।

বৃথামাংস অভক্ষ্য তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—

হে ভরতশ্রেষ্ঠ—বেদোক্ত প্রমাণযুক্ত ও পিতৃলোক সকলের প্রক্রিয়া কালে যে মাংস মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত প্রোক্ষিত ও অভ্যুক্ষিত হয় তাহাই পবিত্র হবিঃ স্বরূপ, ইহার অন্যথা হইলে বৃথামাংস হয়। তাহা অভক্ষ্য অস্বর্গ্য অযশস্য ও রাক্ষস ভক্ষ্য ইহা মনু বলিয়াছেন।

অনুশাসন পর্ব্ব—১১৫ অঃ।

উপরোক্ত ভীষ্মবাক্য মনুবাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। এখন মহাযোগী ভীষ্মের এবং ভগবান মনুর বাক্য অনুসরণ করা কর্ত্তব্য কি তাঁহাদিগের উপদেশ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আচারহীন বাকপটুগণের লাঙ্গুলহীন শৃগালের যুক্তি গ্রহণ করিব সুবুদ্ধি পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন।

---

* যাঁহারা শ্বেত মুখের ব্যবস্থা ভিন্ন দেশী যুক্তি শুনিলে কর্ণে অর্গল বদ্ধ করিয়া থাকেন তাঁহারা Kellog সাহেব প্রণীত living Temple পাঠ করিবেন। সে পুস্তকে মধু এবং মাংস ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক সারবান কথা আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দান ধর্ম্ম।

চিত্তের যে বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইলে মানুষ মানুষ হয় দান তাহার অগ্রণী। বৈরাগ্যের বহিরঙ্গ সাধন দান। বৈরাগ্য ত্যাগবৃত্তির চরম স্ফুরণ, দান ত্যাগের অন্তর্গত সুতরাং দানও বৈরাগ্যাত্মক ত্যাগই জগতের শান্তির প্রস্রবণ। ত্যাগীকে দর্শন করিলে মহা পুণ্য হয়, পৃথিবী ত্যাগীর পদরেণুতে ভূষিত বলিয়া এখনও রসাতলে যায় নাই। ত্যাগ এবং শান্তি ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। ত্যাগীর স্থান সর্ব্বোচ্চ। সাধারণ মানব সন্ন্যাসীর অত্যুচ্চ আসন স্পর্শ করিতে পারে না। স্বার্থ মলিন হৃদয় ত্যাগের নির্ম্মল জ্যোতিকে প্রতিফলিত করে না।

দানতত্ত্ব অতি গূঢ়, ত্যাগ হইলেই দান হয় না। জগতে প্রকৃত ত্যাগ অতি বিরল। কদাচিৎ দৃষ্ট হয় সেই জন্য প্রকৃত ত্যাগীও অতি বিরল।

দাতার মানসিক প্রকৃতি ভেদে দান তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশে সাধারণ বিশ্বাস এই যে, যে কোন প্রকারে দান হইলেই পুণ্য হয়,—বাস্তবিক তাহা নয়। দানে পাপও হয়। দান ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে সামাজিক হিসাবে দানের ক্রিয়া অতি গুরুতর। অবৈধদানে অলসতার সৃষ্টি হয় অলসতা হইতে দরিদ্রতা এবং দারিদ্র্য হইতে পাপ-স্রোতে প্রবাহিত হয়।

এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়াই লোক গুরু শ্রীকৃষ্ণ দানের নিগূঢ়তত্ত্ব অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন।

> দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে।
> দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং ॥
অদেশকালে যদ্দানম পাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং।

গীতা—১৭ অ ২১।২২।২৩।

যে দান কেবল কর্ত্তব্যানুবোধে দেশ কাল ও পাত্রের বিচারপূর্ব্বক এবং প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া করা হয় তাহাই সাত্ত্বিক দান। যে দান প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় অথবা স্বর্গাদি ফল কামনায় এবং দীনচিত্তে প্রদত্ত হয় তাহাই রাজসিক দান। যে দান অনুপযুক্ত দেশে অযোগ্যকালে এবং অপাত্রে ও যাহা সৎকার রহিত এবং অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রদত্ত তাহা তামসিক দান।

"দেশে কালে চ পাত্রে" এই তিনটি শব্দতেই দানের তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

ঐ শব্দ তিনটির ব্যাখ্যায় শঙ্কর দেশে পুণ্যকুরুক্ষেত্রাদৌ কালে সংক্রান্ত্যাদৌ পাত্রে ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারগ ইত্যাদৌ আচার নিষ্ঠায়েত্যর্থ বলিয়াছেন।

স্বামীও তাহাই বলেন—পাত্রের ব্যাখ্যায় পাত্রে তপঃ শ্রুত্যাদি সম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ। বলিয়াছেন——

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কৃত গীতার সংস্করণে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্কর এবং শ্রীধরকে উপহাস করিয়াছেন—কারণ তাঁহারা দেশকাল পাত্র তীর্থাদি গ্রহণাদি এবং ব্রাহ্মণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এই তাঁহাদের দোষ। তিনি শঙ্কর এবং স্বামীর ব্যাখ্যায় স্বজাতিপ্রিয়তা হেতু পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার যেরূপ শিক্ষা তিনি অবশ্য সেইভাবেই ঐ ব্যাখ্যা বুঝিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে

উপরোক্ত ভাষ্যে ভগবৎবাক্যে সংকীর্ণতার আরোপ হইয়াছে। তিনি বলেন যদি প্রাতঃকালে উঠিয়া অকালে এক দুঃখে পতিত মুসলমানকে দান করা যায় তা হলে কি দান ফল হবে না? কোন কর্ম্মই যখন ফলহীন নহে তখন তাঁহার দানের ফল নিশ্চয় হইবে। আপত্তি হবে তবে আর গ্রহণ সংক্রান্তি কুরুক্ষেত্র ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া বেড়াইবার আবশ্যক কি? আবশ্যক আছে বলিয়াই গীতায় দানের কথা বলা হইয়াছে নচেৎ উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। দান মাত্রেরই যদি এক ক্রিয়া হইত অর্থাৎ তারতম্য হীন এক পর্য্যায় ভুক্ত হইত—যখনই যথা তথা এবং যাকে তাকে দিলেই এক ভাবের ফল উপস্থিত হইত তা হলে দানের এত মাহাত্ম্য থাকিত কি? দু এক দানের অবস্থা বিবেচনা করিলেই বিষয় বুঝিতে সুগম হইবে। একখানি দান পত্র এই রূপ———

কস্য দান পত্র কার্য্যানিদঞ্চাগে——

আমি শ্রী—পিতা ৺—ইত্যাদি। আমার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছে। আমি ক্রমান্বয়ে চারিবার দারপরিগ্রহ করিয়াছি কিন্তু এমনি হতভাগ্য যে অদ্যাপি আমার কোন সন্তান হয় নাই। আমার চতুর্থা স্ত্রী শ্রীমতী—দাসী যাঁহার বয়ঃক্রম এখন ২৫ বৎসর এবং যিনি অতি সুশীলা ও পতি-গতপ্রাণা ও অতীব বুদ্ধিমতী তিনি কিছুকাল হইতে আমার সম্পত্তি লইয়া ভবিষ্যতে জ্ঞাতিগণের সহিত কোন গোলমাল উপস্থিত না হয় এই বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। আমিও সে উপদেশের মূল্যবানতা প্রত্যক্ষ করিয়া জীবদ্দশাতেই সমস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতেছি।

আমার সমগ্র সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর ও নগদে ২০ লক্ষের কিঞ্চিদধিক। আমি বহু উপায়ে এই সম্পত্তি আহরণ করিয়াছি, যাহাতে ইহার সদ্ব্যবহার হয় এবং উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হয় তজ্জন্য সজ্ঞানে এবং কাহার দ্বারা প্রতারিত বা প্রণোদিত না হইয়া স্বেচ্ছায় এবং উৎফুল্ল

হইয়া এবং বিধিমত আইনজ্ঞগণের সুপরামর্শ লইয়া আমার চতুর্থা স্ত্রী শ্রীমতীকে দান করিলাম। আজ হইতে আমার সমস্ত স্বত্ব নষ্ট হইয়া আমার ত্যক্ত সম্পত্তিতে শ্রীমতীর পূর্ণ স্বত্ব আবির্ভূত হইল। উহাতে আমার বা আমার পৈতৃক উত্তরাধিকারী কাহার কোন প্রকার দাওয়া বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে চলিবে না।

আমার পিতৃব্য এবং ভ্রাতারা অতি মন্দ লোক তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে আমার স্ত্রীর বাস করা অতি সুকঠিন এবং তাহারা আমার স্ত্রীর ও আমার অতিশয় মিথ্যা এবং অযথা নিন্দাবাদ করে এ কথা আমার স্ত্রী আমাকে প্রায়ই বলিয়া থাকেন। সুতরাং তাহাদিগকে সম্পত্তির কোন অংশ দেওয়া আমার অভিমত নহে।

ভগবান না করুণ যদি অল্পদিনের মধ্যে আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমার কনিষ্ঠ শ্যালক শ্রীযুক্ত—তাঁহার ভগিনীর বিষয়ের অধ্যক্ষস্বরূপ থাকিবেন এবং মাসিক ৫০০ শত মুদ্রা পারিশ্রমিক পাইবেন।

এতদর্থে—সাক্ষীগণের সমক্ষে স্বহস্তে স্বাক্ষর করিলাম।

অল্পদিন পরেই প্রকাশ পাইল দাতার আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে। শালা বাবু ম্যানেজার হইয়া তাঁহার ভগিনীকে লইয়া কলিকাতায় আছেন।

পরে জানা গেল ভগিনা তাহার ভ্রাতাকে সম্পত্তির অধিকাংশ দান করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন।

কিছুদিন পরে ভ্রাতা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই দিনকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিনে পরিণত করিয়া নগরের উত্তরাংশে বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। আরও কিছুদিন পরে সংবাদপত্রে দেখা গেল শ্রীমান ভ্রাতা দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ ধারায় অভিযুক্ত হইয়া কিয়ৎ-কালের জন্য শ্রীঘরে গিয়াছেন।

আর একখানি দান পত্রের মর্ম্ম এইরূপ—

আমি শ্রী———ইত্যাদি।

বাল্যকাল হইতে স্বধর্ম্মেরত থাকিয়া ভগবৎ কৃপায় এই সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছি। বার্দ্ধক্য আগতপ্রায়, অধিককাল কর্ম্ম ভূমিতে থাকিতে হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয়না সুতরাং সময় এবং শক্তি থাকিতে বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করা উপযুক্ত মনে করি। এতদর্থে অদ্য শুভদিনে ভগবৎনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া নারায়ণ এবং ব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া ফল ভগবতে অর্পণ করিলাম। সমগ্র সম্পত্তি নিম্নলিখিত ভাবে ব্যয়িত হইবে।

আমার জন্ম গণ্ডগ্রামে যেখানে দেবমন্দির নাই—বিদ্যালয় নাই ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা ব্যবস্থা নাই, পানীয় জলের বড়ই অভাব। কিয়ৎ পরিমাণে এই অভাব পূরণের নিমিত্ত ভগবৎ দত্ত এই সম্পত্তি এইভাবে নিয়োজিত হইবে।

১। বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং বিগ্রহের বিধিমত ভোগ রাগাদির এবং প্রসাদভোজী অতিথিদিগের জন্য—বাৎসরিক ২ লক্ষ।

২। দেশের বালক ও যুবাগণের সমকালীন শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একটি বিদ্যালয়। যাহার নাম হইবে ব্যাস বিদ্যালয়। তাহাতে থাকিবে।

(ক) ব্রহ্মচর্য্য এবং ত্যাগ শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি যোগাশ্রম।

(খ) বেদ বেদান্ত দর্শন ও অধ্যাত্ম বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটি বৈদিকাশ্রম।

(গ) জড়বিজ্ঞান এবং রসায়নাদি বিদ্যার চর্চ্চাকল্পে একটি বিজ্ঞানাশ্রম।

(ঘ) সাধারণ বিদ্যা শিক্ষার জন্য যথা কাব্য, ইতিহাস, গণিত ইত্যাদির জন্য একটি চতুষ্পাঠী।

(ঙ) একটি শিল্পবিদ্যালয়—কলাবিদ্যা ইহারই অন্তর্গত হইবে।

(চ) শ্রমশিল্পর এক আলয়।

(ছ) কৃষিবিদ্যার আগার।

(জ) আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার মন্দির দেশী এবং বিদেশীয় যত প্রকার চিকিৎসা তন্ত্র আছে তাহার শিক্ষা ও আলোচনার ব্যবস্থা।

(ঝ) আর্ত্ত এবং ব্যাধিতের সেবাসদন।

(ঞ) ব্যায়ামশালা।

(ট) ধর্ম্মানুমোদিত স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য জাতীয় এবং সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা এতদর্থে এককোটি মুদ্রা।

(ছ) অক্ষম ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ এক সমিতি তজ্জন্য ২০০০০৲।

এই দুইখানি দান পত্রের দান ফল কি এক? বলিতে হইবে কি যে প্রথমোক্ত দানে সমাজে পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোক হিতকর কিছুই হয় নাই—অপাত্রে দান হওয়ায় কি বিষময় ফল বলিয়াছে। ইহার জন্য দায়ী কে, অবশ্যই দাতা।

দ্বিতীয় দান পত্রখানি পড়িলে চিত্ত প্রসন্ন হয় না কি? গৌরবে আনন্দাশ্রু ঝরে না কি?

অতঃপর বিনিময়ে অনেক দান হয়। ভয়েও হয়, উপাধির লালসায় প্রাণের দায়ে অভিমানের বশে যথা সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইবার জন্য দান হয়। এসকল দান অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে দান নহে সুতরাং নিকৃষ্ট দান।

দানের প্রকারেও উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভাব থাকে, এমন দান আছে যাহার ক্রিয়া বহুকাল স্থায়ী এবং বহুলোকের উপকারে আসে। অনেক দানের ফল কেবল শরীরের উপর যথা ভোজ্য ভোজ্য দান পুনশ্চ অনেক দানের ফল দেশের জ্ঞানবৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। শেষোক্ত দান যে উৎকৃষ্টতর তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আবার মনে করুণ কোন ধনবান ঘোষণা করিলেন যে ব্যক্তি রঙ্গালয়ে যাইবার ইচ্ছা করিবেন তিনি বিনাব্যয়ে যাইতে পারিবেন আর তিনি তাহার ব্যয়বহন করিবেন। এওত দান কিন্তু এ দানের মূল্য কি?

অপাত্রে দান অতি ভয়ানক। তাহার ফল কেবল ব্যক্তিগত নহে সমাজ এবং জাতির ভবিষ্যতের সহিত ঘন সংশ্লিষ্ট। অনায়াসে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সকলেই চাহে। আর যদি বিনাশ্রমে আহারের সংস্থান হয় তবে কর্ম্মের দিকে কেহই যাইবে না। কেবল খাইবে আর শুইবে তাহার ফল হইবে যে দেশে একটি প্রকাণ্ড অলস জাতির সৃষ্টি। অলস হইলে দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী দরিদ্র জাতির সম্মান জ্ঞান থাকে না সত্যের উপাসনা থাকে না কাযেই এমন পাপ নাই যাহাতে তাহার প্রবৃত্তি দৌড়িবে না। "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা" এ কথাটি বড় মূল্যবান। একের উপার্জ্জনে দুয়ের অধিকার হইলেই অভাব বৃদ্ধি হয়। অভাব অবশ্য পূর্ণ না হইলেই অশান্তির উদয় হয়; শান্তিহীনতা হইতে নানাবিধ সামাজিক বিপ্লব দেখা দেয়।

জাতি পতিত হইলে তাহাতে প্রতিভাবান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন না। জাতীয় অধঃপতনের সর্ব্বপ্রধান কারণ অলসতা ইহার সহচরী বিলাসিতা, আর তাহার কন্যা অকর্ম্মণ্যতা ইহারা সর্ব্বদা। একত্রেই অবস্থান করেন।

ভারতের ইতিহাসে দানের অপব্যবহারের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভিক্ষা ব্যবসায়ী কতলোক আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রজা গণনায় নাকি স্থির হইয়াছে যে এইরূপ কর্ম্মহীন ব্যবসায়ী ভিক্ষুক পঞ্চাশৎ লক্ষের উপর আর তাহারা প্রায়ই হিন্দু। এই অর্দ্ধক্রোর কর্ম্মঠ ঔদরিকের আহার অবশ্য অপর হিন্দুগণকে আহরণ করিতে হয়। ভারতে দারিদ্র্য চির বিরাজিত থাকিবে না ত কোথায় থাকিবে?

ব্রাহ্মণকে দিলে কি উপকার হইবে তাহা ত ভাল প্রকাশ পাইল না।

ব্রাহ্মণ বলিলে যাহারা সূপকারের কার্য্যে ব্রতী আছেন, শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন এবং লাভের প্রত্যাশায় ধনবানের বা ক্ষমতাবানের বিনামাশোভিত পদে যথেষ্ট স্নেহ পদার্থের সুব্যবহার করিতেছেন আর উৎসবের সময় দক্ষিণার মাত্রা চড়াইবার জন্য আপনাকে সদাচারী বলিয়া প্রচার করিতেছেন—ইহাদের বুঝায়না, এবম্বিধ ব্রাহ্মণকে দান অপাত্রে দান ও নরকের কারণ হয়।

বজ্ঞবিৎ বেদ পারগ আচার নিষ্ঠ ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণ এরূপ ব্রাহ্মণকে দান অতি ভাগ্যের কথা এবং সমাজের প্রভূত উপকারী।

প্রকৃত ব্রাহ্মণের ইতর, পর পক্ষপাতিত্ব নাই বিলাসিতা নাই, তিনি স্বার্থের দ্বারা অনুবিদ্ধ নহেন প্রবৃত্তি সমূহ সম্যক নিগৃহীত সর্ব্বভূতহিত তাঁহার ব্রত তাঁহাকে দান করিলেই ত দত্ত বিত্ত সমাজের মঙ্গলার্থে ব্যয়িত হইবে। আমি বিষয়ান্ধ ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞান অতি সামান্য কাহাকে এবং কোন বিষয়ে দান করিলে উৎকৃষ্ট দান হইবে জানিনা কিন্তু ব্রাহ্মণ উত্তম জানেন তাঁহার হস্তে বিষয় ন্যস্ত করাইত উপযুক্ত এবং বুদ্ধিমানের কার্য্য।

দেশ এবং কাল বিবেচনা ও অত্যাবশ্যক; আধ্যাত্মিক নিয়ম এই যখন মন কোন কার্য্যের সিদ্ধির জন্য উন্মুখ হয় তখন সে কার্য্য করা উচিৎ তাহাতে মনের বিকাশ সাধন হয়। তীর্থাদি স্থানে এবং গ্রহণাদি কালে সকলেই সৎকার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া চিত্ত সৎকার্য্যের দিকে ধায় সেই সময় সদনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল অধিক হয়।

যুদ্ধের সময় সকলকে যুদ্ধে নিরত দেখিলে কাপুরুষতা পলায় হৃদয়ে বীরত্বের আবির্ভাব হয় ইহা প্রত্যক্ষ। বাহিক প্রকৃতি আভ্যন্তরীণ ভাবের উদ্বোধন করায় এ কথা স্বীকৃত। হিমাদ্রির অভ্রভেদী তুষারময় বিরাট দেহ এবং নীলসিন্ধুর শান্তগাম্ভীর্য্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে

কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় পুরুষোত্তমে রথ যাত্রায় কাশীতে বিশ্বেশ্বরের আরতি সময়ে নাস্তিকেরও আস্তিকত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়।

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বলিতেছেন "যাঁহারা অক্রোধন ধর্ম্ম পরায়ণ সত্যনিরত ইন্দ্রিয় দমনে রত তাঁহারাই সাধু ব্রাহ্মণ তাদৃশ বিপ্রগণকে দান করিলেই মহৎ ফল হয়। যাহারা অভিমানী নহেন, সকলই সহ্য করেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বিজিতেন্দ্রিয় সর্ব্বভূতহিতে নিরত এবং সকলের হিত কামনা করেন তাঁহাদিগকে দান করিলে মহৎফল হয়। যাহারা অলুব্ধ শুচী বেদজ্ঞ, লজ্জাশীল সত্যবাদী ও স্বকর্ম্ম নিরত তাহাদিগকে দান করিলে মহাফল হয়। যে দ্বিজবর বেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন করেন এবং যজনযাজনাদি ষটকর্ম্ম সাধনে রত ঋষিগণ তাঁহাকে দানের পাত্ররূপে নির্দ্দেশ করেন।

গুনার্হ পাত্রকে দান করিলে দাতা সহস্রগুণ ফললাভ করেন। প্রাজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ সচ্চরিত্র ও শীল সম্পন্ন একজন ব্রাহ্মণই সমস্ত কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ, তাদৃশ বিপ্রকে গো অশ্ব অর্থ অন্নও অন্যান্য দ্রব্য সকল দান করিবে তাহা হইলে পরলোকে শোক করিতে হইবে না। ইহলোকে যখন একমাত্র দ্বিজোত্তম সমস্ত কুল উদ্ধার করেন তখন অনেকে যে উদ্ধার করিবেন তাহাতে আর সংশয় কি। সুতরাং পাত্র বিবেচনা করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গত গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণের নাম শ্রবণ করিলে তাঁহাকে দূরদেশ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক সৎকার করিয়া সর্ব্বতোভাবে পূজা করিবে।"

অনুশা—২২ অঃ।

দান বিষয়ে ভীষ্মমত শ্রীকৃষ্ণ মতেরই পুনরুক্তি মাত্র। হইবারই কথা দানের গূঢ়তত্ত্ব দেশে সকলে ভুলিয়া এক তামসিক ক্রিয়ার অনুসরণ

করিতেছেন। এ বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি পড়িলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। দান করিতেছি অথচ তাহার ফল হইতেছে না বড় দুঃখের কথা। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্যে পণ্ড হয় এ কথা বলাই বৃথা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যোষিদ্ধর্ম্ম কথন।

অনুশাসন পর্ব্বে ভীষ্মের মুখে স্ত্রীগণের প্রতি ব্যবহার এবং স্ত্রীগণের ধর্ম্ম বিষয়ক কথা কিছু আছে। এ কথা গুলির মৌলিকতা বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে কারণ কথা গুলিতে কিছু নূতনত্ব নাই মনু প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুকরণ মাত্র ভীষ্মের নিজের মত হইতে ও পারে না হইতে পারে। তবে যখন তাঁহার মুখে দেওয়া হইয়াছে তখন পরিত্যাগ করিতে পারিনা, বিশেষতঃ কথাগুলির শেষ ভাগ আধুনিক সমাজে বড় বিবদমান।

অনেকে বলিতে পারেন যে ভীষ্মের মুখে স্ত্রীলোকের কথা অন্ধের হস্তীদর্শনের ন্যায় যিনি আজীবন স্ত্রীলোকের কোন ধার ধারিলেন না তাঁহার স্ত্রীজাতির উপর মন্তব্য প্রকাশ অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। ধনুর্ব্বাণের কথা, যোগজাগের কথা এবং অন্যান্য নীতিকথায় তাঁহার বহুদর্শিতা আছে কিন্তু যোষিৎ বিষয়ে তিনি অজ্ঞ।

ভীষ্ম বলিতেছেন—"রমণীগণ নিয়ত পূজ্য ও লালয়িতব্য, যে গৃহে কামিনীকুল পূজিত হন দেবতারা তথায় অনুরক্ত রহেন; আর যে গৃহে

তাঁহারা পূজিত না হন তথায় সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হয়। যে সময় কামিনীগণ শোভ প্রকাশ করেন তৎকালে সেই কুল বিনষ্ট হয়। রাজন কামিনীগণ যে কুলকে অভিসম্পাত করেন সে সমস্ত গৃহ বিচ্ছিন্ন হয় শোভাহীন হয় এবং বৰ্দ্ধিত হয় না।”

স্ত্রীগণ সম্মানভাজন অতএব হে মানবগণ তাহাদিগকে সম্মান কর। স্ত্রীহেতু ধর্ম্ম ও রতিভোগ হইয়া থাকে তোমাদিগের পরিচর্য্যা ও নমস্কার স্ত্রীর আয়ত্ত হউক। অপত্য উৎপাদন, জাতপুত্রের পরিপালন এবং লোকযাত্রার প্রীতির নিমিত্ত স্ত্রীকেই কারণ অবলোকন কর। ইহাদিগকে সম্মান করিলে সমস্ত কার্য্য প্রাপ্ত হইবে। বিদেহ রাজদুহিতা স্ত্রীধর্ম্ম বিষয়ে বলিয়াছেন “স্ত্রীগণের কোন যজ্ঞ ক্রিয়া নাই, শ্রাদ্ধ নাই, উপবাস নাই, স্ত্রীগণের নিজ পতি শুশ্রূষাই ধর্ম্ম তদ্দ্বারাই তাঁহারা স্বর্গ জয় করিয়া থাকেন।”

এতদূর পর্য্যন্ত ত বড় ভাল কথাই ভীষ্মদেব বলিলেন, স্ত্রীগণের তাঁহার উপর বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই।

কৌমার কালে পিতা কন্যাকে রক্ষা করিবেন যৌবনকালে ভর্ত্তা স্ত্রীকে রক্ষা করিবেন—স্থবিরাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করে স্ত্রী কখন স্বাধীনতা লাভের যোগ্যা নহে। স্ত্রীগণ শ্রীস্বরূপ ঐশ্বর্য্য ইচ্ছু জনগণ তাঁহাদিগের সম্মান করিবেন। হে ভারত স্ত্রীলোক পালিত ও সুরক্ষিত হইলে লক্ষ্মী-স্বরূপ হন।”

অনুশাসন প—৪৬ অঃ।

আদ্যোপান্ত স্ত্রীলোকের গুণ কীর্ত্তন কেবল স্বাধীনতা বিষয়ক উক্তিটা হঠাৎ দেখিলে অঙ্গনাগণের বিরুদ্ধে বলিয়া বোধ হয়। এই বচনটি হিন্দু বর্ব্বরতার প্রমাণ বলিয়া অনেক সময়ে দেশী এবং বিদেশী সমাজ সংস্কারক গণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

মূল বচনটি এই—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যম্ ইতি ॥

মনুঃ ৯৷৩।

মহাভারতে এই বচনটি অপরিবর্ত্তিতভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই কথাটি মনুর ৫ অধ্যায়ে ১৪৮ শ্লোকে এইভাবে আছে।

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণি গ্রাহস্য যৌবনে
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রীস্বাতন্ত্রতাং ॥

বালিকা অবস্থায় পিতা রক্ষা করিবেন, যৌবনে স্বামী এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রেরা রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র বাস অনুচিৎ।

স্ত্রীগণ স্বভাবতই দুর্ব্বল এবং আত্মত্রাণে অক্ষম পদে পদে তাহাদের বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা—একজন রক্ষা না করিলে তাহাদের অপমান এবং অপবিত্রতা হইতে রক্ষার উপায় ত দেখা যায় না।

বালককালে পিতা রক্ষা না করিলে কি প্রকারে সে বাঁচিবে—এবং কাহার গলগ্রহ হইবে। সকল জাতিতে ত শৈশবে কন্যাকে পিতা রক্ষা করেন।

তৎপরে যৌবনে পবিত্রভাবে স্বামী ভিন্ন অন্য কেহ স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারে কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি? বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রইত জননীর একমাত্র অবলম্বন হওয়া উচিৎ এ অবস্থায় তাঁহার অন্যত্র বাস কি সুখের না অতি কষ্টের? বৃদ্ধ মাতাকে কে সেবা করিবে? পিতা স্বামী এবং পুত্রের নিকট বাস কি পরাধীনতা?- তবে স্বাধীনতা কি?

স্ত্রী এবং পুরুষ স্থষ্টিতে স্রষ্টার কোন এক উদ্দেশ্য আছে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। সে উদ্দেশ্য কি? জীবপ্রবাহ নহে কি? পুরুষ এবং স্ত্রী ব্যষ্টিভাব পরিত্যাগ করিয়া যদি সমষ্টিভাবে চিন্তা করা যায়—তাহলে

দাঁড়ায় ক্ষেত্রত্ব এবং বীজত্ব। আদিতে এই যুগলভাব বর্ত্তমান ইহা অপরিহার্য্য। পুরুষ এবং স্ত্রী এই সনাতন বিধির ব্যষ্টি প্রকাশ মাত্র। জীবে এবং উদ্ভিদে এই মৈথুনীভাবের পূর্ণ প্রকাশ অনুভব করা যায়।

বীজে এবং ক্ষেত্রে নৈকট্য না হইলে সৃষ্টি প্রবাহ থাকে না। এই মিলন সংঘটন জন্য স্রষ্টা কতকগুলি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। উদ্ভিদ অচল কি করিয়া মিলন হইতে পারে; অপরের দৌত্য ভিন্ন উপায় নাই, ভ্রমরাদি সেই দূত। পাছে ভ্রমর পুষ্পে না যায় সৃষ্টিতে ব্যাঘাত হয় তাই তাহার পারিশ্রমিক রূপে পুষ্পে মধুকোষ রক্ষিত। মধুপান তাহার স্বভাব—তাহার উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই—বিবশ হইয়া সে ফুলকুলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে। সে কি বলিতে পারে যে আর আমি মধুপান করিব না—আমি অদ্যাবধি তৈলপান করিয়া জীবন ধারণ করিব। এখানে তাহার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নাই।

জীব সচল তাহার মধ্যাগের প্রয়োজন নাই স্রষ্টা এমন এক প্রবল শক্তি তাহাতে অর্পণ করিয়াছেন যাহার তাড়নায় সে মিলনের দিকে ধাবমান হয়।

উপযুক্তকালে ক্ষেত্র বীজকে আহ্বান করে। অনেকে আপত্তি করিবেন যে বীজেই অন্বেষণ ভাব বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আকিঞ্চন নাই।

প্রাকৃতিক তত্ত্ব চিন্তা করিলে তাহা বোধ হয় না। অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন প্রাকৃতিক কার্য্য নয় কারণ অপচয় প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে। ক্ষেত্র উপযুক্ত কিনা ক্ষেত্রই তাহা প্রকাশ করিবে বীজকে অন্বেষণ করিতে হইলে অনেক সময় অপচয় হয়; তাহাতে সৃষ্টিক্রিয়া প্রতিহত হইবার সম্ভবনা।

নিম্ন শ্রেণী জীবের রতি বিবেচনা করিলে ক্ষেত্রের আকিঞ্চনত্ব প্রমাণ হয় ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। শক্তির অপব্যবহারে মনুষ্যে বীজের অন্বেষণ ভাব উপস্থিত বলিয়া বোধহয়—কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক।

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাঁহাদের অভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, বীজের বা পুরুষের নৈষ্কর্ম্ম এবং ক্ষেত্রের বা প্রকৃতির চাঞ্চল্য। প্রকৃতির চাঞ্চল্যের আর এক কারণ এই যে চঞ্চলতা ভিন্ন বিকার বা প্রসব ধর্ম্ম উপস্থিত হইতে পারে না। চঞ্চলতা না থাকিলে পরিণাম হয় না—যদি ক্ষেত্রে চঞ্চলতা বা কম্পনভাব না থাকে তাহলে বীজ ক্ষেত্রস্থ হইয়া নষ্ট হইবে। বীজে সূক্ষ্মরূপে জীবত্ব অধিষ্ঠিত বটে কিন্তু ক্ষেত্রের সহায়তা ব্যতীত তাহার প্রকট হইবার সম্ভবনা নাই; যদি তাহা হইত তবে ক্ষেত্রস্থ হইবার পূর্ব্বেই সে প্রকটভাব ধারণ করেনা কেন?

এখন বুঝা গেল যে ক্ষেত্রে চঞ্চলতা বা আকিঞ্চন স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিত। যে শক্তি দ্বারা এই আকিঞ্চন প্রকাশ পায় তাহার নাম "প্রজণঃ" বা প্রজোৎপত্তি হেতু।

কেবল বীজগ্রহণ এবং জনন ক্রিয়ার শেষ হইলেই ক্ষেত্রের দায়িত্ব শেষ হয় না। পালন বা রক্ষা ধর্ম্ম না থাকিলে সৃষ্টির প্রবাহ বা একতানতা থাকে না সুতরাং পালন ধর্ম্ম ক্ষেত্রের, বীজের নহে। স্তন্যে পালন ব্যক্ত।

ক্ষেত্রের বিশুদ্ধতা না থাকিলে প্রজনন ক্রিয়া সুচারূপে এবং জাতকের পুষ্টি হয় না। বিকৃত বীজোৎপন্ন জাতকের পালনও কষ্টকর হয়।

মানবজাতিতে স্ত্রীত্ব এবং পুংত্বের প্রকাশ স্ত্রী ও পুরুষে। প্রজনন শক্তিতে স্ত্রী এবং পুরুষের নৈকট্য অবশ্যম্ভাবী এবং ধর্ম্ম। মিলনের ব্যঘাত যে কারণেই হউক অস্বাভাবিক। যদি স্ত্রী এই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানা হন তিনি পাপার্জ্জন করেণ পুরুষেরও তদ্রূপ।

উক্ত প্রাকৃতিক মিলনের অপব্যবহারে প্রজনন শক্তির হানিকর হয়, অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি ও অতি ব্যবহারে দুষ্ট ফলোৎপাদন করে যথা—অতিভোজন, অতিনিদ্রা, অতি ব্যায়াম ইত্যাদি।

বৈধসীমার মধ্যে এই শক্তি অনুশীলিত হইলে অতি উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ

হয়। বৈধগণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখিবার জন্য শাস্ত্র প্রজন শক্তির সম্বন্ধে অনেক নিয়ম করিয়াছেন। সেই নিয়ম গুলির মধ্যে প্রধান বিবাহ। বিবাহ সমাজের অতি মঙ্গলময় ব্যবস্থা, প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রকৃতির আজ্ঞা পালন মাত্র। মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃতির সহায়ক হওয়া কর্ত্তব্য নচেৎ পাপ হয়; সুতরাং অবিবাহিত থাকিবার অধিকার কাহারও নাই। এ পর্য্যন্ত স্ত্রী এবং পুরুষের স্বাধীনতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পালনধর্ম্মেও স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা নাই, তাঁহারা পালন করিব না প্রতিজ্ঞা করিলে ভবিষ্যৎ জাতি প্রসব গৃহেই নিধন প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান ফরাসীজাতি স্ত্রীগণের বিবাহ বিষয়ে স্বাধীনতা হেতু—প্রজা উৎপত্তি প্রচুর না হওয়ায় দুর্ব্বল হইতেছেন।

প্রজন শক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা সাধারণ মনুষ্যের দুষ্কর কার্য্য। বৈধ উপায়ে শ্রদ্ধাবান না হইলেই ব্যাভিচার প্রবল হইবে। ব্যাভিচার প্রবল হইলেই জাতি ধ্বংস মুখে পতিত হইবে।

ব্যাভিচারে ক্ষেত্র যত অপকার গ্রস্ত হয়, বীজ তত হয় না। কারণ ক্ষেত্রে পরিণাম বা অবস্থান্তর উপস্থিত হয়। বীজে তাহা হয় না। ব্যাভিচার নিবারণ সমাজ স্থিতির অনুকূল তাহাতে বোধহয় মত বিরোধ নাই।

ব্যাভিচার নিবারণ করিতে হইলে তাহার কারণ উৎপাটিত করিতে হয় অথবা কারণ হইতে দূরে থাকিতে হয়। শাস্ত্রে ব্যাভিচারের ষট কারণ উল্লিখিত আছে যথা——

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যাচ বিরহোটনং।
স্বপ্নোন্যগেহ বাসশ্চ নারী সংদূষাণিষট॥

মনু—৯।১৩।

মদ্যপান, অসৎ পুরুষ সংসর্গ, পতির বিরহ (অনুপস্থিতি বা স্থানান্তর)

যথা তথা ভ্রমণ অকাল নিদ্রা এবং পরগৃহ বাস—ব্যাভিচারের এই ছয় কারণ।

আমরা ত ইহার মধ্যে কিছুই অন্যায় দেখিতে পাই না; সুরার মোহিণী শক্তির কথা কি অধিক বলিতে হইবে—নীতি কথা পুস্তকে অধ্যয়ন করিয়া কাহাকেও মদ্যপান হইতে বিরত হইতে কেহ দেখিয়াছেন কি? বাল্যকালে পিতার বা তৎস্থানীয় ব্যক্তির কঠিন তাড়না ব্যতীত রক্ষা পাইবার উপায় কি আছে?

যে অবস্থায় কামিনীর পতিতে অনুরক্তি কম হয় সে সময় দুর্জ্জনসংসর্গ কি ভয়ানক তাহার পরিচয় দিতে হইবে কি?

আর দিন নাই, রাত নাই, মাথার উপরে কেহ দেখিবার নাই এরূপ ভাবে যুবতী স্ত্রীর যথা তথা অটন ব্যাভিচার প্রবৃত্তিকে উৎকৃষ্ট সুযোগ অর্পণ বই আর কি? অকাল নিদ্রায় বৃথা চিন্তার আবির্ভাব হয়, মন কর্ম্মে ব্যস্ত না থাকিলেই কুচিন্তায় রত হয়।

পরগৃহবাস ত এক প্রকার ব্যাঘ্রের বিবরে উপস্থিত হওয়া—তথায় রক্ষা করিবার কে আছে?

এ সকল কারণ হইতে বাঁচিতে হইলে স্ত্রীলোকের সর্ব্বাবস্থাতেই পুরুষকর্তৃক সুরক্ষিত হওয়া উচিৎ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তবে যে সকল সমাজে ব্যাভিচার একটা দোষের কার্য্য বলিয়া গণ্য হয় না সে সমাজের জন্য এ ব্যবস্থা নয়—কিন্তু অবমাননা এবং পিশাচ-গণের আক্রমণ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যও ত কাহারও উপর নির্ভর করিতে হইবে। স্বাধীনতা কোথা থাকিল? স্বাধীনতা অর্থে যদি স্বেচ্ছা চারিতা হয়, যদৃচ্ছা আহার, যদৃচ্ছা বিহার এবং প্রাকৃতিক দায়িত্বের প্রত্যাখ্যান—তবে তাহাকে দূর হইতে নমস্কার করা বিধেয় নয় কি।

যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী তাঁহারা স্ত্রীগণের কি বিষয়ে স্বাধীনতা

প্রার্থনা করেন? পাশ্চাত্য দেশে "ভোট" প্রার্থিনীগণ একরূপ স্বাধীনতার আভাষ দিয়াছেন—সে ত প্রকৃত রাজদ্রোহিতা। সভাসমিতিতে গমন করা বক্তৃতা করা—স্থান বিশেষে নৃত্য করা এ সকল কর্ম্মে স্বাধীনতার প্রকাশ ত কিছুই দেখি না প্রগল্‌ভতার বিশিষ্ট বিকাশ। ক্ষণিক বাহুবা দ্বারা চিত্তকে আত্মাভিমানে মলিন করা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এতাবতা মনুবাক্য যথার্থ কিনা তাহা সুধীগণ ধীরচিত্তে চিন্তা করিবেন।

অনুশাসন পর্ব্বে আলোচনার যোগ্য আর অধিক কিছু নাই—শ্রাদ্ধ দানাদি চাতুর্বর্ণ ধর্ম্মের শাস্ত্রবিধিতে পূর্ণ সে সমস্ত মনুবাক্যেরই প্রতিধ্বনি ভীষ্মের সম্পর্ক বড় কম।

আজকাল ইয়োরাপ খণ্ডে এবং আমেরিকায় সভ্যতার অতি প্রবলতায় এবং শিক্ষার অতিস্ফুরণে এক অভিনব রমণী সমাজের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহারা স্ত্রী এবং পুরুষের সমানধিকার বাদিনী। প্রাকৃতিক দায়িত্ব এবং তৎ পালনের ঔচিত্য ইঁহাদের নিকট বাতুলতা। ইহারা যথার্থই প্রমোদা ইহাদের মনে সংসারে আমোদ আহরণ করিতে হইলে যত উপায়ের আবশ্যক সেই সমস্তই স্বাভাবিক অন্যথা প্রবৃত্তির নিগ্রহাদি কর্ম্ম বৃদ্ধদিগের ভ্রম মাত্র। স্ত্রী এবং পুরুষ সংসারে আসিয়াছে ভোগের জন্য পুরুষ অধিক ভোগ করিবে কেন? জগতে পুরুষের নাম থাকিবে—আর তাহাদের নাম বিলুপ্ত হইবে কেন? এ বিবাদের একটা "হেস্ত নেস্ত" না করিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইবেন না।

এ বিবাদে সভ্যতা এবং শিক্ষা সাগরে যে আবর্ত্ত উঠিয়াছে তাহা যদি পাশ্চাত্য দেশেই আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে আর আমাদের তত চিন্তিত হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু ভারত ললনাগণও যে সেই ঘোরাবর্ত্তে ঝাঁপ দিবার জন্য বদ্ধপরিকরা হইয়াছেন—ইহাতেই বড় ভয়।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভীষ্ম প্রয়াণ।

প্রয়াণকালে মনসা চলেন, ভক্ত্যাযুক্ত যোগ বলেন চৈব
ভ্রর্বোমধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক পরং পুরুষমুপৈতিদিব্যং ॥
সর্ব্ব দ্বারানি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থি তো যোগ ধারণাং ॥
ওঁমত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যহারণ মামুনস্মরণ
যঃ প্রজাতি ত্যজন দেহং সযাতি পরমাং গতিং ॥

গীতা—৮ অ—১০।১২।১৩।

দেব, দ্বিজ, গুরু, পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ লইয়া এবং কোটি ভারত প্রজার ব্যোম ব্যাপী অপকট জয়ধ্বনির সহিত সম্রাট যুধিষ্ঠির মহাযুদ্ধের পর মহানগরী হস্তিনাপুরে পঞ্চাশৎশর্ব্বরী অতিবাহিত করিলেন। আর ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ভারতের অক্ষয় গৌরবস্তম্ভ অনন্তজ্ঞানী সাধক শ্রেষ্ঠ পরমভাগবত—দেবব্রত ভীষ্ম ব্যাস, নারদ অসিত দেবল, প্রভৃতি মহর্ষিগণ হতাবশিষ্ট ভূপালগণ কর্ত্তৃক উপাস্যমান হইয়া নিশিত শরাগ্রে দৈববাঞ্ছিত বীর শয্যায় অষ্ট পঞ্চাশৎ রজনী মুক্তির অপেক্ষায় শয়ান আছেন। ভগবান সহস্রাংশু দিনদেব উত্তরায়ণ পথে পরিবৃত্ত হইয়াছেন। ত্রিভাগ শেষ চান্দ্রমাঘের শুক্লাষ্টমী উপস্থিত। যে শুভমুহূর্ত্তের অপেক্ষায় ষষ্টিদিবস যোগবলে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বাররুদ্ধ করিয়া প্রাণবায়ুকে ভ্রূমধ্যে রক্ষা

করিতেছেন—সেই অনন্ত মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বগ্রাসী কালের এ মুহূর্ত্তের উপর কর্ত্তৃত্ব নাই। আকল্প এই পুণ্যক্ষণ জীবের জীবত্ব ছাড়িয়া ব্রহ্মত্বের অধিকারের বিজয় ডঙ্কা অনন্তবিশ্বে অনন্তকাল নিনাদিত করিবে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রত্যহই হস্তিনাপুর হইতে পিতামহের নিকট ধর্ম্ম কথা শুনিতে আগমন করেন এবং সন্ধ্যায় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। অদ্য তাঁহার শেষ আগমন পূর্ব্ব হইতেই তাহা স্থির আছে। অদ্য দিবাকর উত্তরায়ণ পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা জ্ঞাত হইলেন এবং পিতামহ কলেবর ত্যাগ করিবেন জানিয়া—সংস্কারের নিমিত্ত "ঘৃতমাল্য গন্ধ পট্টবসন অগুরু প্রভৃতি চন্দন কালীয়ক গন্ধ দ্রব্য ও বিবিধ রত্ন প্রেরণ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র, যশস্বিনী গান্ধারী মাতা পৃথা ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রে করিয়া জনার্দ্দন বিদুর যুযুৎসু ও যুযুধানের সহিত" কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির পিতামহকে শ্রীকৃষ্ণের এবং অন্যান্য আত্মীয়গণের তথাগমন বার্ত্তা তাঁহাকে নিবেদন করিলে—তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন——

"দিষ্ট্যা প্রাপ্তোসি কৌন্তেয় সহামাত্যো যুধিষ্ঠির।
পরিবৃত্তো হি ভগবান সহস্রাংশু দিবাকরঃ॥
অষ্ট পঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ান স্যাদ্যমেগতাঃ।
শরেষু নিশিতাগ্রেষ্ যথা বর্ষশতং তথা॥
মাঘোয়ং সমনু প্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যঃ যুধিষ্ঠিরঃ।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোয়ং শুক্লোভবিতুমর্হতি॥"

যুধিষ্ঠির ভাগ্যক্রমে (অধিক বিলম্ব হইলে আর দেখা হইত না) তুমি অমাত্য সহিত উপস্থিত হইয়াছ; ভগবান সহস্রাংশু পরিবৃত্ত হইয়াছেন। তীক্ষ্ণ শরসমূহের উপর অদ্য যে ৫৮রাত্রি শয়ন করিয়া আছি বোধ হইতেছে যে শতবর্ষ এইভাবে আছি। চান্দ্র মাঘ শুক্লপক্ষ উপস্থিত এবং মাসের তিন ভাগ অবশিষ্ট আছে।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "রাজন তুমি ধর্ম্মজ্ঞ বিষয় সংশয় সমুদয় সুন্দররূপে নির্ণয় করিয়াছ বহু শাস্ত্রজ্ঞ বহুল বিপ্রগণকে তুমি উপাসনা করিয়াছ। হে মনুজেশ্বর তুমি সূক্ষ্ম বেদ শাস্ত্রঃ সকল ধর্ম্ম বুঝিতেছে অতএব হে কৌরব তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে; যাহা ভবিতব্য তাহা ঘটিয়াছে। তুমি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন হইতে বেদ রহস্য শ্রবণ করিয়াছ। এই পুত্রগণ পাণ্ডুর ও যেমন তোমার ও তদ্রূপ, অতএব তুমি ধর্ম্মে থাকিয়া ঐ গুরু সুশ্রুষানিরত পাণ্ডু সুতগণের পালন কর। শুদ্ধচিত্ত ধর্ম্মরাজ তোমার আজ্ঞাবর্ত্তী থাকিবেন ইঁহাকে আনৃশংস্য পরায়ণ এবং গুরুবৎসল জানিও।

তোমার পুত্রগণ দুরাত্মা ক্রোধ লোভ পরায়ণ ঈর্ষাভিভূত দুর্বৃত্ত ছিল অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত তোমার শোক করা উচিৎ নয়।" শতপুত্র নিধনজনিত ক্ষত এখন ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে সরস, সান্তনা বাক্যে পুত্রশোক অপনোদন হয় না তথাপি পুত্রবিয়োগ বিধুরকে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্মরণ করাইতে পারিলে তাহার এই দুর্বিষহ শোক সহ্য করিবার ক্ষমতা আসে। তাই ভীষ্মদেব ধৃতরাষ্ট্রকে "ধর্ম্মজ্ঞ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং বিষয়ের অনিত্যতা দর্শাইয়া নিয়তি অলঙ্ঘ্য তাঁহার মনে জাগাইয়া দিলেন।

পুত্র মৃত হইলে শোক অনিবার্য্য কিন্তু পুত্র যদি নিজের বুদ্ধিদোষে গুরুজনের অনুনয় বিনয় অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আহ্বান করে তাহা হইলে শোকের ভার কিছু লাঘব হয় এই উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন তোমার পুত্রগণ দুরাত্মা ও পূর্ব্বে আমি দুর্বুদ্ধি মুর্খ দুর্যোধনকে বলিয়াছিলাম যে পক্ষে কৃষ্ণ সেই পক্ষেই ধর্ম্ম এবং যে পক্ষে ধর্ম্ম সেই পক্ষে জয়। হে বৎস বাসুদেবকে উপায় অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত শান্তি স্থাপন কর, সন্ধি করিলে তোমার সময় উৎকৃষ্ট হইবে। আমি বারংবার এই কথা বলিলে সেই মন্দমতি আমার বাক্য প্রতিপালন

করে নাই এক্ষণ পৃথিবীর সমস্ত নৃপতি গণকে নিধন করাইয়া স্বয়ং নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে।" অবশেষে তাঁহার সেই মূঢ় পুত্রগণের স্থানে সর্ব্বগুণান্বিত যুধিষ্ঠিরাদিকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন এই কথা বলিয়া শেষ করিলেন।

মৃত পুত্রের দোষ বর্ণন করিয়া অন্ধকে অধিক কষ্ট দেওয়া ভীষ্মের উদ্দেশ্য কেহ না মনে করেন।

পৃথিবীতে আর ভীষ্মের অবশিষ্ট কিছু নাই, এখন তিনি প্রয়াণের নিমিত্ত প্রস্তুত। যার অনুজ্ঞায় মাসাবধি অসীম জ্ঞান প্রসঙ্গ করিতেছিলেন তাঁর অনুমতি ব্যতীত কলেবর পরিত্যাগ কি করিয়া হবে তাই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বলিতেছেন—

"হে দেবদেবেশ সুরাসুর নমস্কৃত শঙ্খচক্র গদাধর ত্রিবিক্রম ভগবান তোমাকে নমস্কার! তুমি বাসুদেব, হিরণ্মাত্মা সবিতা বিরাট পুরুষ, তুমি জীব স্বরূপ অনুরূপ, সনাতন পরমাত্মা আমি তোমার ভক্ত ও তদ্গতচিত্ত! হে পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষোত্তম আমাকে নিত্য পরিত্রাণ করিও হে বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম আমাকে আজ্ঞা দাও। হে কৃষ্ণ তৎপরায়ণ পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিও। হে দেব আমি তোমাকে বদরিকাশ্রমে নরের সহিত বহুকালবাসী পুরাণ ঋষিসত্তম দেব বলিয়া জানি নারদ ও ব্যাসদেব আমাকে বলিয়াছেন ইহারা নর নারায়ণ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে কৃষ্ণ এক্ষণে আমি কলেবর ত্যাগ করিতে অভিলাষী আমাকে অনুমতি কর তোমার অনুজ্ঞা হইলে আমি পরমগতি প্রাপ্ত হইব।"

ধর্ম্মের গ্লানি দূর হইয়াছে, দুষ্কৃতগণের বিনাশ সাধন হইয়াছে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির সেই সাম্রাজ্যের রাজা হইয়াছেন সাধুগণের পরিত্রাণ ও হইয়াছে অবশিষ্টছিল কেবল ধর্ম্মবিধির সংস্থাপন অশেষ ধর্ম্মতত্ত্ব বেত্তা দেবব্রত তাহা পূর্ণ করিলেন। ভারত মহাভারতে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ কলেবর ত্যাগের অনুমতি দিলেন।

তদনন্তর সমাগত সমস্ত জনগণকে কলেবর ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ভীষ্ম বলিতে লাগিলেন—

"তোমরা সত্যে যত্নবান থাকিবে, সত্যই পরম বল। হে ভারতগণ তোমরা নিয়ত আনৃশংস্য পরায়ণ নিয়তচিত্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ধর্ম্মশীল এবং তপোনিরত হইবে।"

শেষ কথা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"হে জননাথ ব্রাহ্মণগণ বিশেষত প্রাজ্ঞগণ আচার্য্য ও ঋত্বিকগণ নিয়ত তোমার পূজনীয়।"

যুধিষ্ঠির সম্রাট তাঁহাকে রাজ্যপালন করিতে হবে—আত্মাভিমানে শাসনে ত্রুটি আসিতে পারে। মুমুর্ষুর শেষ কথা প্রায় মন হইতে অন্তর্হিত হয়না তাই তাহাকে উপদেশ করিলেন যে প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণের পরামর্শ লইও কর্ম্মময় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিরত হইও না। যে জাতি স্বদেশস্থ মহাপুরুষগণকে বিস্মৃত হয় তাহার পতন অতি নিকট ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

বঙ্গবাসি আইস কি ভাবে দেবব্রত প্রাকৃতিক আবরণ উন্মোচন করিতেছেন আমরা নির্নিমেষ নয়নে দেখিয়া পবিত্র হই!

'সেই শান্তনব ভীষ্ম তৎকালে সমুদয় কুরুগণকে এইরূপ কহিয়া মুহূর্ত্তকাল মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যথাক্রমে মূলাধারাদি চক্র হইতে চক্রান্তরে মনের সহিত প্রাণাদি বায়ু ধারণ করিলে সেই মহাত্মার প্রাণগণ সম্যক নিরুদ্ধ হইয়া উর্দ্ধগামী হইল। শান্তনুনন্দন যে অবয়বের যে অংশ হইতে প্রাণবায়ুকে মুক্ত করিতে লাগিলেন সেই সেই অবয়ব বিশল্য হইতে লাগিল ক্ষণমাত্র মধ্যে সকলের সমক্ষেই তিনি বিশল্য হইলেন। বাসুদেব এবং মুণিগণ সকলে বিস্মিত হইলেন; তিনি সর্ব্বাবয়ব

* লিপি প্রমাদে মূলে কতকগুলি শ্লোক স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

' শেষোক্ত কথাটি অমৌলিক বলিয়া সন্দেহ হয়। পরাধ্যায়ে কুরুগণকে সম্বোধন আছে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন নাই।

হইতে প্রাণ সংযুক্ত মনকে নিরুদ্ধ করিয়া মস্তকভেদ দ্বারা শূন্যে মিশাইলেন। আকাশে পুষ্পবৃষ্টির সহিত দেব দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, সিদ্ধও ব্রহ্মর্ষিগণ "সাধু সাধু" বলিয়া হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মদেবের মস্তক হইতে মহা উল্কার ন্যায় কোন পদার্থ নিঃসৃত হইয়া আকাশে প্রবেশ করিয়া ক্ষণ মধ্যে অন্তর্হিত হইল।"

যোগ শাস্ত্রের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উৎক্রামণ। যাঁহারা ব্রহ্মভাবে অবস্থিত হইবার অধিকারী তাঁহাদের এইরূপ উৎক্রামণ হয়। ইহা মরণ নহে চিরজীবন। এ জীবনের অধিকারী জগতে কয়জন হয়েন? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ ধ্বংসের পরে এই পরমযোগ অবলম্বনে প্রাকৃতিক দেহ অপসৃত করিয়াছিলেন। শ্রীবুদ্ধদেব কুশীনগরে শাল তরুমূলে এই ভাবেই নির্ব্বাপিত হইয়াছিলেন।

অনেকে এরূপ তিরোভাবে বিশ্বাস করিবেনা তাহা জানি কিন্তু যাঁহারা যোগশাস্ত্রে বিশ্বাসী তাঁহারা দেখিবেন ইহা অতি বৈজ্ঞানিক এবং অবিশ্বাসের কারণ ইহাতে কিছুই নাই তবে সাধারণের কর্ম্ম নহে। মোক্ষধর্ম্ম প্রকরণে যোগবিষয়ক কথা কিছু বলা হইয়াছে তাহাতে যোগীগণের উদান বায়ুজয় ভূত সকলের জয় প্রভৃতি প্রসঙ্গ আছে অভ্যাসে মানুষের ইচ্ছামৃত্যু হওয়া অন্যায্য নহে।

হিন্দু যদি শ্রম বোধ না কর তবে ভীষ্মের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ায়যোগ দিবে চল।

"অনন্তর মহানুভব পাণ্ডবগণ, বিদুর ও যুযুৎসু বহুল কাষ্ঠ ও বিবিধ গন্ধ আনয়ন পূর্ব্বক চিতা নির্ম্মাণ করিলেন, অপরে দর্শন করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির ও মহামতি বিদুর উভয়ে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে ক্ষৌমবসন ও মাল্যদ্বারা আচ্ছাদন করিলেন, যুযুৎসু তাহার উপর উৎকৃষ্ট ছত্রধারণ করিলেন, ভীমসেন ও অর্জ্জুন উভয়ে চামর দ্বয় বীজন করিতে লাগিলেন

নকুল ও সহদেব উষ্ণীষ ধারণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র পদতল হইতে তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলেই সেই মহাত্মার বিধিবৎ পিতৃযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিলেন, অগ্নিতে বারংবার যজন করিলেন, সমগ্র ব্রাহ্মণগণ সামগান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি চন্দনকাষ্ঠ ও কালীয়ক গন্ধ দ্রব্য দ্বারা গঙ্গানন্দনকে আচ্ছাদন করিয়া হুতাশন প্রজ্জ্বলন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। কুরুকুল ধুরন্ধর কুরুসত্তমগণ, কুরুশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয়কে সংস্কার করিয়া ঋষিগণ সেবিত পবিত্র ভাগীরথী গমন করিলেন, ব্যাসদেব অসিত নারদ কৃষ্ণ ভারত কামিনীগণ এবং যে সমস্ত পৌরজন সমাগত ছিলেন সকলেই তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই সমস্ত লোক বিধিপূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্মের তর্পণ করিলেন।

ভীষ্ম অপুত্রক সমগ্র হিন্দু তাঁহার পুত্রের কার্য্যে ব্রতী হইয়া পুণ্যার্জ্জন করুন। এই জন্যই ভীষ্মতর্পণ ব্যবস্থা আছে। যতদিন ভীষ্ম জীবিত ছিলেন তিনি স্থান এবং কালের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন—দেহান্তরে স্থানের এবং কালের অতীত হইয়াছেন। নামরূপ ত্যাগ করিয়া অনন্ত সত্ত্বায় মিলিত হইয়াছেন তিনি এখন সর্ব্বব্যাপী, প্রকৃতি আর তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। কোথায় তাঁহার অবস্থান ত্রিলোকগুরু স্বয়ং তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—

"গন্তাসি লোকান পুরুষ প্রবীর নাবর্ত্ততে যানুপলভ্য বিদ্বান।"

"তপস্যুপস্থিতা লোকা যেভ্যো নাবর্ত্ততে পুনঃ॥"

যেখানে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না সেই স্থানে তিনি যাইবেন—সে কোথায়?

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোর্জ্জুন।
মামুপ্যেত্য তু কৌন্তের পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে। গী—৮।১৬

"হে অর্জ্জুন ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোক-নিবাসীগণেরই পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে, কেবল একমাত্র আমাকে পাইলে পুনরাগমন হয় না। ইহাই বিষ্ণুর পরমপদ এবং পরম ধাম।

অব্যোক্তোক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাংগতিং"।

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ গী—৮।২১

এস ভারতবাসি এস জগৎবাসি কোটি কোটি কণ্ঠে দেবব্রতের জয়ধ্বনি করি—কি অমানুষিক সাধনা! জগতের ইতিহাসে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির একাধারে এমন! সমাবেশ আব দ্বিতীয় আছে কি! কৃষ্ণ বুদ্ধ চৈতন্য ভগদবতার—তাঁহাদের কথা বলিতেছি না কিন্তু মানুষ সাধনায় দেবতাকে পরাভূত করিল এমন দৃষ্টান্ত ভীষ্ম ভিন্ন আর কোথায়? যেমন সাধনা তেমনই সিদ্ধি।

মুক্তপুরুষ দেবব্রত! জীবানুগ্রহই তোমার ব্রত। সেই ব্রতের অনুরোধে যদি প্রাকৃতিক কলেবর পুনর্ব্বার গ্রহণ কর তবে পদধূলিতে বনরাজিনীলা সুজলা সুফলা বাঙ্গলাকে পবিত্র করিও। বাঙ্গালী কর্ম্মহীন জ্ঞানহীন ভক্তিহীন। তোমার পদস্পর্শে তাহার বিলাস শিথিল তনুতে এবং অনাচার বিষ বিসর্পিত ধমনীতে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। তাহলে রাঙ্গাফলে সে আর ভুলিবে না। ব্যাধের মোহন বাঁশরীর তান সে আব কাণে লবে না। "সুধাসাগবের তীরে বসিয়া হলাহল আর পান করিবে না—" বিকৃত মস্তিষ্কে বাতুলের ন্যায় আর কোলাহল করিবে না।

গুরুবাক্য লঙ্ঘন হেতু মহাপাতকের সে এখন প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আত্মবলিদানে তোমার আবাহন করিবে। তবে আসিও কর্ম্মহীন বাঙ্গালির কথা তবে রাখিও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভীষ্ম ও ভক্তিযোগ।

অধুনা অনেকে বলিবেন ভীষ্মের ভক্তি ত কই দেখি না। তিনি কর্ম্মী হইতে পারেন, এবং শান্তিপর্ব্বে তাঁহার বহুজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহাতে ভক্তের কি লক্ষণ আছে। আজন্মকাল অস্ত্রশস্ত্র লইয়াই বিব্রত, কত জীবহিংসা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যহ অযুত সৈন্যের মুণ্ডপাত না করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিতেন না,— তিনি কি না পরম বৈষ্ণব! তাহা হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মের অপার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

সহজ নয় বলিয়াই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। আমাদের দেশে আজকাল যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহার সহিত ভীষ্মের বৈষ্ণবধর্ম্মের সাদৃশ্য বড় কম, সুতরাং আধুনিক বৈষ্ণবগণ ভীষ্মকে তাহাদের দলে লইতে সঙ্কুচিত হইবেন, বিচিত্র কি।

ভীষ্মের ভক্তি বুঝিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রণীত ভক্তি কি তাহার বিচার করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভীষ্মকে বলিতেছেন।

"যতঃ খলু পরাভক্তির্ম্ময়ি তে পুরুষর্ষভ।
ততো ময়া বপুর্দ্দিব্যং ত্বয়ি রাজন প্রদর্শিতং॥
ন হ্যবক্তায় রাজেন্দ্র ভক্তায়া নৃজবে নচ।
দর্শয়াম্যহমাত্মানং ন চাশান্তায় ভারত॥
ভবাংস্তু মম ভক্তশ্চ নিত্যং চার্জব মাস্থিতঃ।
দমে তপসি সত্যে চ দানে চ নিরত শুচিঃ॥

শান্তি—৫১ অ ১০।১১।১২

"যেহেতু আমার প্রতি তুমি অকপট ভক্তি করিয়া থাক সেই নিমিত্ত তোমাকে আমার দিব্যমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলাম। ভক্তিশূন্য বা কপট ব্যক্তি বা আশান্তকে আমি কদাচ নিজ মূর্ত্তি দেখাই না, কিন্তু তুমি আমার নিত্য ভক্ত ও আর্জ্জব সম্পন্ন বিশেষতঃ সদা দান, দম ইত্যাদিতে নিরত।"

শ্রীকৃষ্ণের কথার উপর নির্ভর করিয়াই ভীষ্মকে ভক্ত বলিয়া প্রমাণ করা চলিত কিন্তু কথাটা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে বলিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রণীত ভক্তি গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে আছে। তিনি ভক্তি কি তাহা বলেন নাই কিন্তু ভক্তকে তাহা বলিতেছেন। সমষ্টিভাবে ভক্তি পদার্থটা কি বলিলে অর্জ্জুনের ধারণা হইত না। আমাদের ত কথাই নাই—তাই ব্যষ্টিভাবে ভক্তি যাহার আছে তাহার কি লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহাই বলিতেছেন। আধারবিচ্যুত সংজ্ঞা মাত্র ভক্তি দুর্জ্জের্য় কেবল বৃথা তর্কের স্থল হয়।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সম দুঃখ সুখঃক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষোভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
অনপেক্ষ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্ত স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃসঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ॥

তুল্য নিন্দা স্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মেপ্রিয়ো নরঃ॥

সর্ব্বভূতে যাহার দ্বেষবুদ্ধি নাই সকলের মিত্র সর্ব্বভূতের অভয়প্রদ, মমতাহীন, নিরহঙ্কার, সুখ, দুঃখ যার সমান জ্ঞান ও ক্ষমাশীল সতত সন্তুষ্ট, সমাহিত চিত্ত, সংযত স্বভাব, আত্মতত্ত্ববিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয়, আর আমাতে (ভগবানে) মন, বুদ্ধি অর্পিত এবং ভক্ত সে আমার প্রিয়। যাহাতে লোক সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না ও যিনি অন্য হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হয়েন না এবং যিনি হর্ষ বিষাদ ভয় উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন—তিনিই আমার প্রিয়। যিনি নিস্পৃহ বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি, দক্ষ (সর্ব্বকর্ম্ম পারগ) পক্ষপাতিত্বহীন, ত্রিবিধ ব্যথা বর্জ্জিত সর্ব্বারম্ভ পরাত্যাগী যে আমার ভক্ত তিনিই আমার প্রিয়। যিনি হৃষ্ট হয়েন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না শোকহীন আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত, শুভাশুভ পরিত্যাগী এবং ভক্তিমান তিনি আমার প্রিয়; শত্রুমিত্রের যাহার সমান জ্ঞান, মান অপমান যাঁহার সমান, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে যাহার সমবুদ্ধি ও সর্ব্বসঙ্গবিশূন্য নিন্দাও স্তুতি উভয়ে যাঁহার সমান যিনি সংযত বাক্ শরীরধারনোপযোগী লাভেই সন্তুষ্ট, নিত্য বাসের গৃহবর্জ্জিত—স্থিরমতি তিনিই প্রিয়। ভবদ্ভক্তের কি কি উপাদান আবশ্যক তাহা এখন পাওয়া গেল।

ধীরচিত্তে চিন্তা করিলে এই উপলব্ধি হয়—যে ভগবদ্বিভূতির পূর্ণ অধিকারী না হইলে আর পরম ভক্ত হওয়া যায় না; যিনি ভগবানের যত মহিমা স্বায়ত্ত করিয়াছেন তিনি সেই পরিমাণে তাঁহার ভক্ত। সুতরাং যিনি পরমভক্ত তিনি তাঁহার সম প্রকৃতিক ভিন্ন আর অন্য কিছুই হইতে পারেন না। তিনি আর "তিনি" থাকিতে পারেন না। নদীসমূহ সাগরে যাইয়া ডুবিলে যে অবস্থা হয় পরম ভক্তের অবস্থা তদ্রূপ। যতদিন আমি, আমার অভিমানের ছায়া থাকিবে ততদিন সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা নির্ম্মম,

নিহঙ্কার, সকল বস্তু পরিত্যাগী শুচি সমদুঃখে সুখ ইত্যাদি বিভূতি কি করিয়া চিত্তে স্থান পাইবে। আমিত্বের ন্যায় অশুচি পদার্থ আর কিছু নাই—মল বর্ত্তমানে প্রতিবিম্ব হয় না। অতি নির্ম্মল না হইলে তাঁর ছায়া পড়ে না। মনে থাকে যেন পাপপুণ্য দুই চিত্তমল—প্রভেদ কেবল এই যে এক কষ্টদায়ক অন্য সুখদায়ক। দুইকে অপসারিত না করিলে ভক্তি স্থান পায় না—বা ভক্ত হওয়া যায় না। এককালে দুই প্রভুর সেবা ত চলে না।

অনুকরণই ভক্তির প্রাণ। অনুকরণ আরম্ভ হইলে তবে অনুসরণ হয়। আদর্শকে অনুসরণ না করিলে তাঁহাকে প্রকৃত ভক্তি দর্শান হয় না যে উপাসক সে অবশ্য উপাস্যের শক্তি অর্জ্জন করিবার যত্ন করিবে নচেৎ তাঁহারদিকে ত অগ্রসর হইতে পারিবে না কেবল মুখে প্রসংশা করিলে বিশেষ ফল নাই কর্ম্মে দেখাইতে হবে তুমি কেমন ভক্ত। ভগবান এই কথাই বলিতেছেন একবার নয় দুবার নয় বার বার সেই মোহন কণ্ঠে বলিতেছেন সব ছাড় আমার পথে চল—"সর্ব্বধর্ম্মাণ পরিত্যজ্য" মামেকং শরণং ব্রজ মিছে কোলাহলে কি হবে।

প্রাগুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বাক্য সমূহ বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে বাক্য সকল তার জন্ম, শক্তি এবং স্থানের প্রাধান্য অনুসারে চারিভাগে বিভক্ত যথা—

১। সংকল্পাত্মক, ২। বুদ্ধ্যাত্মক, ৩। অনুভবাত্মক, ৪। দেহাত্মক।

অদ্বেষ্টা নিরহঙ্কার দৃঢ় নিশ্চয় স্থিরমতি শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান প্রভৃতি প্রথম বিভাগের অন্তর্গত। সততযোগী যতাত্মা মযার্পিত মনবুদ্ধি, লোকের অভয়প্রদ মৈত্র সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী "কাংক্ষতি" প্রভৃতি দ্বিতীয় বিভাগের নির্ম্মম সম দুঃখ সুখ মদ্ভক্ত, ভক্তিমাণ, "হৃষ্যতি "শোচতি" মানাপমান সমান প্রভৃতি তৃতীয় বিভাগের এবং শুচি দক্ষ গত ব্যথ, শীতোষ্ণদ্বন্দ্ব

সহিষ্ণু প্রভৃতি দেহাত্মক বা চতুর্থ বিভাগের অন্তর্গত। এই বিভাগ চতুষ্টয় কি ভাবে হইয়াছে তাহা অনুধাবন করা যাক।

মনুষ্য বলিয়া যে জীব সে দ্বিদলের সমাবেশ ১। চেতন ২। অচেতন চৈতন্য তাহার মন নামক শক্তিতে প্রকাশ এবং অচৈতন্য তাহার দেহে প্রকট। চেতন এবং অচেতন এক অদৃষ্ট শক্তিতে সংশ্লিষ্ট আছে।

দার্শনিক পরিভাষা পরিত্যাগ করিয়া সরল ভাষায় বলিতেছি যে মন প্রধানতঃ তিনভাগে বিভাজ্য। ভগবানই তাহাই করিয়াছেন—যথা মন, বুদ্ধি এবং অনুভব; তিনি বলিতেছেন "মর্য্যেপিত মনোবুদ্ধি মদ্ভক্ত।"

মনের যে শক্তি দ্বারা সংকল্প বিকল্প বা চিন্তাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাই হইল বিশিষ্ট মন আর যে শক্তি দ্বারা অধ্যবসায় বা চেষ্টাদি যত্নাত্মক ব্যাপার সাধিত হয় তাহার নাম বুদ্ধি। আর যে শক্তি দ্বারা অনুভব ক্রিয়া বা গ্রহণভাব নিষ্পন্ন হয় তাহাই ভক্ত্যাত্মক; অনুভবই ভক্তির মূল।

সংকল্পাত্মক মন যখন ভগবতে অর্পিত হয় অর্থাৎ যখন মন ভগবান ভিন্ন অন্য বৃত্তির আধার হয় না, ভগবদাকার বৃত্তিতে পরিণত হয় তখনই জ্ঞানযোগ হয়। এ কথা পূর্ব্বে আমরা আভাস দিয়াছি।

চেষ্টাই কর্ম্মের জননী যখন সর্ব্বচেষ্টা বা যত্ন ও অধ্যবসায় এবং তজ্জনিত কর্ম্ম ভগবত পথে নিয়োজিত হয় তখন কর্ম্মযোগ হয়। কর্ম্মফলের সহিত যখন আমিত্বের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় তখন নিষ্কাম কর্ম্ম হয়, নিষ্কাম কর্ম্মই ভগবত কর্ম্ম।

তদ্রূপ যখন অনুভবাত্মক মন ভগবান ব্যতীত অপর অনুভব করে না তখন ভক্তিযোগ হয়। মনে রাখিতে হইবে এ অনুভবে অহং অনুভব ও থাকিবে না।

ঐ তিন পন্থাই যোগ পন্থা। যে যোগী যে মার্গ অনুসরণ করিয়াছেন

তাঁহার তদ্রূপ অভিধান হইয়াছে। যাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে ধরিতে যান তাঁহারই সাংখ্যযোগী যাঁহারা কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে পাইতে চাহেন তাঁহারা যোগী বা কর্ম্মযোগী এবং যাঁহারা প্রেম বা প্রীতি দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চাহেন তাঁহারা ভক্তিযোগী।

জ্ঞানাবতার—ভগবান কপিলাদি মহর্ষিগণ ও শ্রীবুদ্ধদেব।

কর্ম্মাবতার—ভার্গব রাম এবং শ্রীরামচন্দ্র।

ভক্ত্যবতার—নারদাদি এবং শ্রীচৈতন্য।

অজ্ঞানতার সহিত ক্রমশঃ মানবগণ উক্ত তিন পন্থাকে প্রতিযোগী ভাবে পৃথক দেখিতে লাগিল ফল এই দাঁড়াইল যে জ্ঞানমার্গে কর্ম্মমার্গে এবং ভক্তিমার্গে মহাসংগ্রামের সৃষ্টি হইয়া বহু জীবক্ষয় হইতে লাগিল এবং বিদ্বেষ বহ্নিতে ভারত ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে চলিল।

সত্যধর্ম্মের এতাদৃশ বিশৃঙ্খলাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, এবং ঐ তিন পন্থার একত্ব সাধনই তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের মূলমন্ত্র, কি বিরাট কৌশলে তিনি এই তিন স্রোতকে একত্র করিয়া এক অপার শান্তি সিন্ধুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না।

তিনি দেখাইলেন "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলংপার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" "একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃপশ্যতি সপশ্যতি।" শেষে "মদ্ভক্ত" হইবে। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান হয় না এবং জ্ঞানভিন্ন ভক্তি হয় না। অতএব যিনি ভক্ত হইতে চাহেন তাঁহাকে প্রথম ভীমকর্ম্মা হইতে হইবে পরে জ্ঞানার্জ্জন হইবে তবে ভক্তি আসিবে।

মনের কথা ত বলা হইল, কিন্তু মন যে শরীরে সংশ্লিষ্ট তাহার কি হইবে? শরীরকেও সঙ্গে সঙ্গে চরম উন্নতিতে পৌছাইতে হইবে নচেৎ মন উন্নত হবে না। যদি শরীর জরাব্যাধির বাহিরে না থাকিতে পারে তবে সে শুচি, দক্ষ, গত ব্যথ হইবে না। সুতরাং তাহার ও

চরম উৎকর্ষ সাধিত করিতে হইবে। তাই শরীর রক্ষাও ধর্ম্ম সাধন; এ কথাটা আধুনিক শিক্ষায় বিশেষভাবে স্থান পায় নাই। চাকরি উদ্দেশ্য হইলে কোন ধর্ম্ম সাধনই হয় না। ম্যালেরিয়ায় যাহাদের অস্থিমাত্র সার তাহাদের মনের উন্নতি কি করিয়া হইবে বল।

শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ববিষয়িণী উন্নতি সম্যকভাবে সাধিতছিল সংকল্প, চেষ্টাও বুদ্ধ্যাত্মক মনের ও শরীরের যারপরনাই বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি তাঁহাতে ছিল তাই তিনি পূর্ণ। তাঁহাকে কোটি প্রণাম করি।

শ্রীকৃষ্ণ প্রণীত ভক্তি কি তাহা আমরা এখন যৎকিঞ্চিৎ বুঝিলাম তৎপ্রণীত ধর্ম্মই এই "শরীর এবং মনের অব্যাহত অনন্ত উন্নতির দ্বারা ঈশ্বরানুভব।" ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। যে গ্রন্থে এই ধর্ম্মের সূত্র আছে তাহার নাম গীতা হিন্দুর এই চরম ধর্ম্মশাস্ত্র; যাহার প্রসাদে এই গীতা জগতে প্রচারিত তাঁহার জন্ম ভারতে ভারতবাসী যেন অনন্তকাল তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত থাকে।

ভীষ্মদেবের ধর্ম্ম আর পৃথকভাবে বলিবার আবশ্যক নাই গীতোক্ত ধর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্ম। পূর্ব্বে তাহাই বলা হইয়াছে।

আমরা শ্রীভীষ্মের শারীরিক এবং মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচয় যথেষ্ট পাইয়াছি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়ক্রম প্রায় শত বৎসর হইয়াছিল—কি অমানুষিক কর্ম্মই তিনি করিয়াছেন—কি অচিন্তনীয় দৈহিক স্বাস্থ্য এরূপ উৎকৃষ্ট দেহ না পাইলে এরূপ যোগসিদ্ধির আকর হইতে পারে না।

ভীষ্মকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করিতে বোধহয় এখন আর কাহার কোন আপত্তি থাকিবে না। ভক্তিই মানুষের চরমবৃত্তি; তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য এই একমাত্র নিরাপদ তরণী। এ তরণীতে আরোহীর বিচার নাই সকলের সমান অধিকার। পারগমন ও শীঘ্র

হয়! এ বর্ত্মে কূট তর্কের ঘূর্ণাবর্ত্তের বিভীষিকা নাই। বিশ্বাস বায়ুর প্রবলবেগে প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তিশিলা সমূহ উপান্তে নিক্ষিপ্ত হয়। তাই ভীষ্ম বলিতেছেন—

"ত্বং প্রপন্নায় ভক্তায় গতিমিষ্টাং জিগীষবে।
যচ্ছ্রেয় পুণ্ডরীকাক্ষ তদ্ধ্যায়স্ব সুরোত্তম।" শা—৫১ অ—৯।

হে সুরোত্তম পুণ্ডরীকাক্ষ আমি তোমার শরণাপন্ন ভক্ত যা হইলে আমার সদ্গতি হয় তাহাই বিধান কর; বিশ্বাসে আত্মনির্ভরতা ভাসিয়া গিয়াছে। হিতাহিতের ভার তাঁহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

ভীষ্মচরিত্র মহাভারতের মনুষ্য চরিত্রের ভিতর সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণকে মানুষীতনু আশ্রিত হইলেও মনুষ্য মধ্যে ধরি না, যাঁহারা তাঁহাকে মনুষ্যের হিসাবে ধরেণ তাঁহাদের ক্রমে ভীষ্ম দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।

অনেকেই আপত্তি করিবেন ভীষ্ম যখন অর্জ্জুনের নিকট পরাস্ত তখন তাঁহার স্থান অর্জ্জুন অপেক্ষা নিম্নে হওয়া উচিত বিশেষত শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার সখা এবং সারথি।

প্রথমে দুইজনকে ক্ষত্রতেজে তোল করিয়া দেখি। মহাভারতে ভীষ্মের পরাভব দুইবার আছে বারদ্বয়ই অর্জ্জুনের হস্তে তিনি পরাভূত। প্রথম পরাভব তাঁহার গো হরণ যুদ্ধে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রে।

প্রথম পরাভব ক্ষণিক তা হইলেও পরাজয় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি পাওয়া যায়।

১। অর্জ্জুনের প্রতি ভীষ্মের মমতা। অদ্য ত্রয়োদশ বৎসরের পর গুণধর বংশধর সম্মুখে উপস্থিত ধর্ম্মসহায় পাণ্ডবগণ জীবিত আছেন জানিয়া ভীষ্মদ্রোণের হর্ষের সীমা নাই। এই মমতায় তাহার একগ্রতার অভাব হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীরামচন্দ্রের লবের হস্তে ধর্ষণা এবং অর্জ্জুনের বভ্রুবাহনের নিকট পরাজয় এই কারণে হইয়াছিল।

২। অধর্ম্ম্য কর্ম্মে সহায়তা। গোহরণ কার্য্যটা নিন্দিত ছিল ভীষ্মকে দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল তিনি স্বয়ং এ কর্ম্মের বিরুদ্ধে ছিলেন অন্যদিকে অর্জ্জুন ধর্ম্মের সহায়তা পাইয়াছেন। মন্দকার্য্যে শক্তির হানি হয় ইহা প্রাকৃতিক সত্য।

৩। তিনি অতিবৃদ্ধ এবং বহুদিন যুদ্ধে অনভ্যস্ত অর্জ্জুন বয়সে পৌত্র এবং যুদ্ধে নিত্য অভ্যস্ত কুরুক্ষেত্রে পরাভবের কারণও অনেক——————

১। অর্জ্জুনের ধ্বজ অশ্বসারথি এবং ধনু তুণীর অচ্ছেদ্য।

২। শিখণ্ডীকে দর্শনে মানসিক দৌর্ব্বল্য মৃত্যুভয় নহে পাছে শিখণ্ডীর প্রতি বাণক্ষেপ হইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পাপে লিপ্ত হই। এই ভয়। এবং ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হইতেছে এই চিন্তা।

অর্জ্জুনেরও তিনবার পরাজয় আছে একবার ব্যাধরূপী মহাদেবের নিকট যে পরাভবে তিনি পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন অবশ্য এ পরাভব ধর্ত্তব্য নহে। দ্বিতীয়বার বভ্রুবাহণের নিকট এবং তৃতীয় বার দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরের পথে। এই শেষোক্ত পরাভবের কারণ শ্রীকৃষ্ণ বিরহ মনের বৈকল্য। গাণ্ডীব ধনু ছিল, অক্ষয় তুণীর তথাপি ভীষ্ম বিজয়ীবীরকে বিধ্বস্ত করিয়া দস্যুগণ যাদবী দলকে লুণ্ঠন করিল।

অর্জ্জুনের যোদ্ধৃত্ব বিষয়ে ভীষ্মের নিজের কথা এই "নারায়ণ সহায়—সম্পন্ন লোহিত নয়ন যে অর্জ্জুন উভয় সেনা মধ্যেই তাদৃশ বীর্য্যশালী রথী আর বিদ্যমান নাই" "আচার্য্য কিংবা আমি এই দুইজন মাত্র ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধার্থে উদ্যুক্ত হইতে পারি এতদ্ভিন্ন উভয় সেনার মধ্যে এরূপ রথী তৃতীয় বর্ত্তমান নাই" কিন্তু "তিনি যুবা ও কৃতী। আমরা উভয়েই জীর্ণ।"

এতাবতা এই স্থির হইল ভীষ্মার্জ্জুন সমকর্ম্ম যোদ্ধা তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় অর্জ্জুনের যুবাত্ব হেতু কিছু উৎকর্ষ ছিল।

আধ্যাত্মিক উন্নতিতে অর্জ্জুন পিতামহের নিকট অনেক শিক্ষা করিতে পারেন।

অর্জ্জুন সাধক ভীষ্ম সিদ্ধ—অর্জ্জুন যাইতেছেন ভীষ্ম পৌছিয়াছেন। সাধনায় ভীষ্ম মধ্যাহ্ন মিহির অর্জ্জুন ক্ষুদ্র খদ্যোত।

ভীষ্ম যে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্জ্জুন সেই রাজ্যের প্রার্থী। যুদ্ধের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের ক্লৈব্য উপস্থিত কৃষ্ণকে বলিলেন "শিষ্যস্তেহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নং" আর মরণের পূর্ব্বে ভীষ্ম বলিলেন "ত্বৎ প্রপন্নায় ভক্তায়, অর্জ্জুন কালে সাধনায় ভীষ্মে পরিণত হইবেন। অর্জ্জুন অভিমন্যু বধে কতই বিলাপ করিয়াছেন—নিত্যানিত্য বিবেকের ত্রুটি তাঁহাতে রহিয়াছে; তিনি দৈবীসম্পৎ লইয়া জন্মিয়াছেন সত্য, ক্ষেত্র ও একাগ্র কিন্তু এখন তাঁহারা ভক্তি কাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই অনুভব চরম অবস্থায় যায় নাই।

ভীষ্মকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "জন্মপ্রভৃতিতে কশ্চিৎ বৃজিনং ন দদর্শ হ।" আজন্ম তোমার কখন কেহ কোন দোষ দেখিতে পায় নাই।

"যচ্চ ত্বং বক্ষসে ভীষ্ম পাণ্ডবায়ানুপৃচ্ছতে।
বেদ প্রবাদ ইব স্থাস্যতে বসুধাতলে॥"

তুমি জিজ্ঞাসমান পাণ্ডবকে যাহা কিছু বলিবে তৎসমস্ত পৃথিবীতে বেদের ন্যায় প্রামাণ হইবে।

যচ্চ ভূতং ভবিষ্যঞ্চ, ভবচ্চ পুরুষর্ষভ।
সর্ব্বং তজ্জ্ঞান বৃদ্ধস্য তব ভীষ্ম প্রতিষ্টিতং॥

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল বিষয়ই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত॥

উপসংহার।

যাঁহারা জীবের অথবা মনুষ্যের একবার ব্যতীত জন্মান্তর স্বীকার করেন না তাঁহাদের নিকট ভীষ্ম চরিত্রে অনেক অবিশ্বাস্য অবস্থা আছে। এবং যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে মৃত্যু বাস্তবিক মৃত্যু নয় কেবল সরিসৃপগণের নির্ম্মোক মোচনের ন্যায় দেহান্তর গ্রহণ মাত্র তাঁহারা শ্রীভীষ্মের জীবনে অতি রঞ্জন এবং কল্পনার সারহীন প্রহেলিকার কোন চিহ্ন দেখিবেন না বরং "কেন আমি আসিয়াছি কোথা হইতে আসিয়াছি কোথায় যাইব কি ভাবে এই দেহতরীকে সংসার সাগরে চালাইতে হবে কি শিক্ষার বলে ভীষ্মের ন্যায় অবস্থায় উপস্থিত হওয়া যায়, সমাজ কি, জাতি কি, হিংসা কি অহিংসা কাহাকে বলে ইত্যাদি মনুষ্যের বুদ্ধ্যাতীত প্রশ্ন সমূহের সরল ব্যাখ্যা এবং মীমাংসা তাহার দেবাতিরিক্ত চরিত্রে সুস্পষ্ট দেখিবেন।

এক জীবনে জীব "ভীষ্মত্বে" উপস্থিত হয় না লক্ষ লক্ষ জন্মের তিল তিল পরিমাণে অর্জ্জিত সাধনার পুঞ্জীভূত শক্তিতে দেবব্রতের ন্যায় জন্ম হয়।

অনাদিকাল হইতে জীব বদ্ধ আছে মুক্তির আশঙ্কা তাহার হয় না অধিকতর বদ্ধ হইবার চেষ্টাই তাহার দেখা যায়, তবে কখন কখন কেহ সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া সাথী কারাবাসীকে দেখান দেখ "আমি কেমন কারা-গৃহের দুরারোহ উচ্চ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, ক্লেশময় অবরোধ শৃঙ্খল জাল চূর্ণ করিয়াছি, কারা প্রাচীর নির্দ্দিষ্ট পূতি গন্ধময় পদার্থের তামস গণ্ডীর বাহিরে আসিয়াছি, নীচজন নিসেবিত অপবিত্র স্বভাব পঙ্ক সাধন সলিলে চির বিধৌত করিয়াছি।

আমি এখন মুক্ত বুদ্ধ শুদ্ধ, এস তোমরাও এস আর অপেক্ষা করিওনা সময় নষ্ট হইলে তাহাকে পাওয়া যায় না। পরীক্ষায় ভীত হইবার কোন কারণ নাই সময় অনন্ত আরম্ভের প্রত্যবায় নাই যতটুকু পার অগ্রসর হও।" শ্রীদেবব্রত ভীষ্ম এইরূপ একজন কেহর ভিতর।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র ভগবৎ চরিত্র তিনি মনুষ্য নহেন মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন—তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার কর্ম্ম তাঁহার লীলা কিছুই আশ্চর্য্যের নহে—কারণ তাঁহাতে ত সব সম্ভব। কিন্তু ভীষ্ম মনুষ্য, ক্লেশ কর্ম্মের দ্বারা পরামৃষ্ট, আমাদের মত অগণ্য ছিদ্র যুক্ত জীব। তাঁহার ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব হইতে নিস্ক্রমণ এবং আত্ম সাক্ষাৎকার ভীম পুরুষকারের চরম দৃষ্টান্ত। তাঁহার সহিত আমাদের জাতি সমতা আছে তাঁহার সফলতায় আমরা যত উৎসাহ পাই দৈব পুরুষের কৃতকার্য্যতায় তত পাই কি?

শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের আদর্শ ভীষ্ম আমাদের আদর্শ। আসুন ভীষ্মবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীদেবব্রত ভীষ্মের পবিত্র জীবনীর অবহার করি

অকুণ্ঠং সর্ব্ব কার্য্যেষু ধর্ম্ম কার্য্যার্থমুদ্যতং।
বৈকুণ্ঠস্য তদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥"

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

(ক)

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ভীষ্মের বয়স কত হইয়াছিল, কোন ঋতুতে এবং মাসে ভারতযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং কতকাল পূর্ব্বে এই মহাসমর হইয়াছিল জানিবার জন্য অনেকের ঔৎসুক্য স্বভাবত হইবে। তবে সে ঔৎসুক্য নিবারণের ক্ষমতা আমাদের নাই কারণ প্রশ্ন কয়েকটি বড় জটিল, এবং বহু পণ্ডিতের গবেষণায় আরও জটিলতর হইয়াছে। ইংরাজ, জার্ম্মাণ ফরাসী এবং দেশীয় বিবুধগণের বিদ্যাবত্তায় ও বিচারে মহাভারতের জন্ম বিষয়ক প্রশ্নটি প্রেহেলিকাময় হইয়া উঠিয়াছে। কাহার মতে মহাভারত খৃষ্ট জন্মের বহু পরবর্ত্তী গ্রন্থ, কেহ বা বলেন ইহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বটে তবে অধিক দিন পূর্ব্বের হইবে না, পুনরায় কেহ কেহ বলিয়াছেন যীশুর দেড় বা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত যুদ্ধ হইয়াছিল।

কেহ কেহ গ্রীক পরিব্রাজক কেহ বা চীন সন্ন্যাসীর লিখিত পুস্তক হইতে এবং কেহ কেহ ভারতীয় সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ হইতে উপরি উক্ত মতে উপস্থিত হইয়াছেন।

সুতরাং আমাদেরও একটা মত প্রকাশ করিতে ভয় করিবার কোন কারণ দেখি না।

(খ) ভীষ্মের বয়ক্রম।

আমরা এই গ্রন্থের কোন কোন স্থানে ভীষ্মকে শতায়ু বিশেষণে অভিবাদন করিয়াছি এখন দেখা যাক যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম কত হওয়া সম্ভব। ভারতকার তাঁহাকে "অতিবৃদ্ধ" বলিয়া সম্বোধন

করিয়াছেন; কিন্তু কত বয়সে মানুষ অতিবৃদ্ধ হয় তাহা প্রকাশ নাই আমরাত ৬০ বৎসর বয়সেই প্রায় অতিবৃদ্ধ হইয়া যাইতেছি। ৭২ বৎসরে ত কথাই নাই। যুদ্ধের সময় দ্রোণের বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। ভীষ্ম দ্রোণ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। যথা—

"আকর্ণ পলিত শ্যামো বয়সাশীতি পঞ্চকঃ"

দ্রোণপর্ব্ব—১৯১। ৬৪,

মহাভারতে রহিয়াছে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ষোড়শ বৎসরের যুবা এবং সেই বয়সে তাঁহার এক বংশকর পুত্র জন্মিবে।

"তস্যায়ং ভবিতা পুত্রো বালো ভুবি মহারথঃ।
ততঃ ষোড়শবর্ষাণি স্থাস্যত্যমরসত্তমঃ॥
অস্য ষোড়শ বর্ষস্য স সংগ্রামো ভবিষ্যতি।
একং বংশকরং পুত্রং বীরং বৈ জনয়িষ্যতি॥"

আঃ প—৬৭ অ—১১৭-১১৮-১২৩—

এই ষোল বৎসরের মধ্যেই পাণ্ডবদিগের বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস ও পাশ ক্রীড়া হইয়াছিল।

অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে একাদশ বৎসর দশমাস (সৌর) বনবাস স্বীকার করিয়াছিলেন।

"সবৈ সংবৎসরং পূর্ণং মাসমেকং বনে বসন।"

আঃ প—৬১ অ। ৪২—

অবশ্য অভিমন্যুর জন্ম সময়ে তাঁহার অন্ততঃ ১৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল, (বাস্তবিক আরও অধিক বয়স হইয়াছিল)—

দ্রোপদীর স্বয়ম্বরের পর পাণ্ডবেরা ১ বৎসর তথায় বাস করেন—

"তে তত্র দ্রৌপদীং লব্ধা পরিসংবৎসরোষিতাঃ"—ঐ—৩১।

এবং তথা হইতে হস্তিনাপুরে আসিয়া তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করেন এবং এখানে অনেক দিন গত হইলে তবে অর্জ্জুন বনবাসে প্রস্থান করেন। যথা—

"তত্র তে ন্যবসন্ পার্থাঃ সংবৎসরগণান্ বহূন্।"

ঐ—৩৫।—

ভাষা দেখিয়া বোধ হয় অন্ততঃ তিন বৎসর পরে তাহাই সম্ভব কারণ অর্জ্জুন দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলে তবে এ ঘটনা হয়।—

পাণ্ডবগণ জতুগৃহে এক বৎসর বাস করেন এবং তথা হইতে পলাইয়া যাইবার সময়ে বনে হিরম্ব রাক্ষসের বনে অন্ততঃ এক বৎসর বাস করেন এই সময়ে শ্রীমান ঘটোৎকচের জন্ম হয়, তাহা হইলে সে সময় ভীমের অন্ততঃ ১৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

যাবৎ কালেন ভবতি পুত্রস্যোৎপাদনং শুভে।
তাবৎকালং গমিষ্যামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে॥

ঐ—১৫৫ অ। ২০—

যুধিষ্ঠির সকলের বড় তাঁহার অপেক্ষা ভীম দুই বৎসরের ছোট··· দুর্য্যোধন এবং ভীম একদিনে জন্মগ্রহণ করেন—অর্জ্জুন আরও দুই বৎসরের ছোট·········

তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় অর্জ্জুনের বয়স হইয়াছিল অন্ততঃ—

১৬+১২+১+৩+১৬—৪৮ বৎসর তাহা হইলে ভীম এবং দুর্য্যোধনের বয়স ৫০ বৎসর।

তাহা হইলে ভীমের পিতা ধৃতরাষ্ট্রের তখন ৫০+১৬=৬৬ বৎসর হইয়াছিল।

ধৃতরাষ্ট্রের পিতা বিচিত্রবীর্য্য শিশু অবস্থায় রাজা হয়েন এবং পরে প্রাপ্তযৌবন হইয়া ৭ বৎসর রাজ্য করেন। ভীষ্ম তাঁহার রক্ষক ছিলেন,

কিন্তু কত বয়সে তিনি রাজা হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ নাই। তবে তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির সময় বিশেষণ এই—"বালম প্রাপ্ত যৌবনং" এ কথা হইতে ১০ বৎসরের বালক ছিলেন ধরা যাইতে পারে।

ইহার পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ ৩ বৎসর রাজ্য করেন। আর তাহার পূর্ব্বে ভীষ্ম ৪ বৎসর যুবরাজ ছিলেন।

আদি প—১০০।৪৫—

তৎপূর্ব্বে ভীষ্ম গঙ্গাদেবীর গৃহে কতদিন ছিলেন বলাযায় না তখন তিনি বেদ বেদাঙ্গ ধনুর্বিদ্যা সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী হইয়াছেন বৃহদাকার এবং কুমার ও যৌবরাজ্যের উপযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় অন্ততঃ ১২ বৎসর তাঁহার বয়স ছিল—তাহা হইলে সর্ব্বসমেত দাঁড়াইল ৬৬+১০+১০+৪+১২=১০১ বৎসর, যাহা হউক তিনি যুদ্ধের সময় শতায়ু ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই জন্যই কর্ণ তাঁহাকে অতিবৃদ্ধ বলিয়া উপহাস করিয়াছেন।

(গ) ভারত যুদ্ধ কোন মাসে হইয়াছিল।

ভারতযুদ্ধ কোন মাসে এবং ঋতুতে হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করিতে হইলে মহাভারতের যে যে স্থল এই বিচারের সহায়ক হইবে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ১৮ দিন হইয়াছিল—তাহার মধ্যে ভীষ্ম প্রথম ১০ দিন দ্রোণ ৫ দিন কর্ণ ২ দিন এবং শল্য অর্দ্ধ দিন আর বাকী অর্দ্ধ দিন গদাযুদ্ধ এবং সেই দিন রাত্রিতে অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করেন।

"অহানি যুযুধে ভীষ্মো দশৈব পরমাস্ত্রবিৎ।
অহানি পঞ্চ দ্রোণস্তু ররক্ষ কুরুবাহিনীম॥

অহনী যুযুধে দ্বে তু কর্ণ পরবলার্দ্দনঃ।

শল্যোর্দ্ধ দিবসঞ্চৈব গদাযুদ্ধ মতঃপরং॥" আদি প—২।৩০।৩১ —

২। মহাভারতে সৌর মাস এবং চান্দ্রমাস উভয় প্রকার গণনাই পাওয়া যায়। চান্দ্রমাস আবার দুই প্রকারে ব্যবহৃত হয়, যথা মুখ্য এবং গৌণ। যে মাস অমাবস্যায় শেষ হয় তাহা মুখ্য এবং যাহা পূর্ণিমায় শেষ হয় তাহা গৌণ। মহাভারতে যে চান্দ্রমাস দেখিতে পাওয়া যায় তাহা মুখ্য কি গৌণ?

নীলকণ্ঠ নিপুণতার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন, মহাভারতের মাস দর্শান্ত অর্থাৎ মুখ্যচান্দ্র। বনপর্ব্বের এক স্থলে ভাষা দেখিয়া বোধ হয় যেন তৎকালে গৌণ চান্দ্র গণনা প্রচলিত ছিল যথা—

"তামিস্রং প্রথমং পক্ষং বীতশোক ভয়ো বস।"

হঠাৎ দেখিলে অন্ধকারযুক্ত প্রথম পক্ষ এই রকম বোধ হয়। কিন্তু টীকাকার বলিতেছেন "প্রথমং প্রথমোৎ পন্নাণি রক্ষাংসি তৎসম্বন্ধিত্যাৎ পক্ষোপি প্রথমঃ।" অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে রাক্ষস সৃষ্টি হয় তৎপরে দেবতারা হইয়াছিলেন—সুতরাং প্রথম পক্ষ রাক্ষস পক্ষ। তিনি বলিতেছেন প্রথম শব্দ থাকায় অনেকে কৃষ্ণপক্ষ প্রথম পক্ষ মনে করেন, কিন্তু তাহা "অসৎ"।

বনপর্ব্ব ১৬২ অ। ১১—টীকা দ্রষ্টব্য।

মহাভারতের মাস মুখ্যচান্দ্র হওয়ার পক্ষে আরও একটি প্রমাণ রহিয়াছে যথা—গোহরণ পর্ব্বে অর্জ্জুনের চৈত্র মাসের কৃষ্ণ সপ্তমীতে প্রকাশ রহিয়াছে। ত্রয়োদশ বৎসরে কৃষ্ণ সপ্তমীতে প্রকাশ মুখ্য চান্দ্র মাস গণনা না করিলে পাণ্ডবদের সময় উত্তীর্ণ হয় না; সুতরাং ভীষ্ম যে গণনা করিয়াছিলেন, তাহা মুখ্যচান্দ্রে করিয়াছিলেন।

বিরাটপর্ব্ব ৫২ অ। ৪—টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। অখিলগুরু শ্রীকৃষ্ণ বিরাটরাজের উপপ্লব্য নগর হইতে হস্তিনাপুরে আসিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই লোমহর্ষণ যুদ্ধ যাহাতে না হয়। তাঁহার যাত্রার দিন এই ভাবে আছে—

"কৌমুদে মাসি রেবত্যাং শরদন্তে হিমাগমে।
স্ফাতশস্যসুখে কালে কল্য স্বত্ববতাং বর॥"

শরৎ ঋতুর শেষে হিমাগমে—যেকালে সকল শস্য সম্পত্তির আবির্ভাব হয়,—সেই কার্ত্তিক মাসের রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কোন একদিনে।

উঃ প—৮৩।৭—

কথা হইতেছে শরৎ ঋতু কোন কোন মাস, লইয়া হয়? সাধারণতঃ আমরা ভাদ্র আশ্বিনকে শরৎ বলি, কিন্তু অভিধানে তাহা বলে না তথায় আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎকাল মাঘ ফাল্গুন শীতকাল। যথা—

"দ্বৌ দ্বৌ মাঘাদিমাসৌ স্যাদৃতু স্তৈরয়নং ত্রিভিঃ" ইত্যমরঃ।
"মাঘ ফাল্গুনৌ শিশিরর্ত্তুঃ।"

রঘুনাথ।

এই শ্লোকটি হইতে বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ সৌর কার্ত্তিকের শেষে হস্তিনাপুর গিয়াছিলেন। সূর্য্য ভিন্ন ঋতু হয় না, যখন ঋতুর উল্লেখ রহিয়াছে তখন সৌরমাস ধরাই উচিত।

৪। শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই, দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবেন না, তখন বাসুদেব কর্ণকে তাঁহার পক্ষ হইতে ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন, কারণ কর্ণ দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিলেও সন্ধি হইতে পারে। তিনি ইহাতেও কৃতকার্য্য হইলেন না তখন সংগ্রাম যোজনার দিন স্থির করিয়া কর্ণকে বলিলেন—

"ব্রূয়াঃ কর্ণ ইতোগত্বা দ্রোণং শান্তনবং কৃপং।
সৌম্যোহয়ং বর্ত্ততে মাসঃ সুপ্রাপযবসেন্ধনঃ॥

সর্ব্বৌষধি বনস্ফীত ফলবানল্প মক্ষিকঃ।
নিষ্পঙ্কো রসবত্তোয়ো নাত্যুষ্ণঃ শিশিরঃ সুখঃ॥
সপ্তামাচ্চাপি দিবসাদমাবস্যা ভবিষ্যতি।
সংগ্রামো যুজ্যতাং তস্যাং হ্যাহুঃ শক্রদেবতাং॥"

উঃ ১৪২ অঃ। ১৮।১৯।২০

"তুমি এখান হইতে গমন করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপকে বলিও যে বর্ত্তমান মাস সর্ব্বপ্রকারেই উত্তম। এ মাসে ভোক্ষ ভোজ্য ও কাষ্ঠাদি সুলভ, বনে সর্ব্বপ্রকার ঔষধি ও ফল সকলের উৎপত্তি হয়; মক্ষিকার (মধু মক্ষিকার উৎপতন বড় বিরক্তিকর) উপদ্রব অধিক থাকে না; কর্দ্দম নাই জল বিলক্ষণ সুরস (শীতল) বায়ু অত্যুষ্ণ নহে অথচ শিশির-ময়, এ মাস সর্ব্বাংশেই সুখকর। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসের পর অমাবস্যা হইবে ঐ তিথির দেবতা ইন্দ্র অতএব সেই দিনেই সংগ্রামের আরম্ভ কর" উপরিউক্ত কালের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় উহা অগ্রহায়ণ মাসের বিবরণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

"সংগ্রামোযুজ্যতাং" বাক্য হইতে সহজ অনুমান এই হয় যে ঐ দিন যুদ্ধ আরম্ভ কর; বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদ উপরে দেওয়া হইয়াছে,— কিন্তু নীলকণ্ঠ টীকায় বলিতেছেন—"সংগ্রামো যুজ্যতাং" ইহার অর্থ একীভূয়াবতিষ্ঠতাম" সংগ্রামের জন্য একত্র হইয়া অবস্থান কর,—

"সংগ্রামারম্ভস্তু দিনান্তরে এবেতি বক্ষ্যতে।"

সংগ্রামের আরম্ভ অন্য দিনে হইবে।

এখন কোন দিন সংগ্রাম আরম্ভ হইল এবিষয়ে জানা নিতান্ত আবশ্যক দেখা যাক কোন মুনির কি মত।

৫। দুর্য্যোধনকে বার বার উপরোধ করিলেও তিনি কাহার কথা শুনিলেন না এবং পুষ্যানক্ষত্রে সৈন্য নির্য্যাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

"প্রয়াব্বং বৈ কুরুক্ষেত্রং পুষ্যোত্থেতি পুনঃ পুনঃ।"

উঃ প—১৫০।৩

৬। যে মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হয় সে মাসে চন্দ্র এবং সূর্য্য উভয় গ্রহই ত্রয়োদশীতে রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন। এরূপ অপর্ব্বে গ্রহণ হইলে ভয়ানক প্রজা ক্ষয় হয়।

চন্দ্রাদিত্যাবুভৌ গ্রস্তাবেকাহ্না হি ত্রয়োদশীম্।
অপর্ব্বণি গ্রহং যাতৌ প্রজা সংক্ষয়মিচ্ছতঃ॥"

ভীষ্মপঃ—৮৩।২৮

৭। পুনরায় ভীষ্ম পর্ব্বের এক স্থলে অমঙ্গল লক্ষণ প্রকাশ করিয়া সঞ্জয় বলিতেছেন—

"মঘাবিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং প্রত্যপদ্যত।" ভীষ্মপর্ব্ব—১৭।২

অনেকে এই অর্থ করেন যে চন্দ্র মঘানক্ষত্রযুক্ত হইলে সেই দিনে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে নীলকণ্ঠ বিশেষ নিপুণতার সহিত এই অর্থ করিয়াছেন যে ঐ শ্লোক যুদ্ধের আরম্ভ সূচক নহে। উহার অর্থ এই যে মঘা পিতৃনক্ষত্র সেই নক্ষত্রযুক্ত হইলে তাহার ফল স্বর্গ লাভ অর্থাৎ যুদ্ধের সময় মৃত ব্যক্তিদিগের দিব্যদেহ প্রাপ্ত জন্য চন্দ্রমণ্ডল পিতৃলোকের সন্নিহিত হইল।

যে পাণ্ডিত্যের দ্বারা নীলকণ্ঠ এই ব্যাখ্যায় উপস্থিত হইয়াছেন তাহা পরে বিবৃত হইবে। বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদও নীলকণ্ঠের অনুমত।

৮। দ্রোণবধপর্ব্বে রাত্রি যুদ্ধে এই ভাবে লিখিত আছে—

"ত্রিভাগ মাত্র শেষায়াং রাত্র্যাং যুদ্ধমবর্ত্তত।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সংহৃষ্টানাং বিশাম্পতে॥
অথ চন্দ্রপ্রভাং মুষ্ণন্নাদিত্যস্য পুরঃ সবঃ।
অরুণোঽভ্যুদয়াঞ্চক্রে তাম্রীকুর্ব্বন্নিবাম্বরং॥"

রাত্রির ত্রিভাগ অতীত হইয়া এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে এমন সময় সেই সংহৃষ্টচিত্ত কুরুপাণ্ডবগণের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

দ্রোণপর্ব্ব—১৮৫।১।২

তদনন্তর আদিত্যের অগ্রভাগে অরুণ সমস্ত চন্দ্রপ্রভা হরণ ও অম্বরকে তাম্রবর্ণ করিয়া উদিত হইলেন।

ইহা হইতে রজনীর শেষ ভাগ জ্যোৎস্নাময় ছিল বুঝা যায় তাহা হইলে ঐ দিন পূর্ণিমা না হইলে কৃষ্ণপক্ষ ছিল প্রমাণ হয়।

২। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, যুদ্ধে মৃতদিগের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সমাপন করিয়া পাণ্ডবেরা কৃতোদক হইয়াছেন। পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন—

"তত্রেতে সুমহাত্মানোঽন্ববসন পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নিবর্ত্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহি পুরাৎ॥"

শান্তি—১।২

বৰ্দ্ধমান রাজবাটীর সংস্করণ অনুবাদ করিয়াছেন "শোচাপনয়নার্থ এক মাসকাল পর্য্যন্ত পুরের বহির্ভাগে গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা মাস মাত্র শব্দের অর্থ একমাস ধরিয়াছেন শৌচং শব্দের অর্থ শোক ধরিয়াছেন—কিন্তু শোক অপনোদনের জন্য একমাস বাহিরে কেন থাকিতে হইবে? তবে শান্তিপর্ব্বে প্রথম কয়েক অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের শোক প্রকাশ এবং নারদাদি ঋষিগণের তদপনোদনের বিবরণ আছে। কিন্তু একমাস কাল পুরদ্বারে অবস্থান করিলে যে সময়ের অসঙ্গতি হয় তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই।

নীলকণ্ঠ তাঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাময়িক অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সেইজন্য শৌচ শব্দের অর্থ তিনি শোক লয়েন নাই। "অশৌচ হইতে শুদ্ধি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। মাস মাত্র শব্দের এক

মাস অর্থ লয়েন নাই, ইহার অর্থ দ্বাদশ দিন করিয়াছেন। যেমন চন্দ্র, পক্ষ, নেত্র, বেদ, বাণ, ঋতু, সমুদ্র ইত্যাদি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ অঙ্কের স্থানাভিষিক্ত হয় সেইরূপ মাস শব্দ দ্বাদশ (১২) অঙ্কের নির্দ্দেশক। কুরুপাণ্ডবেরা ক্ষত্রিয় তাহাদের একমাস অশৌচ হইতে পারে না—বার দিন হয়।

১০। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তিনি কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে উপদেশ দিবার অনুজ্ঞা করিতেছেন এবং এইভাবে বলিতেছেন—

"পঞ্চাশতং ষট চ কুরুপ্রবীর শেষ দিনানাং তব জীবিতস্য।"

তোমার জীবনের আর পঞ্চাশ+ষট=৫৬ দিন অবশিষ্ট আছে—এইরূপ সহজার্থ কিন্তু সে অর্থ হইতে পারে না তাহা হইলে ভীষ্মের শর-শয্যা ৯৪ দিন হইয়া যায়। কূটার্থ এই পঞ্চ×ষট=৩০ এবং আশতং শব্দের অর্থ যাহা অন্যে শত দিনে পাবে তাহা তুমি ৩০ দিনে পার।

বর্দ্ধমান রাজ বাটীর পণ্ডিতেরাও এই অর্থ স্বীকার করিয়াছেন।

১১। যে দিন ভীষ্ম কলেবর ত্যাগ করেন সেদিন উত্তরায়ণ হইয়াছে এবং অনুশাসনপর্ব্বে এইভাবে লেখা আছে—

"অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষ শতং তথা॥
মাঘোয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাস সৌম্য যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগ শেষঃ পক্ষোয়ং শুক্লোভবিতুমর্হতি॥

এখন ঐ অষ্টপঞ্চাশতং পদের অর্থ কি ৫৮ কি অন্য কিছু। সহজার্থ ৫৮ বর্দ্ধমান রাজ বাটীর অনুবাদ ৫৮ আমরাও গ্রন্থে ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, বঙ্কিম বাবু এবং অন্যান্য লোকে ৫৮ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু

ঐ অর্থ লইলে একটা বড় বিরোধ উপস্থিত হয়। বিরোধ এই যদি ভীষ্মদেব ৫৮ রাত্রি শর-শয্যায় শায়িত ছিলেন এই অর্থ লওয়া যায়,—তাহা হইলে তিনি যেদিন পাতিত হয়েন সেদিন শুক্লপক্ষে পড়ে কারণ তাঁহার তিরোভাবের দিন উপরিউক্ত শ্লোক হইতে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি। কিন্তু তাহাত নহে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অমাবস্যায় বা তৎপর দিনে শেষ হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিম্নে এ কথা পরিস্ফুট হইবে।

১২। যেদিন দুর্য্যোধনের ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ হয় অর্থাৎ—যুদ্ধের শেষ দিনে বলদেব তীর্থযাত্রা হইতে যুদ্ধ দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছেন এবং বলিতেছেন—

"চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ।
পুষ্যেণ সংপ্রযাতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ॥"

অদ্য বিয়াল্লিশ দিন আমার গত হইয়াছে আমি পুষ্যে গিয়াছিলাম আজ শ্রবণায় পুনরাগত হইয়াছি।

পুষ্যা হইতে শ্রবণা এক চান্দ্রমাস ব্যবধানে ঠিক ৪২ দিন হয়—যথা ২৮+১৪=৪২!

১৩। যে সময়ে গদা যুদ্ধ হইতেছে সেই সময়ের বর্ণনা এই—

"রাহুশ্চাগ্রসদাদিত্যমপর্ব্বণি বিশাম্পতে।
চকম্পে চ মহাকম্পং পৃথিবী সবনদ্রুমা॥"

পর্ব্বদিন না হইতেই সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছে। পনর দিনের দিন পর্ব্বদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যে মাসে হইয়াছিল সে মাসে দুই তিথি ক্ষয়ে ২৬ দিনে মাস হইয়াছিল, তাহা হইলে ১৩ দিনে পক্ষ হইয়াছিল।

এখন ফল কি দাঁড়াইল দেখা যাক। উপরিউক্ত ৭ নং স্থলের টীকায় নীলকণ্ঠ ভারত সাবিত্রী গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভারত যুদ্ধ কোন মাসে এবং পক্ষে আরম্ভ হইয়াছিল প্রমাণ করিতেছেন। যথা—

"হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম।
প্রবৃত্তং ভাবতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যম দৈবতে॥"

প্রথমে মার্গশীর্ষে। এখানে ত্রয়োদশী শব্দে তদ্যুক্ত চতুর্দ্দশী গ্রহণ করিতে হইবে। পুনরায়,

"অর্জ্জুনেন হতোভীষ্ম মাঘমাসেহ সিতাষ্টমীতি।"
ত্রয়োদশ্যাং তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজ নিপাতিত ইতি॥

মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে অর্জ্জুন ভীষ্মকে পাতিত করেন। এ স্থলে মাঘ শব্দ পৌষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে মাস সমস্ত সৌর।

যমদৈবত অর্থে যুগ্মদৈবত লইতে হইবে। নচেৎ ভরণী নক্ষত্র হয়, বাস্তবিক মৃগশিরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ইহার পর নীলকণ্ঠ ১১ নং স্থলোক্ত "অষ্ট-পঞ্চাশতং রাত্র্যঃ" বাক্যের এক অভিনব ব্যাখ্যা করিতেছেন, সে ব্যাখ্যার অর্থ এই যথা—অষ্ট-পঞ্চাশদূনং শতং অর্থাৎ এমন শত যাহার অষ্টপঞ্চাশৎ কম, তাহা হইলে হইল (১০০-৫৮=৪২) দ্বিচত্বারিংশৎ বা বিয়াল্লিশ দিন।

নীলকণ্ঠের মতে ভীষ্মদেব ৪২ দিন শরশয্যায় শায়িত ছিলেন। নীলকণ্ঠের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু এ ব্যাখ্যাতেও অন্ধকারে ঢেলা মারাভাব রহিয়াছে,—কারণ ৯ এবং ১০ নং স্থলের সহিত মিলিতেছে না। ৯ নং স্থলে যদি নীলকণ্ঠের মতে ১২ দিন লওয়া যায় এবং ১০ নম্বরের ৩০ দিন ধরা যায় তাহা হইলে ভীষ্মের শরশয্যা (১২+৩০+৮=৫০) পঞ্চাশৎ দিবস হয়।

অন্য পণ্ডিতদের মতে এক মাস পুরদ্বারে হইলে ৮+২৮+৩৯=৬৬ দিন হয়। ইহাতে পক্ষ শুক্ল হয় কিন্তু অষ্টমী তিথি হয় না পঞ্চমী হয়,—তিতিক্ষয় ও বৃদ্ধিতে কম বেশ করিলেও অষ্টপঞ্চাশৎ শব্দের অর্থ

৬৬ কি করিয়া বলা যাইতে পারে। তবে ঐ শব্দের অর্থ ৫৮ নহে তাহাও স্থির, কারণ তাহা হইলে ভীষ্মের তিরোভাব শুক্লপক্ষ না হইয়া কৃষ্ণপক্ষ হয়।

ব্যাসদেব বোধ হয় তাঁহার কূটার্থ সকল এ সমস্ত বিরুদ্ধ গণনার ভিতর নিহিত করিয়াছেন।

যাহা হউক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থির পাওয়া গেল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সৌর অগ্রহায়ণ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে আরম্ভ হয় এবং পৌষমাসে কোন দিনে শেষ হয়।

নীলকণ্ঠ এইরূপ হিসাব দিয়াছেন, ইহার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই।

কার্ত্তিক শুক্ল দ্বাদশী রেবতী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণের উপপ্লব্য হইতে হস্তিনাপুরে আগমন; মার্গশীর্ষ কৃষ্ণপঞ্চমীতে পুষ্যে সেনানির্য্যাণ ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশীতে আরম্ভ; পৌষ শুক্ল প্রতিপদে যুদ্ধ শেষ।

(ঘ) এখন হইতে কতদিন পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল?

তিথি নক্ষত্র ও মাসের একটা নির্ণয় হইল, এখন যে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহাতে দেশীয়দের সহিত এবং তাঁহাদের গুরু সাহেবদিগের সহিত গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হইবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরকাল নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রতিলক্ষ্য অত্যাবশ্যক মনে হয়।

১। মহাভারতে ভারত-যুদ্ধের কাল বিষয়ে এই শ্লোকটি আছে,—

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডব সেনয়োঃ।"

আদি—২।১৩—

কলি ও দ্বাপরের সন্ধি সময়ে সমন্তপঞ্চকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।

আজকাল কলির গতাব্দ ৫০১৫ বৎসর। যদি এই শ্লোকটিই থাকিত আর এ বিষয়ে অন্য বাক্য প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে কোন গোল ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে কয়েকটি শ্লোক আছে, যাহার অর্থ লইয়া নানামুণি নানা মতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা কোথায় উপস্থিত হই বিবেচনা করা যাউক।

২। বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতে বার্হদ্রথ নৃপতিগণের বংশ বিবরণ আছে। জরাসন্ধ বৃহদ্রথ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক, ভীম কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। এই বংশের শেষ রাজা রিপুঞ্জয়, ইনি জরাসন্ধ হইতে ১০০০ বৎসর অন্তর।

"ইত্যেতে বার্হদ্রথা ভূপতয়ো বর্ষসহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি।"

বিষ্ণুপুরাণ ৪ অং। ২৩।৩

"বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যাঃ সহস্র বৎসরং"

ভাগবত নবম স্কন্ধে ২২ অধ্যায়।

৩। ঐ রিপুঞ্জয়ের সুনিক নামে এক অমাত্য হইবে সে স্বামী রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া প্রদ্যোত নামা স্বপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। এই প্রদ্যোত বংশে পাঁচজন নৃপতি একশত অষ্টত্রিংশৎ বৎসর রাজ্য করিবেন।

"ইত্যেতে অষ্টত্রিংশদুত্তরমব্দশতং পঞ্চ প্রদ্যোতাপৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি।"

বিঃ-পু ঐ-২৪।২—

"———পঞ্চ প্রদ্যোতনা ইমে।

অষ্টত্রিংশোত্তরশতং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং নৃপাঃ॥"

ভাগবত। ১২।১।৩,

৪। অতঃপর শিশুনাগ রাজা হইবেন এবং এই বংশে দশজন রাজা হইবেন তাঁহাদের রাজ্যকাল ৩৬২ বৎসর, ভাগবত বলেন ৩৬০ বৎসর।

"ইত্যেতে শৈশুনাগা দশভূমিপালা স্ত্রীণি বর্ষশতানি
দ্বিষষ্টাধিকানি ভবিষ্যন্তি।"

বিং পু ঐ—২৪।৩,

"শিশুনাগা দশৈবৈতে ষষ্ট্যুত্তর শতত্রয়ং।
সমা ভোক্ষ্যন্তি————॥"

ভাগবত ঐ ১২।১।৬

৫। ঐ শিশুনাগ বংশের শেষ রাজা মহানন্দী। এই মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত অতিলোভী নন্দ মহাপদ্ম রাজা হইবেন। এই বংশে আট জন ভূমিপাল হইবেন, তাঁহাদের রাজত্বকাল একশত বৎসর।

"————একং বর্ষশতং অবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি।"

বিঃ পু—ঐ ২৪।৬,

"যে ইমং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমা।"

ভাগবত ঐ ১২।১।১০,

৬। চাণক্য যাঁহাকে কৌটিল্যও বলে এই নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার বা বারিসার এবং পৌত্র ভারত-সম্রাট অশোকবর্দ্ধন। শ্রীবুদ্ধদেব ঐ বিন্দুসারের সমকালীন।

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীকবীর অতিপ্রসিদ্ধ, সেকেন্দর বা আলেকজণ্ডর আসিয়াছিলেন। তিনি খৃ পূ ৩২৫ অব্দে আসেন। তাহা হইলে ফল দাঁড়াইল এইরূপ—

বার্হদ্রথ রাজগণ	১০০০—বৎসর
প্রদ্যোতগণ	১৩৮—"
শিশুনাগগণ	৩৬২—"
নন্দবংশীয়েরা	১০০—"
	১৬০০—বৎসর

এবং নন্দমহাপদ্মের অভিষেক ১৫০০ বৎসর। উপরিউক্ত রাজবংশ এবং তাহাদের ভোগকাল অতি স্পষ্ট এবং সংস্কৃতেও কোন কূটভাব নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হয় খৃ পূ ১৯২৫ অব্দে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন এবং সেই সময়ে যুদ্ধ হয়।

৭। ৺রামদাস সেন তাঁহার উপাদেয় বুদ্ধদেব গ্রন্থে রাজতরঙ্গিনী প্রণেতা কবি কল্হণের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কাশ্মীরে গোন রাজা হয়েন এবং এই গোন যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। তাহা হইলে কলির গতাব্দ ৫০১৫-৬৫৩=৪৩৬২ বৎসর। বঙ্কিম বাবুও অবশ্য এ প্রমাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।

৮। ভারতযুদ্ধ নির্ণয়ের মতামত ইয়ুরোপায়দিগের প্রচারিত অনেক আছে। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি সেইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, কেহই খৃঃ পূ যাইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন নাই, বরং অনেকে খৃষ্টের বহু পরে যুধিষ্ঠিরকে টানিয়া আনিয়াছেন, আমুন তাহাতে যুধিষ্ঠিরের তত কষ্ট হইবে না।

দেশীয় গণৎকারদের মধ্যে বঙ্কিমবাবু সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে মহাভারতের কাল নির্দ্দেশ আছে, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন,—যে ১৫৩০ খৃঃ পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে কখন হয় নাই।

যে প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া তিনি সাহস করিয়া এ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই প্রমাণগুলি একবার বিচার করা যাক।

বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে কতকগুলি শ্লোক আছে, সেগুলি মহাভারতের কাল নির্দ্দেশক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ঐ শ্লোকগুলি উভয় পুস্তকেই একভাবের কোথাও কোথাও কিছু ভাষার পরিবর্ত্তন আছে মাত্র। শ্লোকগুলি বিষ্ণুপুরাণকার বা ভাগবতকারের নিজের নহে অন্য কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বিষ্ণুপুরাণ "অত্রোচ্যতে" বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন এবং ভাগবত "প্রাহুঃ পুরাবিদ" বলিয়া শেষ করিয়াছেন।

এই শ্লোকগুলি মহাভারতের কাল নির্ণয়ের জন্য লিখিত নহে,—পৃথিবীতে কবে কলিযুগ প্রবৃত্ত হইল, কবে তাহার বৃদ্ধি এবং কখন অতিবৃদ্ধি হইল তাহাই বলা যাইতেছে। প্রসঙ্গ ক্রমে কলিযুগের পরিমাণ এবং তাহার ধর্ম্ম কি তাহা বলা হইতেছে।

"যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চোদশোত্তরং॥ ৩২
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠান্ত্যব্দশতং নৃণাম॥ ৩৩
তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশ শতাত্মকঃ॥" ৩৪
যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ
বসুদেব কুলোদ্ভূত স্তদৈব কলিরাগতঃ॥ ৩৫

* * * *

প্রযাস্যন্তি যদা চতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষু কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৩৯
যস্মিন কৃষ্ণো দিবং যাতস্তাস্মন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যাং নিবোধমে ॥ ৪০

ভাগবতেও শ্লোকগুলি প্রায় ঐ ভাবেই আছে, আবশ্যক মত কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে জ্ঞেয়ং পদের স্থানে "শতং" পদ আছে।

ভাগবতে যে টীকা আছে তাহা দেখিলেই ঐ শ্লোকগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা নিঃসন্দেহ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাহার স্থূল মর্ম্ম দিতেছি।*

পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক কাল ১০১৫ বৎসর, ভাগবত অনুসারে ১১১৫ বৎসর। পূর্ব্ব কথিত রাজবংশ হইতে প্রায় ৫০০ বৎসর অন্তর, একই পুস্তকে একই গ্রন্থকারের এরূপ লেখার অর্থ কি। ভাগবতে টীকাকার আপাততঃ অসঙ্গতির লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন "বিবক্ষয়া অবান্তর সংখ্যেয়ং"—অর্থাৎ ঠিক গণনা নহে, প্রধান অঙ্কের উল্লেখ মাত্র। বস্তুতঃ সার্দ্ধ সহস্র বৎসর।

কিন্তু আমরা বলি যদি "অঙ্কস্যবামাগতি" এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় তাহা হইতে পঞ্চোদশোত্তরং পদের অর্থ ১৫০০ বৎসর হয় আর তাহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

বঙ্গবাসীর বিষ্ণুপুরাণে পনর হাজার বৎসর অনুবাদ ভ্রান্তি।

৩৩ শ্লোকের অর্থ লইয়া অনেক মারামারি হইয়াছে—বিদেশীয় এবং দেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার কোন অর্থ স্থির করিতে পারেন নাই। বঙ্কিম বাবু ইহাকে দুর্ব্বোধ্য বলিয়াছেন।

---

* উপরিউক্ত শ্লোকগুলির প্রকৃত অনুবাদ বঙ্গবাসীর প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণের সংস্করণে হয় নাই।—ভাগবতে শুদ্ধ অনুবাদ আছে।

এই শ্লোকের বিষয় একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক মনে করি।

কলির প্রবৃত্তি এবং বৃদ্ধি নিরূপণ করিতে যে উপলক্ষণ তাহাই এই শ্লোকে রহিয়াছে। ইহা একটি জ্যোতিশ্চক্রের গণনা।

ভারতে অনেক প্রকার জ্যোতিশ্চক্রের গণনা প্রচলিত ছিল—যথা সূর্য্যকেন্দ্রিক, চন্দ্রকেন্দ্রিক. পৃথিবীকেন্দ্রিক নক্ষত্র ও ধ্রুবকেন্দ্রিক। ইহা হইতে আমরা সৌরচান্দ্র নাক্ষত্র ও ধ্রুব বৎসরের পরিচয় পাই। ৩৩ শ্লোকে ধ্রুবকেন্দ্রিকগণনার পরিচয় রহিয়াছে। এ গণনা এখন প্রায় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে—ধ্রুব এই চক্রের কেন্দ্র ছিল (ধ্রুব=Polestar)

সপ্তর্ষিমণ্ডল ৭টি স্থির তারা ধ্রুবকে এক স্থির গতিতে প্রদক্ষিণ করে। ইহাদের গতির একটা অন্যান্য গ্রহ তারাগণের গতির ন্যায় কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। যেমন সূর্য্য দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশি ভোগ করেন ধ্রুব তারাও সেই ভোগ করিয়া থাকে। রাশিগুলি কেবল কতকগুলি নক্ষত্রের সমষ্টি মাত্র। মধ্য নক্ষত্র ঐ শ্লোকে ধ্রুবকে নির্দ্দেশ করিতেছে।

গগনের উত্তরদিকে ধ্রুব তারা অবস্থিত। উত্তর মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া উদয় সময়ে দক্ষিণ হইতে দেখিলে—সপ্তর্ষিগণকে এইভাবে দেখা যায়—
১। মরীচি, ২। বশিষ্ঠ—অরুন্ধতী ইঁহার পার্শ্বে। ৩। অঙ্গিরা, ৪। অত্রি, ৫। পুলস্ত, ৬। পুলহ, ৭। ক্রতু।

পুলহ এবং ক্রতু ধ্রুবের সহিত সম রেখায় অবস্থিত। ইঁহাদের দ্বারাই ধ্রুব নক্ষত্র নির্দ্দিষ্ট হয়েন। ইহারা অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে শত বৎসর অবস্থান করেন।

ধ্রুব যে কোন সময়ে এক প্রকার গণনার কেন্দ্র ছিলেন তাহা পাতঞ্জল দর্শনের "ধ্রুবে তদ্গতি জ্ঞানং" সূত্র হইতে বেশ অনুমান হয়। পরন্তু এই ভাগবতেই ধ্রুবকেন্দ্রের কথা স্পষ্ট ভাবে রহিয়াছে।

"এবং নক্ষত্র রাশিভিরুপলক্ষিতেন কালো
ধ্রুবং মেরুঞ্চ প্রদক্ষিণতঃ পরিধাতা—ইত্যাদি।
ভাগবত—৫।২২।১।২

এখন বোধ হয় ঐ শ্লোকে আর তত দুর্বোধ্যত্ব রহিল না—এখন অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করা থাক্।

অর্থ এই সপ্তর্ষিমণ্ডল অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে ১০০ বৎসর করিয়া থাকেন। তাঁহারা পরীক্ষিতের সময় মঘানক্ষত্রে ছিলেন। সেই সময় "দ্বাদশাব্দ শতাত্মক" কলি প্রবৃত্ত হইল।

বঙ্কিম বাবু বুঝিয়াছেন দ্বাদশশত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সংস্কৃতের এ অর্থ নহে। উহার অর্থ যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিলেন তখন দ্বাদশ শত বর্ষাত্মক যে কলি তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। পদটি কলির বিশেষণ দিবামানে কলির পরিমাণ ১০০০ বৎসর আর তাহার সন্ধ্যা ২০০ বৎসর এই ১২০০ বৎসর কলির জীবন। এ শ্লোকের পরে ৪২ শ্লোকে তাহাই কথিত।

তাহারা যখন ঐ সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্বাষাঢ়ায় যাইবেন তখন কলি বৃদ্ধি হইবে ইহাই হইল ৩৯ শ্লোকের অর্থ। অবশ্য ইহা ১০০০ বৎসর। নন্দাৎ প্রভৃত্যেষু অর্থে প্রদ্যোতাদি নন্দ পর্য্যন্ত নন্দ আরম্ভ নহে শেষ—তবে নন্দ অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাব নামের উল্লেখ।

প্রদ্যোত হইতে নন্দ ৫০০ বৎসর অন্তর। সাকল্যে ১৫০০ বৎসর হইল।

বঙ্কিম বাবু প্রভৃতির সহস্র বৎসর মাত্র ধারণা একান্ত ভুল।

সরলার্থ এই—পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক কাল ১৫০০ বৎসর। পরীক্ষিতের জন্ম সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, সেই সময় কলি যাহার পরমায়ু ১২০০ বৎসর পৃথিবীতে প্রবৃত্ত হইল।

৩৫ শ্লোক দেখিলে আরও স্পষ্ট হইবে কলির সন্ধ্যা বা আরম্ভ পূর্ব্বেই হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে থাকায় তাঁহার পাদস্পর্শে কলি শক্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই, তাঁহার যেদিন তিরোভাব হইয়াছে সেই দিন হইতে সে পৃথিবীতে প্রবৃত্ত বা আপনার অধিকার জারি করিয়াছে। আর ইহার এক হাজার বৎসর পরে যখন প্রদ্যোত এবং নন্দ প্রভৃতি রাজা হইবেন তখন কলির পূর্ণ প্রভাব হইবে।

ফল দাঁড়াইল পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক ১৫০০ বৎসর এ বিষয় আর কোন বিরোধ দেখা যায় না, তবে এ প্রমাণ কেন গ্রহণ করিব না।

তাহা হইলে আজ হইতে (১৯২৫+১৯১৫)=৩৮৪০ বৎসর পূর্ব্বে ভারত যুদ্ধ হইয়াছিল।

যদি দ্বাদশ শতাত্মক পদের অর্থ ১২০০ বৎসর ধরা যায় তাহা হইলেও ৫০১৫—১২০০=৩৮১৫ উপরিউক্ত বিষ্ণুপুরাণের গণনার সহিত মিল হয়।

তবে এই গণনাতে রাজতরঙ্গিণীর গণনা হইতে প্রায় ৫০০ বৎসরের পার্থক্য। কিন্তু কলির গতাব্দ ৫০১৫ ইহার ভিতর কলির ২০০ শত বৎসর সন্ধ্যা এবং ১০০ বৎসর সন্ধি বাদ দিতে হইবে তাহা হইলে ৫০১৫—১০০০=৪০১৫ বৎসর হয় বিষ্ণুপুরাণের গণনা হইতে ২০০ বৎসর অন্তর।

মহাভারতে যে কলি ও দ্বাপরের সন্ধির উল্লেখ আছে তাহা এই ভাবেই বুঝিতে হইবে।

রাজতরঙ্গিণী যে সমস্ত প্রমাণের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কলির গতাব্দ ৬৫৩ করিয়াছেন সে সমস্ত প্রমাণ আমাদের সমক্ষে নাই সুতরাং আমরা বিষ্ণু পুরাণের গণনাই গ্রহণ করিতে বাধ্য।

আর একটি গণনার কথা বলিয়া এই নীরস প্রবন্ধের উপসংহার করি।

(গ) র ১১ নং স্থলে যে অষ্টাপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ পদটি আছে তাহার অর্থ নীলকণ্ঠ এবং ভারত সাবিত্রীকারের মতে বিয়াল্লিশ, তবে অষ্টপঞ্চাশতের অর্থ উপরি উক্তস্থলে যে ৫৮ নহে সেটা স্থির তাহার কারণ তাহা হইলে শুক্লপক্ষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আসিয়া পড়ে। তবে শ্লোকের অন্যান্য অংশের সহিত সময়ের মিল হয়।

ভীষ্মের শরশয্যার ৪২ দিন পরে উত্তরায়ণ হইয়াছিল। এখন দেখাযাক এই ৪২ দিনের দিন কোন মাসে এবং তারিখে পড়ে সৌর এবং চান্দ্র মাস দুই বিবেচনা করিতে হইবে।

যুদ্ধ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে আরম্ভ হয় চান্দ্র হিসাবে সেদিন মাসের ১৩ বা ১৪ তারিখ, তাহা হইলে ভীষ্ম ২২ কিম্বা ২৩ অগ্রহায়ণ শায়িত হয়েন—ইহার উপর ৪২ দিন যোগ করিলে—পাওয়া যায়—৭ বা ৮ই চান্দ্র মাঘ! ইহাতে শুক্লপক্ষ এবং মাঘ চান্দ্র ও সমনুপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু নিম্নলিখিত অসঙ্গতি আসিয়া পড়ে।

যদি চান্দ্র এবং সৌর মাসে সমপরিমাণ হইত তাহা হইলে কোন গোল ছিল না কিন্তু তাহা হয় না—কারণ চান্দ্রবৎসর সৌর বৎসর অপেক্ষা ১০ দিন ছোট—সুতরাং প্রতি পাঁচবৎসরে ২ মাস চান্দ্রহিসাবে সৌর অপেক্ষা কম হয়। তাহা হইলে আড়াই সৌর বৎসরে চান্দ্র বৎসর একমাস কম হয়। এই একমাস পূর্ণ করিয়া না লইলে কালের কোন স্থিরতা থাকে না। এই জন্য প্রতি আড়াই বৎসরে এক পূরক মাস চান্দ্রবৎসরে যোগ করিতে হয় তাহা হইলেই চান্দ্র এবং সৌর বৎসর সমান থাকে। এই পূরক মাসের নামে মলমাস।*

বুঝাগেল চান্দ্র এবং সৌরমাসে এক চান্দ্রমাস অর্থাৎ ২৮ দিন পর্য্যন্ত

* মুসলমানেরা চান্দ্র মাস ব্যবহার করেন কিন্তু মলমাস প্রয়োগ না করায় তাঁহাদের মহরমাদি পর্ব্বদিন ২৭ সকল ঋতুতে এবং মাসে আসিয়া উপস্থিত হয়।

অন্তর হইতে পারে। যে বৎসর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল—সে বৎসর চান্দ্র এবং সৌরমাসে কতদিন পৃথক ছিল।

চান্দ্র এবং সৌর বৎসরে ১০ দিন পৃথক হইলে মাসে প্রায় একদিন করিয়া পার্থক্য বাড়িতে থাকে। তাহা হইলে যে বৎসর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল সে বৎসর যদি মলমাসের পরের বৎসর হয় তাহা হইলে ১০ দিন অন্তর ছিল—২য় বৎসর হইলে—২০ দিন ছিল—এবং মলমাসের বৎসর হইলে ২৮ দিন ছিল।

আমরা পূর্ব্বকথিত স্থল সমূহ হইতে এবং ভারত সাবিত্রীর সিদ্ধান্ত হইতে এই পাইয়াছি যে যুদ্ধের মাসে—চান্দ্র এবং সৌর অগ্রহায়ণ বর্ত্তমান ছিল।

তাহা হইলে ইহা স্থির যে সে সময় চান্দ্র এবং সৌরমাসে ২৮ দিন তফাৎ ছিল না—কারণ তাহাহইলে সৌর অগ্রহায়ণ আসে না—। সুতরাং হয় দশদিন না হয়—১৭ দিন পর্য্যন্ত তফাৎ ছিল—। কিন্তু যদি যুদ্ধ ১৩ বা ১৪ চান্দ্র অগ্রহায়ণে হয়—তাহা হইলে ১৪ দিনের অধিক অন্তর থাকিতে পারে না।

এ গণনাঅনুসারে সৌর ৭ বা ৮ পৌষ ভীষ্মের পতন স্থির হয়।

ইহার উপর ৫৮ দিন যদি যোগ দেওয়া যায় তাহা হইলে—সৌর ফাল্গুনের ৬ই বা ৭ই পড়ে—যথা—

পৌষ মাসের————বাঁকী———২১
মাঘ মাসের—————————৩১
ফাল্গুন মাসের————————৬

৫৮ দিন।

এ গণনা হইতে যুদ্ধের সময়ের সুন্দর স্থির হয় কারণ—ভীষ্মের তিরোঁভাবের দিন উত্তরায়ণ হইয়াছিল—আর—আজকাল ৭ই পৌষ উত্তরায়ণ হয়। তাহা হইলে ৫৮ দিন পিছে ছাড়িয়া আসিয়াছে।

এখন একদিনে পিছে হটায় কত বৎসর জানিতে পারিলেই কত বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধ হইয়াছিল পাওয়া যাইবে।

পৃথিবীর মধ্য রেখা এবং ভচক্রের মধ্যরেখা সমসূত্রপাতে যে স্থলে মিলিত হইয়াছে তাহার নাম ক্রান্তিপাত। ক্রান্তিপাত হইতে পূর্ব্ব পশ্চিমে কল্পিত রেখার নাম বিষব রেখা। সূর্য্য যে গতি দ্বারা ঐ রেখার ২৭ অংশ উত্তর এবং ২৭ অংশ দক্ষিণে গমণ করেন তাহাকে বলে অয়ন (Equinoxial precession) এক অয়নে ৬৬ বৎসর ৮ মাস হয়।

তাহা হইলে ৫৮ অয়নে ৩৮৬২ বৎসর—ইহা বিষ্ণুপুরাণের গণনায় সহিত ঠিক মিলে যায়।

ইহা হইতে "অষ্টপঞ্চাশত" পদের একটা কোন গূঢ় অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয়। ঐ শ্লোকের সমস্তই মিলিল কেবল শুক্লপক্ষ হইল না। কিন্তু ইহাও স্থির যে শুক্লপক্ষ ব্যতীত ভীষ্ম দেহত্যাগ করেন নাই—কারণ তাঁহার ন্যায় যোগীরা কৃষ্ণপক্ষে দেহ ত্যাগ করেন না—পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহাতে গতির হানি হয়।

শেষকথা এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা হইল না যদি ঐ পদের অর্থ ৫৮ না হইয়া বিয়াল্লিশ হয়—তাহা হইলে ৬৬⅔ × ৪২ = ২৮০০ বৎসর অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধের অল্পকাল পূর্ব্বে ইহাতে বিষ্ণুপুরাণের উক্তি ভ্রমাত্মক হইয়া যায়। আমরা মহামূর্খ ভরসা করি কোন পণ্ডিত এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিবেন।

(চ)

মহাভারতের প্রচার সম্পর্কে আমরা বলিয়াছি নীলকণ্ঠ সর্পসত্রে প্রথম প্রচারের পক্ষপাতী—মত প্রকাশ করিয়াছেন বাস্তবিক তাহা তিনি—করেন নাই। তাঁহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই—তিনিও সর্প সত্রের বহুপূর্ব্বে প্রচারিত এই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন

(ছ)

কুরুক্ষেত্র জগতের—সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধ বলিয়া আমরা শ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছি—কিন্তু গ্রন্থ সমাপ্তির পরে—ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ সেনা সংখ্যায় আমাদের সে গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে। তাহা হইলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, যুদ্ধকে কি করিয়া পশুত্ব হইতে পৃথক রাখিতে হয় তাহার চরম দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনন্তকাল শ্রেষ্ঠ থাকিবে।

এই ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ ভীষ্ম কথিত সমাজতন্ত্রের অনেক সহায়তা করিবে এরূপ আশা হইতেছে।